REGISTERED NO. C. 305.

নবপর্য্যায়, ৪র্থ ভাগ] বৈশাখ ১৩২২। [১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়

মাসিকপত্র

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল, } সম্পাদিত।
পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ
সহকারি-সম্পাদক।

সূচী।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

উপাধি-দানপত্রম্।

চট্টগ্রামবাস্তব্যায়, শ্রীমতে ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থায় নানা শাস্ত্রেষু সমধিক-পাটবন্দৃষ্ট্বা 'শাস্ত্রী'ত্যুপাধিঃ প্রদত্তঃ। শকাব্দীয় (১৮৩৬) সৌর-কার্ত্তিক-পৌর্ণমাস্যাং সোমবাসরে, কলিকাতাস্থ-গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরে।

১। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শর্ম্মণা। (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ-অধ্যক্ষ, সংস্কৃত পরীক্ষা-সমিতি-সম্পাদক)

২। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ শর্ম্মভিঃ। (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভার্সিটি এম্. এ সংস্কৃত অধ্যাপক)

৩। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন শর্ম্মণা। (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত চতুষ্পাঠি-সমূহ পরিদর্শক)

৪। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ শর্ম্মভিঃ (সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ন্যায় শাস্ত্র-অধ্যাপক, সংপ্রতি পাকাটোল নবদ্বীপ)

৫। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—শ্রীলক্ষ্মণশাস্ত্রি দ্রাবিড় শর্ম্মণা,

সানন্দং সমভ্যনুজ্ঞায়তে পদবীয়ম।

(গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ এবং সাঙ্গবেদবিদ্যালয় অধ্যাপক, সম্পাদক।

৬। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক—

শ্রীচিত্রধর মিশ্রৈর্ম্মীমাংসকশিরোমণিভি মৈথিলৈঃ।

(দ্বারবঙ্গাধীশ্বর প্রধান-সভা ধর্ম্ম-জাতি-বিচার-পাঠশালাধ্যক্ষ)

৭। ব্যাকরণ-বেদান্তাচার্য্যোপাধিধারি-দ্বিবেদ্যুপনামক—শ্রীঠাকুরপ্রসাদ শর্ম্মভিঃ। (গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, সংপ্রতি এলাহাবাদ সংস্কৃত বিদ্যালয়-সমূহ পরিদর্শক)

সূচীপত্র।

১৩২২ সাল।

* মাঘ ও ফাল্গুন একত্রে ও চৈত্র সংখ্যার পত্রাঙ্ক প্রত্যেক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছে। পং সং।

* মাঘ ও ফাল্গুন একত্রে ও চৈত্র সংখ্যার পত্রাঙ্ক প্রত্যেক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছে। পং সং।

* মাঘ ও ফাল্গুন একত্রে ও চৈত্র সংখ্যার পত্রাঙ্ক প্রত্যেক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছে। পং সং।

* মাঘ ও ফাল্গুন একত্রে ও চৈত্র সংখ্যার পত্রাঙ্ক প্রত্যেক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছে। পং সং।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] বৈশাখ ১৩২২। [১ম সংখ্যা

আবাহন।

পূর্ণ ইন্দু ঢল ঢল, ঢালি সুধা নিরমল,
সোমরসে সর্ব্বভূতে সঞ্চারে জীবন
পাবকে পবনে যাহা, ভূলোকে দ্যুলোকে তাহা,
রূপে, রসে, গন্ধে, সর্ব্বে তাহারি স্ফুরণ।

(১)

নব রবি-করোজ্জ্বল শান্ত নীল নভস্থল,
কনক-কিরণ-স্নাত শ্যাম-ধরাতল,
কাননে কুসুমদলে, নীহারকণিকা ছলে,
অসংখ্য হীরক খণ্ড করে ঝলমল।
কোকিল-কূজিত কুঞ্জে, বিয়াকুল অলি গুঞ্জে,
রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দে দিক্ মুখরিত;
বাসন্তি সুষমা-সাজে সুশান্ত ধরণী রাজে
মধুছন্দ-রাগে হিয়া মৃদু বিকম্পিত।

"সমীরণ মধুময় মধুক্ষরে সিন্ধুচয়,
মধুময় তৃণ লতা ওষধি সকল,
মধুময় মধু-নিশা, মধুর হাসিছে ঊষা,
মধুময় বজ্রোযুতা ধরণী শ্যামল !
মধুময় নভস্থল মধুমান দ্রুমদল,
দেবলোকে পিতৃলোকে মধুস্রোত বয়,
মধুমান দীপ্তরবি, মধুরসে সিক্তগবি,
মাধুর্য্য-আপ্লুত সবি সব মধুময়।"
সেই মধুচ্ছন্দ তানে মন বুদ্ধি চিত্ত টানে
কি যেন আনন্দময় কোন দেশ হ'তে
পবনে সলিলে মিশি, উছলিয়া দশ দিশি
পাশছে আনন্দ গীতি এ মর্ত্ত্যজগতে।
বসি বিশ্ব-হৃদি পুরে কা'র বীণা সপ্তসুরে
ঢালিছে অমিয় ধারা পুরি দিগঙ্গন
সে মহা রাগিণী ছন্দে ভুলি সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বে
উঠিছে মরমে কিবা আকুল স্পন্দন ;
কত ছন্দ, কত রস, কিবা রূপ, কি পরশ,
কি গন্ধ গৌরব ছুটে ও মধু সঙ্গীতে
লক্ষ্যহীন গ্রহতারা হর্ষভরে দিশাহারা
আনন্দে ছুটিছে কা'ব চরণ চুম্বিতে !
গগন পবন জল, সে মাধুর্য্যে ছল ছল,
অনন্ত লহরী তুলি' খে'ল' কি লীলায়,—
জগতের পর পারে কাহার নিকুঞ্জ দ্বারে
ঢলিয়া গলিয়া গিয়া মিশিবারে ধায় !
কি যেন কি ভাষামন্ত্রে কি ছন্দ, কি ঋষিতন্ত্রে
কি অচিন্ত্য লক্ষ্যে ধায় সে অনন্ত গীতি।
নীরব স্পন্দনে তা'র খুলি মরমের দ্বার
অলক্ষ্যে বহিয়া যায় কোন্ লক্ষ্য প্রতি !
অচ্ছিন্ন ঝঙ্কার তা'র এ' বাজে বিশ্বহৃদি তারে
মহামন্ত্রে এক-মাত্র প্রণব রাগিণী—

অশনি গর্জ্জনে তাই, যে গীতি শুনিতে পাই,
কাল মেঘ, প্রভঞ্জন , তা'রি গুরু বিকম্পন,
বহে তাই তটিনীর মৃদুল হিল্লোলে;
লতার লাবণ্যে মাখা তাহারি পাই যে দেখা,
চপলা চমকে যাহা, প্রিয় আলিঙ্গনে তাহা,
তাহাই উঠিছে ফুটি' পুষ্প-পরিমলে;
রসে, গন্ধে, শব্দে, স্পর্শে, সুবিশাল দৃশ্য বিশ্বে,
বহিতেছে সেই এক সনাতনী বাণী :—
অনন্ত অনাদি নিত্য অপোজ্যোতিরসোহমৃত
ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পবিত্র রাগিণী।

(২)

ত্যজি' দেহ দৃশ্য বিশ্ব ইন্দ্রিয়-আবাস,
তরঙ্গ-রঙ্গেতে কত সে লীলা বিলাস,
বাসনার শত আশা করিয়া নিরাস,
শোক হর্ষ, দুঃখ দৈন্য, পাপ পুণ্য ছাড়ি'
আকাঙ্ক্ষা আশার পার, নিরাশার রুদ্ধ দ্বার,
ছাড়ায়ে চলেছে ঐ কম'রূপ ধরি।
(তাই) তটিনী ধাইছে সাগরে মিশিতে
গিরি তুলে শির আকাশে;
রূপের লাগিয়া ধাইছে নয়ন,
গন্ধ মিশিছে বাতাসে।
তপনে ঘেরিয়া ঘুরিছে ধরণী ,
ধরণীর পাশে ঘুরিছে চাঁদা;
জগত মাঝারে সে চাহে তাহারে
যা'র কাছে যা'র পরাণ বাঁধা।
জগত জুড়িয়া মিলনের মেলা,
মিলনের আশে করে ছুটাছুটি;
জীবন প্রবাহ মরণ বেলায়,
আবেগে কাঁপিয়া পড়িছে লুটি।

ঊর্দ্ধে নীল নভস্থলে নিম্নে নীল সিন্ধুজলে,
উভয় নীলিমা জুড়ি' দিগান্ত সীমায়,
গগন পবন জল কি মাধুর্য্যে ঢল ঢল
অসংখ্য লহরীমালা খেলে কি লীলায় !
কামের কম্পনে তা'ই তাহাই দেখিতে পাই,
বাজিতেছে সেই সত্য সনাতন বাণী—
অনন্ত অনাদি নিত্য অপো-জ্যোতিরসোঽমৃত
ব্রহ্মাভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পবিত্র রাগিণী।

(৩)

যখন যে দিকে চাই তা'রি ঊর্দ্ধে দেখি তাই
সে চির-নবীন সেই পুরাতন বাণী—
অনন্ত বিশ্বের বক্ষে, গুপ্ত মরমের কক্ষে,
একতানে বাজে সেই অমৃত রাগিণী,—
দেহাতীত কামাতীত শুদ্ধ বুদ্ধি পরতীত
মনের অতীত পর সেই পরা বাণী
দেহ, কাম, মনে ব'সে জুড়ি মহাছন্দ রসে
সে মহাযোগিনী সর্ব্ব ছন্দের জননী।
(তাই) কামে বাসনাতে যাহা সঙ্কল্প বিকল্পে তাহা
দেখি সেই মহামন্ত্র জগত-প্লাবিনী।
চতুর আনন কত ডুবে তা'হে অবিরত,
আদি অবসান হীন সে গীত রাগিণী।
তাহার চরণ তলে উঠে' পড়ে' যায় গলে'
সঙ্কল্প বিকল্পে গড়া শত ঊর্ম্মিমালা
সুবিমল ঢল ঢল লীলা রসে অচঞ্চল,
বিষ্ণু হৃদি-পদ্মে ব'সে খেলে সে বিমলা।
'মহেশ-বদনোদ্ভবা বিষ্ণুহৃদয়-সম্ভবা
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা,'—এরূপ যাঁহার
ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন, তপ আদি-সহ
সবার প্রসূতি, সর্ব্ব জ্যোতির আধার ;

ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী, সতী, রুদ্রাণী সে সরস্বতী.
সৃজনকারিণী শিবা পোষিণী, নাশিনী
অনাদি অনন্ত নিত্য আপো জ্যোতিরসোঽমৃত
ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ পবিত্র রাগিণী।
চিদাকাশ হৃদাকাশে, যাঁ'র প্রতিবিম্ব ভাসে,
সবার প্রসূতি, ভর্গ বরেণ্য সবার;
সবার জননী উমা, সেই বুদ্ধি-বিন্দু দে'মা,
সর্ব্ব হৃদে ফুটে যাহে আভাস তোমার।
সকলের মূলে মাগো, আনন্দ স্বরূপে জাগো,
তাইত, সকলি ভবে লাগে মধুময়,
মাধুরি স্বরূপ তবে বুঝিবে কেমনে সবে
'বোধ'রূপে তুমি হৃদে না হ'লে উদয়!
রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ,
তোমার পদাঙ্ক যদি দৃষ্ট নাহি হয়',
জগতে যা' কিছু যত, হবে ভোগে পরিণত
হিংসা দ্বেষ আকাঙ্ক্ষার পূতিগন্ধময়।
কমনীয় কামরসে জীব মোহ মায়াবশে
সংসারের নাগ-পাশে হয়ে জর্জ্জরিত
ক্ষুদ্র অহঙ্কারে মজে' নরকের বহ্নি মাঝে.
সদতই কৃপাময়ি হয় প্রজ্বলিত।
তাই কৃপাময়ি মা গো শিবসীমন্তিনি জাগো,
তোমার অবিদ্যারূপ করি পরিহার,
জীবহৃদি মণি দ্বীপে রতনমন্দিরে শিবে
বিদ্যা-রূপে সর্ব্ববিত্তে কল্যাণি তোমার।
রত্নসিংহাসন'পরে বগলা মূরতি ধ'রে,
মানস-মোহিনী রূপে বসিয়া শঙ্করি,
পাপ-রসনারে টানি' শিরেতে মুদ্গর হানি
অস্মিতা-অসুরে মাগো ফেলহ সংহারি।

শ্রীচিন্তা—

আমাদের একোনবিংশ বৎসর।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা অনুস্মৃতিস্বভাবাৎ।
যৎ যৎ করোমি সকলং পরস্মৈ নারায়ণায় সমর্পয়ামি।
যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতং।
ত্বয়াকৃতন্ত ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদনঃ॥

গত বৎসরের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই সেই বেদবেদ্য পুরুষোত্তমের শ্রীচরণকমলে অর্পিত হইল। ওঁ তয়োধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ॥

পন্থার অষ্টাদশ বর্ষ হাসি কান্নায় একরকমে অতিবাহিত হইল। সাবালক হইয়া পন্থা পশ্চাৎ জীবনের অনুশীলন করিল। দেখিল, কিরূপে শিশুর মত অধ্যাত্মজগতের খেলানা-স্থানীয় বিষয়রাশি ও অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। দেখিল যে তাহার সহিত বাহ্য পারিপার্শ্বিক জগতেরও এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে যখন অদ্ভুত ঘটনা লইয়া আকৃষ্ট ছিল, তাহার গ্রাহকদিগের মধ্যেও সেইভাবের প্রতিধ্বনি হইত এবং তখন সকলেই পন্থার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার যশঃসৌরভের বর্দ্ধনা করিতেন। সেই সময়কার 'পন্থার' অভিভাবকগণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম।

তারপর, স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পন্থার গমন এবং তাঁহার নিকট হইতে অধ্যাত্মবিদ্যার "হাতে খড়ি" সিদ্ধ হয়। তাঁহারই হৃদয়ের বাণী পন্থার প্রতি শিরায় রক্তরূপে এখনও প্রবাহিত হইতেছে। তারপর পন্থা তত্ত্ব-বিদ্যা-সমিতির স্কুলে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ঐ সমিতির সভ্যগণ অবসর মত পন্থার কিছু তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং কখনও কখনও উপদেশাদি দিতেন। কিন্তু পন্থা প্রকৃত পক্ষে তখনও তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির মুখ-পত্র হয় নাই। আধুনিক তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত করেন, উহার অধিকাংশই হিন্দুর পক্ষে নূতন নহে। তবে একটী মহাভাবে ঐ সমিতির উপদেশগুলি বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি শ্রীমতী আনি বেশান্তের অভিনব অবতারবাদ প্রভৃতির কথা বলিতেছি না ও উহার সহিত আমার কোন সহানুভূতিও নাই। তিনি কর্ত্রী হইবার অগ্রে তত্ত্ববিদ্যা সমিতি সর্ব্বাত্মিকা বা বিদ্যাভাবে তত্ত্বগুলির প্রচার করিতেন এবং

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এই সর্ব্বাত্মিকা ভাবের বিকাশ হওয়া খুবই আবশ্যক। আজকাল হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপাসনা পুনরায় আসিতেছে। কিন্তু ঐ সব ভাবগুলি এখনও ব্যক্তিগত ভাবে পর্য্যবসিত, তাহাতে তত্ত্বের স্থান নাই। যে সাধনা আমার ভাল লাগে তাহাই ভাল; আমার গুরু একজন প্রকাণ্ড যোগী। এখন গুরুমাত্রেই অবতাররূপে ক্রমবিকাশের একটী স্তরমাত্র। বেদবেদ্য ঋষিপূজ্য ভগবান্ আর এখন ধ্যেয় নহেন, সম্প্রদায়মাত্রেই এখন তাঁহাদের নিজ নিজ গুরুকে ভগবানের স্থানে বসাইয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত। সকলের ভগবান্ যে সকলেরই ভিতরে, অধিকার অনুসারে ফুটিতে পারেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন উদ্দেশ্য বা মুখ্যভাবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং অপর সকলকে সেই মতে আনিবার জন্য সদাই ব্যস্ত। নবীন ধর্ম্মভাবে উন্মত্ত শিশু মানব মনে করে যে সে বুঝি না কার্য্য করিলে জীবকুলের রক্ষা হইবে না, সে ভুলিয়া যায় যে, প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই পরিপূর্ণ পরমপুরুষের সত্তা স্বতঃই বিদ্যমান, এবং তিনি যখন যে পথে মানবকে লইয়া যান সেই পথই মানবের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়। আধুনিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এই ব্যক্তিগত ভাবের প্রাধান্য বাড়িয়াছে। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী জানেন যে 'সর্ব্বে'ই আত্মা সমানভাবে বিরাজমান, ও সাধনা এবং উপদেশের ভিতর দিয়া সার্ব্বজনীন সর্ব্বাত্মিক তত্ত্বগুলি প্রকট হয়। তুমি নামসংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার ভিতর ইন্দ্রিয়গুলি যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবশেষে ধ্যেয়ের আকারে পর্য্যবসিত হয়, তাহার কারণ খোল করতাল এবং শব্দরাশি নহে। উহা প্রত্যাহার ও ধ্যানতত্ত্বের সর্ব্বাত্মিক নিয়মের বিকাশমাত্র। রামকৃষ্ণদেব 'নহি হাম্ তুঁহু তুঁহু' বলিয়া সমাধিতে অবস্থিত হইতেন Jennyson নিজ নাম জপ করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। সকলের হৃদয়ে চৈতন্যের মধ্যে পরাভাবের যে আকর্ষণ আছে, যাহার বশে আমরা ব্যক্ত বহু ত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখী হইয়া, অভিনব পরাভাবের দিকে ছুটিয়া যাই সে ত' কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ সম্পত্তি নহে; সে যে হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রকাশের ফলমাত্র। সেই পরমাকর্ষক 'পর' পুরুষ সকলের হৃদয়ে বসিয়া জীবকে অবশ-ভাবে খেলাইয়া লইয়া যাইতেছেন, তিনি যখন বাহিরের দিকে খেলেন, তখন বিশ্বামিত্রেরও ধ্যানভঙ্গ হয়, ও ঋষিবর বাহিরে আসিয়া মেনকাকে পরিগ্রহ করেন। আবার যখন তিনি জীবকে আপনার দিকে টানেন, তখন বিল্বমঙ্গল লীলাশুক হইয়া তাঁহাতে ডুবিয়া যায়। তাঁহার আকর্ষণ

ও ধ্যানের সর্ব্বাত্মিক তত্ত্বই ভক্তজীবনে প্রকটিত অভিনব ঘটনাবলীর মূল কারণ; তাহা না বুঝিয়া ব্যক্ত ভাবের মোহে আমরা বিশিষ্ট গুরু সম্প্রদায় প্রভৃতির পূজা করিয়া ফেলি।

বৃন্দাবন-লীলার আগে ভাগবত দ্রব্যাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং ভাবাদ্বৈত রূপ সর্ব্বাত্মিক ভাবের সাধন উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে বাহিরেই তাঁহাকে দেখিতে হয়। তিনি হৃদয়ে স্বতঃ অভিব্যক্ত হইলেও বাহিরের ভেদভ্রান্তি না ঘুচিলে আমরা যে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। একদিন হিন্দুর ইহা মূল ভাব ছিল। তাই অপর কর্তৃক প্রতারিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও হিন্দু বুঝিত যে উহা "আপন করম দোষে।" সে যাহা হউক, হৃদয়ে প্রেমময়ের আকর্ষণ অস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইলে, আমরা প্রথমে তাঁহাকে বাহিরেই দেখিয়া ফেলি। 'আমি'টাকে এত ছোট করিয়া ফেলিয়াছি যে, আমি ছাড়া 'সবই' স্বতঃই বাহিরে গিয়া পড়ে বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতর দিয়া এই সকল তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

গুরুতত্ত্বের সাহায্যে জীবের হৃদয়ের অপরিস্ফুট 'পরা'-প্রীতি বা পরকীয়া রস সর্ব্বপ্রথমে ভগবদ্রূপে প্রতিস্থাপিত হয়। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে মানব যে ভাবে ভগবানকে চায়, প্রকৃত গুরু সেই তত্ত্বের বীজ দান করেন। ইহাই সাধনের প্রথম অবস্থা। আমি পেশাদারী দীক্ষার কথা কহিতেছি না, প্রকৃত গুরুলাভের ফল কহিতেছি। তখন জীব পদাবলীর ভাষায় বলে—

সখি। কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

তখন ব্যক্তিগত ভাবে সাধনা করিতে, জীব দেখিতে পায়—

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তা'রে॥

এখনও 'চাওয়া পাওয়া' আছে চেষ্টা আছে, প্রযত্ন আছে; এখনও মনে হয় 'আমি না সাধনা সাধিলে অমনি কি হইতে পারে'? এইরূপে সাধক জোর করিয়া বাহ্যের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া ভিতরে তাঁহাকে খুঁজিতে যায়।

তাহাতে এক অভিনব ফল সিদ্ধ হয়। তৎপূর্ব্বে সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল বৃত্তি বাহ্যভাবে বস্তুরূপে না সমাপ্ত হইলে তৃপ্তি হইত না। এইবার প্রত্যাহার আরম্ভ হইল; এই বাহ্যের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, ও ভিতরের প্রতি আস্থা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও জীব ভগবানের প্রকাশের পূর্ণক্ষেত্র হইতে পারে না। এই অবস্থায় যদি কোন দিন সেই 'পর' পুরুষের আকর্ষণ প্রকট হয়, তখন জীব ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া বাহ্যভাবেই ছুটিয়া আসিতে চায়। তাহার মনে হয় বুঝি সেই পরাগতিতে তাহার 'আমি'টী পর্য্যন্ত হারাইয়া যাইবে। 'বিশিষ্ট অহং জ্ঞানে মুগ্ধ জীবের ভাব বিদ্যাপতির পদে সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। প্রত্যাহারের সময় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি আত্মার সখীরূপে খেলে। "চিত্তস্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।" পাতঞ্জল। ২।৫৪।

তাই—

সব সখি মিলি যব শুতায়ল পাশ,
চমকি চমকি ধনি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
করইতে কোরে ধনি মোড়সি অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনে যেন বালভুজঙ্গ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুঁহু রসসাগর মুগধিনী নারী॥

তারপর রসিকশেখরের কথঞ্চিৎ অনুভূতির পর, তাঁহাকে সর্ব্বাত্মভাবে দেখিতে হয়। তিনি যে সব, তিনিই যে কর্ত্তা, তিনিই যে আকর্ষক, তাঁহার টানেই যে ধ্যান ধারণা প্রভৃতি হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া জীব দ্বিতীয় বা ধ্যানের স্তরে উপনীত হয়। তখন প্রত্যয় মাত্রই একতান হইয়া ধ্যেয়রূপে মিশিতে যায়। একটী প্রত্যয় হইল; উহা আর বাহ্যভাবে বস্তুরূপে স্থির হইল না। বস্তু ভাব ক্ষণমাত্র জাগিল বটে; কিন্তু পরক্ষণেই ধ্যানরূপ আকর্ষণের স্রোতে পড়িয়া বাহ্যজ্ঞানটী অন্তর্ম্মুখী হইয়া (প্রতি + অঞ্চতি = প্রত্যয়) ধ্যেয়ের দিকে ছুটিয়া যায়। প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়াই সেই মদনমোহনের রূপ ফুটিয়া উঠে।

ধরি নাপতিনীবেশ, মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া আছে রাই

নাপতিনীরূপ ব্যক্ত ভাবের দিয়া শেষে কি ফুটিল দেখ ;—

নাপতিনী কহে ধনি শ্যামনাম ধরি আমি

বসতি যে তোমার নগরে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এত নাপতিনী নয়

কামাইলা যাহ নিজ ঘরে ॥

তারপর দেখ 'পসারী'রূপে কামদাতা দোকান পাতিয়া বলিতেছেন—

মুকুতা প্রবাল মণিময় হার

পাতিক মাণিক যত

বহুদিন মনে আনিলা যতনে

তোমাদের অভিমত ॥

তার পর ভগবান—

দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে

রাধিকা দেখিবার তরে।

পিন্ধিয়া বিভূতি সাজল মুরতি

রুদ্রাক্ষ লইয়া করে ॥

ইহাই তাঁহার শাস্ত্র ও সাধনার ভিতরের মূর্ত্তি। শিশুমানব তখনও ফল চায়, তখনও 'ধনং দেহি পুত্রং দেহি" বলে, তাই দেয়াশিনীরূপে ভগবান বিদ্যাভাবের আরাধনা করিতে বলিতেছেন—

কহে জয়দেবি ব্রজপুরে সেবি

গোকুল রক্ষক নিতি,

গোপগোয়ালিনী সৌভাগ্যদায়িনী

পূজ দেবি ভগবতী ॥

* * *

সবাকার জয় শত্রুহবে ক্ষয়

মনে ভয় না ভাবিবে,

তোমাদের প্রতি সুন্দর মতি

সবাকার ভাল হবে ॥

কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ ভাব ফুটিয়াছে, তাঁহাকে দেয়াশিনী বলে—

একটী শপথি রাখহ যুবতি

কহিতে বাসিহে ভয়,

পরগতি সনে　　বেঁধেছ পরাণে
ইহাই দেবতা কয়॥

তখন—

নিরখি বদন　　বিহ্বল তখন
শ্যামনাগর চাটে।

তারপর—

নাগর আপনি　　হইল 'বণিকিনী'
কৌতুক করিব মনে।

আবার দেখ—

'বেদিয়ার' বেশ ধরি　　বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।

আসিয়া,—জীব-ভাবের　　বস্ত্রখানি চাহিলেন,—

বস্ত্র মাগিবার তরে　　আইনু তোদের ঘরে
বস্ত্রদেহ আসিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব　　ভাল একখানি পাব
দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গের খানি॥

কতরূপে, কতভাবে 'সর্ব্বের' ভিতর দিয়া ভগবান্ জীবের নিকটে ভিক্ষা করেন। ভিক্ষাটী কিসের? হিরণ্ময়—কারণ শরীরের বা জীবকোষের।

বসন না লয়　　আর ধন চায়
কহে সুবদনী পাশে।
চিন্ময় মাঝারে　　হেমঘট আছে
দিয়া পুর অভিলাষে॥

ইহাই সর্ব্বাত্মিকা-ভাব বা বিদ্যাতত্ত্বের বিলাস। ইহাই তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির উদ্দেশ্য। 'সর্ব্বের' ভিতর, জীবের ভিতর, প্রকৃতির ভিতর, সেই পরপুরুষের পদ-ছায়া বা বিলাস দেখিতে দেখিতে ভিতর বাহির সমান হইয়া যাইবে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, সেই মহানটের নাট্যের মধ্যে আমরা ত' তাঁহাকে চিনিতে পারি না। আমরা তাঁহাকে বাদ দিয়া পৃথক্ ভাবে জীবসেবা করিতে ছুটি। কাজেই কতকগুলি মৃততত্ত্ব লইয়া খেলা করিয়া পরম-তত্ত্বকে হারাইয়া ফেলি। 'পন্থা' এই স্তরে থাকিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের মধ্যে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনিই যে সমস্ত শাস্ত্রের বেত্ত,

ঋষি-প্রণীত সমস্ত শাস্ত্রের, সমস্ত উপদেশের ভিতর দিয়া যে তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হয়, এমন কি শাস্ত্র 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দে যে তাঁহাকেই প্রকাশ করে—

"বাসুদেবপরঃ নান্যং অর্থো বিদ্যতে কশ্চন।"

ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সর্ব্বাত্মিক ভাবেই শাস্ত্রের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। ঐ ভাবে বর্জ্জিত হইয়া শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান গুলিও—"বৃথা শ্রমো হি কেবলং" হইয়া যায়।

বৈষ্ণব কবির ভাবের ভাষায় ভগবানের সর্ব্বাত্মিকা ভাবের খেলা কিছু বুঝা গেল। সবই যে আত্মা সবই যে ভগবান্ ইহা বুঝাইবার জন্য—"দ্যূতম্ ছলয়তামস্মি" প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ'—প্রভৃতি নানা ভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। আমরা ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণতার প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া, আপন আপন মহলে বসিয়া রহিয়াছি। তাই তিনি নানাবিধ বেশে আগমন করত পুরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে চাহেন। লম্পট, কামের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সামান্য সুখের পশ্চাতে ঘুরিতে ঘুরিতে, সহসা কোন রমণীর ভিতরে অভিনব ভাবে অভিব্যক্ত কি এক জিনিস দেখিয়া ফেলিল, যে তাহাতে তা'র কাম-পিপাসা প্রেমরূপে পরিণত হইয়া গেল। প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতে করিতে কবিবর Wordsworth রাধার ভাষায়—'শ্যাম তুঁহু মম মরণ সমান' বলিয়া ফেলিলেন। তখন স্তিমিত-ইন্দ্রিয়ে নিবৃত্ত হৃদয়ে, তাঁহার ভিতর দিয়া কি এক অপরূপ রূপের মদনমোহন প্রভা বিকশিত হইয়া গেল; এবং তিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যাহা নাই এমন এক 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি'র অনুভব করিলেন,—

The Light that ne'r was on land or sea
The consecration and the poet's dream

এইরূপে আয়ুর্ব্বেদে জীবনী শক্তিরূপে তিনিইত ফুটিয়া উঠেন। এটি অপরাবিদ্যার স্তর। এইরূপে জ্যোতিষ কলাবিদ্যা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহার পদচিহ্ন চিনিতে পারা যায়।

তারপর বিদ্যা বা মহাবিদ্যার ভিতর দিয়া তাঁহার বিকাশ। উহা ঘন একরস ভাবের খেলা, উহাতে আর জগৎ, দ্রব্য শক্তি প্রভৃতি ভাবের লেশ থাকে না। কবিতার রস অনুভব করিতে গেলে, যেমন কবিতা থাকা আবশ্যক,

মহাবিদ্যা ভাবে আর তত্তটুকুও থাকে না। সমস্ত চৈতন্যই বা চৈতন্যময়ীই আপনা আপনি ভগবৎরূপে সিদ্ধ হইয়া যান।

পরাগতি, মহাবিদ্যা প্রভৃতি একভাবেরই খেলা। ধ্যান ও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে আর সর্ব্বভাব থাকে না, সর্ব্বঘন হইয়া একে মিশিয়া যায়। সেইজন্য এই বৎসরে আমরা একদিকে দশ মহাবিদ্যা-তত্ত্ব, অপর দিকে সন্ধ্যাবন্দনা ও যোগ-মার্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সেই মহাভাবময়ী আনন্দময়ীর 'অবসান'রূপ খেলা দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করিব। হিন্দু দেখিবেন যে অধুনাতন প্রচলিত উপাসনা-প্রণালী অপেক্ষা কত উচ্চ স্তরে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় আমাদিগের এই আশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু আমরা জানি করুণাময় ঋষিগণ জীবের করধারণ করত উত্তোলন করিবার জন্য এখনও প্রস্তুত আছেন,—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা দেবী এখনও জীবহৃদয়ে খেলিতেছেন,—আর-

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।

জাগরণ।

১

নূতন ক'রে নূতন ত'রে চল্‌রে সখি! চল্,
নূতন প্রাতে আঙিনাতে ডাকি দলে দল।
রসিক সখি! দখিণ বায়,
বকুল বাসে আকুল ধায়,
চাঁদের সুধা মাখিয়ে গা'য় জুড়ায় আঁখি, চল্
বাজাই ভোরে তাহার তরে শঙ্খ সুমঙ্গল।

২

রূপের মাঝে অরূপ সে যে, গানের মাঝে তান,
বাণীর মাঝে হাসি সে যে, প্রাণের মাঝে প্রাণ।

তা'রি নামে পাগল মোরা,
তা'রি রূপে ভুবন ভোরা,
কালা গোরা বর্ণচোরা নবীন সুঠাম,
মধুর মধু, বঁধুর বঁধু, নয়ন আরাম।

৩

শান্তিচোর পুরাণ'র তপ্ত বাতে ভরি',
আশা, ভাষা, ভালবাসা হেলায়' পাসরি'
মুছিয়ে মলা নয়ন জলে,
মিলি' তাহার চরণ তলে,
তৃপ্ত করি' দৃপ্ত তার উচ্ছ্বাস—সে যে মরি।
আশার আশা, ভাষার ভাষা, তৃষার তৃষাহারী।

৪

পেতে দেব,' দেব', দেব, হৃদয়-আসন তা'য়,
বুকের বুকে, লুকিয়ে সুখে, বুঝ্‌ব শ্যামরায়'।
জ্বাল্‌ব বাতি দিবারাতি,
নবীন আলো, নবীন ভাতি,
উঠ্‌বে ফুটে, যা'বে টুটে, বেদনা, বিদায়,
সাঙ্গ হ'বে, রঙ্গ সব,—ব্যঙ্গ অভিনয়।

৫

রুদ্ধ ক'রে শুদ্ধ মোরে ভাব্‌ব না সই আর।
বিলিয়ে দেব', মিশিয়ে দেব' ভাবের তা'রে তার।
লুপ্ত আজি সকল ব্যথা,
সুপ্ত দুখ-বিশাদতা ;
নব কথা, নবীনতা, ফুকারে এবার,
গুপ্ত হৃদ ব্যক্ত করি' হ'ব আগুসার।

'প্রসাদ'

[মোক্ষ।]

এইত শ্যামসুন্দর।

ইন্দিবর কান্তি-হর এইত শ্যামসুন্দর।
এইত হাঁসি, এইত বাঁশী, এইত ব্রজ নটবর॥
এইত সে সুনীল তনু, এইত গোপী-মনচোর।
এইত সখা নয়ন-বাঁকা, এইত ব্রজমনোহর॥
এই যে আকাশ, এই যে বাতাস, এই যে ক্ষিতি অগ্নি জলে।
এই যে নীল সিন্ধুতোয়ে, এই যে নদী কলরোলে॥
এই যে সুখে, এই যে দুঃখে, এই যে প্রেম অশ্রুজলে।
এই যে লতা পুষ্প পাতায়, এই যে নব দূর্ব্বাদলে॥
এই ত শ্যামল বনস্থলে, এই যে ভীষণ দাবানলে।
এই যে পরিপূর্ণ প্রেমে জীবন সব টলমলে॥
এই যে রোদন বেদনেতে, এই যে যোগে বিচ্ছেদে।
এইত তুমি জীবনস্বামি। বিপদে ও সম্পদে॥
এই যে তুমি জীবন ধারে, এই যে তুমি মৃত্যুতে।
এই যে তুমি বন্ধু বেশে দাঁড়িয়ে ভব-সিন্ধুতে॥
এই যে তুমি পরম জ্ঞানে, এই যে তুমি ভ্রান্তিতে।
এইত তুমি দ্বন্দ্ব মোহে এইত তুমি শান্তিতে॥
এই যে তুমি নানা ছন্দে, এই যে তুমি সঙ্গীতে।
এইত তুমি কলহ বাদে, এই যে নানা ভঙ্গীতে॥
এই যে প্রাণে, এই যে মনে, এই যে হাঁসি কান্নাতে।
এই যে তোমায় পরশ পাই নিভৃত হৃদি কুঞ্জেতে॥
এই যে তুমি শিশুর মুখে, এই যে নারী-চিত্তেতে।
এইত তুমি—এইত তুমি—এইত তুমি— সর্ব্বেতে॥

রূপময়ের রূপ।

গত বৎসর দুইটী প্রবন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপদেশ বিষয়ে, একমাত্র ভগবানই যে ভাগবতের বেদ্য ও গতি, তাহা অপরিস্ফুট ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার পর তীর্থভ্রমণাদি ব্যপদেশে প্রবাসী হইয়া থাকায় আর এ বিষয়ে কিছু লিখিতে পারি নাই। এজন্য আপনাদের ও গ্রাহকগণের নিকট আমার অপরাধ হইয়াছে। যাহা হউক, যদি ভগবান্ দিন দেন, তবে এবৎসর এ বিষয়ে পুনরায় যথাজ্ঞান ও যথাস্মৃতি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাগবত অন্য শাস্ত্রের ন্যায় সার্ব্বজনীন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি নির্ণয়ের জন্য রচিত নহে। ভাগবত সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি মূল ভাবের ভিতর দিয়া নানা তত্ত্ব-কথা বলিবে সত্য, কিন্তু তাহা এরূপভাবে বলিবে যে, 'ছাঁট্ ছুট' বাদ দিয়া,সার টুকু,—ভগবানই যে একমাত্র সত্য ইহাই প্রতিপন্ন করিবে। এক্ষণে ভগবান্ বলিতে ভাগবত কি বুঝান, তাহা দেখা আবশ্যক, কারণ আজকাল ভাগবত-বক্তৃগণদ্বারা প্রকটিত ভাগবদ্ধর্ম্মে ভগবানের "মূর্ত্তির" দিকেই যেন মানবের বেশী ঝোঁক পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আধুনিক ভক্তগণ আর মূর্ত্তি ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। এমন কি 'রূপ' ও 'মূর্ত্তি'র পৃথকত্ব তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন। দ্বিভুজ মুরলীধর বা সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের রূপ, উহা মূর্ত্তি নহে। আমরা প্রাকৃত বলিয়া মূর্ত্তি অবলম্বনে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হই, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি—"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন।" ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান্ প্রভৃতি তাঁহার প্রকট বিলাস ভাব!

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদাস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভা। ১।২।১১।

তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেবও ত মূর্ত্তি নহেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের কিছুদিন পরে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবনে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমসমাদরে অতিথি সন্ন্যাসীঠাকুরকে

বসিতে আসন দিলেন। সন্ন্যাসীঠাকুর আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ;--

সন্ন্যাসী বলেন এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন কহ মোর প্রতি ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—কি উত্তর দিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু জগদ্গুরু। তাঁহার গুরু কেশব-ভারতী, এ কথা কি করিয়া বলেন? তিনি মনে ভাবিলেন,

মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈতমহাশয়।
ব্যবহার পরমার্থ দুই পক্ষ হয় ॥
যদ্যপিহ ঈশ্বরের মাতাপিতা নাই।
তথাপিহ দেবকীনন্দন করি গাই ॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥

এইরূপ মনে করিয়া তিনি সন্ন্যাসীঠাকুরকে বলিলেন—

"কেশবভারতী চৈতন্য-গুরু হয়।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র, তাঁহার পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ কোথা হইতে পিতার নিকটে সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া পৌছিলেন।

এইমাত্র অদ্বৈত বলিতে সেই ক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ॥
পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ব্বশক্তিধর ॥

জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর গুরু আছেন,—এই কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতকুমার বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভুর বড় রাগ হইয়াছে। তিনি পদ্মপলাশ সদৃশ দুটি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন :—

"কি বলিলা বাপ। বোল দেখি আর বার।
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার!

কোন্ বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা এ তো অদ্ভুত কারণ ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
যেন বুঝি এখানে সে কলিকাল হৈল ॥
অথবা চৈতন্যমায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥
বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কে বা চৈতন্যের মায়া তারিবারে পারে ॥
চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনে ইহা কহিলা কেমনে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যবে চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায় ॥
জল-ক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞি।
বিহরেন আত্মক্রীড—আর দুই নাই ॥
যত যত মহামুনি মহাঅভিমান।
উদ্দেশো না থাকে কারো, কোথা কব নাম ॥
পুন সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভি-পদ্ম হৈতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥
হইয়াও, না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
তবে শেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি ॥
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে।
তত্ত্ব-উপদেশ প্রভু কহেন আপনে ॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সভারে ॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হৈতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥
যাহা হৈতে হয় আসি জ্ঞানের উদয়।
তান্ গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। ২৩ বৈশাখ, ১৩২১।

উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় যে, যে স্বরূপতত্ত্বের কথা বলা হইল তাহাত' মূর্ত্তি নহে, উহা "রূপ" বটে। যাহা ধরিয়া থাকে বা যাহার দ্বারা ধরা যায় তাহাকে 'গ্রহ' বলে। উপনিষদে এই ভাবে 'গ্রহ' 'অতিগ্রহ' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। যে মহাভাবে আমাদের মন-বুদ্ধ্যাদি সমস্ত বৃত্তিসমূহ নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের স্বরূপের আভাস প্রদান করে, তাহাকে বিগ্রহ বলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিভিন্নভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রচিত হয়, কিন্তু সকলের ভিতর দিয়াই একটী মহাভাব বা রূপের বিকাশ হয়। সেই মহাভাবই রূপের ব্যঞ্জনা ;— 'রূপ্যতে ইতি রূপম্' ইহাই আচার্য্যের উপদেশ। স্বপ্রকাশতাই রূপ। উহা মূর্ত্তিতে নাই ; অথচ ব্যক্তাব্যক্ত, মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্ত পদার্থ হইতেই একভাবে স্ফুরিত হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণও কখনও একরূপ ভাবে মূর্ত্তি লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যে রূপ-সাগরে শ্রীরাধা ডুবিয়া ছিলেন—"জনম অবধি হম্ রূপ নেহারিনু" বলিয়া তিনি যে রূপের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহাত' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান বিশিষ্ট মূর্ত্তি নহে। তাঁহাদের 'রূপ' এক 'পরা' মহাভাবের ব্যঞ্জনা মাত্র।

নব জলধর রূপ,   মুনির মন মোহে গো
    তেজিঞ জলে যেতে করি মানা॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি   বহিয়া মদন জিতি
    চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবন বিজয়ী মালা   মেঘে সৌদামিনী কলা,
    শোভা করে শ্যাম চাঁদের গলে॥   (চণ্ডীদাস)

বেশী কথায় আবশ্যক কি, মূর্ত্তির যে ধ্যান হয় না, রূপেরই ধ্যান হয়, তাহা আগামী বারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। *

তন্ত্রশাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলেন দেখা যাউক। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কহিতেছেন :—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ॥ ৩৪।
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ॥
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদিগ্বিভুঃ॥ ৩৫

* আশাকরি ভারতী মহাশয় আগামী বারে একথাটি বুঝাইয়া দিবেন। কথাটি বড়ই জটিল, আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। পং সং

গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৬। (দ্বিতীয় উল্লাসঃ)

ভাগবত বলেন :—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥ ভাগ ২।৭।৪৭

"কিং তত ভগবতঃ স্বরূপম্? যস্মিন্ মনোধারণাবিধায় মায়াং তরন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—শশ্বদিতি সার্দ্ধেন। যদ্ব্রহ্মেতি বিদুর্মুনয়স্তদ্বৈ ভগবতঃ পদং স্বরূপম্। কিং তদ্ব্রহ্ম তদাহ,—অজস্রং নিত্যঞ্চতৎ সুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি। অজস্রসুখত্বে হেতুঃ—শশ্বৎ সদা প্রশান্তম্ অতো নিত্যসুখরূপম্। বিশোকত্বে হেতুঃ—অভয়ম্। তৎ কুতঃ? যতঃ সমং ভেদশূন্যম্ অতোঽভয়ম্। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ? যতঃ প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকরসং। নন্থ জ্ঞানস্যাপি নীলপীতাদ্যাকারেণ চক্ষুরাদি করণভেদেন চ ভেদো দৃশ্যতে? ন। শুদ্ধং নির্ম্মলম্।

নন্থ দর্শিতো বিষয়করণোপরাগরূপো মল ইত্যত আহ,—সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যম্। বৃত্তেরেব তদুপরাগঃ, ন জ্ঞানস্যেতি ভাবঃ। নন্থ তথাপি জ্ঞাত্রা সহ ভেদঃ স্যাৎ? ন। আত্মতত্ত্বম্ আত্মনো জ্ঞাতুঃ স্বরূপমেব তৎ ন ততো ভিন্নম্। নন্থচ তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শব্দবোধ্যত্বপ্রতীতেঃ কুতো বোধরূপত্বং, তত্রাহ—শব্দো ন যত্রেতি। আরোপিতভ্রমনিবৃত্তাবেব শব্দস্য ব্যাপারঃ, ন তদ্বোধ ইত্যর্থঃ। নন্থ ভবতু নাম নিবস্তুভেদজ্ঞানরূপত্বাৎ বিশোকত্বম্। সুখস্য তু নানাকারকসাধ্যক্রিয়াফলত্বাৎ কথমজস্রসুখত্বং তস্যেত্যত আহ। যত্র বহুকারকসাধ্যঃ ক্রিয়ার্থঃ উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধং ক্রিয়াফলঞ্চ নাস্তি। ইন্দ্রিয়ৈ জ্ঞানাংশস্যাভিব্যক্তিরিব ক্রিয়াভিরানন্দাংশস্যাভিব্যক্তিমাত্রং ক্রিয়তে, নোৎপত্ত্যাদির্ধর্ম্মিতি ভাবঃ। নন্থৎপত্ত্যাদ্যভাবেঽপি মায়া মলাপাকরণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহাণামিব তুষাপাকরণেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ। মায়া অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জমানেব যস্মাৎ পরৈতি দূরতোঽপসরতীতি।"—শ্রীধরঃ।

ভাষার্থ—ভগবানের স্বরূপ কি? যাহা মনে ধারণা করিলে মায়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়? যাহা ব্রহ্ম বলিয়া মুনিগণ জানেন তাহাই ভগবানের পরমপদ

বা স্বরূপ। পদ শব্দে আচার্য্য বলেন—যাহা ফুটিয়া উঠে, যাহা প্রতিপন্ন হয়; 'পদ্যতঃ ইতি পদম্'। অজস্র নিত্য সুখ ও বিশোক। অজস্র-সুখ কেন? শশ্বত ও সদা প্রশান্তঘন সমরূপী বলিয়াই সে সুখের নিত্যত্ব। বিশোকের হেতু কি? না, তিনি অভয় বলিয়া, যাহা সম ও ভেদশূন্য তাহাই অভয়; কারণ, শ্রুতি বলেন—দ্বিতীয় থাকিলেই ভয় থাকে। তিনি প্রতিবোধমাত্র বা জ্ঞানৈকরস; বোধের বা ব্যাবহারিক জ্ঞানের তলায় তলায় থাকিয়া বিপরীত ভাবে ফুটিয়া উঠেন। যদি বল জ্ঞানেও নীল পীত প্রভৃতি আকারগত, ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি করণগত ভেদ দৃষ্ট হয়। না, সেরূপ জ্ঞান নহে; শুদ্ধ ও নির্ম্মল জ্ঞান। যদি বল দর্শিত-বিষয়মাত্রেই করণ প্রভৃতির চিহ্ন বা উপরাগ থাকিয়া যায়, তাই বলি—তিনি সদসতঃ পরং অর্থাৎ বিষয় ও করণসঙ্গেরও অতীত। বৃত্তিতে উপরাগ থাকে, জ্ঞানে উপরাগ থাকে না। আচ্ছা, তা' যেন হইল; কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ ত' থাকিবে। না, তিনি যে আত্মা 'আমি' বা জ্ঞাতার স্বরূপ। 'আমি' জ্ঞানটিই তাঁহার বিলাসমাত্র। আচ্ছা, তাঁহাকে ঔপনিষদ্ পুরুষরূপে শব্দদ্বারা লক্ষিত করা হয়; তাহা হইলে তাঁহার বোধরূপত্ব কোথায় গেল? না; তাঁহাকে শব্দদ্বারা জানিতে পারা যায় না। শব্দ তত্ত্ব আরোপিত ভ্রম নাশ করে মাত্র, তাহাতে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বোধ হয় না। তাঁহাতে বহুকারকসাধ্য ক্রিয়াদি পঁহুছিতে পারে না। এমন কি, মায়াশক্তি দ্বারাও তাঁহার কোনও বিকার হয় না। মায়া তাঁহার নিকট হইতে লজ্জায় দূরে পলায়ন করে। ছিন্ন জ্ঞানেই মায়ার খেলা। তিনি যে, নিত্য পরিপূর্ণ, কাজেই তিনি মায়ার অতিগ। বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা বিজৃম্ভিত বুদ্ধিতেই মনে হয়, যেন তিনি মায়ার বিলাস ও গুণগণের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া গুণবানের মত প্রকাশিত হন।

তস্যা বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥ (ভা ১।২।৩১

যেমন যতক্ষণ আমাদিগের দৃষ্টি অগ্নির প্রকাশিত মূর্ত্তির দিকে থাকে, ততক্ষণই ইন্ধনাদি সংযোগে আকারের বোধ থাকে; কিন্তু অগ্নির স্বরূপের দিকে থাকিলে আর সে ভ্রান্তি হয় না; তদ্রূপ বিশ্বাত্মা ভগবান্ও জীবগণের ভিতরে পুরুষরূপে থাকিয়াও আধারের নানাত্ব প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশিত হয়েন।

যথাহ্যবহিতো বহ্নির্দারুম্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥ (ভা ১।২।৩২।

ভগবানে যে বিশেষরূপ বুদ্ধি হয় তাহার কারণ কি ?

এতদ্রূপং ভগবতো হ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাদিভিরাত্মনি॥ (ভা ১।২।৩০)

ভাগবত বলিলেন, উহা ভগবানের মায়াগুণে মহদাদিদ্বারা রচিত হয়। সে কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য ভাগবত বলিলেন—

যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ॥ ১।৩।৩১।

"যেমন মেঘসমূহ আকাশস্থ বলিয়া অনভিজ্ঞ জনগণ মেঘের বর্ণাদি আকাশেই আরোপ করিয়া থাকে, এবং পার্থিব রেণুতে বর্ত্তমান ধূসরতাদির ধর্ম্ম বায়ুতে আরোপ করিয়া থাকে দ্রষ্টা অদৃশ্য আত্মার দৃশ্যত্বও অর্থাৎ শরীরাদিও তদ্রূপ অজ্ঞজনের কল্পনা মাত্র।" কথাটি যে কত গভীর পাঠকগণ একটু বুঝিয়া দেখুন; আকাশে যেরূপ বাষ্পকণা-সমূহ ভাসিতে থাকে, সেইরূপ আমাদের 'অহং' জ্ঞানের অবয়বী ভাবে বা ধর্ম্মে প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকে। ইহাই পাতঞ্জলের "ধর্ম্মমেঘ সমাধির স্তর।" এই অবয়বী বুদ্ধিতে সমুদয় কর্ম্ম, এমনকি সাধনাদি, কৃত হয় বলিয়া, জীবাকে পুনর্বার অবয়বে আগমন করিতে হয়। আমাদিগের এই অবয়বী বুদ্ধি কিরূপ তাহা জানেন? ঐ বুদ্ধির বশে আমরা আপনাদিগকে শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ভাবি। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা একটী জ্ঞান হইলে, সেই, জ্ঞানে আমরা ত' পরম পুরুষকে দেখিতে পাই না। বড় জোর আমাদের বিশিষ্ট 'আমির' পরিপোষক চক্ষুর রূপভাবের পরিচ্ছদ-পরিহিত বহিস্থ সত্যবোধ বা বস্তু-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; সেইজন্য ঐ জ্ঞানে করণাদির অঞ্জন থাকিয়া যায়। উহাতে নিরঞ্জন দৃষ্টি হয় না। চিরকাল দৃষ্টি শক্তিকে বাহ্য বস্তুরূপে অবসান করিয়া দেখিয়া আমরা মনে করি যে, দৃষ্টিশক্তি বুঝি বস্তু দেখাইবার জন্যই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও জানে যে, দৃষ্টিতে কেবল রূপের (light) স্পন্দন মাত্র গৃহীত হয়, বস্তুবোধ ফোটে না। বস্তুবোধটি স্থূল 'অহং' ভাবের সংস্কারসঞ্জাত। রেলওয়ে লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, যেমন বহু দূরে লাইন দুটি মিলিত বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ চৈতন্যের সমস্ত খেলা যে 'এক পরমাত্মা রূপ আধারে পরিসমাপ্ত', ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির এই কথাটি বিস্মৃত হইয়া প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি' ভাবের সংস্কারানুগ আধার অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমরা বিশিষ্ট বস্তু

প্রভৃতি দর্শন করি। আমাদের প্রাণ সর্ব্বদাই কি এক প্রেমরূপী পরমার্থের দিকে অনুধাবিত হয়, এই পরাগতিটী ঠিক সত্যের ভাষা ও ইঙ্গিত। কিন্তু 'আমি'কে শরীরী ও পুংলিঙ্গাত্মক ভাবিয়া, ঐ দেখ রাম, শ্যাম সোনাগাছির পিশাচীসমূহে সেই প্রেমের অবসান করত তাহাতে নিমজ্জিত হইতেছে। ঐরূপ সংস্কারের বশে আবার 'অস্তী'তিরূপে প্রবাহিত প্রাণের টানটিকে বাহ্য জগতের দিকে প্রধাবিত করিয়া, নিত্যমুক্ত জীব স্ব স্ব কোটী কোটী জন্ম কল্পনা করত সংসার-চক্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, এক মাত্র তত্ত্ব পরমাকর্ষক ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া কতকগুলি পরিচ্ছদ পরিধান করত, তত্ত্বদর্শীর অভিমানে সং সাজিয়া, সংসারে বিচরণ করিতেছে। ইহাই পাতঞ্জলে সংস্কারোপগ সমাধির স্তর। কিন্তু যখন সাধক ঐ সংস্কারকণিকাও বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন, যখন সেই অপ্রাকৃত মদন-মোহনের—প্রকৃতির অতিগরূপে মোহিত হইয়া, তাঁহারই জন্য সর্ব্ব ধর্ম্ম ও অবয়বী বুদ্ধি ত্যাগ করত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" 'আমি'-রূপ পরাগতির ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করে, যখন "পশ্যেত ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" আমিরই ভগবৎ ভাব দেখিবার জন্য অভিসার করে, যখন 'দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে' আমির ভিতরেই পদচিহ্ন দেখিতে পায় তখন প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের পথে, অভিব্যক্ত গতি ভগবানেই পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। তখন 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' অথচ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং' কে সর্ব্বভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি তত্ত্বগুলি আর বাহিরের চিত্র অঙ্কন না করিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দেয়, ও ইন্দ্রিয়ে হৃষীকেশ, মনে প্রদ্যুম্ন, বুদ্ধিতে অনিরুদ্ধ, অহঙ্কারে সংকর্ষণ, চিত্তে বাসুদেব, ও আত্মা বা আমিতে পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইয়া, জীবের সমস্ত গতি পরমোপশান্তি লাভ করে। শ্রীরাধা যখন কালরূপ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুবিয়া যান,—তখন জীব বুঝিতে পারে যে ছিন্ন 'অহং'জ্ঞানের বশেই এতদিন ভগবানের সহিত নিত্যলীলা করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, ও জন্মাবধি কত রূপ দেখিয়াও তাহার রূপতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় নাই। তাহার পর যখন শ্রীকৃষ্ণ-রূপের ভাষা অধিগত হয়, তখনও সে দেখিতে পায় যে সেরূপে আর ছোট 'আমি' থাকিতে পারে না, ও ছোট 'আমি' লইয়া সেই রূপ উপভোগ করিতে গেলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

জনম অবধি হম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

তিনি যে পর, তাঁহাকে ত ভোগ্য বা বিষয়রূপে শেষ করা যায় না। তোমার

'আমি'টীকে তাঁহার বিষয় ক্ষেত্র বা ভোগ্য করিয়া ছাড়িয়া দেও, তবেই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। তখনই বুঝিতে পারিবে যে কেন—

লাখ জনম হম্ হিয় রাখনু
পরাণ না জুড়ন গেল।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বা ভোগেচ্ছা বিসর্জ্জন না করিলে ত' আর তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কামুকেরা মনে মনে সখী সাজিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া ভ্রমণ করিবার আশা করে,—আর মহাপ্রভু বলিলেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

[মোক্ষ]

অনুভূতি।

এই যে তোমার আলোক বায়ু,
তোমার পরশ দিচ্চে মোরে,
এই যে কোটি কণ্ঠে তোমার
শুনছি বাণী পরাণ ভরে॥
দেখ্‌চি চেয়ে যতই দূরে,
তোমার রূপটি উঠ্‌ছে ফুটে,
সকল রূপে তোমার প্রকাশ
বল্‌তে তা'রা আস্‌ছে ছুটে॥
রসনায় যে মিষ্ট পেলাম,
তা'তেই তোমার স্বাদ বুঝিলাম,
ফুলে ফুলে কতই গন্ধে
তোমার গায়ের গন্ধ পেলাম॥
জেনেছি আমি, জেনেছি ঠিক
তোমার প্রকাশ জগন্ময়,

তুমিই আছ আর কিছু নেই
তোমার রূপ এ বিশ্বময় ॥

(২)

কে তুমি মোর প্রাণের আলো ?
আমি চিন্‌তে নারি তোমায় ভালো ॥
কে তুমি মোর সাথে সাথে
ভাবে দেখ্‌ছি ঢল ঢল
কে হও তুমি আমার ওগো,
নামটি তোমার বল বল ?
যখন মাতৃগর্ভ হ'তে
পড়্‌লাম এসে ক্ষিতি তলে,
কে তুমি গো সেখান হ'তে
নিতে আমায় হাত বাড়ালে ?
কে এসে মোর তপ্ত হিয়া
নিমেষেতে জুড়িয়েছিলে ?
ক্ষুধায় আমি কাতর দেখে
মাতার স্তনে কে দুগ্ধ দিলে ?
অচেনা অজানা দেশে
যখন আমি পড়লাম এসে
কে তুমি গো হেঁসে হেঁসে
মায়ের বেশে দেখা দিলে ?
অজ্ঞানেতে অন্ধ হয়ে
কাঁদ্‌ছি যখন ভূমে পড়ে,
সোণার কিরণ পরশ দিয়ে
হৃদয় কে মোর জুড়াইলে ?

(৩)

চাঁদের কিরণ হ'তে যে গো
দিচ্ছে উঁকি সদাই মোরে
করুণ আঁখির দৃষ্টি তাহার
ভরে আছে এই আকাশ জুড়ে ॥

বায়ু এসে তার কথাটি
কি যে আমায় শুনিয়ে গেল
কত ফুলের গন্ধ হ'তে
তাহার গন্ধ ছুটে এল !
নর-নারীর মুখে মুখে
তাহার যেন চিত্র আঁকা,
প্রতি জীবের চোখে চোখে
কা'রে যেন যায় গো দেখা ॥
সাগরের ওই সুনীল বুকে
কত শত লহর তুলে,
সুনীল তনুর আভা তাহার
ঢেউর সাথে উঠ্‌ছে দুলে ॥
কত ভাবে কত সাজে
দেখা পাই যে হৃদয় মাঝে
আবার নর নারীব হৃদয় হ'তে
দেখতে মোরে ছুটে এলে
মা, মা বলে ডাকৃতে তোমায়
বড়ই ভালবাসি আমি
সকল দেশে মায়ের বেশে
তাই যে মোরে দেখা দিলে ॥
'সখা' বলে আদর করে
যত মোরে জড়িয়ে ধরে,
অপূর্ব্ব তা'র প্রণয় দেখে
নয়ন ভরে আসে জলে ॥
শুনে তা'র ওই মধুর বাণী
নিশি দিন কাঁদ্‌চি আমি,
সখার বেশে তাই যে এসে
মোরে বন্ধু বলে সম্বোধিলে ॥
নর-নারীর হৃদয় হ'তে
দেখ্‌তে মোরে ছুটে আসে

মুখের তার ওই অরুণ-রাগে,
কমল-কলি বিকশিল ॥
তা'র পরশে অবশ তনু
আঁখি পাগল তাহার রূপে,
এমন হৃদয়-ভরা নয়ন-কাড়া
রূপ্‌টি কে তা'র নিরমিল ॥

অরূপের রূপ।

(রাজসাহী বৈষ্ণবসভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত)

যে অনন্ত মুহূর্ত্তে বিশ্বাসী মানবের নয়নান্তরাল হইতে শুদ্ধ সুপ্ত-জগতের নিবিড় অন্ধকারের ঘন যবনিকা সহসা অপসৃত হইয়াছিল, তরুণ অরুণের ভাস্বর কিরণে ধরণী-জননীর সদ্যঃ-স্নাত উছল উজল আননে অমল ধবল হাসির রেখাটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে মুহূর্ত্তে, সে সময়ে ভাবরস-পরিপ্লুত মানবের হৃদয়কন্দর পরীক্ষা করা বা সুহাসিনী ধরণীর উল্লাস ও আবেশের স্পন্দন অনুভব করার কথাটা মানবের নিকট কেমন ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বিশ্বের সেই নবীন-প্রভাতে বিশ্বরচয়িতার স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের বাণী, বিশ্ববাসীর সেই বিহ্বল-বিধুর পুলক-গাথা, আর জড়কণা বিশ্বের চিরদিন পুঞ্জিত মর্ম্মকথা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য স্বয়ং বিশ্বরচয়িতার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, বলিলেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না। এমন কত দিন বিশ্বসৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির মধ্যে নিস্পন্দ সুপ্তভাবে অতিবাহিত করিয়া মানুষ তাহার অন্তরের শক্তি পরিস্ফুট করিয়া তুলিল ;—মানুষের কত কালের মৌন ছুটিয়া গেল ; রূপের মধ্যে কি এক অমর সার্থকতার অনুভব করিয়া মানুষ আত্মহারা হইয়া কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সাদে আপন কৃতজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিল। মানুষ গাহিল :

অয়ি ! লোহিতবরণি উষা !
কোন্ অজানা অচেনা স্বপ্ন-লোকেতে
হাসলো আবেশালসা।

মরি হৃদয়ে বাহিরে গগন-অজিরে
কি বা ও মধুর ভূষা!
এস' লোহিত বরণি ঊষা।

'ঊষা' 'ব্রাহ্মণসমাজ,' অগ্রহায়ণ ১৩১৭।

মানুষের সুপ্তশক্তি গভীরতর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, তাহাকে এই সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল, রূপকে খুঁজিতে খুঁজিতে মানুষ অরূপের ক্ষীণ আভাস লক্ষ্য করিল, সমীপবর্ত্তী প্রদেশ হইতে দূর, বহুদূর প্রদেশের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, দূর ও সমীপ কোন এক অসীমের সীমারেখায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল, রূপ ও অরূপের কি এক অপরূপ মিলনভূমি অস্পষ্ট-ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিল। এই রূপতৃষার মনোবিজ্ঞান, এই সৌন্দর্য্যের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া উপনিষদের ঋষি পুলকে গাহিয়া উঠিলেন,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ঈশ। ৫।

বিশ্ব-সৌন্দর্য্য রসে পুলকিত মানব, প্রমত্ত, পাগল, বিহ্বল মানব,—রূপের মধ্য দিয়া অরূপের উপলব্ধির নেশায় বিভোর হইয়া দেখিল,—

'ধ্যায়তী পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং, ধ্যায়তীবদ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা ধ্যায়ন্তীং দেবমনুষ্যাঃ।' ছান্দোগ্য ৭ম।

সনাতন বৈদিক ঋষির হৃদয়ে বিশ্বের এই ধ্যানমুদ্রা, সমাধি বদ্ধ যে ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল, যুগে যুগে মানব মনের উপর সেই প্রভাব, সেই শক্তি কার্য্য করিয়া চলিতেছে। মানবের নিকট মানবের দেবতা, ভক্তের নিকট ভগবান্, চিরদিনই রূপের মধ্য দিয়া আপনার অরূপত্ব প্রকট করিতেছেন; সৌন্দর্য্য-সুধা বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় অসৌন্দর্য্য,—ভয়, ব্যথা, বিষজ্বালা দূরীভূত করিতেছেন। বিশ্বরূপ-দর্শন-ব্যথিত ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানের সৌন্দর্য্য-সৌম্যতা দেখিবার জন্য আকুল হইয়া কহিতেছেন,—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

ভগবান্ তাঁহার সৌন্দর্য্য ভক্তের আঁখির উপর ধরিতেছেন। সাধক জগজ্জননীর রুদ্ররূপে ভয়বিপর্য্যস্ত হইয়া ডাকিতেছে,—

নরশির মুণ্ডমালা ত্যজে পর্ মা বনমালা
কালী ছেড়ে হও মা কালা হ্যাদে গো পাষাণের মেয়ে।

উপাসকের কাছে উপাস্যের সৌম্যতাই যে প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ, আর যাহা কিছু সুন্দর তাহাই সৌম্য। কাজেই ভক্ত শাক্তের কাছে মায়ের রূপে জগৎ আলো,—জগজ্জননী "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী!" প্রকৃত 'সুগত' নিরতের নিকট তাঁহার দেবতা 'অমিতাভ,'—তাঁহার 'রূপের ছটায় অরুণ ঘটায় মোহিত হয় মন।' বিশ্বপ্রেমপিপাসু কবির নিকট তাঁহার দেবতা, বিশ্বপ্রেমের প্রস্রবণ, "সুন্দর হৃদি-রঞ্জন, নন্দনফুলহার"। এই ভুবন সুন্দর, কেন না ইহা তাঁহারই 'নন্দনগন্ধনন্দিত'। আনন্দবাদীর নিকট সৌন্দর্য্যই আনন্দ;—তা'ই মধুর শরত-প্রভাতে তাঁহার নিকট—

'নাচে তরঙ্গ-তরী অতি চঞ্চল, কম্পিত অংশুক কেতন অঞ্চল
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল আলস লালস পাসরি।
উদয় অচল-তল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল কন্দন,
কনককিরণ ঘন শোভনস্যন্দন নামিল শারদ সুন্দরী।' (রবীন্দ্রনাথ)

আর বৈষ্ণবের নিকট তাঁহার দেবতা, 'রাধারমণ বৃন্দাবন-বিপিনবিহারী মুরলী-ধারী কন্দর্পদর্পহারী, রাস রসিক রসময় নটবর শ্যামসুন্দর।.

সৌন্দর্য্যই হইল ভক্তির ও ভালবাসার ভিত্তি, কাজেই ভক্তের নিকট তাঁহার দেবতা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। সৌন্দর্য্যই মহত্ত্বের পরিচায়ক, রূপনিষ্ঠাই অরূপ সাধনের বীজমাত্র। রূপই সত্য, রূপই তত্ত্ব, রূপই সারাৎসার,—কবি, Keats এর কথায় Beauty is truth, Truth beauty—That's all ye know and all ye need to know'

রূপই সনাতন;—যাহা কিছু সনাতন, তাহাতে রূপের মহিমা প্রকট। বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মে এ তথ্য যেমন পরিস্ফুটভাবে গৃহীত হইয়াছে, বুঝি জগতের অন্য কোন সাহিত্য, অন্য কোন ধর্ম্মে সেরূপ ভাবে গৃহীত হয় নাই। বৈষ্ণবের সাহিত্য, সৌন্দর্য্যের সাহিত্য; বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম; বৈষ্ণবের শিক্ষা, দীক্ষা, তন্ত্র, মন্ত্র এই সৌন্দর্য্যমন্ত্রের জপ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বৈষ্ণবের চক্ষে উপাস্যের রূপের মহত্ত্বে দৃশ্যাত্মক বিশ্বের রূপ গরিমা। ভক্তের চক্ষে ভগবান্ ও তাঁহার জড় বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণ ও মেঘ সুসদৃশ হয়। এই রূপের মধ্যে অরূপের প্রকাশের মাধুরীর উপলব্ধি করিয়া, অরূপের মধ্যে রূপের উজ্জ্বল মধুর বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই), ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন,—

কিবা দলিত কজ্জল কলিত উজ্জ্বল
সজল জলদ শ্যামল সুন্দর।

স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে,
মনে হয় যেন বকপাঁতি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড ইন্দ্রের কোদণ্ড—
সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর।

কি রূপের অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারিলে, রূপের সাধনা-পথে পথিক হইতে পারিলে, জীবন আনন্দময় হয়, সংসার সুখের সদন হইয়া উঠে ? তাই বিদ্যাপতির পদাবলীতে পাই—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু পেখনু পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু দশদিক্ ভেল নিরদ্বন্দা॥

নবীনতা, চিরনবীনতা, রূপ বা কমনীয়তার নিত্য সহচর। কবি বলেন—ক্ষণে ক্ষণে 'যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ'। সৌন্দর্য্যের হ্রাস নাই, ক্ষয় নাই ;—সৌন্দর্য্যই যখন হইল ভক্ত ও ভগবানের মিলনভূমি, তখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে, ভক্তের নিকট, ভক্তির কাঙ্গালের নিকট) ভগবান্ যেমন সুন্দর, ভগবানের নিকট ভক্তও সেইরূপ সুন্দর, সেইরূপ আদর ও আবেগের বস্তু কেমনে হয়েন। তাই ভক্তের হৃদয়বৃন্দাবনে ভগবানের নিত্যলীলা কত মধুর, কত প্রাণস্পর্শী, কত স্বভাব-সুন্দর॥ বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধা ও গোপীগণই এই মাধুর্য্যের, এই স্বভাবসৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যপিপাসা তাঁহাদের সৌন্দর্য্যস্ফূর্ত্তিই বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের প্রতি পত্র, প্রতি বর্ণ উজ্জ্বল করিয়াছে। ভক্তের ভগবানের রূপ বর্ণনে নিম্ন-লিখিত পদ হইতে অধিকতর সৌন্দর্য্যের 'নিছনি',—রূপের মহিমা,—নবীনতার রস কেহ কখনও আস্বাদন করিয়াছেন কি ?

অঞ্জনগঞ্জন, জগজনরঞ্জন, জলদ-পুঞ্জজিনি বরণা।
তরুণারুণ থল-কমলদলারুণ মঞ্জরী-রঞ্জিত চরণা॥
দেখ সখি! নাগররাজ বিরাজে
সুঘট সুধাময় হাস বিকাশিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবর-বর গরব-বিমোচন লোচনমনমথ ফাঁদে।
ভাঙভুজগপাশে বাঁধল কুলবতী কুলদেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমরকরম্বিত জানুলম্বিত কোকিল কদম্বমাল।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই ঐছন মুরতি রসাল॥

রূপ উপলব্ধি হইতে ভক্তির স্ফূর্ত্তি কেমন করিয়া সাধিত হয়, অথবা রূপের

পরিণত সমালোচনাই কেমন ভক্তির কবাট খুলিয়া দেয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটী হইতে বোধগম্য হইবে—

তরু অবলম্বন কে!

হৃদয় নিহিত মণিমাল বিরাজিত সুন্দর শ্যামর দে॥

নব কুবলয়দল কিয়ে অতসী-ফুল নীল মুকুরমণি আভা।

কিয়ে দলিতাঞ্জন কিয়ে নবঘন বরণে না পায়হ শোভা॥

কুসুমিত চিকুর বলিত-বর বরিহা চাঁদ বিরাজিত ভালে।

আর এক অপরূপ মলয়জতিলক চাঁদ উয়ল ঘনমালে॥

কোটি ইন্দু জিনি বয়ন মনোহর অধরে মুরলী রসাল।

জ্ঞানদাস-চিত ওরূপ অবিরত ভাবিতে যাউ মোর কাল॥

রূপের মাধুরীর তারতম্যে ভক্তির তারতম্য হয়, তাই 'বৃন্দাবনক্রীড়া কৌতুক নাটকে'র নান্দীস্বরূপিণী চির নবীনতাময়ী শ্রীরাধার নাম নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে কোন কবি কহিয়াছেন;

তড়িত জিনিয়া বদন সুন্দর মুখে হাসি আছে আধা।

গণক যে নাম সে নাম রাখুক, আমি যে রাখিনু রাধা॥

সৌন্দর্য্য ও মাধুরী কেন বা কি করিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, চক্ষের প্রেম কেমন করিয়া বিরহ-দারুণ অশ্রু উচ্ছ্বাসে পবিত্রিত হয়, প্রকৃত অনুরাগ সংসারের বাধা দুঃখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেমনই ক্রমান্বয়ে পুষ্ট হয়, তাহা গোবিন্দদাসের নিম্নোদ্ধৃত বিখ্যাত পদে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে:—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।

ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥

কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু ধৈরজ রহল দূরে।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেনবা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়।

নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বিঁধিতে ধায়॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে হিয়ার মাঝারে দোলে।

উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥

কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে।

না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধিল, না কহি লোকের লাজে॥

এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।

না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয়॥

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের রূপমাধুরী, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তির আবির্ভাবের কত সহায়তা করিয়াছিল তাহার নিদর্শন পাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে শ্রীরাধাভাব-ভাবিত হইয়া, রাধারূপরূপিত হইয়া রসোদ্গার করিয়াছেন,—তাঁহাতে কান্তি ও মাধুরীর সন্নিবেশ না হইবে কেন?

প্রেমের সাগর বয়ান কমল
লোচন খঞ্জন তারা।
কিয়ে শুভক্ষণ সর্ব্বসুলক্ষণ
ভেঁটলু প্রাণ পিয়ারা।
গোরারূপ দেখিলুঁ মোহন বেশে।
যার অনুভব, সেই সে জানয়ে,
না পায় আন উদ্দেশে॥
রূপের সদন ও চাঁদবদন,
সরুয়াবসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা করপদ জিনি কোকনদ,
রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গা॥
ভাবের আবেশে ভাবিনী লালসে
অন্তর বাহির গোরা।
এ নয়নানন্দ ভাবে অনুবন্ধ,
সতত ভাবে বিভোরা॥

শচীনন্দনের ও নিত্যানন্দের স্বভাবসিদ্ধ লাবণ্যের প্রসঙ্গে চৈতন্য-ভাগবত কার বলিতেছেন;—

কলধৌত কলেবর গৌর তনু।
তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনি কিয়ে অঙ্গছটা।
অবধৌত বিরাজিত চন্দ্রঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গমালা।
তাহে রোহিণীনন্দন দিগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥

মুনি ধ্যান ভুলে, সতী-ধর্ম্ম টলে।
জগতারণ কারণ বিন্দু বলে॥

গোরাচাঁদকে দেখিলেই কাহার শুষ্ক মনেও না প্রীতি-মন্দাকিনী বহিত? বৃন্দাবনের রূপবিলাসী কৃষ্ণচন্দ্রের সার্থকতা, নবীন ভাবে বঙ্গের নবীন যুগে নবদ্বীপে নবদ্বীপ-চন্দ্রের চরিত মধ্যেই সংসাধিত হইয়াছিল,—নাম ও প্রেমের সৌন্দর্য্য বিলাইয়া, সুন্দরকায় গৌরচন্দ্র দেশ মাতাইয়াছিলেন।

রমণীয়তা, তৃপ্তিই অনুরাগের চরম উপাদান। সৌন্দর্য্যের ফল দয়িত বা দয়িতার সৌভাগ্য লাভ ব্যতীত আর কি? ভক্ত ভগবানের নিকট সুন্দর— যেহেতু তিনি ভগবানের চিরদয়িত চির মঙ্গল-ভাজন চির জীব ও শিবে, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় এই দয়িততার দায়িত্ব না থাকিলে বিশ্ব এতদিন অদৃশ্য হইয়া পড়িত, সংসার শুধু দগ্ধ জীর্ণারণ্য হইত। ভগবান্ও ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে চিরারাধ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সকল সময়েই বলিয়া থাকেন 'নিখিল জগত সুন্দরতর পুলকিত তব 'দরশে।' এই পুলকোচ্ছ্বাসে ভক্ত আত্মহারা অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে লীন হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য রসাস্বাদের মুহূর্ত্তমাত্রের জন্যও অন্তরায় ঘটিলে, তিনি আপনাকে হতভাগ্য মনে করেন। আনন্দ-সান্দ্রসুখানুভূতির মধ্যে দয়িতের কোমল মঙ্গল আঁখিটী দয়িতাকে ঘেরিয়া রহে; ভগবানের দৈনন্দিন কর্ম্মরাশির মধ্যে ভক্ত তাঁহার প্রেমানন্দধারা প্রবাহিত দেখিয়া আপনার সৌভাগ্যে আপনি গর্ব্বিত ও ধন্য হন। ভগবান্ও ভক্তের ভক্তিডোরে আপনাকে বাঁধা দেখিয়া আপনার আনন্দ-ময়ত্বের প্রকাশ করেন। নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটীতে এই লোভনীয় চরম আনন্দের কথা সংসূচিত হইয়াছে;—

শ্রীমতী বড় আদর করিয়া,—গরব করিয়া বলিতেছেন,—

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীরনাগরী পিরীতে বাঁধল তায়॥

ভক্তের আহ্বানে, তাহার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রেমে ভগবান্ও কম গর্ব্বিত নহেন। তিনি প্রেমময়ী শ্রীরাধার উদ্দেশে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন:—

সুন্দরি! আমারে কহিছ কি ॥
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি ॥
থির নহে মন সদা উচাটন সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশদিগ পানে তোমারে হেরিতে পাই ॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে ॥
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী পরাণ হৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥

এ চপলতায়, এ আকুলতায় ভগবানের অংশ ভক্তের অপেক্ষা কম নহে; প্রেমের আকর্ষণের শক্তি, দূরত্ব, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অক্ষুণ্ণরূপে সমভাবে স্বপ্রতাপ প্রকাশ করে। তাই ভক্তের অনুরাগের পরিণত দশায় আত্মকাহিনীতে দেখি,—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালরূপ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙা নয়ন-নাঁচনে ॥

এ এক অখণ্ড আনন্দ,—খণ্ড-আনন্দ, আত্মীয়তা, স্বার্থসাধন-তৎপরতা, ভোগ সকলেই তখন লুপ্ত; প্রত্যেকেই তাহার সত্তা এক গভীরতর নিয়মের, এক গভীরতর ধর্ম্মের, এক পবিত্রতর আনন্দের সত্তায় মিশাইয়া দিয়াছে। ইহাই প্রেম বা পিরীতি। বৈষ্ণব ভক্তি সূত্রকারের আদর্শে বলিতে গেলে,—

সর্ব্বেরসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ।
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি যত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ ॥
খণ্ডানন্দাঃ রসাঃ সর্ব্বে সোঽখণ্ডানন্দ উচ্যতে।
অখণ্ডে খণ্ডধর্ম্মা হি পৃথক্ পৃথগিবাসতে ॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য, এম-এ।

আত্মতত্ত্ব।

(১৩২১ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার শেষভাগে, কথিত হইয়াছে যে "এক জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞানং ভবতি" অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চ জ্ঞান জন্মে। তাহা সিদ্ধির জন্য প্রথমে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ বিশুদ্ধ নির্ম্মল আকাশে অবিদ্যাবশতঃ গন্ধর্ব্ব-নগর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শুদ্ধ আত্মাতেও অবিদ্যাবশতঃই জগৎ উৎপন্ন হয়। আর যেরূপ বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে ত' সেই আকাশ গন্ধর্ব্বনগর কোন কালে উৎপন্ন হয় নাই—সেইরূপ এই অদ্বিতীয় আত্মা বিষয়েও এই দুঃখরূপ জগৎ কোন কালেই উৎপন্ন হয় নাই। যেরূপ নেত্রের তিমির রোগপ্রযুক্ত পুরুষ এক চন্দ্রকে অনেক বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ এই অজ্ঞানী জীব এক অদ্বিতীয় আত্মাকে অনেকরূপে দেখে। যেরূপ মূঢ় বালক আপন অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র নিরোধ করিয়া নির্ম্মল আকাশে ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্ররূপ দেখে, সেইরূপ অজ্ঞানী জীবও অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ আনন্দস্বরূপ আত্মাবিষয়ে এই দুঃখরূপ জগৎ কল্পনা করিয়া দেখে।

শঙ্কা,—যে পুরুষের আত্মসাক্ষাৎকার হয় নাই এরূপ অজ্ঞানী জীব যদি কখন এই জগৎ দেখে ত,' সে বিষয়ে কিছু আশ্চর্য্য নহে, পরন্তু আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া যে বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য-সহিত অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বিদ্বান্ পুরুষও এই প্রপঞ্চ দেখিতে পায়, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। সমাধান,—যেরূপ ইহলোকে পূর্ব্বাদি দিকে পশ্চিমাদি দিক্ ভ্রম অজ্ঞানী পুরুষের হয়, সেইরূপ শাস্ত্রবেত্তা পুরুষেরও সেই দিক্ ভ্রম হইয়া থাকে। যেরূপ এই জ্ঞানী পুরুষের অদ্বিতীয় আত্মা-বিষয়ে নানাপ্রকার জগৎ প্রতীত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ রক্ষিত যে অবিদ্যার লেশ (দগ্ধ দড়ি পোড়া দগ্ধ ছাইএর ন্যায়, ভর্জ্জিত ধান্যের ন্যায়) তদ্দ্বারা সেই বিদ্বান্ পুরুষেরও শরীরের নাশ পর্য্যন্ত কল্পিতরূপে জগৎ-ভাণ হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহলোকে যে পুরুষ শঙ্খকে শুক্লবর্ণবিশিষ্ট জানে সেই পুরুষেরও কামলা রোগ-বশতঃ সেই শঙ্খ পীতবর্ণ প্রতীত হয়, এবং যে ব্যক্তি গুড়কে মধুর রসবিশিষ্ট

জানে সেই পুরুষেরও জিহ্বা-দোষবশতঃ গুড় তিক্ত-রসবিশিষ্ট প্রতীত হয়, সেইরূপ যে বিদ্বান্ পুরুষ অদ্বিতীয় আত্মার নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারও অবিদ্যার লেশবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মনাশ পর্য্যন্ত জগৎ কল্পিতরূপে প্রতীত হইবে।

এক্ষণে বিদ্বান্ পুরুষেরও অজ্ঞানী জীব হইতে বিলক্ষণতা বুঝাইবার জন্য অজ্ঞানী জীবের প্রপঞ্চ দর্শনের বিষয় অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি। যেরূপ বাস্তবিক জল-শূন্য উষর ভূমিতে, তৃষ্ণাতুর মৃগাদি জীবের নানা প্রকার লহরীযুক্ত জল প্রতীতি হয়, সেইরূপ ভেদ-প্রপঞ্চ-রহিত এই অদ্বিতীয় আত্মাতে বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী পুরুষের এই ভেদ-প্রপঞ্চ প্রতীতি হয়। আর যেরূপ বাস্তবিক রজত-ভাব-রহিত শুক্তিতে লোভী পুরুষের রজত প্রতীতি হয়, সেইরূপ বাস্তবিক প্রপঞ্চভাবরহিত এই অদ্বিতীয় আত্মাতে, এই অজ্ঞানী পুরুষের জগৎ প্রতীতি হয়। আর যেরূপ মন্দ অন্ধকারে পুরুষ ভয়রূপ দোষের বশে সর্পভাবরহিত রজ্জুতে সর্প দর্শন করে, এবং চোরভাবরহিত স্থাণুতে চোর দর্শন করে, সেইরূপ এই অজ্ঞানী জীব অবিদ্যারূপ দোষের বশে, দুঃখ-হীন চেতন আত্মাতে দুঃখ-বহুল ও জড় অনাত্মরূপ জগৎ দর্শন করে। হে মৈত্রেয়ি। যেরূপ স্বপ্নাবস্থায় এই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের পতি জায়াদি জগৎ প্রতীতি হয় তাহা স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায়ও যাহা কিছু পতি জায়াদি জগৎ প্রতীতি হয় সেই জগৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। সেই জগৎ আত্মারূপই। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি। এরূপ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকারকে তুমি শ্রবণাদি সাধনযুক্ত শুদ্ধ মন দ্বারা এবং মহাবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ কর। এরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতীতির পর তুমি পুনঃ সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হইবে না। হে মৈত্রেয়ি। যেরূপ আকাশে কল্পিত গন্ধর্ব্বনগর বাস্তবিক আকাশরূপই ও আকাশ হইতে ভিন্ন সেই গন্ধর্ব্বনগরের সত্তা নাই, সেইরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে কল্পিত এই জগৎও আত্মাস্বরূপই। আত্মা হইতে ভিন্ন সেই জগতের সত্তা নাই। এই কারণে সেই অধিষ্ঠান আত্মার শ্রবণ হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের শ্রবণ হইবে; এবং এই অধিষ্ঠান আত্মার মনন হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের মনন হইবে। এবং এই অধিষ্ঠান আত্মার ধ্যান হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের ধ্যান হইবে। এবং এই অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান হইবে। হে মৈত্রেয়ি! অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান হইতে এই বিদ্বান্ পুরুষের সর্ব্ব জগতের জ্ঞান হইবে এই

প্রকার বচন যে আমি তোমাকে বলিলাম, সেই বচনের অভিপ্রায় এই যে অধিষ্ঠান আত্মা হইতে এই কল্পিত জগতের ভিন্ন সত্তা নাই, সুতরাং সেই অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান হইলে পর এই বিদ্বান্ পুরুষের সেই কল্পিত জগতেরও কাজেকাজেই জ্ঞান হইবে। পরন্তু এই স্থানে এতগুলি পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থের এই প্রকার স্বরূপ, এই প্রকার বিশেষরূপে সেই সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান সেই বিদ্বান্ পুরুষের হইবে না। কারণ এই বিদ্বান্ পুরুষ বিশেষরূপে এই জগৎকে জানে বা বহুভাবে এরূপ কোন শ্রুতিবচন দেখা যায় না। আর এই সম্পূর্ণ জগৎ জ্ঞানে সুখরূপ পুরুষার্থ নহে এবং দুঃখাভাবরূপ পুরুষার্থ নহে এবং সেই দুই পুরুষার্থের সাধনরূপও নহে। এরূপ অপুরুষার্থরূপ জগতের বিশেষ জ্ঞান দ্বারা সেই বিদ্বান্ পুরুষের কিছুমাত্রও সুখ প্রাপ্তি হইবে না। তদ্বিপরীতে এই জগতের বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এই বিদ্বান্ পুরুষের পরিশ্রম প্রাপ্তিই হইবে। হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন এই সম্পূর্ণ জগৎ এই জীবের সুখেরই হেতু হইবে তাহা হইলেও এই সমস্ত জগতের বিশেষরূপে জ্ঞান হওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। সুতরাং এই বিদ্বান্ পুরুষ এই জগৎকে বিশেষ বা ছিন্নরূপে জানিবে না।

হে মৈত্রেয়ি। যদ্যপি এই অনাত্ম প্রপঞ্চের জ্ঞান দ্বারা অধিকারী পুরুষের কিঞ্চিন্মাত্রও পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইবে না, তথাপি তোমার স্ত্রী-স্বভাব, সুতরাং যদি কখন কৌতুকের জন্য তুমি এই সম্পূর্ণ জগৎকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞানই এই কল্পিত জগতের জ্ঞানের হেতু। অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান বিনা জগতের জ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই। হে মৈত্রেয়ি। যেরূপ ঘট শরাবাদি যত কিছু মৃত্তিকার কার্য্য আছে, সেই ঘটাদির বাস্তবিক স্বরূপ মৃত্তিকা-রূপ উপাদান কারণ। সুতরাং সেই মৃত্তিকারূপ উপাদান কারণের জ্ঞান হইলে পর এই পুরুষের ভিন্ন দেশস্থিত এবং ভিন্ন কালস্থিত সমস্ত ঘট-শরাবাদি কার্য্যের জ্ঞান হইবে। সেইরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মার কার্য্যরূপ যত কিছু জগৎ, সেই জগতের আত্মারূপ কারণই বাস্তবিক রূপ। সুতরাং শ্রবণাদি সাধন দ্বারা এই অধিকারী পুরুষের যখন আত্মারূপ কারণের জ্ঞান হইবে তখন সেই অধিকারী পুরুষের জগৎরূপ কার্য্যেও কাজেকাজেই জ্ঞান হইবে।

এক্ষণে ভেদ জ্ঞান বিষয়ে অনর্থের কারণতা নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি! যে পুরুষ অদ্বিতীয় আত্মাতে নানাপ্রকার ভেদ দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী পুরুষ ইহলোকে ও পরলোক বিষয়-সম্বন্ধী সুখও প্রাপ্ত হইবে না, তবে সেই ভেদদর্শী পুরুষ মোক্ষরূপ সুখ প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে কি আশা

আছে ?" এক্ষণে ভেদদর্শী পুরুষের ইহলোকে সুখের অভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি। ইহলোকে যে নারী আপনার পতি ও পুত্রাদি আত্মীয়-বর্গকে দেখে তখন সেই আপনাদিগের প্রতি ভেদদৃষ্টিরূপ বিষমতা দেখিয়া সেই পতি এবং পুত্রাদি আত্মীয় সেই নারীকে পরিত্যাগ করিয়া দেয়, অথবা আপনাদের চিত্তে সেই নারীকে উপেক্ষা করিয়া এইরূপ যে পতি এবং পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ সেই নারীকে আপনার আত্মার ন্যায় প্রিয়রূপে না দেখে, কিন্তু আপনা হইতে বিভিন্নরূপে সেই নারীকে দেখে, তখন সেই নারী পতি-পুত্রাদি আত্মীয়বর্গের আপনার প্রতি ভেদদৃষ্টিরূপ বিষমতা দেখিয়া সেই পতি-পুত্রাদি আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া দেয়, আপনার চিত্তে সেই পতি-পুত্রাদিকে উপেক্ষা করে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, ইহলোকে যে নারী বা পুরুষ যত দিন পর্য্যন্ত এই জড়-চেতন পদার্থকে আপনার আত্মার ন্যায় প্রিয় জানিয়া সেই পদার্থ পালন করে, ততদিন পর্য্যন্তই সেই জড়-চেতন পদার্থ সেই নারীকে এবং সেই পুরুষকে সুখ প্রদান করে; কিন্তু যখন এই দেহধারী জীব সেই পদার্থকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে জানে তখন সেই পদার্থ জীবকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। সেই পদার্থের বিয়োগ দ্বারা সেই জীবের পরম দুঃখ প্রাপ্তি হয়। হে মৈত্রেয়ি! ভেদদর্শন দ্বারা এই জীব দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কারণ এই যে, যেরূপ ইহলোকে যে পুরুষ মহারাজাকে মহারাজারূপে দেখেন, সেই পুরুষের উপর সেই মহারাজা প্রসন্ন থাকেন। আর যে পুরুষ সেই মহারাজাকে দরিদ্ররূপে দেখেন, সেই পুরুষের উপর সেই মহারাজা ক্রোধবান্ হন। সেইরূপ যে দেহধারী জীব পতি জায়াদি পদার্থকে আপনার আত্মারূপে দেখেন, সেই জীবকে সেই পতি জায়াদি পদার্থ সুখ প্রদান করে। আর যে দেহধারী জীব সেই পতি-জায়াদি পদার্থকে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখেন, সেই জীবকে সেই পতি-জায়াদি পদার্থ দুঃখ প্রদান করে। যদি সেই পতি-জায়াদি পদার্থ এই জীবের আত্মরূপ না হইত, তবে আপনা হইতে ভিন্ন রূপে দেখিলে, সেই পতি জায়াদি পদার্থ এই জীবকে দুঃখ প্রদান করিত না। সুতরাং এই সর্ব্বলোকের অনুভব হইতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, ইহলোকে যে কোন পতি-জায়া-পুত্রাদি পদার্থ আছে তাহাদের এক আত্মাই বাস্তবিক স্বরূপ। সেই ভেদরহিত অদ্বিতীয় আত্মাকে যে পুরুষ ভেদবিশিষ্ট দেখে সেই ভেদদর্শী পুরুষ দুঃখই প্রাপ্ত হয়। হে মৈত্রেয়ি! পতি-জায়াদি পদার্থকে আপনা হইতে ভিন্নদর্শী জীব যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে পুরুষ ব্রাহ্মণত্ব

জাতিকে এবং ক্ষত্রিয়ত্ব জাতিকে আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে সেই ভেদদর্শী পুরুষকে সেই ব্রাহ্মণত্ব জাতি এবং ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি উভয় লোকে দুঃখই প্রদান করে। তথায় ইহজন্মে সেই ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি জ্ঞান ভেদদর্শী পুরুষকে পাপ প্রাপ্তি করে। এবং সেই পাপজন্য অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভি-নিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ প্রাপ্তি করে। আর সেই ভেদদর্শী পুরুষ পরলোকে ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং নীচ জাতি প্রাপ্তি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি পরলোকেও সেই ভেদদর্শী পুরুষকে দুঃখ প্রদান করে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি সেই ভেদদর্শী পুরুষকে দুঃখ প্রদান করে, সেইরূপ স্বর্গাদি লোক, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ঋগাদি বেদ ইত্যাদি সমস্ত সেই ভেদদর্শী পুরুষকে ইহজন্মে নানা প্রকার ভ্রমণ করায়, আর মৃত্যুর পর সেই ভেদদর্শী পুরুষকে নানাপ্রকার নরকদুঃখ প্রাপ্তি করায়। আর এই পুরুষ যখন ঋগাদি বেদকে আপনার আত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেখে তখন সেই ঋগাদি বেদ সেই ভেদদর্শী পুরুষকে শূদ্রাদি নীচ জাতি প্রাপ্তি করায়। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিক শরীর প্রাপ্ত হইলেও সেই ভেদদর্শী পুরুষকে সেই ঋগাদি বেদ যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কারহীন করে, অথবা তাহাকে পতিত করে, অথবা যজ্ঞোপবীতাদি সংস্কার হইলেও সেই ভেদদর্শী পুরুষকে সেই ঋগাদি বেদ বেদের পদ বাক্য স্বরের উচ্চারণ করণবিষয়ে অসমর্থ করে। অথবা সেই বেদের অধ্যয়ন হইলেও সেই ঋগাদি বেদ সেই ভেদদর্শী পুরুষকে বেদের অর্থজ্ঞানরহিত করে। অথবা সেই বেদের অর্থ জ্ঞান হইলেও সেই বেদের অর্থ এবং সেই বেদের পাঠ শীঘ্র বিস্মৃত করিয়া দেয়। অথবা সেই বেদের অর্থ স্মরণ হইলেও সেই ভেদদর্শী পুরুষকে সেই ঋগাদি বেদ, বেদবিহিত কর্ম্ম করিতে অরুচি প্রাপ্তি করায়। এইরূপে সেই ভেদদর্শী পুরুষকে সেই ঋগাদি বেদ অনেক প্রকার দুঃখ প্রদান করে। আর এই পুরুষ যখন সমস্ত দেহধারী জীবকে আপনার আত্মা হইতে ভিন্নরূপে দেখে, তখন সেই সমস্ত দেহধারী জীব সেই ভেদদর্শী পুরুষকে ইহজন্মে এবং জন্মান্তরে অনেক প্রকার দুঃখ প্রদান করে। হে মৈত্রেয়ি। অধিক বিস্তার করিয়া কি কহিব, আকাশাদি পঞ্চভূত সহিত যত জড়-চেতনরূপ জগৎ, সেই জগৎকে যখন এই পুরুষ আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবে তখন এই সমস্ত জগৎ সেই ভেদদর্শী পুরুষকে অনেক দুঃখ প্রদান করিবে। হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে এবং পরলোকে যত কিছু স্ত্রী পুত্র ধনাদি প্রিয় পদার্থ আছে সেই সকল প্রিয় পদার্থ যখন এই জীব

প্রাপ্ত হইবে না, তখন এই অজ্ঞানী জীব সেই পদার্থের অপ্রাপ্তি দ্বারা দুঃখই প্রাপ্ত হইবে। আর যদি কখন দৈবযোগবশতঃ সেই অজ্ঞানী জীবের সেই পদার্থ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলেও কোন রোগাদি নিমিত্তবশতঃ সেই অজ্ঞানী জীব যখন সেই প্রিয় পদার্থ ভোগ করিতে অসমর্থ হয় অথবা বিদেশ গমনবশতঃ যখন সেই পদার্থ বিয়োগ হয়, অথবা সেই প্রিয়পদার্থের যদি নাশ হয়, তখন সেই অজ্ঞানী জীব পরম দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই স্ত্রীপুত্র ধনাদি পদার্থ আপনার অপ্রাপ্তিকালে এবং আপনার প্রাপ্তিকালে সেই অজ্ঞানী জীবকে দুঃখই প্রদান করে। হে মৈত্রেয়ি। এই প্রকার সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সেই ভেদদর্শী অজ্ঞান জীবকে দুঃখই দিয়া থাকে। এই কারণে তুমি সেই পদার্থকে আপনার আত্মা হইতে ভিন্নরূপে কখনই দেখিবে না, কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ জগৎকে আপনার আত্মারূপে দেখিবে।

হে মৈত্রেয়ি। এই আনন্দস্বরূপ আত্মা স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ, স্বগত ভেদ রহিত. এবং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ এবং জন্মাদি বিকাররহিত। এই প্রকার যে আত্মার জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান। আর এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন যত কিছু অনাত্মপদার্থ আছে, সেই সমস্ত অনাত্মপদার্থকে বিষয় করিতে সমর্থ যত প্রকার জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত জ্ঞান ভ্রান্তিরূপ। সুতরাং হে মৈত্রেয়ি। ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি, এবং স্বর্গাদিলোক এবং ঋগাদি বেদ এবং আকাশাদি পঞ্চভূত ইত্যাদি যত প্রকার জড়-চেতনরূপ জগৎ আছে সেই সমস্ত জগৎ এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু সেই সমস্ত জগৎ আত্মারূপই।

এক্ষণে মননের রীতি দেখান যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! জড়-চেতনরূপে প্রসিদ্ধ যাহা কিছু এই জগৎ, সেই সমস্ত জগৎ এই আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে অবস্থিতি করিতেছে, এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হয়, এই আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই সেই জগৎ লয় হয়। বেদ-প্রমাণেও জানা যায় যে এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তৎব্রহ্ম" "জন্মাদ্যস্য যতঃ" আর সমস্ত জগতের কারণ যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান ও আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে পর সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই লয় হইয়া যায়। তখন স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা বা "অ-তৎ" পদার্থ শুদ্ধ 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিহিত হন। এক্ষণে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মায়ারূপ

তম সমূলে নাশ হয় তাহা দেখান যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ একই স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ নিদ্রাদোষ-বশতঃ নানাপ্রকার প্রতীত হন; তিনি নিজেই রাজা, নিজেই ভৃত্য, নিজেই অমাত্য ইত্যাদি নানারূপ হন; সেইরূপ একই আত্মাদেব, বালকের বৈতাল দর্শনের ন্যায়, আপনার স্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ অনেক প্রকার হইয়া প্রতীত হন। শঙ্কা;—হে ভগবন্! যেরূপ মধ্যাহ্নের সূর্য্য বিষয়ে অন্ধকারের স্থিতি সম্ভব নহে সেইরূপ ভাসমান স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা বিষয়ে এই অজ্ঞানের স্থিতি সম্ভব নহে। সমাধান;—হে মৈত্রেয়ি! এই মায়া অত্যন্ত দুর্ঘট এবং দুস্তর এবং জীবের অত্যন্ত দুঃখদায়ী এবং এই সংসাররূপ মূলের জননী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

(১)

(ক) সম্পাদকীয় কথা।

সর্ব্ব-নিয়ন্তৃ—মঙ্গলময় জগৎপিতা ও বিশ্বজননী চিন্ময়ীর উপাসনা, আর্য্য জাতি বহু সহস্র কাল হইতে করিয়া আসিতেছেন। এই বিশাল ভারত ভূমিতে আর্য্যগণ, নানা সম্প্রদায় নানা স্থানে অনেক উপায়ে 'জগতের' পিতা ও জগজ্জননীর সাক্ষাৎ লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ভগবদারাধনায় বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্য—পবিত্র পুষ্পাদি উপচার দ্বারা, আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, একাগ্রতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীভগবৎ-আরাধনা করা হয়। ইহাতে অনাদি কাল-আগত সনাতন বেদ মন্ত্র ও বেদার্থ-অনুযায়ী স্মৃতি তন্ত্র, মন্ত্র মহর্ষিগণের সুগভীর চিন্তানিয়ন্ত্রিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবদারাধনা করিতে হইলেই আরাধ্য, আরাধক, আরাধনা এই তিনেরই প্রয়োজন হয়, যেমন ভোজন-কার্য্যে ভোক্তা, ভোগ্য, ও ভোজন-ব্যাপার এই তিন দেখিতে পাওয়া যায়। যেই খানে ভোজন দেখা যায় তথায় ভোক্তা ও ভোগ্য বস্তু অবশ্যই থাকে, তদ্রূপ আরাধনা বলিলে, আরাধ্য দেবতা, সাধক ও সাধনা এই তিনের যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োজন। যাঁহারা বলেন—দেবতা ভিন্ন ভক্তি, ও ভক্তিবিহীন উপাসনা হইতে পারে, তাঁহাদের স্বেচ্ছা-কল্পিত, পাশ্চত্য ভাবের, যথা-কথঞ্চিৎ 'নাম' মাত্র

ভগবদারাধনাকে আমরা দেবতাশূন্য ভক্তি ও ভক্তিবিহীন উপাসনাই মনে করি। মন্দ, মধ্য, উত্তম এই ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, অধিকারীর প্রতিমা বা মূর্ত্তি ভিন্ন আরাধনা হইতে পারে না। সমাধিস্থ যোগধ্যান-নিরত মনীষিগণের প্রতিমা ভিন্ন উপাসনার কথক সম্ভব হয়। নিরাকারের বা শূন্যের পক্ষে এই উপাস্য, উপাসক, উপাসনা প্রযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য রীতানুসারে দেবতাহীন দেবালয় ও উপাস্য ও তন্ত্র-মন্ত্র-বিহীন উপাসনা প্রচারে কেহ কেহ ব্রতী হইয়াছেন। তাহাতে আধ্যাত্মিক সমুন্নতির কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। "বিশ্বনিয়ন্তৃ পরমেশ স্বয়ং সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ (১) অশরীরী হইয়াও সাধকদিগের পরমকল্যাণ এবং নির্ব্বাণের নিমিত্ত নামরূপাদি দ্বারা পদার্থের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির) বিভিন্নরূপে কল্পনা করিয়াছেন।" তবে যে, মৃৎ দারু, তৃণময় প্রতিমাদিতে লোকে উপাসনা করে তাহা কাহার? কি ভগবানের না মৃত্তিকাদির? আমরা বলি, তাহা ভগবানেরই আরাধনা মৃৎ-কাষ্ঠ প্রভৃতি আশ্রয় বা আলম্বন মাত্র। যেরূপ সামান্য চিত্র দেখিয়া কোন মহাপুরুষের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও তাঁহার স্বরূপে নিশ্চয় করা হয় তদ্রূপ স্বচ্ছ ও পূত বস্তুতে অর্থাৎ নির্ম্মল জলে, দর্পনে, অনলে, পটে অচিরে লোকের মন একাগ্রতাসহকারে ধাবিত হয়। এই নিমিত্ত নিখিল জ্ঞানশীল মহর্ষিগণ জলাদিতে জগৎপিতা ও জগদম্বার আরাধনার বিধান করিয়াছেন। (২) তাহা না হইলে কেবল 'ঈশ্বর আছেন,

(১) "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

সংক্ষেপার্থঃ—চিন্ময়স্য—চেতন্যস্বরূপস্য, অদ্বিতীয়স্য সহকারি-রহিতস্য নিষ্কলস্য বিভোরপরিচ্ছিন্নস্য অশরীরিণঃ অবিনাশিন, উপাসকানাম সাধকানাং কার্য্যার্থং—ঐহিকপরমকল্যাণ পারত্রিক-নির্ব্বাণার্থং, এবং বিশেষণবিশিষ্টস্য পরমাত্মনঃ, ব্রহ্মণ ইতি সর্ব্বত্র কর্ত্তরি ষষ্ঠী, রূপকল্পনা—নামরূপে ব্যাকরণম্। অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদিরূপেণ অনেকধা ইব স্থানমিতি।

বিশ্বপিতা বিধাতাই স্বয়ং জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অর্থাৎ কল্প, প্রলয়, মহাপ্রলয়ে দুঃখ সাগরে পতিত জীবগণের উদ্ধারার্থ নানারূপ পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন। তাহা না হইলে তাঁহার স্বরূপ লোকের অবাঙ্মনসগোচর হইত।

(২) "অধিষ্ঠাত্র্যো দেবতা বিদ্যন্তে প্রতিমাভূতস্তু শাখাদয়ঃ তাঃ কলাঃ সাধয়ন্তি"। উব্বটভাষ্যে। "অপ্সুদেব' মনুষ্যাণাং রবৌ দেবা মনীষিণাং। প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ॥" স্মৃতিঃ।

মানবগণের আরাধ্য দেবতা স্বচ্ছ সলিলাদিতে, মহামনা মুনিদিগের দেবতা আদিত্য চন্দ্র প্রভৃতিতে। অল্পবুদ্ধি লোকের দেবতা প্রতিমাদিতে, যোগিগণের হৃদয়ে সকল সময়েই শ্রীহরি বর্ত্তমান।

তিনি আমার মঙ্গল করিবেন' এই কথা দ্বারা, শারীরিক মানসিক ক্লেশ দূর হয় না, মন্ত্র তন্ত্র, পবিত্র প্রতিমা উপচারাদিরহিত তাদৃশ কেবল কথার কথায় তাঁহার আরাধনা, সেবা হয় না। কোন একটী আশ্রয় বা আলম্বন অবশ্যই চাই। বেদান্ত দর্শনের "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"(৩) এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অতি বিশদ ও সুন্দর ভাবে বিচারপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতীক বা প্রতিমা প্রভৃতি আরাধনার আশ্রয়, ও আলম্বন মাত্র উহা আধারের উপাসনা নয়। যে আধারে যাহা ধ্যেয় বস্তু তাঁহারই উপাসনা, কেননা আশ্রয়ণীয় পোতারোহণে সমুদ্র উত্তরণ করিয়া অভীষ্ট দেশ লাভ করাই লোকের বাঞ্ছিত, পোত বা সমুদ্র নয়। যে হেতু তাহাতে ত প্রাপ্ত বস্তু সুলভ্য চরম আরাধ্য নয়। যাহা চির বাঞ্ছিত, যাহাকে পাইলে আর দ্বিতীয় প্রাপ্য বস্তুর জন্য মন ব্যাকুল হয় না, চির পিপাসা মিটিয়া যায় তাহাই চাই। সেই জন্য যাহাতে মন সহজে ধাবিত হয় সেই পবিত্র সুলভ বস্তুর আশ্রয়ে স্থূল স্থূল অরুন্ধতীর ন্যায় (৪) ক্রমে সুদুর্লভ মুনিধ্যানগম্য পরম বস্তুই চরম লভ্য।

জড়ে বস্তুতে উপাসনা করা ঈশ্বরের আরাধনা নয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়, প্রথম ও মধ্যাধিকারীর জড়বস্তুর সম্পর্কশূন্য উপাসনা হইতেই পারে না। জড় বস্তুতে যে পরমেশ্বরের বিভূতি বিদ্যমান আছে এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি বিস্তর পাওয়া যায়। ক্রমোপাসনা ভিন্ন প্রথমে হঠাৎ কাহারও ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না। প্রত্যেক জড়েতে সেই সেই অভিমানিনী দেবতা বিদ্যমান আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ শাস্ত্রী

---

(৩) "ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"। উৎকর্ষাদ্ধেতোঃ মনআদিষু আশ্রয়েষু ব্রহ্মণ এব দৃষ্টিঃ জ্ঞানম্, নতু ব্রহ্মণি তেষাং আদিত্যাদীনাং আরাধনং তেষাং মোক্ষদাতৃত্বাভাবাৎ॥"

'আদিত্য ব্রহ্ম' 'মন ব্রহ্ম' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেতে আদিত্যাদি কেবল প্রতীক বা আলম্বন মাত্র, আরাধনা সর্ব্বত্র পরমেশ্বরই হইয়া থাকে, এই ভাবে প্রতিমাদিও আশ্রয়মাত্র জানিবে।

(৪) অরুন্ধতী যেরূপ সূক্ষ্ম বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাকে দেখিতে হইলে প্রথমে চন্দ্রমণ্ডল, তাহারপর সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার উত্তর দিকে বৃহৎ নক্ষত্র দেখান যায়। সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্র হঠাৎ আশ্রয় ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে 'স্থূলারুন্ধতী' ন্যায় বলে।

(খ) (সান্তবাম স্বামীর কথা।)

আমি। আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তা'তে আর সন্ধ্যা আহ্নিক না ক'রে থাকা যায় না, তা'ই স্বামিজি, আপনার কাছে এসেছি, যদি কিছু বলেন!

স্বামী। হাঁ তোদের যেরূপ ভীষণ উৎকট ধর্ম্মসংস্কারের ঝোঁক দেখছি, তা'তে যে এতদিন তোরা সন্ধ্যা না করে কেমন করে ছিলি তা'ত বুঝতে পাচ্ছিনি। এ'সব প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে কেন? নীলকণ্ঠ, বাণীকণ্ঠ, পীতকণ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে গেলেইত' ভাল ছিল।

আমি। না। আপনার ভিতর একটা অসাম্প্রদায়িক Breadth of view বা দৃষ্টির প্রসারতা আছে, তা'ত সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। আর দেখুন, আমরা শিক্ষিত লোক হয়ে, যে পুনরায় শাস্ত্রের ও মন্ত্রের খুটিনাটি নিয়ে থাকব, তা' বোধ হয় আপনি আশা করেন না। পণ্ডিতদের কাছে গেলেই, তাঁ'রা সায়নাচার্য্য, দাঁড়ানাচার্য্যের প্রভৃতির কথা তুলিবেন, তা' মাথা মুণ্ড কিছু বুঝি না।

স্বামী। হাঁ; তোদের প্রবৃত্তি আমি জানি। তাই বলিয়াই তোদের কাছে শুধু শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে কথা কই না। তা' তোদের একটা গুণও আছে। তোদের অনুভূতি ও বোধের ভিতর একটা জিনিষ আনতে পারলেই, তোরা তা' বুঝতে পারিস্ এবং কাজেও করতে প্রবৃত্ত হস্। আজকালের পণ্ডিতেরা এইটা ভুলে গিয়ে, তোদের দেখলেই নাস্তিক বলে শিউরে উঠে। তা, তো'রা যে ভাবে চাস্ সে ভাবে দু' একটা কথা বলতে পারি। কারণ, জানি দু' ভাবেই কার্য্য সিদ্ধ হয়। কখনও বা ক্রিয়া হইতে ভাব উৎপন্ন হয়, কখনও বা ভাব হইলে ক্রিয়া আপনি আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। তা' তুই প্রশ্ন করে যা,' আমি যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিব।

আমি। ঐ যে 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' বলে, ও জিনিষটা কি? ভক্তি করে ভগবানের নাম করলেই ত' হয়, তা'তে আর ও সাপের মন্তর আউড়ে লাভ কি?

স্বামী। তোরা' ত দূরের কথা, মূল ভাবটি ভুলে গিয়ে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে সন্ধ্যাকে কসরৎ ও মন্ত্র উচ্চারণে পর্য্যবসিত করেছেন। তোরা ভুলে যাস যে সৃষ্টি ও তৎপ্রসূত জীবশক্তি, প্রকৃতির অনন্ত পরিণাম ও বিকাশ

ভগবানের স্বরূপ চৈতন্যের একদেশে মাত্র হইতেছে। তো'রা মুখে বলবি "পাদোহস্য বিশ্ব ভূতানি" 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" "ময়ি ইদং প্রোতং সর্ব্বং সূত্রে মণিগণা ইব", কিন্তু তোদের ধর্ম্মব্যাখ্যা সাধনা ও নিত্য জীবনের ব্যবহার দেখলে মনে হয়, যে তোরা বাস্ক মণির সংখ্যা করিতেই ব্যস্ত, 'সূত্রের' কান ধার ধারিস্ না। তোরা ভাবিস্ যে তোদের এই পরিচ্ছিন্ন 'আমি' জ্ঞানটী যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ তা'কে 'চাড়া দিয়া' ব্রহ্মে পৌঁছাতেই হইবে। কথাটা বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। তোরা 'আমি'টীকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত ভাবিস্, প্রত্যেক তরঙ্গই যেন একটী ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা। তরঙ্গ যে বায়ু-শক্তির সাহায্যে একই মূল জল তত্ত্বে উদ্ভূত হইতেছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া তো'রা বিশিষ্ট তরঙ্গের গতি প্রভৃতি নির্ণয়ে ব্যস্ত। সেইরূপ মায়ার নাম রূপ শক্তির প্রভাবে 'রাম' ভাবটি উৎপন্ন। রাম ভাবে, যে রাম ভাবটীকে লইয়া কিরূপে সে ভগবানে পঁহুছিবে। সে ভুলিয়া যায় যে যতক্ষণ 'রাম' ভাবটী থাকে, ততক্ষণই তাহার গতি বা ক্রমোন্নতি (Evolution)। আর যাই 'রাম ভাবটী' ছাড়িয়া দিবে তাই সে মূল জল-তত্ত্বে পরিণত হইবে কাযেই 'ঢেউ' গণিতে গিয়া তোমাদের আর একরস জলের জ্ঞান হইল না, হইবারও বিশেষ আশা নাই।

আমি। সন্ধ্যা-প্রসঙ্গে এ সব কি বলিতেছেন?

স্বামী। একটু স্থির হইলেই বুঝিতে পারিবে। ২টী তরঙ্গের সান্ধ-স্থলে কি আছে জান? যাহ'তে এই তরঙ্গগুলির উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, সেই অবিকৃত পরমাত্মা ব্রহ্মতত্ত্বই সমুদ্ররূপে বিশেষ প্রকাশ বা তরঙ্গ ভাবগুলির আশ্রয়, কিন্তু যতক্ষণ ঢেউয়ের নাম রূপ দেখিবে, ততক্ষণ ত' তাহাকে চিনিতে পারিবে না। সেই জন্য বিশিষ্টজ্ঞানের সন্ধি-স্থানে বা 'সন্ধ্যা'স্থানে আসিতে পারিলেই সন্ধ্যা করা হয়।

আমি। সেই সন্ধি-চৈতন্য কি? একটু বুঝাইয়া বলুন।

স্বামী। যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং
নানোপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥ ভা ১১।২৮।১৯

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্ত।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্॥ ভাগবত ১১।২৮।২০

যেমন একই স্বর্ণ কার্য্যকারণাদি রূপে হিরণ্ময় কুণ্ডলাদি ভাবে অভিব্যক্ত হইলেও ঐ অভিব্যক্তির পূর্ব্বে, পশ্চাতে ও মধ্যে এক সুবর্ণ-তত্ত্বই থাকে, তদ্রূপ নানাভাবে ব্যপদেশ বা ব্যবহারের মধ্যে, প্রতীয়মান বিশেষ অন্তরালে, শ্রীভগবানের আধাররূপ 'আমি' ভাব রহিয়াছে। জাগ্রতাদি তিন অবস্থাতে অভিব্যক্ত গুণত্রয়ের ও কার্য্যকারণ কর্তৃত্ব বোধের, আধ্যাত্ম অধিদৈব ও অধিভূত এই তিন ভাবের বিলাসে জগৎভাব ফুটিতেছে। কিন্তু যে তুরীয় বা চতুর্থ ভাবের সাহায্যে, অন্বয় ও ব্যতিরেক দুই ক্রমেই, এই ব্যক্তভাব অন্বিত হইয়া থাকে, যে মহাজ্যোতির প্রকাশে এই ভাবসকল প্রকটিত হয়, যাহা 'চক্ষুর চক্ষু' 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং যিনি সমাধি অবস্থায় চৈতন্য-খেলা সমূহ সংহনন করিয়া আপনাতে আপনি নিবৃত্ত হন, তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই সন্ধি-চৈতন্য।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
বাচারম্ভণমবিকারো নামধেয়ম মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ শ্রুতিঃ।

আমি। বাবা! তবেই সন্ধ্যা করেছি।

স্বামী। বিশেষ আতঙ্কের কারণ নাই। আমাদের বুদ্ধি এতই বিশিষ্ট-ভাবাপন্ন, যে ছিন্ন বিশেষের পশ্চাতে দেখিতে গেলেই ভয় হয়। ছিন্নজ্ঞান আমাদের এত প্রিয়, যে ছিন্ন স্পন্দনের শেষ হইলেই আমরা চমকিয়া উঠি। তুমি ভাবিতেছ যে আজকালের 'বামুণ' পণ্ডিতগণ বুঝি বড় ভাগ্যবান্। যাহার ভিতর শ্রীভগবানের চৈতন্য ফুটে নাই, তিনি 'ভয়ঙ্কর' পণ্ডিত হইলেও তদ্দ্বারা সন্ধ্যাকার্য্য সাধিত হয় না তোমরা সংসারী, তাই স্ত্রী পুত্র, সুখ, লইয়া সংসারার মালা গাঁথিবার চেষ্টা করিতেছ। তাহারাও তাই করে, তবে বেশীর ভাগ,—দু-চারটা শাস্ত্রের বুকনি ও পারিভাষা। "তুমি খাও হাতে জল আমি খাই ঘাটে" আবার দেখ—মহাবীর হনুমানকে যখন মণিময় মালা উপঢৌকন দেওয়া হইল, তখন তিনি এক একটি মণি দন্তে ভাঙ্গিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহার ভিতর শ্রীরামচন্দ্র আছেন কি না? যে বিশেষ ভাব বা পদার্থে ভগবানের নাম বা চিহ্ন নাই, তাহা'ত আর ভক্তপ্রবরের নিকট আদরণীয় নহে। যাহার সূত্রের জ্ঞান নাই, সে মনে করে বিশেষের মালাটি বুঝি আপনিই গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহার সূত্রের জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা আছে, তাহাকে অবশ্যই অন্ততঃ দুইটী মণি সরাইয়া সন্ধিস্থানে দেখিতে হইবে। কথাটার প্রকৃত মর্ম্ম তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই।

আমি। তা'ত' পারিই নাই। একটা আবছাওয়া মত' দেখিতেছি। কি করিয়া সে দৃষ্টি আসে, তাহা বলুন।

স্বামী। উহা চৈতন্যময়ীর বিলাসের ফল। জগতে কয়জন মানব বিশিষ্ট বস্তু বা পদার্থের অতিরিক্ত ভাব দেখিতে পায়? বিশিষ্ট স্ত্রী পুত্র ধন মান লইয়াই তাহারা তৃপ্ত। তাহাদের 'সন্ধ্যার' কি প্রয়োজন আছে? তাহার পর যখন মানব বুঝিতে পারে যে বিশিষ্ট বস্তুতে তৃপ্তি নাই,—যতক্ষণ তাহারা 'আমি'র অনুরূপ ভাবে খেলে ততক্ষণই তৃপ্তি, না হইলেই অতৃপ্তি,—তখনইত সে 'আমি'র দিকে চায়। তারপর সে দেখিতে পায় যে একই 'আমি' ও একই ভাবের বস্তু থাকিলেও বরাবর একই ভাবের ক্রিয়া হয় না। এই অবস্থায় সে বলিয়া উঠে— "সেই আমি, সেইত তুমি, কোথা' গেল ভালবাসা" তারপর সে অল্প অল্প বুঝিতে পারে যে 'আমি' ও 'বস্তুর' অতিগ কি এক শক্তি বা সত্তার অস্তিত্ব আছে। ঐ চৈতন্য যখন বুদ্ধিরূপে ভিতরে একটী প্রবণতা জাগাইয়া দেয় ও বাহিরে তদনুরূপ একটিই বস্তুর বোধ জন্মায়, তখনই মানব আনন্দের অনুভব করে। এই চৈতন্যকেই ন্যায়শাস্ত্র ফলদাতা ঈশ্বররূপে বর্ণনা করে। এই চৈতন্যের উপলব্ধিই কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? 'আমি' এবং 'বস্তুর' সন্ধিস্থলে যখন দৃষ্টি পড়ে, তখনই তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। ইহাই প্রথম সন্ধিস্থলে প্রকটিত ভগবানের বিলাস। তখন জীব দেখিতে পায় যে সে এক মহান্ চৈতন্যের গবুস্থ জ্রূণের ন্যায়, এবং সেই মহা-চৈতন্যই উপযোগী ভাবে তাহার 'অহং' জ্ঞানের বাহিরে স্থিত ভোগ্য বস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া কিরূপে তাহার ভিতর অল্পে অল্পে সৎ-চিৎ ও আনন্দের স্থাপনা করিতেছে।

আমি। কি রূপে এই চৈতন্যের অনুভূতি হয়?

স্বামী। যখনই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে বিষয় উপভোগ করিবে তখন যদি বিশিষ্ট অহং জ্ঞানের মোহ বা কাম একটু স্তম্ভিত করিতে পায়, তাহা হইলে সেই দৃষ্টি ফুটিবার প্রথম সোপানে আসিতে পারিবে। ইহার নাম তিতিক্ষা। বিষয় ভোগ কর; দেখ না উহাতে কি আছে? একবারে ডুবিয়া পড়িও না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে যে এই কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারে, সেই সুখী ও যোগী। এইজন্যই যম ও নিয়ম। যদি সন্ধি-চৈতন্য না থাকিত, তাহা

হইলে বাহ্য বস্তু বোধ জ্ঞান, সুখ বা অন্য কোনও রূপে তোমাতে মিশিতে পারিত না। সেই চৈতন্য যদি তোমার অতিরিক্ত না হইত, তাহা হইলে, তোমার অস্তিত্ব জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধিত হইতে পারিত না আজ এই কথাটাই বুঝ ও সন্ধিস্থলে যে চৈতন্য আছেন তাহা প্রত্যেক প্রত্যয়ের মধ্যে দেখিবার চেষ্টা কর। আর পরে বলা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সাধক সর্ব্বানন্দ। *

(দশমহাবিদ্যা)

নব সংক্রমণে, উত্তর অয়নে,
পৌষের শেষের পবিত্র দিবসে,
ঘোর অমানিশি মাতা মুক্তকেশী
উদিলা মেহারে জ্ঞান (১) মূলে এসে।
হরহৃদিচারী জননী শঙ্করী,
সর্ব্বানন্দের সকাতর ডাকে,
আইলা অভয়া লইয়া বিজয়া,
আপনার কোলে লইতে তাহাকে।
যোগনিদ্রা গত পড়' মৃতবৎ
'পূর্ণানন্দ'-তনু লোটাইছে ধরা
শব হৃদাসনে বসে যোগাসনে,
ধ্যানে সর্ব্বানন্দ জগত পাসরা।

---

* প্রায় তিন শত বর্ষের অধিক কাল হইল ঠাকুর সর্ব্বানন্দ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহার গ্রামে দশমহাবিদ্যার সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মেহার এ, বি রেলওয়ের চাঁদপুর ষ্টেশন হইতে অল্পদূরে—ভিতর রেলওয়ে ষ্টেশন নামিয়া যাইতে হয়।

(১) জীন এক প্রকার বৃহদায়তন বৃক্ষ। 'মেহারে জীনমূলে বিবুধতমোযুতৈঃ' ইত্যাদি। পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দের পিতামহের সহচর ভৃত্য ও সর্ব্বানন্দের উত্তরসাধক।

কহিলা জননী "দেখরে বাছনি
আমিরে সম্মুখে আসিয়াছি তোর,
ত্বরা লহ বর একা মহেশ্বর,
শূন্য রহিয়াছে সে কৈলাসপুর।"

সর্ব্বানন্দ কহিল—

"কায্ কি জননি খুলিয়া নয়নে
তুমিত' আছ মা হৃদয়-আসনে
নয়ন-পলকে পাছে এ বালকে
ছেড়ে যাও, তা'ই ভয় হয় মনে।

দেবী।— তোমার হৃদয় সদা আমা-ময়,
আছে চিরকাল, রহিবে সদা.
অন্তরে বাহিরে আছে তো'রে ঘিরে
সর্ব্বানন্দ! তোর শর্ব্বাণী মাতা।
জান নাকি ধন, জননী কখন,
তনয়ে ছাড়িয়া থাকিতে না পারে,
বিমুখী সন্তান, খেলাতে অজ্ঞান
চাহে না, তাইত' দেখিতে নারে;—
ক্রোধ উপেক্ষায়, ঘৃণা কি হেলায়,
মা'র পানে ফিরে চাহেরে যে জন,
স্নেহভরা কোলে, তা'রে লন তুলে;—
মা'র নাই ভাল মন্দের গণন!

সর্ব্ব।—মাগো!

তোর রূপ হেরি, জন্ম জন্ম ধরি,
তিরপিত কভু না হ'ল নয়ন,
যেরূপ দেখিলে. মাহি মজি ভুলে,
সেইরূপ তব দেখাও এখন।

দেবী।— বাছা!

সর্ব্বেতে দেখরে 'সর্ব্ব'রূপে মোরে,
'পরা'রূপে দেখ অন্তরেতে তোর;—

তোর মোর রূপে অভেদ স্বরূপে,
আমি মাতা তুই তনয় যে মোর।
বুঝিলেত ধন, কি চাহ এখন,
তোমারে অদেয় নাহি কিছু রয় ;—
ইচ্ছা যেবা হয় পূরাব নিশ্চয়,
তোর ইচ্ছা সব মোর ইচ্ছাময়।

সর্ব্ব।— কি চাব জননি স্তুতি নাহি জানি
না জানি কিসে বা তব স্তুতি হয়,
এই শুধু জানি তুমি গো জননী
দেও মা শিখায়ে যা' বলিতে হয়।
পূর্ণানন্দ মোর সাধক উত্তর
শবরূপে শুয়ে ধরণী-আধারে,
বাসনা আমার বিদিত তাহার
যা' চাহিতে হয় সে চাহিতে পারে।"
অঙ্গুষ্ঠ পরশে যা' দিয়া মহিষে
রাখিলা চরণে কবলিত করি',
সে পদ স্পর্শিয়া, পূর্ণজোগাইয়া,
"উঠরে নির্ব্বংশে" কহিলা শঙ্করী।
পূর্ণানন্দ উঠি' পদে পড়ে লুঠি,
পূর্ণানন্দে ভাসি পূর্ণানন্দে কয়,
"করুণায় কালি, নির্ব্বংশ করিলি,
পূর্ণানন্দ যেন পূর্ণানন্দ রয়।"

দেবী।—ওরেবে নিগুর্ণ পূণা, তোর স্তুতি আছে শুনা,
সর্ব্বের অভীষ্ট কিবা শুনারে আমায়,
আজি সর্ব্বে দিতে বর, ছাড়িয়া কৈলাস ঘর,
এই কলিকালে আমি এসেছি ধরায়।

পূর্ণ।— বর দিবি, মা বরদে! তবে দুর্গে! এ বর দে
'সর্ব্বে'র অটল মতি থা'ক তব পায়.

---

* মহিষাসুরকে। কিঞ্চিদূর্দ্ধ্বং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি (শ্রীদুর্গাধ্যান)।

রাখি মতি সর্ব্ব-পদে যে তোরে ভজে ববদে
পূর্ণানন্দ যেন তা'রে বুক পেতে পায়।

দেবী।—ওরে পূর্ণা! হীন মতি, এই'ত আমার রীতি,
এইত স্বভাব মোর এ'ত নয় বর,
না ভজিয়া সর্ব্ব পায়, কেবা কোথা মোবে পায়,
তব ইচ্ছামত বর চাহরে অপর।

পূর্ণ।— "জয় মা বরদা শিবা, তুই বিনে আর কেবা,
যাচিয়া করুণা করে জীবেরে এমন
দে মা তবে এই বর, মহা বিদ্যারূপ ধর,
দশ-মহা-তত্ত্ব-রূপ করাও দর্শন।"

দেবী।— "সাধু সাধু সর্ব্বানন্দ, সাধু সাধু পূর্ণানন্দ,
কলি-কবলিত জীব উদ্ধারের হেতু,
মতঙ্গের পুণ্যাশ্রমে, পবিত্র মেহার ধামে,
রচিলে আনন্দময় মুকতির সেতু।"
এত বলি জগন্মাতা, কহে সর্ব্বানন্দে তথা,
"সর্ব্ব-রূপে আগে মোরে কর দরশন,
কালীরূপে অনন্তরে, ভৈরব ঋষিরে স্ম'রে
উষ্ণিক ছন্দেতে পাবে করিতে ঈক্ষণ।"

* * * *

পূর্ণানন্দ করে ধরি', সর্ব্ব যে বিময় করি,'
কহে, "পূর্ণা দাদা কোথা গেলরে শঙ্করী,"
পূর্ণ কহে "সর্ব্ব মাঝে দেখরে কল্যাণী রাজে
সর্ব্বরসে সর্ব্বগন্ধে সর্ব্বরূপ ধরি।"

তাই,— গগন, পবন, জল, তৃণ, লতা, ফুল, ফল,
ভূধর, সাগর, জীব, বিশ্বচরাচর,
শশী সূর্য্য গ্রহগণ, বুদ্ধি, চিত্ত, প্রাণ, মন,
শিবতম শিবরসে ব্যাপ্ত নিরন্তর।
সে রস আস্বাদি হায়, চকোর গগনে ধায়
সুধাকর-কর-সুধা করিবারে পান,

ভূতলে ভ্রমর বুলে, উদ্যান-বিতানে ফুলে,
রঙ্গে কুরঙ্গিণী ধায় শুনি বংশীগান।
দেখি দীপ্ত হুতাশন পতঙ্গ,—পাগল মন,
অধির হইয়া ধায় আলিঙ্গিতে তা'য় ;
গজেন্দ্র করেণু সঙ্গে, সে রসে মাইয়া রঙ্গে,
সুগভীর পঙ্কহ্রদে ডুবাইছে কায়।
সূতিকা-মন্দির দ্বারে ঐ দেখ চেয়ে তারে
আনন্দ-প্রদীপ মাতা জ্বালে কুতূহলে,
আবার শ্মশান বাসে, ভীষণ সে অট্টহাসে,
শ্মশান বহ্নিতে স্থায়ী অগ্নিরূপে জ্বলে।
কর ঐ দরশন সিদ্ধ ঋষি মুনিগণ
সর্ব্ব দেবদেবীগণ মিলে অঙ্গে তাঁ'র
বিধি বিষ্ণু গঙ্গাধব, হয়ে সব একত্তব,
প্রণমিছে তাঁ'ব পদে দেখ বার বার।
ঐ দেখ :—ভৈরব শিঙ্গায় কি তান বাজায়
চন্দ্র তারা ভাস্করে
উষ্ণিক্ ছন্দে মহান মন্ত্রে,
কালের হৃদি কন্দরে।
আকাশ পবন জল হুতাশন
সেই তালেরই রঙ্গেরে
তপন তারা লক্ষ্যহারা
ছুটছে কোথা অম্বরে।
মরণ তন্ত্রে প্রণব মন্ত্রে
ভৈরব ঋষির হুঙ্কারে
বাজছে সাধে মহান নাদে
মহাকালের ডঙ্কারে।
বিশ্ব গ্রাসিতে অট্ট-হাসিছে
'কলন'-মন্ত্র ঝঙ্কারে ;
সর্ব্বনাশি মুক্তকেশী
বিশ্ব-রাশি সংহারে।

বর্ষগুলি　　　কল্পধূলি
　　যুগ যুগান্ত কঙ্কড়ে
লাগছে যত　　　ঘাত প্রতিঘাত
　　হর্ষ, আশা, শঙ্কারে—
ভাঙ্গছে তত　　　অবিরত
　　করাল দণ্ডে মর্ম্মরে,
অট্টহাস্যে　　　করালাস্যে,
　　রক্তদন্তা হুঙ্কারে।
ব্যক্ত বিশ্ব,　　　নয়কো দৃশ্য
　　চিহ্ন রূপে দৃশ্যেরে
কোটী ব্রহ্ম　　　মুণ্ডমালে
　　দুল্‌ছে কালীর কণ্ঠেরে।

সর্ব্ব।—এ কি!

পুঞ্জীকৃত ঘনীভূত ঘোর অন্ধকার,
দলিত অঞ্জনপুঞ্জ গঞ্জিত আকার,
মহামেঘ-প্রভানীল তম, সমুজ্জ্বল
পদভরে সমুদয় করে টলমল!
দন্তুরা উজ্জ্বল দন্ত করিয়া বিকাশ
সমগ্র 'বিশেষ' বিশ্ব করিতেছে গ্রাস।
ব্যাদিত বিকট ভীম করাল বদনে
বিশ্ব-বীজ রক্ত-রাগে ভাতিছে দশনে
লক্ লক্ রসনায় রসরূপে সবে
লেহিয়া গ্রাসিছে 'সর্ব্ব' যা,—আছে যা' হবে।
ভূত ভবিষ্যত নাহি, নাহি বর্ত্তমান
নহে কোন চিহ্ন জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় সন্ধান
নামরূপ গোত্রাকৃতি যা' কিছু সকল
প্রবেশিছে মহাবেগে সে মুখে নিষ্ফল
কেবল সৃক্কণীপ্রান্ত লিপ্ত রক্তরাগে
বিশিষ্টের অতিক্ষীণ প্রভামাত্র জাগে।

সূর্য্যেন্দু-পাবক-দীপ্ত অপাঙ্গহিল্লোলে
পরাজ্যোতি পেয়ে দ্যুতি ধক্ ধক্ জ্বলে।
বাম ঊর্দ্ধ করে ধরি কৃতান্ত খর্পর
কাটি কাটি নরশির শত অষ্টোত্তর
নির্ব্বিশেষ চিহ্নরূপে কণ্ঠে হার করি,
কি মহান্ মুণ্ডমালা পরেছ, শঙ্করি।
সর্ব্বভাব সর্ব্বরূপ করি সংহরণ
আর করে ছিন্নমুণ্ড করেছ ধারণ।
দক্ষিণ উভয় করে, দক্ষিণারূপিণী
ঊর্দ্ধ পর কি দেখাও শিব-সীমন্তিনি।
কটিতটে করকাঞ্চি হারে ক্রিয়ারাশি
দগ্ধ-বস্ত্র অবভাসে উঠিতেছে ভাসি।
গতিহীন মহাকালে রতিরঙ্গে টানি,
বিপরীত পথে কোথা চলেছ ঈশানি!
অদৃশ্য আধার হতে বাম পদ তুলি,
বিশ্বনাথ-হৃদে দক্ষ-পাদপদ্ম ডালি'
কোন্ 'পর' অভিমুখে চলিছ সর্ব্বাণি।
বিশিষ্টে দলিয়া অন্তরঙ্গে কোলে টানি।
মুক্ত-কেশে কোথা তুমি যাও দিগম্বরি।
করালী কলনী কালি দেখে ভয়ে মরি।
ধরি সদানন্দ করে কহে পূর্ণানন্দ ধীরে,
"সিংহীর সাবক কি রে মায়েরে ডরায়?
মহাকালী রূপে যা'রে বাহিরে দেখিছ তা'রে,
হৃদে দেখ তারারূপে সে কালী খেলায়।

(ক্রমশঃ) শ্রীচিন্তা—

———

ন-কর্ত্তা।

বিলুপ্ত বনানীর শেষ নিদর্শন অভ্র-ভেদী প্রাচীন মহীরুহের মত আমাদের সংসারে সেকালের শেষ চিহ্নের সাক্ষী-স্বরূপ পিতামহবর্গের মধ্যে একমাত্র ন-কর্ত্তা বা ন ঠাকুরদাদা তখনো সশরীরে বর্ত্তমান।

'তেহি নো দিবসা গতাঃ'—সেকাল ও একালে যে একটা গুরুতর তফাৎ বা সংঘাতিক প্রভেদ হইয়া থাকে তাহা স্বতঃসিদ্ধ এবং চির প্রবাদের মধ্যে পরিগণিত। যেটি যায়, সেটি আর আসে না,—বিদায় দিয়াছি যারে নয়ন জলে এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে। তবে ইহা ঠিক যে বিগত ৫০।৬০ বৎসরের আমাদের দেশে সেকাল ও একালের মধ্যে একটা বিষম ও মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

একালে আমাদের সংসারে ন-কর্ত্তা মূর্ত্তিমান সেকালের ন্যায় অধুনা-লুপ্ত চাল চলন ও আচার ব্যবহারগুলিকে সচেতন রাখিয়াছিলেন। মোটের মাথায় আমাদের সংসারটী উভয় কালের যুগ-সন্ধির ন্যায়। পিতৃস্থানীয়গণ অর্থাৎ জ্যেঠামহাশয়, বাবা ও খুল্লতাত প্রভৃতি একালের 'চেলা'—ইংরাজি টোলে শিক্ষিত, সহর-প্রবাসী, কামিজ-কোট-পারহিত, বহুব্যয়ী, ক্ষীণকায়, চা-বিস্কুট-পায়ী ও অল্লাধিক অজীর্ণাদি রোগ-আক্রান্ত, মধ্যে বাটী যাইয়া ক্রিয়াকলাপে আমোদ আহ্লাদ পরিশ্রম ব্যতীত পল্লী-সমাজ বা জমি জমাৎ ও চাষবাসের সঙ্গে তাঁহাদের বড় একটা সম্পর্ক নাই। আমরা অর্থাৎ আর এক পুরুষ অধস্তন, বালক ও যুবকেরাও ঐ পথের পথিক।

ন-কর্ত্তা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত,—বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ্য ব্যতীত সাধের ভদ্রাসন ও পল্লীসমাজ ছাড়িয়া বড় একটা কোথাও যাইতেন না; এবং তাহাও অতি অল্পদিনের জন্য। অস্থি ও পেশীবহুল দীর্ঘাকার, বলবান্ দেহ, তখনো আবশ্যক হইলে বাজী রাখিয়া দুই জনের খোরাক একলা খাইতে, দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ৪।৫ ক্রোশ পথ মাথায় গামছা বাঁধিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতে, এবং লাঠির দ্বারা ২।৩ জনের মহড়া লইতে সক্ষম ছিলেন।

এখানে আমাদের একটু বংশ ইতিহাস বলা আবশ্যক। আমরা পল্লীগ্রামে বনিয়াদি ও অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবার; আমার অতিবৃদ্ধ পিতামহ কিছু সঙ্গতি হইলে একখানা মৌজা ক্রয় করেন, উহাই আমাদের লক্ষ্মী।

তারপর পুরুষের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার ফলে ক্রমশঃই বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়। পিতামহ পাঁচ সহোদর ছিলেন; তন্মধ্যে ন-ঠাকুরদাদা অপুত্রক ও জীবিত। অন্যান্য সহোদরগণের সন্তান সন্ততি ১০ জন এবং ইহারা সকলেই জীবিত, ইংরাজি-শিক্ষিত, কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী, তত্রাচ এখনো এক সংসারভুক্ত।

আমাদের সহরেব বাসা বড়লোকের ধরণের;—বামুন, ঝি, গাড়ী জুড়ী, বন্ধু-বান্ধবদের সহিত প্রীতি-ভোজন, থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দর্শন, এবং ইত্যাদি রূপে অজস্র ব্যয়ের অভাব ছিল না। দেশে ইহার ঠিক বিপরীত, যতদুর সম্ভব মোটা চাল ও মিতব্যয়িতা; তক্তাপোষের একটী বহুমলিন জাজিম ও সতরঞ্চ, কাচের লণ্ঠনে নারিকেল তৈলের অল্পোজ্জ্বল আলোক, কলাপাতা করিয়া নিজ জোত-উৎপন্ন মোটা চাউলের ভাত, দেউড়ীতে কর্ত্তাদের আমলের পুরাতন পাল্‌কী এবং বাবরীকাটা চুল ও প্রমাণ লাঠি হস্তে পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণচন্দ্র ওরফে 'কেষ্টা।'

এখনো আমরা একান্নবর্ত্তী, এবং ক্রিয়াকলাপ ও উৎসব প্রভৃতিতে আমাদের বাটী অতি অবশ্য যাইতে হয়, এবং সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতে হয়। এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, আমাদের সংসার সেকাল ও একালের যুগ সন্ধি। ন-কর্ত্তা সেকালের লোক, সুতরাং তাঁর দোষও ছিল এবং গুণও ছিল; আমরা একালের লোক সুতরাং আমাদের দোষও নাই, গুণও নাই।

ন-কর্ত্তা অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং সে মিত্যব্যয়িতাব মাত্রা এত বেশী যে তাহা কৃপণতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাঁহার নিকট কোন কিছু চাঁদা বা অন্য বাবদে আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল; এমন কি তাঁহার হাতের ফাঁক দিয়া জল গলিত কি না এ বিষয়ে বাল্যকালে আমাদের গভীর সমস্যার বিষয় ছিল। সেকালের ন্যায় তাঁ'র অনেকগুলি কুসংস্কার ছিল, যথা—অন্নদান, জলদান, কন্যাদায়, পিতৃদায় প্রভৃতিতে সরকার হইতে বৃত্তি বা সাহায্য দান; কিন্তু লাইব্রেরী, সভাসমিতি বা মেমোরিয়াল প্রভৃতিতে এক আধলা পয়সাও আদায় করা যাইত না। পৌত্রগণের মধ্যে তিনি আমাকে ও বিপিনকে (সেজ কাকা বাবুর ছেলে) একটু বেশী ভাল বাসিতেন; কিন্তু আমাদের আবদারেও কিছু আদায় হইত না; আমরা এই প্রকার কৃপণতার জন্য দাদামহাশয়কে পরলোকে নরক নামক স্থান বিশেষে বাস অবশ্যম্ভাবী বুঝাইয়া দিলেও কেবল হাসিতেন। চাল অত্যন্ত মোটা ও বন্দোবস্ত

কায়েমী,—যে সকল দ্রব্য বহুদিন টিকিবে সে সকল ভিন্ন অন্য দ্রব্যাদি ক্রয় করান অত্যন্ত দুরূহ ছিল। 'পূজার জন্য পিত্তলের কলা প্রস্তুত করাইলে যদি দেবতারা অসন্তুষ্ট না হইতেন, তাহা সেরূপ করিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না।

তাঁহার আরো অনেক কুসংস্কার ছিল ; সেগুলি আমাদের মোটেই ভাল লাগিত না ; যথা,—দিবাভাগে ব্রাহ্মণ মাত্রকেই করজোড়ে প্রণাম, এমন কি নিজের অতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী অথবা পৌত্রগণের বন্ধু বা সমবয়স্ক ব্রাহ্মণকেও ওইভাবে প্রণাম ; এতদ্ব্যতীত সামাজিক ও সাংসারিক রক্ষণশীলতাও সকল সময়ে আমাদের যেন অত্যধিক বাড়াবাড়ী বলিয়া মনে হইত।

সেজ-জ্যেঠা বাবু একবার তাঁহার জন্য একটী সোনা বাঁধান হুঁকা আনিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেটী কখন ব্যবহার বা বাহির করেন নাই ; কারণ তাঁহার দৃষ্টান্তে দরিদ্র জ্ঞাতিগণও ঐ দেখাদেখি ওইরূপ ব্যয়বাহুল্য ও বিলাসিতা অভ্যাস করিবে।

বাটীতে আমাদের সৌখীন বস্ত্রাদি পরিধান করিবার আইন ছিল না—পাছে দরিদ্র গ্রামবাসিগণ নকল করিয়া বসে।

একবার ভোজে আমরা পোলাওএর মনস্থ করিয়াছিলাম ; কিন্তু দাদা মহাশয় তাহা ফর্দ্দ হইতে কাটিয়া দিয়া বলেন যে, "যা" রয় সয় তাহাই করা উচিত, কেননা তোমরা বার মাস পোলাও চালাইতে পারিবে না ; কিংবা সমাজস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবে না।"

একবার আমাদের বাড়ীর রজককে সামাজিক প্রথামত তাহার বাটীতে যাইয়া নিমন্ত্রণ না করার জন্য আমাদের অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

দাদামহাশয়ের সংসারে সর্ব্বময় প্রভুত্ব এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল ; তাঁহার কঠোর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিত না। তিনি অল্পেই ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বিশেষ কোন গুরুতর কারণ না থাকিলে শীঘ্রই ভুলিয়া যাইতেন, এবং আন্তরিক ক্ষমা করিতে পারিতেন ; তত্রাচ কাহাকে শাসন করিবার সময়ে নির্ম্মম ভাবে শাসনও করিতেন।

ইহা ছাড়া তাঁর গুণও ছিল—অত বড় কৃপণ লোকও দুর্ভিক্ষের জন্য তিন বার জমিদারীর সমস্ত অক্ষম প্রজার খাজনা মাপ করেন, এবং সরকারী তহবিল হইতে মালগুজারী জমা দেন। তখন ও কাজটাকে বিশেষ বড় বলিয়া মনে করিতাম না ; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সমস্ত খাজনা মাপ করিয়া নিজ তহবিল হইতে কালেক্টারীর খাজনা দেওয়া যে কিরূপ দুরূহ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

ক্রিয়াকলাপ বা পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে ৪।৫ খানি গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেন।

বর্ত্তমানে স্বদেশী-নেতাগণের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনা যায়; কিন্তু তিনি একাদিক্রমে আমাদের সমস্ত বিষয়ের, গ্রাম্য বারোয়ারীর তত্ত্বাবধান ও সমাজ-পতিত্ব করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও কেহ তাঁহার অভিসন্ধি বা হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই।

ক্রিয়া-কলাপ কিংবা মধ্যাহ্নে ভোজনার্থীর সংখ্যা ভিন্ন অন্য বিষয়ে তাঁহাকে সঙ্গতিপন্ন জমিদার বলিয়া জানিবার উপায় ছিল না; কেবল কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে একজন চাকর গামছা ও ছাতা লইয়া যাইত, এবং দূর গমনকালে আর একজন পাইক সঙ্গে থাকিত।

ন-কর্ত্তা যে বিশেষ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; যাহাদের পল্লীগ্রামে জমিদারী শাসন ও তেজারতী করিতে হয়, তাহাদের 'ধার্ম্মিক' সাজা চলে না; তদুপরি কখনো কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতেও দেখি নাই। স্নানান্তে গৃহদেবতা 'রাধাবল্লভ জীউকে' দর্শন ও প্রণাম ও ইষ্টমন্ত্র জপ ছাড়া কোনরূপ ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখি নাই। কারণ বোধ হয়,—বৈষয়িক কার্য্যবাহুল্যজনিত সময় অথবা প্রবৃত্তির অভাব। গুরুদেব আসিলে তাঁহার কায়মনোবাক্যে সেবা, এবং মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান ও ৺কালীমাতা দর্শনের জন্য কলিকাতার বাসায় আগমন, ইহাই তাঁহার নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান।

তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান কালীন, আমাদের অত্যন্ত সাবধান ও অনাচার-বর্জ্জিত হইতে হইত। এতদ্ব্যতীত কৃষ্টচন্দ্র ওরফে 'কেষ্টা' মধ্যে মধ্যে তরিতরকারী, মৎস এবং বাসাবাটীর কুশল সংবাদ জানিবার জন্য পত্র লইয়া উপস্থিত হইত; সে জন্য মধ্যে মধ্যে সাবধান হইতে হইত, কেননা কৃষ্ণচন্দ্র যে কর্ত্তাবাবুর চর ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মোটের মাথায় আমাদের সংসার একাল ও সেকালের ভাব মিশ্রণে সুখের সংসার ছিল; কিন্তু একটী ঘটনায় সমস্ত চুরমার হইয়া পড়িল।

কলিকাতায় হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ও ধনী হরনাথ মিত্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে; পরন্তু তত্ত্ব-তালাস যাতায়াত ও দহরম-মহরমে ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়।

হরনাথ বাবুর একটী বয়স্থা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যাটী সহর অঞ্চলের আদব-কায়দায় দুরস্ত, বাঙ্গলা ও অল্পস্বল্প ইংরাজী শিক্ষিতা, এবং গীত-বাদ্য-নিপুণা।

হরবনাথ বাবুর একান্ত ইচ্ছা যে বিপিনের সহিত তাহার বিবাহ দেন ; কেন না আজ কালের বাজারে বিপিন সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয় পাত্র। আমাদেরও বিশেষ আগ্রহ হইল, কেন না মেয়েটী সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়স্থা ও সহরের আদব-কায়দায় দুরস্ত ;—তা' ছাড়া কলিকাতার বনিয়াদী, সম্ভ্রান্ত ঘরের সহিত কুটুম্বিতা ঘটিবে, ইহাও আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

হরনাথ বাবু প্রায় ৫।৭ হাজার টাকা খরচ করিবেন, এরূপ আন্দাজও দিলেন। তবে বিবাহটী যাহাতে কলিকাতায় হয়, ইহাও তাঁহার অনুরোধ ছিল। সেজ কাকাবাবু সকল বিষয়েই এক প্রকার মত দিলেন, কথাবার্ত্তাও একরূপ স্থির হইয়া গেল ; কিন্তু কলিকাতায় বিবাহকার্য্য হওয়া সম্বন্ধে ন-কর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত কিছুই স্থির হইল না। সেজ কাকা স্থির করিলেন যে, একবার বাটী যাইয়া কর্ত্তাকে কোনরূপে এই প্রথা-বিরুদ্ধ কার্য্যে রাজী করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।

ইতি মধ্যে 'কেষ্টা' দেশ হইতে এক পত্র লইয়া উপস্থিত ; পত্র পাঠ করিয়া আমরা বিচলিত হইলাম।

"পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমস্ত—

পরে বাবাজীউ বহুদিবস তোমাদের বাসাবাটীর কুশল সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি ; লোকমারফৎ সংবাদ পাঠাইয়া সুখী করিবা। এখানে কৃষ্ণরাম-পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নরহরি মিত্র আমাদের বিশেষ পরিচিত,—কুটুম্ব ও বনিয়াদি ঘর ;—তাঁহার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সেই কারণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আমাদের শরণাগত। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে বধূমাতার বয়স প্রায় একাদশ, সুলক্ষণা কর্ম্মিষ্ঠা ও গৃহকর্ম্ম-নিপুণা এবং জানা-ঘরের তখন অধিক কিছু জানিবার প্রয়োজন দেখি না। শরণাগত ও কন্যাদায়গ্রস্ত হেতু এবং কুলীন ও কুটুম্বের মান রক্ষা বিশেষ উচিত বিবেচনায়, তাঁহাকে অভয় দিয়াছি ; এবং শ্রীমান্ বিপিনের সহিত বিবাহ ধার্য্য করিয়াছি। আগামী মাসেই শুভকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার সঙ্কল্প আছে ; অতএব তোমরা সকলে যত সত্বর নিজ বাটীতে আসিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইবে। তোমরা সকলে আমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ জ্ঞাত হইবে এবং এবাটীর সমস্ত সংবাদ কুশল জানিবে। পুনশ্চ,—মিত্রজা মহাশয় ২ খানি স্বর্ণ (নিরেট) এবং ৩টী রৌপ্যালঙ্কার, নগদ ১০১৲ টাকা এবং যথারীতি বরাভরণ দানসামগ্রী ও বিবাহরাত্রির খরচ বহন করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। ইতি রামচন্দ্রপুর, ১১ই বৈশাখ, ১৩০৩ সাল। আশীর্ব্বাদক—

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাস দত্ত।"

পত্র পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত ;—কর্ত্তাবাবুর প্রকৃতি আমরা জানি, সুতরাং বিশেষ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত ; অথচ কলিকাতায়, বিশেষতঃ হরনাথ বাবুর মত লোকের সহিত কুটুম্বিতা, সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা, প্রচুর নগদ বিদায় ও ভবিষ্যতের বিশেষ আশা ও উন্নতির স্থল, এরূপ সম্বন্ধ ত্যাগ করা কাহারো মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে নরহরি বাবুর কন্যা সুন্দরী নয়,—'পাঁচ পাঁচি।'

যুক্তি-তর্কের পর স্থির হইল যে আমরা শীঘ্রই বাটী যাইব এবং সেজ কাকা দাদামহাশয়কে কলিকাতায় বিবাহের সমস্ত লাভ ও সুবিধার কথা বুঝাইয়া মত করাইয়া লইবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ফল অন্যরূপ হইল ; তর্কের ফলে এবং উভয়ের জিদে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটিল।

ন-কর্ত্তা। এখন আর উপায় নাই, আমি মিত্রজাকে বাগ্‌দান করে ফেলেছি।

সেজকাকা। কিন্তু এ সম্বন্ধ আপনাকে ছাড়তেই হবে। কেন না কলিকাতায় বিবাহের যে সুযোগ ঘটেছে, তাহা ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ন। আমি ত' কোন সুবিধাই দেখছি না। তা' ছাড়া কলিকাতার সম্বন্ধ যে এমন প্রলোভনের বলিয়াও মনে হয় না।

সে। কেন তাঁহারা বিশেষ বড়লোক, সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ।

ন। কেন? রামচন্দ্রপুরের দত্ত তোমরাও কি কম পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত? ঘনশ্যাম দত্তের প্রপৌত্র ও রামকানাই দত্তের পৌত্র তুমি, বংশমর্য্যাদায় কোন্ অংশে কম?

সে। দেখুন, ওখানে বিবাহ হইলে, বিপিনের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

ন। উন্নতি নিজ অদৃষ্ট ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করে ; তা'র জন্য পরমুখাপেক্ষী হইবার কোন প্রয়োজন নাই।

সে। দেখুন, তারা প্রচুর খরচ করতে প্রস্তুত—

ন। কুটুম্বের পয়সা লওয়া রীতি আমাদের বংশে কখন নাই। ধূমধাম করিতে হয়, নিজের উপার্জ্জনে কর ; নিজের সামর্থ্য না থাকে তবে বৈবাহিকের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি?

সে। কন্যাটী পরমা সুন্দরী ; কিন্তু নরহরি মিত্রের কন্যা 'পাঁচ পাঁচি।'

ন। (বিরক্ত হইয়া) গৃহস্থের কন্যার রূপের প্রয়োজন নাই ; রূপের প্রয়োজন বেশ্যার।

সে। আপনি কিন্তু কন্যাটী না দেখিয়াই, কোন তদন্ত না করিয়াই, মত দিলেন কেন ?

ন। পরিচিত ঘর, ভাল কুলীন, বংশমর্য্যাদাসম্পন্ন ; সুতরাং কন্যা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ওবংশের মেয়ে নিশ্চয় কর্ম্মিষ্ঠা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও বিনীতা হইবে। এবং সহরের মেয়ের পক্ষে পল্লীগ্রামের শ্রমসাধ্য কার্য্য ও একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত হওয়া দুরূহ হইবে।

সে। কিন্তু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া মত দিলেন কেন ?

ন। আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের এ সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা কহিবার প্রয়োজন ছিল না।

সে। (বিরক্ত হইয়া) কিন্তু আমিও কি কেউ নই ? আমার মতামতের কি কোন মূল্য নেই ?

ন। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কেন আমাকে কি তোমাদের বাজার-সরকার না গোমস্তা মনে কর। যতক্ষণ হরিশ দত্ত সংসারের কর্ত্তা ততদিন তাহার বিচার মেনে চলতে হবে।

দুরদৃষ্টক্রমে অথবা দুষ্ট সরস্বতীর প্ররোচনায় সেজ-কাকার দুর্ম্মতি ঘটিল, ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি হরনাথ বাবুকে কথা দিয়াছি, আমি তাঁহার নিকট অপমানিত হইতে পারিব না—আমার পুত্রের ইচ্ছামত বিবাহ দিবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে।"

ন-কর্ত্তারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিলেন,—"আমিও শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি ও বাগ্‌দান করেছি, আমি তাহার প্রত্যাখান করিয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে চাহি না। আমাদের বংশের কলঙ্ক ঘটিবে, তোমার জন্য আমি চৌদ্দ পুরুষকে নরকে পাঠাইতে পারি না।"

সে। কিন্তু আমি বিপিনের বিবাহ কলিকাতাতেই দিব, ইহা স্থির।

ন। কি—এত বড় স্পর্দ্ধা ! তুমি আমার মুখে চুণ কালি দিতে চাও ? আচ্ছা বেশ, কাল থেকে আর তোমাদের বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই ; কাল থেকে তোমারও আর মুখদর্শন করিতে চাই না।

সেজ কাকা অপমানিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। ন-কর্ত্তা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, রামহরি ঘোষ ও সদর নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—'আপনারা ইসাদী হউন, আমি আজই রাত্রে উইল করিব।'

তাঁহারা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্; চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ কি?

ন। সংসারে পাপ ঢুকিয়াছে—একান্নবর্ত্তী পরিবার শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তা'র পূর্ব্বেই আমি চলিয়া যাইতে চাই।

সমস্ত বাটী মৌন, নির্ব্বাক্, বিষাদ ও অবসাদগ্রস্ত—কাহারো আহারাদি হইল না।

যদি সেজ কাকা তখনি পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত এ বিষবৃক্ষের চারা গজাইয়া উঠিত না। সকলেই ন-কর্ত্তার প্রকৃতি জানিতাম; যা' মুখে, তা'ই কাজে; সুতরাং প্রভাতে একটা বিষম বিপ্লবের আশঙ্কায় উদ্বিগ্নচিত্তে অনিদ্রায় আমরা রাত্রি কাটাইলাম; আমাদের সুখের সংসারে এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। বিধির বিধানে কিন্তু অবস্থা-চক্রের গতি অন্য পথে ফিরিল।

শেষ রাত্রিতে বিপিন 'কলেরায়' আক্রান্ত হইল। অবস্থাগতিকে মনান্তর ও সমস্ত ভুলিয়া আমরা বিপিনকে লইয়া কালান্তক কলেরাব সঙ্গে যুঝিতে লাগিলাম।

সেজ কাকার অশান্তি অসহ্য; সকলে তাঁহাকেই গঞ্জনা দিতে লাগিল; বলিল,—"গুরুজনের অবমাননার ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে, দম্ভভরে যে পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিল, 'আজ সে পুত্রের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়।"

রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল; সন্ধ্যার সময়ে চরমে উঠিল। সেজ কাকা কোন উপায় না দেখিয়া, পাগলের মত ছুটিয়া, ন-কর্ত্তার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"আমি অবোধ—না বুঝিয়া গুরু পাপ করিয়াছি। আপনি ক্ষমা না করিলে আর বিপিনের রক্ষা নাই।"

ন-কর্ত্তা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি উন্মাদ বলিয়া, আমি উন্মাদ হই নাই—আজীবন কায়মনোবাক্যে তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া, একটা তুচ্ছ কথা লইয়া তোমাদের অকল্যাণ ঘটাইব না।"

সন্ধ্যা আসিল,—পূজারী ঠাকুর এত বিপদের মধ্যেও নির্লিপ্ত ভাবে রাধাবল্লভ-জীউর আরতি আরম্ভ করিলেন,—যথারীতি শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল।

কি জানি কেন, আজ দেবতার আরতি যেন স্বর্গীয়, শান্তিময় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইল ;—আজ বিপদে পড়িয়া বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে নাটমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত।

শান্তির জল মস্তকে লইয়া সকলে গৃহে ফিরিলে ন-কৰ্ত্তা আরো কিয়ৎক্ষণ গৃহ-দেবতার দিকে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন ,—এ যে তাঁহারি ঘরের ঠাকুর, কত দিনের কত পরিচিত—বাল্যের কৈশোরের যৌবনের প্রৌঢ়ের ও বার্দ্ধক্যের চির-পরিচিত ঠাকুর।

ধীরে ধীরে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, "দয়াল ঠাকুর! তুমি বংশানুক্রমে আমাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছ। কখন কোন দিন তোমার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করি নাই, চিরকাল অভাবের অতিরিক্ত জোগাইয়া আসিয়াছ, কখন কোনও অভাব ঘটে নাই , তা'ই তোমার নিকট প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

"ঠাকুর, আজি আমি বিপন্ন ও বিপদ্গ্রস্ত , প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ হইতে এ সংসারের ও বিষয়ের সহিত আমার কোন সংস্পর্শ নাই। ঠাকুর তুমি থাকিতে, বংশে অকালমৃত্যু ঘটে নাই। দয়া কর নাথ! যেন বংশে অকালমৃত্যু না দেখিতে হয় ও যেন তোমার কৃপায় এ অধীন দাসানুদাসের মুখ রক্ষা হয়। ঠাকুর, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবার ত্রুটী না করে থাকি ত' ঠাকুর দয়া করিও, এই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ।"

অনেকক্ষণ স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিয়া প্রণামপূর্ব্বক সে স্থানের ধূলি মাথায় মাখিয়া উঠিয়া আসিলেন ; মুখচোখ দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস যে। ঠাকুর তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিপিনের ব্যাধি সন্ধ্যার পর হইতেই কমিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ন-কর্ত্তা নিজেই সে রাত্রে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার জিদ্ রাখিলেন ও মুখ রক্ষা করিলেন। পরদিন হইতে আমাদের সংসারের বা বিষয়ের সহিত চিরকালের জন্য তাঁর সমস্ত সম্বন্ধ বিছিন্ন হইল। প্রাচীন তেজস্বী পিতামহ নিজের জীবনের বিনিময়ে সংসার, শান্ত ও পৌত্রকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেজ কাকার অনুতাপ বোধ হয় কখন দূর হইবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ।

অপরূপ শ্যাম যুগল রূপ সুন্দর
তপন তনয়া তটে নীপহি মূলে
ব্রজ-গোপী-জনগণ চিত-বিমোহন
সতত ভকত হৃদয় মন ভুলে।
শ্যাম মুখমণ্ডল নীল সরসীরুহ
পুঞ্জিত মধুলোভে মধুকর পাঁতি
রাই মুখমণ্ডল তিমির অপোহর
বিকশিত কনক সুধাকর ভাতি।
নয়নে নয়ন মিলি মোহ হৃদি মাতিরঙ্গ
পূরল দশদিশি প্রেম রবিগনে
কলঙ্ক বিহীন সুধাংশু কিরণ পাশ
সপত বরণ শিখিছ কি সনে
শ্যামকি কলেবর নীল পয়োধর
লম্বিত বনমালা বলাকাক পাঁতি
অম্বরে মণ্ডিত থির ক্ষণ প্রভা যনু
চৌদিকে বিকশিত রাই তনু কাঁতি।

শ্যামোরাস-বাঞ্ছিত বঙ্কিম-কুঙ্কুম
বিম্বিত মতিমালা রাইগলে শোভে,
কো যনু রাজে দাড়িম্ববীজ লুকায়ল
লজ্জিত প্রতি গজ মতি মাঝে শোভে।
ফুল কোকনদ রাতুল শ্রীপদগণ
খণ্ডিত শশিকলা শোভে নখদলে,
অলক্ত-বাণ সুরঞ্জিত রাইপদ
বিহি নিরমায়ল কনক কমলে।
রুণু ঝুনু বোলত নূপুর কি সিঞ্জন
শ্রীচরণ পরশ প্রেম অনুরাগে,
জগজন বিমোহন রূপ মনোহর
হেরি শরমে রতিপতি দূরে ভাগে।
রাধা শ্যাম ইহ মধুর মুরতি রাজে
সতত ভকত হৃদি মন্দির মাঝে
দাস কুমার দীন, অনুতাপ-তাপিত
না পড় সতত জীবন আন কাজে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস, বি, এ।

মহাবিদ্যা



কালী।

পন্থা
মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।

চতুর্থ ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩২২। [২য় সংখ্যা

"আমার বন্ধু"

বঁধুয়ার সনে ছিল জানা শোনা
কত কাল নাহি মনে।
কিছুকাল যেন গিয়াছিল কেটে
আমার বঁধুয়া সনে॥
আমার কুটীরে বঁধুয়া আসিত,
কত দিত উপহার।
বধুর দুয়ারে যাইনি কখন,
খুঁজিনি বসতি তার॥
তার পর যবে হারাই তাহারে,
কত খুঁজি নাহি পাই।
মনে হ'ল যেন "বঁধুয়া কখন
ছিলনা, এখনও নাই॥
কি কুহেলি ঘেরা রহি এত কাল
কি মিছা ছলনা মাঝে

স্বপনের ঘোরে, মায়ার আবেশে,
কে ছিল বঁধুয়া সাজে ?”
খুঁজিয়া খুঁজিয়া জীবনের শেষে
বঁধুয়ারে যদি পাই
অবশেষে একি ! আঁখি মেলি দেখি
“আমারি” যে কিছু নাই।
(দেখি) জগৎ জুড়িয়া বঁধুয়ার ঘর
বঁধুয়া বিশ্বরাজ !
“আমার প্রাচীর” কোথা গেল উড়ে’
“আমি”বা কোথায় আজ।

শ্রীশশধর মৈত্র।

ভক্তি-তত্ত্ব।

(গতবৎসর চৈত্র সংখ্যার পর)

ভক্তির সাধনা পুরাণ বর্ণিত।

ভক্তি ও ভক্তদের কথা বলিতে বলিতে একটা অবান্তর কথা বলিতে হইল, যদিও তাহা কোনরূপেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমস্ত জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতির যেমন একটা সাধনা আছে, ভক্তিরও তেমনি একটা সাধনা আছে। যদিও ভক্তি আমাদের ‘সহজ’ বৃত্তি, কিন্তু তাহাও সুসংস্কৃত না হইলে, সুবিচারিত না হইলে, তাহার ঔজ্জ্বল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য আচার্য্যেরা ভক্তি-সাধনের একটি ক্রম বলিয়াছেন :—

‘আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া
ততোঽনর্থনিবৃত্তিস্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমা’।

ভক্তির পথে, প্রথমেই “শ্রদ্ধা”। সংসারের কীট আমরা সহজে আমাদের মস্তক অবনত হইতে চাহে না। কিন্তু এ পথও আবার এম্নি যে আগে মাথা পাতিয়া দিয়া, তবে এ পথে চলিতে পারা যায়। সুতরাং যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে কিরূপে আমার মাথা পাতিয়া দিব ? আমার উদ্ধত মন, কাহার কথায় কর্ণপাত করিবে ?

তাই আগে শ্রদ্ধা-সম্পদ্ উপার্জ্জন করা ভক্তিপথের পথিকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ভগবানের প্রতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি, মানবের প্রতি এবং সমুদায় জীবের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব থাকা প্রয়োজন;—যেন আমরা কাহাকেও উড়াইয়া না দিই;—যাহা আমি বুঝিতে পারি না তাহাই অশ্রদ্ধেয়, যেন আমার চিত্তের এরূপ অবস্থা না হয়। বড় সাবধানে এ পথ দিয়া যাইতে হয়। সকলের কাছে বিনত হইয়া, দীন অপেক্ষা আপনাকে দীন বোধ করিয়া, এ পথে যে চলিতে পারে, সেই প্রেম ভক্তির সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া পৌছিতে পারে। তা'ই প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। ইহার পর সাধুসঙ্গ। মহাত্মাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতেই হউক,—তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গ না করিলে এ ভীষণ ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার আর কোন দ্বিতীয় তরণী নাই। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা" শঙ্করাচার্য্যের এই সুগভীর বাণী সর্ব্ব যুগেই জয়যুক্ত হইয়াছে। আমি জানি, আপনারাও হয়ত জানেন, কত লোকের পাপকলঙ্কিত জীবন, পাষাণের মত কঠিন হৃদয়ও মহাত্মাদের চরণস্পর্শে ধন্য হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন 'আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়'। সাধুদিগের পবিত্র জীবনে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কথায় কত পাপতপ্ত জীবনে প্রেমের উৎস ছুটিয়াছে, কত কুকর্ম্মকারীর জীবনের গতি অন্য মুখে ফিরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। মেরি কার্পেণ্টার স্বেচ্ছায় কারাগারে গিয়া তথায় দস্যু-তস্করদিগের নিকট পরিপূর্ণ প্রেমে ভগবানের অভয়বাণী শুনাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এজন্য তখন কতই না তাঁ'কে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কত অসম্ভব ঘটনার সহিত না তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। সেবার অভিলাষে, বিনীত অন্তঃকরণে, তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। দস্যুরা ক্রমে ক্রমে শান্ত হইল, তাঁহার ভালবাসামাখা ভক্তিপূর্ণ কথাগুলি তাহাদের অন্তরের মধ্যে গিয়া আঘাত করিল। সাধুরা পাপীদিগকে কোল দেন, তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে পারেন;—ইহাতেই ক্রমশঃই চিত্ত শুদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম ভজন সাধনাতে কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, এমন কি ভগবদ্ভজনাকে মস্ত একটা আপদ্ বলিয়া মনে হয়। কত চাপল্য, কত চিত্তবিকার, আসিয়া মনকে তখন ঘেরিয়া বসে, তাহাও এই ভগবদ্ভজনার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। ইহারই নাম অনর্থবৃত্তি, ইহাই ভক্তি লাভের চতুর্থ সোপান। যাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদিতে অধিকক্ষণ সময় দিতে না পারেন,

তাঁহারাও যদি প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় অতি অল্পক্ষণের জন্যও ভগবানকে স্মরণ করেন, তাহা হইলেও ক্রমশঃ তাঁহারা কল্যাণপথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

অনর্থনিবৃত্তির পরই নিষ্ঠা ও পরে রুচি। নামে রুচি হইলেই আর তখন ভয় নাই, আমরা তখনই যেন তাঁহাকে কিছু স্পর্শ করিতে পারি। নামে রুচি জন্মিলেই বুঝিতে হইবে যে প্রেম স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব সনাতনকে বলিয়াছিলেন ;—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন
এই তিন সার ধর্ম্ম শুন সনাতন"

তার পরই আসক্তি;—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" পরমেশ্বরে পরানুরাগই ভক্তি। এই পর্য্যন্তও যে পৌঁছিতে পারে সে কৃতার্থ হইয়া যায়। তার পর ভাব—তারপর মহাভাব। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিবার সময় ইহার কিছু আভাস দিব। মহাভাব প্রাকৃত জীবের মধ্যে আদৌ সম্ভব হয় না। ভগবান্ এই মহাভাবের কথা শুনিবার বুঝিবার মাত্র সৌভাগ্য জীবকে দান করিয়াছেন ; দেবলোক ও পিতৃলোকে ইহার সংবাদ বিদিত নহে।

আধুনিক ভক্ত বৈষ্ণব ও কবিগণ, জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটা গোড়া পত্তন হইয়া আসিতেছিল। সময়ে অসময়ে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া এই ধর্ম্মের শ্রী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। ভালবাসাই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে এই ভালবাসার কি অমৃত উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহাদের কবিতা পড়িলে মন প্রাণ বিচলিত হইয়া যায়, ভগবদ্ভক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে। যদিও শাক্ত, শৈব ও বৈদান্তিক ধর্ম্মের "আওতায়" এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। এমন কি জ্ঞানমূলক বেদান্ত ও শৈবধর্ম্মে এবং কর্ম্মমূলক শাক্তধর্ম্মে ভক্তির সুবিমল কিরণজ্যোতি ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছিল। তাই আমরা তান্ত্রিকদিগের বীরাচার ও ব্যভিচারের মধ্যেও, ভক্তির কনক-রেখা অঙ্কুরিত দেখি। পরবর্ত্তী তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের ইষ্টদেবীর সে রণরঙ্গিনী ভৈরবনাদিনী মূর্ত্তির মধ্যে করুণার স্নিগ্ধচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। ভয়ঙ্করী প্রচণ্ডমসিধারিণী করাল মূর্ত্তির মধ্যেও স্নেহ-বিগলিত সকরুণ মাতৃমূর্ত্তি ক্রমশঃই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। অত্যন্ত আধুনিক

কবি ভক্ত রামপ্রসাদের 'কালী' তো বৈষ্ণবদের 'কৃষ্ণ' বলিলেই হয়, কেবল অসি বাঁশীর প্রভেদ বই তো নয়। বেদান্ত ও শৈব ধর্ম্মের মধ্যেও এ স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। না আসিয়াই পারে না। যে ধর্ম্মে ভক্তির কথা নাই, তাহা মনুষ্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবার নহে, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ্যেও স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

ভারতীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রথমে সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কালক্রমে বিষ্ণুর অবতার নৃসিংহ, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণের উপাসনা বৈষ্ণব সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। কখন এবং কি রকমে এই সকল উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ইতিবৃত্ত বোধ হয় ইতিহাসজ্ঞেরা বলিতে পারিবেন। যতটা জানি দাক্ষিণাত্যে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উদ্ভূত হইয়া আধুনিক বৈষ্ণব সমাজের আকার ও ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান, এবং পরবর্ত্তী শিষ্য ও প্রশিষ্যরা তাঁহাদের স্ব স্ব মতানুযায়ী গুরু-দিগের নামে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। অধুনাও সেই সম্প্রদায় কয়টি বর্ত্তমান আছে। চারিটি সম্প্রদায়ের নাম যথাক্রমে শ্রী, চতুর্ম্মুখ, রুদ্র ও চতুঃস্বন। শ্রী-সম্প্রদায়ের আদিগুরু রামানুজস্বামী, চতুর্ম্মুখসম্প্রদায়ের আদিগুরুর নাম মধ্বাচার্য্য। এই দু'টি সম্প্রদায়ই বিশেষ ভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর উপাসক, কিন্তু পরস্পরে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীরামচন্দ্রের ও মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য মানিয়া চলেন। সকল সম্প্রদায়ই অহিংসা, শুদ্ধাচার, পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন, জপ, দেবসেবা, সাধুসেবা প্রভৃতি সাত্ত্বিক ধর্ম্মের যজন করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা সকলেই গৃহত্যাগী এবং উদাসীন। অবশ্য গৃহস্থরাও এই সকল সম্প্রদায় হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিতেন, অথবা গৃহস্থ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া উপাসনা করিতেন। এই সকল সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক বৈষ্ণব-নেতাদিগের পৃথক্ পৃথক্ মঠ আছে। অনেক সময় এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশবিশ্রুত তীর্থস্বরূপ মহানুভবগণ যোগ দান করিয়া সম্প্রদায়গুলিকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ভক্তিতে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন; এবং তাঁহাদিগের ভক্তি-কোমল উদার প্রাণের মধ্যে সম্প্রদায়গুলি অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করিত।

কিন্তু 'বাংলার' মাটিতে আসিয়া ভক্তি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। যে ভক্তিভাব এতদিন শান্ত, দাস্য, সখ্য এবং কদাচিৎ বাৎসল্যভাবে ভক্ত-হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত, বাংলার সেই ভক্তি মধুর কান্তাভাবে সচল হইয়া উঠিল, ভক্তপ্রাণকে প্রিয়জনবিরহে সচঞ্চল করিয়া তুলিল। সমস্ত বাংলাদেশ

এই মধুর রসে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। প্রিয়বিরহের সে কাতর মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত, প্রিয়তমের প্রতি কান্তার অভিমান, কুঞ্জে কুঞ্জে সে অভিসার, রাসক্রীড়া—সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যকে যেন কোন অভিনব অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বাণীর সঙ্গীত-সুধায় আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব গোস্বামীর সে আদর্শগীতি কবিতা "প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং, সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং'—দেহি মে মুখকমল-মধুপানং," মানিনী প্রিয়তমার সান্ত্বনার জন্য কি উদ্বেগ ব্যাকুলতা। আবার চণ্ডীদাসের "একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়। আপন বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়"—এমন চমৎকার সরল আত্ম-সমর্পণ; আবার বিদ্যাপতি বিরহ-ব্যাকুলা রাধিকার মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"সখিরে মম দুঃখের নাহিক ওর,
এভরা বাদর মাহ ভবিল শূন্য মন্দির মোর।"

কখন ভক্ত কবি আপনাকে ভক্তিহীন অতিদীন মনে করিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধি ও মতিভ্রমের কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রিয়তমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, সে কাতরকণ্ঠের বাণী আজও আমাদের হৃদয়দেশকে যেন আলো-ড়িত করিয়া দিতেছে—

"তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপনু আব মঝু হব কোন কাজে।
মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহ জগতারণ দীনদয়াময়
অতএব তোহারি বিশোয়াসা।
আধ জনম হাম নিঁদে গোঁয়ায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা,
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা?

এই সকল সুললিত মধুর নীতি কবিতাগুলি মহাপ্রভুর ভাব উদ্দীপনার বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কবিরাও এই সকল মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন;—তবে ইঁহাদিগের নায়ক শ্রীগৌরাঙ্গ এবং প্রাচীনদিগের সমস্ত সঙ্গীত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া। ভক্ত বৈষ্ণবেরা এইরূপে ব্রজ-সাহিত্যকেও সম্পদবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজগতে বিচিত্র এক লীলা দেখা যায় যে ; যখনই কোন দেশে ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই ধর্ম্ম সংস্থাপনার জন্য ভগবানের কোন এক বিশেষ অলৌকিক শক্তি আমাদের মধ্যে আসিয়া কার্য্য করে এবং দেশব্যাপি সংস্কারের স্রোতকে বিভিন্ন মুখে সবলে ফিরাইয়া দেয়। এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন বেদার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, জ্ঞান-ভক্তিশূন্য কর্ম্মকাণ্ডে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল,—দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পশুর রক্তে দেশ কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। অসহায় নিরীহ পশুগুলি যজ্ঞের বলির জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে হত হইত, তাহাদের সকরুণ কাতর দৃষ্টি কাহারও সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিত না—ঘোর নিষ্ঠুরতার প্রচণ্ড অগ্নির মধ্যে দেশের দয়া ধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় আবার একবার তাঁহার আসিবার প্রয়োজন হইল। তিনি সমস্ত জীবের পিতা, সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলবিধাতা, যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হন। তাঁহার দয়াশক্তি বুদ্ধরূপে প্রকট হইল। বুদ্ধদেব করুণার প্রতিমূর্ত্তি। যূপকাষ্ঠে আপনার গলদেশ স্থাপন করিয়া হত্যাকারীদিগকে পশুহনন কার্য্য হইতে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণার স্রোতে দেশ ভাসিয়া গেল। দেশময় চতুর্দ্দিকে তাঁহার সত্য উপদেশ সকল ধ্বনিত হইল। মৃত্যু, শোকে, ভয়ে, দুর্ভিক্ষে যাহারা পিড়ীত ও মূর্চ্ছিত ছিল, তাহারা তাঁহার অভয় ও অমৃতবাণী শুনিয়া জাগিয়া উঠিল। আবার দেশের গতি ফিরিয়া গেল—ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইল। অনেক বৎসর এইভাবে গেল, আবার ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল, পরম করুণার ধর্ম্ম আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে শেষ নাস্তিকতায় পরিণত হইল। অহিংসার ভাণ করিয়া বহুবিধ উপায়ে বিভিধ অধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধুরা ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া উঠিলেন। আবার আলোকের প্রয়োজন হইল। বৌদ্ধরা কষ্ঠের সর্ব্বপ্রকার পাশ কাটাইতে গিয়া, বন্ধন ঘুচাইতে গিয়া, ভগবদ্‌বন্ধনকেও ঘুচাইয়া চলিল। একেবারে এতটা শূন্যবাদে গিয়া পড়িয়াছিল যে সাধারণ লোকের চিত্ত হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন "তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ম্‌" শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান-দুন্দুভি বাদিত হইয়া উঠিল। আবার ধর্ম্মের স্রোত ফিরিল, ধর্ম্মের মধ্যে অস্তিত্ব দেখিয়া বিরহবিকল প্রাণ যেন আনন্দিত হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্য্য ভগবানের বৌদ্ধদের শূন্য-বাদ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিলেন। "ভগবান্‌" অমৃতস্বরূপ কিনা, তাঁহাকে না হইলে মানবাত্মার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। ক্রমে শঙ্করের উপদেশ আবার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। আবার অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানিতে দেশ পূরিয়া গেল। শঙ্করের বেদান্তবাদ লোকে

ভুল করিয়া বুঝিতে লাগিল। জ্ঞান নাই, বৈরাগ্য নাই অথচ লোকে কর্ম্মত্যাগ করিয়া, এবং দুই পাতা বেদান্ত পড়িয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। একদিকে কাপালিক, অঘোরপন্থী ও তথাকথিত তান্ত্রিকেরা ধর্ম্মের নামে ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল। খুব উত্তাপবৃদ্ধি হইলে যেমন বর্ষণের প্রয়োজন হয়, তেমনি আবার ভারতের পাপতপ্তবক্ষে ভক্তির সুশীতল ধারা সিঞ্চনের প্রয়োজন হইল। বসন্তসমাগমে মলয় বায়ু আপনা আপনিই প্রবাহিত হয়, বনে বনে কুসুম ফুটিয়া উঠে; বৃক্ষ লতা নবীন পত্র-মুকুলে আচ্ছন্ন হইয়া যায় গিরি, শৈল, অরণ্য নব বিকশিত কুসুম-সুরভিতে ভরিয়া যায়, দেশের সমস্ত কোকিল বসন্তের সাড়া পাইয়া কুহরিয়া উঠে—তেমনি দেশব্যাপি কঠোর জ্ঞানবাদীদিগের ভক্তিশূন্য জ্ঞান ও উপধর্ম্মের অত্যাচারে যখন দেশ উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আধ্যাত্মিক জড়তার হিমবর্ষী শৈত্যে দেশ দুর্দ্দশার চরম সীমাতে উপনীত হইয়াছিল, তখন এ দুদ্দশা হইতে পরিত্রাণ দিবার জন্য আবার এক মহা শক্তির আবির্ভাবের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঋতুরাজ বসন্ত আসিতেছে জানিয়া যেমন সমস্ত লতা-পাতা পুষ্প-পল্লব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যেমন নবীন শ্যাম শোভায় সজ্জিত হইয়া যেন অপেক্ষা করিতে থাকে এবং বিবিধ বিহগকুল পুলকিত হইয়া সুস্বরলহরী সংযোগে তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে, তদ্রূপ ভক্তকুলসম্রাট চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অনেকগুলি দয়ার্দ্র-হৃদয় সাধু মহাজন প্রেমের তারে ঘা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তির মঙ্গল-বীণা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল সাধুরাই দেশবাসীর মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে ছিলেন—ভক্তির বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য যে দেশময় মহাপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সম্ভব হইত না, যদি দাদু, কবীর, নানক, রামানন্দ, মাধবেন্দ্র প্রভৃতি পরম ভক্ত প্রেমিকগণ দেশবাসীর হৃদয়ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া না রাখিতেন।

প্রেমিক ভক্ত শ্রীমৎ কবির সাহেব ও শ্রীমৎ নানক দেশবাসীকে এক নূতন আলোক দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের রচিত দোঁহাগুলি এখনও মানব-হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। এই সকল ভক্তদিগের চরিত্র অন্য কোন স্থানে সুবিধামত আলোচনা করিব।

বঙ্গদেশেও চৈতন্যের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে ভক্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গদেশে হরিদাস, শ্রীবাস প্রভৃতি সাধুগণ, পূজ্যপাদ অদ্বৈত

প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া অল্পে অল্পে দেশে ভগবদ্ভক্তির প্রচার করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মাড়ম্বর, উপধর্ম্মের উপাসনা, এবং বিশ্বাসশূন্য অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক অদ্বৈতাচার্য্য ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁদিয়া উঠিতেন এবং শ্রীভগবান্ যাহাতে এই পতিত জীবকুলের উদ্ধার সাধন করেন তজ্জন্য তাঁহার আবির্ভাবের প্রার্থনা করিতেন। চৈতন্য ভাগবতে আছে :—

"বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার
অদ্বৈত আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার।"

বাস্তবিক তখনকার দেশের অবস্থা কি ভয়ানক তাহা কল্পনা করিলেও ভয় হয়। চৈতন্য ভাগবতে তখনকার সমাজের বেশ একটি সুন্দর ছবি দিয়াছেন :—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে,
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি,
তাহা যে পূজেন সেহ মহা দম্ভ করি।
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে,
মদ্য মাংস দানে পূজে কোন কোন জনে।
যোগীপাল গোপীপাল, মহীপাল গীত,
ইহা শুনিতে লোক সব মহা আনন্দিত।"

দেশের যখন এই অবস্থা, তখন নিত্য সশঙ্কিত চিত্তে আচার্য্যের ক্ষুদ্র মণ্ডলী পরম প্রেমভরে ব্যাকুল অন্তরে নির্জ্জনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। কখন কখন তাঁহারা সমবেত হইয়া ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও হরিনাম সঙ্কির্ত্তন ও নৃত্য করিতেন। দুষ্ট লোকে যখন এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীর সন্ধান পাইল তখন মণ্ডলীস্থ সকলকেই তাহারা মহা বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল এবং সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেও ক্ষান্ত হইল না। চৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন—

"হাত তালি দিয়া যে সকল ভক্তগণ। আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥
ইহাতেও উপহাস করে যে সবারে। ইহারা কি জন্য ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নারায়ণ। দাস-প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ॥
সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া খাইতে। ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে॥
এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙিয়া। এই যুক্তি করে সব নদীয়া মেলিয়া॥

আবার কতকগুলি অতি-সাবধান ব্যক্তিরা এই সকল ভক্তদিগের কীর্ত্তন শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "নারায়ণ এখন ঘুমাইয়া আছেন, ইহারা

ডাক হাঁক করিয়া যদি অকালে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে, তবে তিনি জাগিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদের অপরাধে আমাদের শুদ্ধ বিনাশ করিবেন, অতএব বল প্রয়োগ করিয়াও ইহাদিগকে ক্ষান্ত করিয়া দেওয়া উচিত।” এইরূপ পরামর্শ করিয়া কেহ কেহ এই নিরীহ ভক্তদিগের বিরুদ্ধে মুসলমান কোতোয়ালের নিকট তাহাদিগের অযথা কুৎসা ও নিন্দা করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল এবং এই সকল লোক যাহাতে থামিয়া যায় তজ্জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কলিকালের হিরণ্যকশিপুগণ যখন ভগবানের জাগরণের ভয়ে অস্থির, তখন অদ্বৈতাচার্য্য ভাবিতেছেন,—

“কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ,
ভক্তিগন্ধ নাহি, যা’তে যায় ভব-রোগ।
লোক-গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়।”

দেশের এইরূপ দুর্দ্দিনে নবদ্বীপচন্দ্র শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইল। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় যেরূপ দুর্গতি হইয়াছিল এবং প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারা দেশে তিনি যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন;—তাঁহার অনিন্দসুন্দর মূরতি, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, অলৌকিক প্রতিভা, অভূতপূর্ব্ব ভগবৎ-প্রেম, জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা—দেখিলে আমাদেরই মনে উদয় হয় বুঝি ‘ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়’ আবার ভগবান্ অবনীতে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। সুতরাং যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার রূপে গুণে ভাবে ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—যাঁহাদের পাপ-পঙ্কিল দুর্গন্ধময় জীবন তাঁহার স্বর্গীয় প্রেমসৌরভে সুবাসিত হইয়াছিল—মোহাসক্ত ভগবদ্‌বিমুখ চিত্ত যাঁহার প্রভাবে ভগবান্-অভিমুখে আকুল হইয়া ছুটিয়াছিল, তাহারা যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই মনে করিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই কারণ নাই। দেশে বিদেশে, যুগে যুগে সকল মহাত্মা জীবের পরিত্রাণের জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন,—সকল দেশের লোকই সেই সকল করুণাবতারদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই পূজা করিয়া আসিতেছে; সুতরাং শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও ভক্তদিগের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং রূপ গোস্বামী যে তাঁহার কড়চায় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে উক্তরূপ ধারণায় এই শ্লোকগুলি রচনা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি!

নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি হইতে আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের গূঢ় তত্ত্বগুলিও উদ্ঘাটিত হইবে।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি র্হ্লাদিনী শক্তিরস্ম-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥
শ্রীরাধায়া প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈব বা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

"রাধাকৃষ্ণ" ভক্তিই চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ। কৃষ্ণকে ইঁহারা ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব মানিয়া ইঁহারা চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিষয়টি বুঝিতে লইলে আমাদের এইবার একবার শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন হইবে, তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বিচারের সুতীক্ষ্ণতম তরবারি হাতে করিয়াও ইহার বিচার করা চলিবে না, কারণ গৌরাঙ্গ-ভক্তগণ সকলেই প্রায় পরম পণ্ডিত, জ্ঞানী, ও সাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ে গৌরাঙ্গের যে অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের ভক্তিরচিত সেই সোণার গৌরাঙ্গকে শুধুমাত্র বিচারকের চক্ষে বিচার করিতে গেলে নিতান্ত অবিচার করা হইবে। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যেক হাব-ভাবটি পর্যন্ত ভক্তরা লীলার মত বুঝিয়াছেন, তাই ভক্তকবি বলরামদাস শ্রীচৈতন্যের নৃত্য স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন;—

"নাচত গৌর সুনাগর মনিয়া।
খঞ্জন গঞ্জন　　পদযুগ রঞ্জন
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধনিয়া।

আবার প্রেমিক কবি লোচনদাস গৌরাঙ্গের রূপমাধুর্য্যে মত্ত হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন,—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে—

"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতা মাতা প্রেয়সীগণ লঞা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান। ভক্তিবিনু জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে প্রেম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিব ভক্তি ভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥
তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরী করিমু নানারঙ্গে॥
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥"

ব্রজধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অপূর্ব্ব লীলাবিলাস করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা আবশ্যক, নচেৎ গৌরাঙ্গের ভাব ভক্তি বুঝিতে পারা যাইবে না। পুরাণে অন্যান্য অবতারের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন—

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'

কৃষ্ণের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসা ইত্যাদি ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের কৈশোর লীলা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

(ক্রমশঃ)

অপরূপের রূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এই অখণ্ড সহৃদয় হৃদয়বেদ্য রসের আস্বাদনার উন্মাদনায় প্রাণে কি এক নবীন বিদ্যুৎ-শক্তি খেলিয়া যায়,—'পিরীতি'র চির-নবীন ইতিহাসে কি এক চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয় অধ্যায় আত্ম-প্রকাশ করে। তখন প্রেমিক ভক্ত আপনার ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি করিয়া ভগবানের মহত্ত্বে আপনি মহৎ হইয়া পড়েন, ইহাই হইল স্বরূপ-জ্ঞান বা তত্ত্ব-জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান না হইলে, মূর্ত্তির ঘন অবয়বের তুচ্ছ প্রাচীরের বেষ্টন না লঙ্ঘন করিলে, মানুষ দেবতার দেবত্ব হইতে হৃদয়ের উন্নততর প্রেরণা পায় না। রূপকে মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা চাই-ই। রূপের অবয়ব নাই, কাঠিন্য নাই, রূপ অমূর্ত্ত, মূর্ত্তির অতীত 'প্রভা তরল জ্যোতি'র আধার। মূর্ত্তি জড়, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্,—রূপ দৈবত, সতত চেতন, সতত উল্লাসময়। ভগবানের অখণ্ড আনন্দের অংশ অংশী হইয়া মূর্ত্তি রূপে রূপিণী হয়—সৌন্দর্য্যের পুলকোচ্ছ্বাসে দয়িত বা দয়িতাকে আপনার করিয়া তুলে, আর অরূপের মন্দ আভাস দিয়া আপনার রূপ-গ্রহণ ক্ষমত্বকে সার্থক করে। ভক্ত কবি চণ্ডীদাস রূপ ও মূর্ত্তির পার্থক্য প্রকট করিবার জন্য, রূপ, স্বরূপ, ও অরূপের চিরমঙ্গলময় ত্রিগুণাত্মক গ্রন্থির প্রকৃতি বুঝাইবার জন্যই, ভগবদ্ভক্তের এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন,—

সরূপ বিহনে রূপের জনম কখন নাহিক হয়।

এই 'রূপ'-শক্তির লীলার ফলে ভক্ত সাধনার উচ্চতর স্তরে আরূঢ় হন;—প্রেম জ্ঞানের মধ্য দিয়া আপনাকে উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত করিয়া তুলে। তখন ভক্ত কহেন,—

বঁধু তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তর করি মানি॥
নয়নে অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীতি অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

কালিয়া চান্দে'র লোভনীয় মূর্ত্তি সন্দর্শনে, তাঁহার পুলক-বিহ্বল স্পর্শে তাঁহার নাম স্মরণে তখন অন্তরে আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে,—জড় জগতের দৈনন্দিন ঘটনার বিরক্তিকর মোহ তখন টুটিয়া যায়। তখনই মনে হয়,—

তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা-রস।

তখন সেই অখণ্ড আনন্দের প্রেরণায় জগতের সমস্ত খণ্ড আনন্দ—সুখ, ধর্ম্ম, ভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে হয়। আত্মবিসর্জ্জন বা আত্মত্যাগ ব্যতীত কখনও কি শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি সম্ভবে? ভাগবতের দশম স্কন্ধে গোপীগণের সর্ব্বস্ব কুল, শীল, জাতি, মান, পতি, পুত্র, ধন জন, গৃহ, দ্বার, ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের বার্ত্তা কি হৃদয়স্পর্শিনী। গোপীগণ বলিতেছেন,—

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতী স্তদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিত নিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যং॥
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥১০-২৯-৩৮

এই অনুরাগের সান্দ্রতায় ভক্ত ভগবানের সাহচর্য্য ব্যতীত তাঁহার জীবন কি নিদারুণ তাহা বুঝিতে পারেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্‌ও ভক্তের হৃদয়ের গাঢ়তার উপলব্ধি করিয়া ভক্তে আত্মপ্রবেশ করেন। ভক্ত ভগবান্ দুই এক হন, খণ্ড সৌন্দর্য্য অনন্ত সৌন্দর্য্যে আপনা হারাইয়া ফেলে। তখন প্রকৃতই ভক্তের কানে, ভক্তের হৃদয়ে, ভক্তের প্রাণে পবন এই কথাই বহিয়া আনে:—

শীতের ওড়না পিয়া, গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥

দয়িত ব্যতীত তখন সংসারযাত্রা দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে; এ সংসারযাত্রা ব্যাবহারিক সংসারযাত্রা নহে, অনুরাগের উৎকর্ষে ব্যবহারিক সংসার-বন্ধন শিথিল হইয়া লুপ্ত হইয়া পড়ে।

এখন প্রশ্ন এই, এ অনুরাগ কি আপনি গভীর হয়? তাহা যদি হইত তাহা হইলে 'ক্ষণিক আলোক আঁখির পলকে' ভগবানের দেখা সাঙ্গ হইত না। তাহা হইলে চকিতে ভক্তের প্রথম প্রীতির উদয়ের দিনে, ভক্ত দেবতাকে চকিতে

হারাইত না। দেবতার এ বিষয়েত নির্ব্বাঙ্কতিশয্যের অভাব নাই; তিনি ভক্তের হৃদয় মাঝে অনবরত বাঁশী বাজাইতেছেন; শুধু তাঁহার বাহিরে নয়, তাঁহার অন্তরেও সৌন্দর্য্যের মধুময় সঙ্গীত-ছন্দে সুধা বিকিরণ করিতেছেন; রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে, শ্রবণে, মননে, নিদিধ্যাসনে তাঁহার অমৃত-ভাণ্ডারের রস আদি বিতরণ করিতেছেন। বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে বাঁশী বাজিয়াছিল,—গোকুল 'শ্যাম মুরলীধারী'র গানে পাগল হইয়াছিল।

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গলীলা মিলায় শিলা শুনিতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা পবন চকিত গগন ভুবনমোহিত গানে॥

* * * * *

কুলবতীকুল করে নিরমূল নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাধা ও মরমে বিমোহিনী কালা জানে॥

এই হৃদয়ধ্বংসী বংশীনিনাদে সৌন্দর্য্যের হাট বসাইয়া দেয়,—প্রাণে প্রাণে কি টান,—অনন্তে সান্তে, অরূপে রূপে, কি প্রেমশক্তির বিকাশ,—তাহা বুঝাইয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানের, শ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্যলীলা, অষ্টকালীয় নিত্যলীলার মধ্যদিয়া, ভাব, হাব, বেশবিন্যাসের সাহয্যে এই প্রাণের টান প্রকট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অরূপ রূপের মাঝে থাকিয়া রূপমুগ্ধ জীবকে ইঙ্গিতে ডাকিতেছেন; জীব ভাবিতেছে, "যাব কি যাব না, মিছে এ ভাবনা, মিছে মরি লোকলাজে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার অপেক্ষা কিশোর-লীলাতেই সৌন্দর্য্যের অধিক আকর্ষণ আছে, অধিকতর প্রবল আনন্দময়ত্ব আছে; তাই বুঝি বৈষ্ণব কবি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকেই অরূপের কমনীয় আসনে বসাইয়া ফুলদল দিয়া অর্চ্চন করিয়াছেন; কখনও

"চন্দনচর্চ্চিত নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী।

* * * *

হরিরিহ মুগ্ধ বধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলি পরে।"

কখনও রাসবিলাসিনী হাসবিকাসিনী গোবিন্দদাস-চিত্তমোহিনী রাধার এই বিপিনবিনোদকলা-বলিত রাসরহস্যের সঙ্গীতধারা ভক্তের কর্ণকুহরে বহাইতে বৈষ্ণব কবি ক্ষান্ত হয়েন নাই, 'বৃন্দাবিপিন নিকুঞ্জ মাঝে' 'সুসময় শ্যাম গোরীর' হিন্দোললীলার বর্ণনে তাঁহাদের শ্রান্তি হয় নাই। তবে কখনও আমরা

বাল্যলীলায় সরল অমায়িকতা, অরূপের রূপ-পিপাসার ঝঙ্কার বৈষ্ণব-কবির পদে শুনিতে পাই।

সবহুঁ মিলিত যমুনাতীর অঞ্জলি পূরি পিয়ত নীর
বৈঠল তঁহি তরুব ছায়, বীচনন্দনন্দনা। (দাস প্রসাদ)

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাঁচনি বেত্রবেণু মুরলী খুরলী গানবি

ইত্যাদি পদে বাল্যলীলায় সৌন্দর্য্য বিকাশের ধারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রূপ, প্রেম ও মাধুরী এই তিনের অপূর্ব্ব সমবায়ে দয়িত, দয়িতার জীবন, ভগবান্ ও ভক্তের বন্ধন, বৈষ্ণবের সাহিত্য ও ধর্ম্ম এক অভুতপূর্ব্ব রসের উপনিষৎ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্য সত্যই 'যা গোবিন্দরসপ্রমোদ-মধুরা সা মাধুরী মাধুরী।" এই মাধুরীতে মলিনতা নাই, অতৃপ্তি নাই, মোহ নাই,— এ রূপ তৃষা, 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া যাহাকে বর্ণনা করা যাইতে পাবে, স 'এব ভূমা' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ হয়, তাঁহার উদ্দেশে বলিয়া কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, কত আত্মতৃপ্তিময় তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। 'সেই পিরীত অনুরাগ বাখানিতে অনুখন নুতুন হয়'। কিন্তু এ নূতনত্ব আকাঙ্ক্ষায় বিহ্বলবিলাস নহে, এ চিদানন্দ মনের নিত্য নূতন রসাস্বাদ, এ সৌন্দর্য্য-সাগরের প্রেম-মন্থনদণ্ডে মথিত অনন্ত অফুরন্ত রত্নচয়। তা'ই ভগবান্ ভক্তশিরোমণিস্বরূপিণী শ্রীরাধাকে মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন:—

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমায় মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি।
মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান-শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কমলা মূরতি॥
সঙ্গের সাঙ্গনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাশরিব জীবনে কেমনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

এরূপ অবস্থায় আকুলতা আছে, আতুরতা নাই, প্রেম আছে তৃষ্ণা বা কামগন্ধ নাই; সৌন্দর্য্য আছে, সৌন্দর্য্যকুসুমশোষী দারুণ কীট নাই, আস্বাদের মধুরতা আছে, রসান্তর নাই। এ অবস্থায় রূপ অরূপ ব্যতীত থাকিতে পারে

না, ভক্তে ভগবানের সাযুজ্য পাইয়াছে, দাসত্ব নহে। শুধু সৌন্দর্য্যধর্ম্মের উপাসনায়, শুধু রূপগরিমার উদ্বোধনায়, শুধু একাগ্রতায় এ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। সত্য সত্যই অমর জর্ম্মণ কবি Gœtheএর বাণী—The Beautiful is higher than the good, for the Beautiful holds within it the good' যে সনাতন সত্য—বৈষ্ণব সাহিত্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এইরূপ বোধের মধ্যে যদি সত্যের, নিভৃত অনন্ত সত্যের, অনুসন্ধান করিয়া থাক, তবে হে রূপমুগ্ধ জীব! তোমার মঙ্গল,—নহিলে ঘোর অনর্থ, সমূহ বিপদ্। উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি। ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

ছিন্নরূপ নেহারিয়া আকাঙ্ক্ষার সঞ্চয় করিয়া হৃদয় দগ্ধ করিলে চলিবে না; বাসনার প্রবল তাড়নে অনিত্য রূপের মোহলাঞ্ছনায় অভিভূত হইয়া নিত্য অরূপের বিষয় উদাসীন হইলে চলিবে না। তনু প্রাণ মন দিয়া হৃদয়-সিংহাসনে অরূপ-অনিন্দ্য সুন্দর শ্যাম নটবরের রূপবোধ জাগ্রত করিতে হইবে, ভক্তির স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে, প্রেমের বিকাশ, বিভূতির বিলাস লক্ষ্য করিতে হইবে, আর ভক্তি-স্তিমিত হইয়া সেই অরূপের উদ্দেশে ডাকিতে হইবে,—

হবিস্ত্বং হরস্ত্বং বিরিঞ্চিস্ত্বমেব ত্বমাপস্ত্বমগ্নিস্ত্বমিন্দুস্ত্বমর্কঃ।
নভস্ত্বং ক্ষিতিস্ত্বং মরুস্ত্বং মুরারে নমস্তে নমস্তে নমস্তে সমস্তেশ্বরায়॥

সেই দিনেই প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের দীক্ষা, বৈষ্ণব সাহিত্যের শিক্ষা, প্রেমের অবিনশ্বর রাজ্য, রূপ বোধের অফুরন্ত নীতিভাণ্ডার, দগ্ধজীব! তোমার পিপাসা নাশ করিবে, তোমার দুঃখ নিবৃত্তি করিবে, তোমার উচ্চতর উদ্দেশ্যের, উচ্চতর লোকের, অধিকারী করিবে, তোমার মনুষ্যত্ব সার্থক হইবে;—সে দিনই বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুভক্ত তোমার সানন্দে অভিনন্দননান্দী দান করিবে, ও বলিবে—

"প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে॥"

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য; এম, এ

অমৃত-আনন্দ-আত্মা।

অনন্ত আনন্দ-সিন্ধু আত্মার প্রকাশ,
এ দেহের সুখ যা,' তা' তাঁ'র সুধা'ভাস ॥
জীবন-সাগর হতে আমিত্বের ধারা বয়,
জীবনই পরমানন্দ, জীবনের নাহি ক্ষয় ॥
মরণ মরণ নয়,—জীবনের মূলাধার,
মরণের পারে হের জীবনের পারাবার ॥
মরণ নয়ত সে যে অনন্ত জীবনে মেশে,
দেহকে জীবন ভাবি কেন কাঁপিতেছ ত্রাসে ॥
লক্ষ লক্ষ ঢেউ যথা অনন্ত সাগর-বুকে,
পরমাত্মা-সিন্ধু মাঝে 'আমির' তরঙ্গ ঝুঁকে ॥
সবাতে 'আমি' ফুটছে সে 'আমি'র পারাবারে,
অসংখ্য বুদ্বুদ্ যথা ফুটে সিন্ধুনীরে ॥
প্রাণ সাগরের অসংখ্য ঢেউ আসছে আকাশ হতে,
দেহের মাঝে দিচ্ছে উঁকি নিত্য শ্বাসের পথে ॥
গৃহচ্ছিদ্র ভেদি যথা সূর্য্যকিরণ হাসে,
পরমাত্মার কিরণ তথা দেহের মাঝে পশে ॥
সুধার সিন্ধু আছে এই আকাশ খানি জুড়ে,
আকাশ যদি প্রকাশ হয় বুঝবে আপনারে ॥
দেহের মেলা ছায়ার খেলা মায়ায় বাঁধে জীবে,
আকাশেতে দৃষ্টি রাখ দেখ্‌বে সদাশিবে ॥
আকাশ অমৃতখনি দেহে মরণের বাসা,
মরণ জিয়ায়ে রাখ দেহেতে করিয়া আশা ॥
তুমি ত' এ দেহে নও বৃথা কেন মুগ্ধ হও,
দেহ ছেড়ে শ্বাসের পথে আকাশেতে বসে রও ॥
সময় যখন আসেরে ভাই বীজটি তখন ফুটে,
বীজের মধ্যে কি চমৎকার গাছটি জেগে উঠে ॥

পরমাত্মার বীজ তেম্নি আছে তোমার মাঝে,
ভক্তিবারি সেচন কর ফুটবে সময় বুঝে॥
বসন্তের হাওয়া যবে হয়ে যায় সুরু,
পল্লবিত কুসুমিত হয় তখনি তরু॥
গুরু-কৃপা কল্পতরু বসন্তের হাওয়া,
বয় যখনি হয় তখনি বীজটি তাহে বোওয়া॥
শ্রদ্ধার পবিত্র বারি তাহে সিঞ্চ দিবানিশি,
বীজটি ফেটে গাছটি হবে ফুটবে কুসুম হাসি॥
জগদাত্মার হৃদয়-গন্ধ ছুটবে তাহা হ'তে,
কত অলি ব্যাকুল হয়ে ছুটবে চারিভিতে॥
দেখ্‌বে তখন্ জগৎ খানি যাঁহার হাতে গড়া,
বিশ্বমাঝে 'সর্ব্ব'রূপে তিনি আছেন ভরা॥
"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" বুঝবে তখন তুমি,
কে তুমি আর এ সব কেবা, কেবা জগৎ-স্বামী॥
জানলে পরে আপনা হতে তাঁহার পদতলে,
লুটিয়ে দিবে প্রাণটি তোমার, জলটি যেমন জলে॥

ভাগবতের উপদেশ।

রূপময়ের রূপ।

গতবারে আমরা শ্রীভাগবতের অনুসরণে প্রেমময়ের রূপ সম্বন্ধে অস্ফুট আলোচনা করিয়াছিলাম, ও রূপ এবং মূর্ত্তির পার্থক্য বুঝিবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। আচার্য্য শঙ্কর ও বৈষ্ণব মহাজনগণ 'রূপ অর্থে এই ভাবই দেখিয়াছেন। যাহা ফুটিয়া উঠে, যাহাতে নিত্য শুদ্ধ আনন্দঘনের ভাব জাগাইয়া দেয় তাহাই রূপ। ইহাই 'ধাম' শব্দদ্বারা ভাগবতে লক্ষিত হইয়াছে।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতি বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥৩।২৬।৩

প্রত্যগ্ধাম অর্থে "প্রত্যক্ প্রতিলোমং ধামঃ স্ফূর্ত্তিঃ যস্য" (শ্রীধর)

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহী বা ভাতি মায়য়া ॥ ৫৫।
বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ভাগবত ৩।২৬।

সেই অখিলাত্মা ভগবানই স্বপ্রকাশ ভাবে রূপের ভাষায় ফুটিয়া উঠেন। এমন কি ভগবানের রূপ ভিন্ন জগতে বস্তু বলিয়া দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সেই রূপই বস্তুর ভিতর দিয়া উদ্ভাসিত হয়।

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ১০।১৪।২২

সেইজন্য এই জগৎ-রূপ ভাবটী বাস্তবিক পক্ষে সেই শেষরহিত সৎরূপই বটে। মায়াদ্বারা উহা 'উদ্যত' অর্থাৎ বস্তু হইতে ফুটিয়া উঠে বলিয়া মনে হইলেও, বাস্তবিক সেই সৎরূপে 'অস্তধিষণ' অর্থাৎ নিবস্ত প্রতিভাস হইয়া, অদয় ব্রহ্মরূপে শেষ হইয়া যায়। "ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে"। অতএব ভগবান্ যে কেবল নিত্য অনন্ত সুখবোধ রূপ, তাহাই গজেন্দ্রের স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—

তমক্ষরং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরমনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ৮।৩।২১

সেই অক্ষর পরমেশ্বর কেবল আত্মা বা 'আমির' ভিতর দিয়া প্রকটিত—যোগের গম্য। মন বুদ্ধি প্রভৃতি তাঁহাকে দেখাইতে পারে না; কারণ—

যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়োনির্য্যান্তি সংযান্ত্য সকৃৎ স্বরোচিষঃ।
যথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ৮।৩।২৩
সবৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥৮।৩।২৪

মন বুদ্ধি আদি তত্ত্বগুলি তাঁহারই জ্যোতিরূপে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাতেই লয় পায়। যেমন সূর্য্যের কিরণ হিরণ্ময় পাত্রের, এবং অগ্নির জ্যোতি অগ্নির প্রকাশকে দেখাইতে পারে, স্বরূপকে দেখাইতে পারে না, সেইরূপ তত্ত্বগুলিও তাঁহাকে দেখাইতে যাইয়া নিঃশেষে তাঁহাতে ডুবিয়া যায়, আর দেখান হয় না। তিনি দেব, মনুষ্য, অসুর, পক্ষী, পশু নহেন, তিনি স্ত্রী বা পুরুষ নহেন; তিনি গুণও নহেন কার্য্যও নহেন, সৎও নহেন, অসৎও নহেন। কিন্তু 'নেতি নেতি' দ্বারা যাবতীয় বিশেষের নিরাস করিলে, যাহা কিছু অবশেষে থাকে,—তিনি তাহাই। তিনি 'অবশেষ অমৃত' বলিয়াই, তাঁহাকে 'মরণ সমান' বলিয়া

বোধ হয়। যেমন মরণরূপ পরাগতিতে ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিশেষভাব ছাড়িয়া সুখস্বরূপ অনুভূতিতে মিশিয়া যায়, সেরূপ তাঁহার টানে 'সর্ব্ব'ঘন হইয়া তাঁহাতে মিশিয়া যায়।

সজনি কি হেরিনু নাগর কান।
কানড় কুসুম-তুল　　নীলমণি ঢল ঢল
বরণ চিকণ অনুপম।

সে রূপের ত' পরিমাণ হয় না। প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিত্য নূতন দেখিয়া তাঁহাতেই 'সর্ব্ব'ভাব হারাইয়া ফেলি। এমন কি লক্ষ লক্ষ সাধক দিবানিশি ধ্যানে যে ভাব অনুভবে বুঝে, সেই লক্ষ সাধকের ভাবরাশি একত্র করিলেও ত' সে রূপ-সাগরের পরিমাণ হয় না ;—তাই

লাখ লাখ যুবতি　　দিবস নিশি আবতি
হেরই নহ পবিমাণ॥

সে যে 'সব' উছলিয়া, 'সর্ব্বভাবের' নিঃশেষ করিয়া, পরাভাবে ফুটিয়া উঠে।

সইলো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজোর নীলমণি　　মবকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।

মনে হয়, যমুনা জলে বুঝি তিনি আছেন, কিন্তু ঐ দেখ—

জিনিয়া যমুনা-জল　　নিবমল ঢল ঢল
দরপণ জিনিয়া রসাল॥
কিয়ে নব নীল　　নলিনী কিয়ে উৎপল
জলধর নহত সমান।
কমলিয়া কিশোর　　কুসুম অতি কোমল।

তবে তাঁহাকে ধরি কোথায়? কেবল একবস ঘন ধ্যানপ্রবাহের মধ্যে রস-রূপে তাঁহাকে বুঝিতে পাবা যায়। তাই তিনি—'কেবল রস নিরমাণ।'

কামে সে রসের পরিমাণ হয় না। কারণ কামেব আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ও বিশিষ্ট অহং' ভাবের স্থাপনা সে রূপেব স্রোতে পড়িয়া স্তম্ভিত ও লীন হইয়া যায়।

ওরূপ হেরি প্রাণ　　কি জানি কেমন করে
মুরছই কতহুঁ অনঙ্গ।

যে কাম কোনও অঙ্গে নাই, যাহা কামিনীর বারেকমাত্র অপাঙ্গভঙ্গিতে জাগিয়া উঠিয়া মানবকে বিপর্য্যস্ত করে, যাহার প্রভাবে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে, পাপ পুণ্যরূপে প্রতিভাত হয়,—সেই অনঙ্গও তাঁহার রূপস্রোতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

দিব্য স্বপ্রকাশতার ভিতর দিয়া ঐ রূপ স্ফুরিত হয়। তাই শ্রীদেবকী-স্তোত্রে ভাগবত বলেন যে, সেরূপ আদ্য, অব্যক্ত ব্রহ্মস্বরূপ। রমণীয় চক্ষে রূপ ফুটিলে যেমন রূপে রমণী ভাব থাকে না, সেরূপ গুণের ভিতর দিয়া তাঁহার বিলাস হইলেও তিনি নির্গুণ, বিশেষে নির্ব্বিশেষ, আকারে নির্ব্বিকার, সর্ব্বের আধার বলিয়া বিষ্ণু, এবং সকল আত্মাকে প্রকাশ করেন, ও সকল আত্মার ভিতর দিয়া প্রকটিত হন, বলিয়া অধ্যাত্মদীপ।

> রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।
> সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং স ত্বং বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ভা ১০।৩।২৪

তাই ভাগবত বলিলেন—

> ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
> মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥১০।১২।১১

যে ভগবান্ হরি জ্ঞানিগণের পক্ষে সদা স্বপ্রকাশ ও পরম সুখস্বরূপ, ভক্তগণের পক্ষে পরম দেবতারূপে, এবং মায়ামুগ্ধ জনগণের পক্ষে নরবালকের রূপে প্রতীয়মান হয়েন,—গোপবালকেরা তাঁহার সহিত এইরূপে বিহার করিতে করিতে পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিল।

পাঠক। তাঁহার রূপ দেখিবে কি? মনে কি পড়ে, যে দিন নব প্রেমের স্রোতে প্রণয়িনীর প্রত্যেক অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে তোমার প্রাণের ভিতর কি সুখের স্রোত বহিয়াছিল? কিরূপে প্রত্যেক অঙ্গের গঠন ও গতিতে সেই স্রোত খরতর বহিয়া তোমাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল? অথচ যখন সেই প্রণয়িনীকে লালসা-লোলুপ হৃদয়ে বক্ষে ধারণ করিলে, তখন ঐ দেখ কি এক পরাগতিতে ইন্দ্রিয়গণের নূপুর-সিঞ্জিত, কামের অদৃপ্ত লালসা, মনের বিশ্ব-সৌন্দর্য্যোপকরণে প্রণয়িনীর প্রতিমা গঠনের সঙ্কল্প-বিকল্প-কার্য্য, ও এমন কি বুদ্ধির বস্তু বা প্রণয়িনীরূপে অবধারণ কার্য্য, সকল কার্য্য-কারণের খেলা স্তিমিত স্তম্ভিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া কি এক অমেয় আনন্দরসে ডুবিয়া যায়। তুমি কামুক বলিয়া উহার ভিতর সেই পরপুরুষের স্পর্শ দেখিতে পাও না। মা সাধ্বীগণ! তোমরা যে অনেকক্ষণ পরে গৃহকার্য্যাবসানে সন্তানকে বুকে লইয়া কি এক অনুভবরূপ সুখসাগরে

ডুবিয়া যাও, সে ত তাঁহারই পদচিহ্ন। বিশিষ্ট 'অহং' জ্ঞানের বশে বোধটিকে বোধরূপে না রাখিয়া আমরা বস্তুরূপে পরিসমাপ্ত করিতে চেষ্টা করি। তাইত' দারা, পুত্রাদি-রূপে তাঁহাকে বুকে ধরিয়াও আমাদের পিপাসা মিটে না; দেহ-জ্ঞানের ব্যবধানে স্রোতটী ছিন্ন হইয়া যায়।

সে যাহা হউক, আমরা ভাগবতে ফিরিয়া আসিব :—

ব্রহ্মাও তাঁহাকে 'কেবলং বোধলক্ষয়ে' এবং

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥১০।১৪২৩

বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।

অতএব সেই নিরঞ্জন নিরবচ্ছ বোধ ও সুখ স্বরূপে প্রত্যেক ভূতে অবস্থিত ভগবানের নিত্য, অপ্রাকৃত রূপ আছে, নাই কিন্তু নিত্য প্রাকৃত মূর্ত্তি নহে। অনন্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার অভিব্যক্তি হয় সত্য, কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তিই মায়া-বিজৃম্ভিত। উহা সাধকের সংস্কারের অনুরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠে; তাহাতে শ্রীরূপের হানি হয় না। দাক্ষিণাত্যে রাবিবর্ম্মার চিত্রিত শ্রীকৃষ্ণে ও বঙ্গদেশের প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির চিত্রে যে আকারগত কত পার্থক্য তাহা সকলেরই বিদিত আছে। কাবুলে এখনও হিন্দুর বাস আছে। তাহারা ভগবানকে পাগড়ী পরিধান করাইয়া দিব্য কাবুলীবেশে অঙ্কিত করে। ইহাই করুণাময়ের সাধকের সংস্কারানুগত বিকাশ। সুতরাং রূপ ও মূর্ত্তির পার্থক্য স্বীকার না করিলে শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপের হানি স্বীকার করা হয়।

ধ্যানের ভাষায় দেখিলে এই সত্যই অন্যভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ধারণার পর যখন প্রত্যয়রাশি ঘন হইয়া বোধরূপ একরসে মিশিতে যায় তখনই ধ্যান হয়। যাঁহারা ধ্যানপরায়ণ তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে প্রত্যয়ের একতানতা না আসিলে, ধ্যান আসে না। মনে কর, তুমি সেই কালরূপের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে; তাঁহার স্থল-কমলদল-গঞ্জিত চরণযুগল হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে যাইয়া দেখিবে, ঐ ব্রহ্মগোপাল মূর্ত্তির একদেশ চিন্তা করিতে যাইয়া অপরাঙ্গ-সমূহ চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া যায়। শারদ-শশি-সন্নিভ পদনখ অঙ্কিত করিতে যাইয়া চরণকমল-দল লুকাইয়া যায়। মীন-জঙ্ঘ রচনা করিতে কর্কট-প্রতিকৃতি বর্ত্তুল জানু ও এত সাধের বিরচিত চরণকমল লুপ্ত হয়; ঢল ঢল কাঁচা কমনীয় বর্ণ যোজনা করিতে যাইয়া, হায়! কোথায় বর্ণ যোজনা করিব হারাইয়া ফেলি!!

দুই প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধ্যান ভঙ্গ করে। প্রত্যাহার সিদ্ধ না হওয়াতে, মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে এক আধার আছে তাহা না দেখিতে পাইয়া, অনেকেই সংস্কারের বসে হয়ত গৃহিণীর নয়ত প্রিয়তম তনয়ের শ্রীঠ্যাং চিন্তা করিয়া বসেন। তারপর বিজ্ঞানেচ্ছা অতৃপ্তির জন্য, 'কেন এরূপ' 'কেন সেরূপ' ইত্যাদি প্রকারের প্রশ্ন-স্রোতে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে। ইহাই বিক্ষেপ-শক্তির খেলা। তারপর যদি কোন কৌশলেও শ্রীপদের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে পার, তা' হইলেও দেখিবে তাহাতে কোনও ভাবের বিকাশ হইতেছে না, কেবল একখানা পদেরই চিত্র হইল। ইহা অপ্রকাশ বা আবরণ শক্তির খেলা। অনেকে দেখিয়াছেন কসরৎ করিয়া যে দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইল তাহাও তৃণমৃত্তিকাদি বিনির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় কোন ভাবের বিকাশবিহীন। বহু, ছিন্ন প্রত্যয়গুলি বাহ্য কোন কৌশলেও ঘন করা যায় না। তবে যদি ভগবান অনুরূপে সাধকে গ্রহণ (অনুগ্রহ) করিয়া ভাবরূপে স্ফুরিত হয়েন, তবে এই ছিন্ন বহুগুলি কি আশ্চর্য্য কৌশলে মিলিত হইয়া যায়। তখন গদ্ গদ্‌চিত্তে সাধক বলিয়া উঠে—

সখি কি কহব অনুভব মোয়, সোহি রূপ বাথানিতে, তিলে তিলে নূতন হয়।

বাস্তবিক তখন ত' আর তাহার ব্যাখ্যা বা খ্যাতি থাকে না। তখন কি এক অভিনব, প্রাণাবাম, বিশেষ-জ্ঞানের অতীত, বোধস্বরূপ আনন্দ-ঘন প্রবাহে ডগমগ হইয়া উঠে ও সেই স্রোতে পতিত হইয়া অন্তরে ও বাহিরের সমস্ত বিচ্ছিন্ন ও বহু ভাবগুলি সেই মধুময় বোধের সাকারতা ও সম্পূর্ণতা প্রকটিত করে। তখনই অব্যয় নীলিমার স্থিব প্রশান্ত নীলিমা, নবনীতের কোমল লাবণ্যের সহিত নিঃশেষে মিশিয়া যাইয়া আর আকাশ বা নবনীতকে না দেখাই—উভয়ের মধ্যে অথচ উভয়ের অতীত শ্রীভগবানেরই স্বরূপে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তখন আর কুণ্ডল চিন্তা করিতে যাইয়া গৃহিণীর বলয়ের কথা মনে পড়ে না, কঞ্জাক্ষের ভাব স্ফুরিত হইতে 'বোটানিকেল' উদ্যানের পদ্মের কথা মনে পরে না। তখন গোপীগণবেষ্টিত শব্দে বার-বণিতা-ভাবাপন্ন কতকগুলি যুবতীর স্মৃতি উদিত হয় না, ও তৎসঙ্গে পূর্ব্ব জীবনের উপভুক্ত ভোগবিলাস-স্মৃতি জাগরিত হয় না। তখন বাস্তবিকই সকল বিশেষণগুলি একঘন প্রেমময়-স্বরূপে, নিঃশেষিত রূপে মিশিয়া যাইয়া সেই মদন-মোহনের মহান্ ভাব স্ফুরিত করে। কেবল তখনই—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং বিকসিতবদনং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং॥

শ্যামং শার্ঙ্গং ত্রিভঙ্গং রবিকরভূষণং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং—

*　　*　　*　　*　　*

গোপাল-বেশযুক্ ব্রহ্ম দর্শনে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে, তখনই মূর্ত্তি হইতে রূপ ফুটিয়া উঠে। রূপতত্ত্বের ভিতর মহাভাবময় রাধাভাবই শক্তি, অকৈতব প্রেমই তাহার প্রেরক, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিই তাহার আধার।

হয়ত বৈষ্ণব মহোদয়গণ আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন। তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন যে বৈষ্ণব ভাবের উপাসনায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যে মহাযোগিনী মহামায়া সর্ব্বভাবে, বৃত্তিসকলের অবসানরূপে বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-রূপে না খেলিলে, ধ্যানে একতানতা প্রবাহিত হয় না; ও সাধক কেবল মনন-প্রবাহে পতিত হইয়া ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে থাকে। যোগ-দর্শনের তত্ত্বগুলি কেবল 'কুস্তি' করিবার জন্য উপদিষ্ট নহে। ঐ সকল তত্ত্ব, সুর বা ভাবের ভিতর দিয়াই চিত্ত পুরুষরূপে স্থির হইতে পারে, অন্য কোন প্রকারে পারে না। যে যে-ভাবেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহুক্ না কেন, বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা মহামায়া প্রসন্না না হইলে কিছুতেই ছিন্ন ভাবগুলি একাগ্রে মিলিত হইয়া ধ্যানের একতানতা আসিতে পারে না! এই ছিন্নভাবগুলিকে শুদ্ধ করাই তন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধির মূলতত্ত্ব। তাহার পর ভূতশুদ্ধিকৃত সাধক স্থিরভাবে শ্রীভগবানের প্রকাশক্ষেত্ররূপ 'অহং' ভাবে অবস্থিত হইয়া মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরাও জানে কিরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, প্রতিমার ভিতর দিয়া এক ভাস্বর, অভিনব জ্যোতি প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই জন্য কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়া, মহামায়া মহাযোগিনী শক্তির কৃপায় যখন বহুভাব সংহত হইয়া একাভিমুখে মিলিতে যায়, তখনই গোপীগণ শ্রীভগবানের রাস-লীলার অধিকার প্রাপ্ত হন। ভগবান্ যে এক। সেই জন্যই বাহ্যভাবে নানারূপে তাঁহার স্বরূপ বিতন্বত হইয়া থাকিলেও, তাঁহাকে লাভ করিবার পথ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বপ্রকার সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যেই মূলতঃ একই ভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। ভাগবতে এইভাব সুরক্ষিত রহিয়াছে।

তবে ভাগবতের বিশেষত্ব কোথায়? ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ সাধক স্বতঃই ভাবিয়া ফেলেন যে তাঁহার গুরূপদিষ্ট ও তদাচরিত মন্ত্র ও সাধনপদ্ধতির এমনই একটি বিশেষত্ব আছে যে তাহাতেই ভগবানের প্রকাশ হইবে। এই

রূপের ভেদভাবে আপনাপন সাধনমার্গের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সকলের প্রবৃত্তি হয়। মানবের এমনি মোহ, আমাদের অন্তরে ভেদবুদ্ধি এতই বদ্ধমূল, যে আমরা মুখে শ্রীভগবানকে স্বপ্রকাশ সর্ব্বহৃদে সমান ভাবে অভিব্যক্ত বলিলেও, আমাদিগের মনে মনে ইহাই ধারণা যে 'ক্লীং' জপ না করিয়া 'ক্রীঁ' জপ করিলে আর তাঁহার স্ফুরণ হইবে না। সেই জন্য সতত অহঙ্কারে পুষ্ট হইয়া 'আমি' ও 'আমার' লইয়া মত্ত থাকি ও ভাবি যে স্ত্রীলোকের মত করিয়া বস্ত্র পরিধান করত তদনুরূপ ভাব-ভঙ্গি করিয়াই বুঝি রসিক-শেখরকে ধরিতে পারিব। তদ্রূপ ভ্রান্ত শাক্ত ভ্রাতাও ভাবেন যে 'মা মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে দিগন্ত কম্পিত করত, মায়ের ছেলে বলিয়া অভিমানমত্ততার বশে যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাতেই জগদম্বা প্রসন্না হইবেন। সর্ব্বদেশে সকল ধর্ম্মেই প্রায় সাধক-দিগের ভিতরে এইরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়। ভগবানে সর্ব্বার্থতা সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ ভাবের বিকাশ প্রায়শঃ ভেদদৃষ্টিরই ফল। অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সাধকগণ মনে করেন যে, ভগবৎ-প্রকাশের সর্ব্বাত্মক নিয়ম বা স্তর সমূহ তাঁহাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক। অন্যের বেলা ধ্যান ধারণা ও চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে নহে। এই প্রকার ভ্রান্তি অহঙ্কার-প্রণোদিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কোনও ভগবদ্বিলাস আছে, কারণ সেই মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে কোনও কিছুই থাকিতে পারে না। সর্পজ্ঞান মিথ্যা হইলেও উহা সত্য রজ্জুজ্ঞানে পরিস্থাপিত। ভগবানের একতাই, সমরূপতাই, প্রকৃতির ক্ষেত্রে সর্ব্বাত্মিকতারূপে প্রতি-ফলিত; সর্ব্ব আত্মাই যে তিনি ইহা বুঝাইবার জন্যই সর্ব্বজীবের ভিতর দিয়া, একই নিয়ম, শৃঙ্খলা বা তত্ত্বসমূহেব বিকাশ হইয়া থাকে। প্রকৃতির সার্ব্ব-জনীনতা এই সর্ব্বাত্মিকতারই আভাস মাত্র।

ভগবানের অদ্বিতীয়তা রূপটীও জীবের অহঙ্কারের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে। তিনি অদ্বিতীয়, তাহাতে দ্বিতীয়ের ভাণ পর্য্যন্ত নাই, সুতরাং তাহাতে পঁহুছিলে দ্বিতীয়ভাবেব বিকাশ আর হইতে পারে না। এবার শুদ্ধ তাহার এই অদ্বৈত ভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইব, আগামী বারে ঐ তত্ত্বের রহস্যটী যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ এই রহস্যের অবরোধ না হওয়াতে শাস্ত্রের উপদেশসমূহ কদর্থে পরিণত হইয়া, নানাবিধ ভ্রষ্টাচারের উৎপাদন করিতেছে। ভগবানের নানাভাবে প্রকটিত হইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই গুরু একভাবে উহা প্রাপ্ত হইয়া, অপরকে উহা দিতে পারেন। ঐ একতা প্রাপ্ত

হইয়াই শাস্ত্র 'ইহা কর, ইহা করিও না' এই আদেশ করেন; যে ভাবে এক হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ হয় অন্য হৃদয়েও সেইভাবে প্রকাশ হইতে পারে বলিয়াই, ক্ষুদ্র সাধকগণ সাধনা-পথে অগ্রসর হয়েন। সুতরাং সর্ব্ব প্রথমে এই একতা বা বিদ্যাভাবের সিদ্ধি হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তা' বলিয়া তাহার অদ্বিতীয়তার কি কিছু হানি হয়? প্রাণায়াম-মার্গে তদীয় সর্ব্বাত্মিকা ভাববশে একই প্রকারের ফল লাভ হয়, 'কিন্তু তা' বলিয়া কি কেহ বলিতে পারেন যে প্রাণায়াম না করিলে কাহারই ভগবচ্চরণ লব্ধ হইবে না? তিনি অদ্বিতীয় বলিয়াই, জগতে সাধনপদ্ধতিসমূহেরও বিপর্য্যয় ঘটে; জগাই মাধাই প্রভৃতিও ধার্ম্মিক হইয়া যায়, বিশ্বামিত্রেরও পতন হয়, মনুষ্য-সখা বুদ্ধিতেও দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হয়, ও অশ্বথামা-হস্তে পঞ্চ-পাণ্ডব-শিশুর মৃত্যু সংসাধিত হয়। তাঁহার মত ত' আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই; তবে কোন্ মানযন্ত্রে তাঁহার পরিমাণ করিবে? পাঠক, বলিতে পার কি তাঁহার কোন্ ভাব প্রভাবে পতিতা অহল্যা পাষাণী হইয়াও মুক্ত হইল? জয়দ্রথ-বধ সময়ে নভোমণ্ডলে সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইল! আগামী বারে এই সমুদয় বিষয় আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

রূপ।

খাম্বাজ—যৎ।

কত আর লুকাবি শ্যামা—
ও রূপ লুকায় কি মা লুকাইলে?
ও যে আঁধার আলো করা রূপ মা,
ফুটে উঠে আধার পেলে॥
অনন্ত নীল গগনে—
লুকাতে রূপ মিশিয়ে গেলে;
মিলে কালর সঙ্গে, রূপের আলো,
তারা! সব তারাময় করে দিলে॥

নবীন নীরদ মাঝে—
শ্যামা রূপ লুকাইলে ;
ধরলো না রূপ, কুড়িয়ে নিয়ে
চপলা সব ছড়িয়ে দিলে ॥
অসীম নীলাম্বু মাঝে—
লুকাতে রূপ ডুবে গেলে ;
রূপে বিভোর নাচে সাগর,
ঢেউয়ের মাথায় তোমায় তুলে ॥
বিজন বিপিন মাঝে—
শ্যামা রূপ লুকাইলে ;
পেয়ে রূপের আলো কুসুমগুলো
ফুটি' ওরূপ লুটিয়ে দিলে ॥
কোনো রূপের থাকে না রূপ
বিনা ও রূপ 'দেবা' বলে—
জ্যোতির চরম শ্যামাবরণ
আলোর ভিতর কালো জ্বলে ॥

'দেবা।'

সংসার ও ভগবান্।

নাগোব-দোলায় চড়ে বন্ বন্ করে ঘুরবে, আর মাথা ঘুরবে না এ হতেই পারে না। গো-যানে করে অনবরত যদি অসমতল স্থানের মধ্যে যাতায়াত করিতে হয়, তবে গাত্রবেদনা হইবে না আশা করা বিড়ম্বনা। তেমনি সংসারে থাক্‌তে গেলেও (না থেকেই বা কোথায় যাবে ?) দুঃখ কষ্ট ভোগও একবারে অনিবার্য্য! সুতরাং অতি ধ্রুব বিষয়ের জন্য অধিক ভেবে লাভ নাই। সেইজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলে রাখলেন যে, "ওগুলা কি জান ? ওগুলি "মাত্রাস্পর্শ" (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সম্বন্ধ), সেইজন্যই শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ প্রদ। আর ওগুলা "আগমাপায়ী"—অর্থাৎ চিরকালের জিনিস না—মধ্যে মধ্যে আসবে, চলে যাবে ;—তা' বাপু ওগুলি সহ্য করতে হবে।" বেশ স্পষ্টাস্পষ্টি কথা, এ কথার উপর আর কোন জবাব দেওয়া চলে না। আর যদি কেউ বলে,

'আমি তোর সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিব, সপ্তম স্বর্গে চড়িয়ে দিব—সেখানে কোন দুঃখ নাই কষ্ট নাই—সেখানে ভারী মজা'—তা হলে সেই গুরুমহাশয়টির সহিত একটু সাবধানে ব্যবহার করো ! অর্থাৎ কালটা কলিকাল কিনা, দেশে অনেক ভণ্ড জমায়েত হয়েছে, তা'ই ভয় হয়! সংসারটা—যেখানে বাস করচ, সেটা যে কি, একবার বুঝে দেখ না—এ সংসারটি একটি মস্ত কুহেলিকা—এ কুহেলিকা যদি ভেদ করতে চাও, তবে এই সংসার-নাট্যের নটরাজটির কথা একটু ভাল করে ভেবে দেখ ; তা হলেই চমক ভেঙ্গে যাবে! যে ভাবে সংসারে এত আমার ধন-জন, কত আমার বন্ধু-বান্ধব,—মান প্রতিষ্ঠা কিছুরই আমার অভাব নাই—এখন মজা করে দিনকতক সুখভোগ করা যাক্—এও যেমন ভ্রান্তচিত্তের কথা,—আবার যে ভাবে "এ কি ভয়ানক সংসার, একি ঝঞ্ঝাট, এ কি দুঃখ, এ কি দৈন্য, এ কি অসামঞ্জস্য, কোথায় ঈশ্বর, কেউ কোথায় নাই, বৃথা ডেকে ডেকে মরা—এমন কুস্থান বাবারে মলাম" !!—সেও তেমনি ভ্রান্ত। অবশ্য সাধারণতঃ জগতেও দু'রকম ভাবই (Daspects) দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওর কোনটাই সত্য (real) নয়।

সংসারের রূপ কি জান ? কখনো মনে হবে, কি সুন্দর কি আনন্দের স্থান !! এত ভালবাসা, এত প্রীতি, এত স্নেহ আর কোথায় ? পিতা মাতা, পতি পত্নী, ভাই ভগ্নী, স্বজন বান্ধব—সবই যেন এক একটি সুখের উৎস, সবই যেন সুখের হাট-বাজার! ধন মান খ্যাতি এবং চাকচিক্য ত কম নয়! মনে কর যখন যা' ভাবছি তা'ই ঘটচে, যখন যা' চাচ্চি—তা'ই পাচ্চি। শরীরে বল, আরোগ্য, চনেচনে ক্ষুধা, আবার ক্ষুধা উপশমের কত বিবিধ খাদ্য—কিছুরই অভাব নাই, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সবই যেন আমার হাতধরা! কিন্তু ব'সো—সংসারের আর এক মূর্ত্তি আছে। তাহা ভয়ানক অপেক্ষাও ভয়ানক!! মনে হলে থরথর করে গা কেঁপে উঠে! একদিকে মূর্খতা অজ্ঞানতা ত' আছেই, আবার অন্ন-বস্ত্রের অভাব—রোগ যন্ত্রণা মৃত্যু—তার উপর দুর্ভিক্ষ মহামারী—সব যেন হাঁ করে গিল্‌তে আস্‌চে! দেখতে দেখতে ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী পড়ে গেল, আগুন লেগে যথাসর্ব্বস্ব পুড়ে গেল !! মহামারীর প্রবল আক্রমণে একের পর একটি - এমনি কত পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, পতি, পত্নী, বুকের হাড় ভেঙ্গে চুরমার করে, তা'রা চলে গেল!! এত দারিদ্র্য যে রোগ হলে ঔষধের পথ্যের পয়সা জোটে না, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না ; সবাই ঘৃণা করে—অবিশ্বাস করে, যত রকম রোগ সবাই যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে শরীরে বাসা বেঁধেছে !! বাড়ীর চালে খড়

নাই, বৃষ্টিতে দেওয়াল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্চে !! কন্যার সংখ্যা বেড়ে চলেচে —বিবাহের তা'দেব বয়স পেরিয়ে যাচ্চে—সৎপাত্রে সম্প্রদান করবার সামর্থ্য নেই! টকাটক্ কবে বিধবায় গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠচে!! ছেলেগুলাকে পড়াবার খরচ জোটাতে পারা যায় না—মূর্খ হয়ে বাড়ীতে বসে বসে তাঁদের গোঁয়ারতমী বেড়ে উঠছে !! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া চিত্তকে ব্যাকুল করে তুল্চে !! এও এক মূর্ত্তি !! এই আলোক আঁধারই সংসার! সবারই ভাগ্যে যে আবাব এ দুই জুটবে,—তা'র কোন মানে নাই!! কারও হয়ত' জীবন ধবেই দুঃখ। কিন্তু বাবা নিববচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই! বোধ হয় থাকলে সুখেব মর্য্যাদা হানি হ'তো!

একটা কথা জেনে রাখ! এই সংসাবে যখন দেখ্বে চারিদিক্ অন্ধকার, কোথাও কূলকিনাবা নাই,—সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে বিপদের উন্মত্ত ঝঞ্ঝা উতলা হয়ে হা হা করে উঠচে—দিক্‌দিগন্ত চেনা যায় না। মনে হবে এ কি! "এ কোথায় পড়লাম,—সাথী নেই. বন্ধু নেই, দয়া নেই, আলো নেই, কোমলতা নেই, কেহ ব্যথার ব্যথী নেই! এ যে নরক" !! কিন্তু ভয় নেই—একটু ধীরতা অবলম্বন কর; একটু দন্তে দন্ত পেষণ করে চুপ করে অপেক্ষা কর;—দেখবে একটু পরে এ সব অন্ধকাব কেটে যাচ্চে, সব গোলমাল মিটে যাচ্চে! কারণ এ জগতে কিছুই নিত্য নয়!

শ্রাবণেব ঘন বরষায়—নিবিড় তিমিরময় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি মুহুর্ম্মুহু প্রাণে আতঙ্কেব সঞ্চার করে; অবিবত মুষলধারে বৃষ্টিধারা ও ঘন ঘন অশনি-সম্পাত যখন প্রলয়ের অভিনয় করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে, তখন আশ্রয়হীন প্রান্তরের মাঝে পথিক শীতত্রাস-কম্পিতবক্ষে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবে—"বুঝি এ রাত্রির আব অবসান নাই, এ বিপদে আর পরিত্রাণ নাই" !! তখন কি তা'র একবারও মনে উদয় হয়, যে আবার সূর্য্য উঠবে, দিক্ পরিচ্ছন্ন হবে, মাথার উপর পাখীরা আনন্দে গান ধরবে—আবার নর-নারীব হাস্যসরস মুখগুলি দেখতে পাওয়া যাবে? কিন্তু এ বিপদ্‌ও কেটে যায়, এ ঘোর প্রলয় রাত্রিরও অবসান হয়। ধীরে ধীরে মেঘগুলি সরিয়া যায়— কালে অবিশ্রান্ত বারিপাতও থামিয়া যায়! আবার শারদ জ্যোৎস্না কেতকী-কুসুমের মত ফুটিয়া উঠে; মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যালোকের অমল কিরণে সবই যেন সুন্দর সবই যেন আশাপ্রদ বলে মনে হয়!! এই সংসার!! এই এখানকার নিয়ম! কিন্তু এখানে একটা আমাদের মস্ত শিক্ষা হয়! নিরন্তর বিপদ্-ব্যাকুল নিরাশ্রয়চিত্ত আরও নিবিড়ভাবে

ভগবানকে আশ্রয় করতে শিক্ষা করে। যতই বিপদ্ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে, ততই তাঁ'র সঙ্গে সংযোগের মাধুর্য্য ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায়! বিপদের মধ্যে এই পরম সম্পদ্ পাওয়া যায় বলেই, আদর্শ-রমণী ভারতেশ্বরী কুন্তী—বিপদ্কেই প্রার্থনা করেছিলেন! বিপদ্ যে সকল সময়ে আমাদের বিপন্ন করিয়াই ক্ষতি করে, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রকম সুযোগের সম্ভাবনা করিয়া দিয়া তবে সে ক্ষান্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষতির মধ্যে এই লাভটুকু যে আদায় করিতে না পারে—তাহার ক্ষতি অবশ্যই অপূরণীয়!! জানিও তোমাব সুখও যেমন মিথ্যা, দুঃখও তেমনি মিথ্যা। আর এই দুয়েব সংযোগই হইল সংসার। এই বিচিত্র সংসার রচনা যাঁ'র বিচিত্র যাঁহার মায়া-মাধুরিমা—ইহাতে থাকিয়াও যিনি ইহার পর পারে—তাঁ'রই পাদপদ্মে প্রসন্ন হয়ে শরণ গ্রহণ করাই, প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য—ইহাই আসল চাতুরী! একবার মনঃপ্রাণ দিয়ে ডাক দেখি—সমস্ত অন্ধকার বিদলিত করিয়া তাঁর দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে! তিনি যে নিজেই বলেছেন "ওরে আমি যে তোদের সখা—আমি যে তোদের বন্ধু, আমাকে 'সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং' জেনে তোরা আমাকে শান্তিলাভ কর্"। আমরা তা'তো করি না;—আমরা কেবলি সেই মুখসপরা মুখ দেখে, আঁত্‌কে উঠি। তিনি যে আমাদের ডাক্‌চেন, আমরা যে তা শুনি না। সে ত আমাদেরই দোষ! সংসার খেলাঘর সাজিয়ে ভগবান্ খেলা করচেন এতে ভাববার চিন্তিবার কিছুই নাই! তুইও খেলায় যোগ দে' না! বেশ এখন মজা পাবি!! তা' না খেলে আমি নিজের ঘরে নিজে যদি চোর হয়ে বসে থাকি—তবে তাঁর রাজমুকুট-পরা দণ্ডপাণি-মূর্ত্তি দেখে তো ভয় হবেই। মিথ্যাকে সত্য মনে করে যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক,—তবেত শেষে কাঁদ্‌তেই হবে। কিন্তু ভক্ত যে—প্রেমিক যে—সে এ খেলায় ভয় পায় না—সেও এই খেলায় তাঁ'র 'খেলুড়ে' হয়ে বেশ আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এ তাঁর মায়া-নাট্য কি না, বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি অনেক সময় ভড়কে যায়, ভক্তও বিহ্বল হয়ে পড়ে—তখন সত্য সত্যই সে একটা কিছু আজব ব্যাপার বলে ইহাকে মনে করে বসে। তখন সে ত্রিতাপে তপ্ত হয়ে হাহাকার করে উঠে এবং এই মায়ার খেলা ভেঙ্গে দিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু বাপু! যাবে কোথা! তাঁ'কে বাদ দিয়ে তো আর সংসার নয়? তখন সে ভগবানকে যতই ডাকে—ভগবান্ চুপটি করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। বেশী জ্বালাতন করলে বলেন "বাপু, ন মেদ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" ভক্ত বলে, "বাঃ ঠাকুর একি কথা! আমার যে প্রাণ যায়!!" রসিকশেখর তখন হাস্য করিয়া বলেন,—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ,
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"।
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ,
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

"ও সব সুখ দুঃখ তোমাদের, জানি-টানি না বাপু! জ্ঞান তোমাদের অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই এ বিভীষিকা দেখছ! আমি তোমাদের কর্ম্ম করতেও কাকেও বলি নাই—পাপ পুণ্যও দিই নাই। অমি সর্ব্বত্র সম বুদ্ধি, তোমরাও এই রকম বুদ্ধিকে সর্ব্বত্র সম কর, আর কোন গোল থাক্‌বে না।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

"যাহাদের পাপ ক্ষয় হয়ে গ্যাছে, দ্বৈধ মিটে গ্যাছে, যাঁ'রা সংযতচিত্ত এবং সর্ব্বভূতের হিতকারী—সেই সকল ঋষিরা ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন।"

ভক্ত বলে "পবকালে তো তাদের ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হ'বে, এখন উপায়?" ভগবান্ বলেন "ভয় কি?"

"কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥"

বেশী কিছু নয়—এই কাম ক্রোধ থেকে বিমুক্ত হয়ে একটু সংযত-চিত্ত হয়ে, ঘর দুয়ার ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেই আর কি—"বিদিতাত্মা" হবে—তখন এই কালেই বা কি আর পরকালেই বা কি, সর্ব্বকালেই "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" লাভ করবে।" এই বলেই অন্তর্ধ্যান!! ভক্ত ভাবে "বাঃ রে এলাম্ খেলা করতে, এখন ব্রহ্ম নির্ব্বাণেব পথ দেখিয়ে দিচ্চেন।" তখন ভক্ত কেঁদে বলে, "একি ঠাকুর একি! এ কথাত তোমার সঙ্গে ছিল না।" ভগবান্ মুখ টিপে টিপে হাসেন! ভক্ত তখন ভগবানের ভাব দেখে চোখে অন্ধকার দেখে, রসিক-চূড়ামণি তখনও গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন, যেন বাস্তবিকই পাপ-পুণ্য কর্ম্মের জন্য মানুষগুলাই দায়ী তাঁর ভাব দেখে তখন এই রকমই মনে হয়! ভক্ত তখন ভবসাগরে কূল কিনারা না দেখতে পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে; সে বলে "মৈবং বিভোন ইতি ভবান গদিতং নৃশংসং" 'প্রভু—এমন নৃশংস বাক্য তোমার বলা উচিৎ নয়'—আমরা জানি তুমিই সব, তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা, ত্রিলোকেশ—আমাদের প্রিয়তম, প্রাণ-সখা, আর এক আজ শুনালে "তুমি কেউ নয়"। আজ এ

তোমার এ কি অদ্ভুত বদন ও মূর্ত্তি দেখি! তবে "বামঃ কথং ব্রজন্নাথা করবাম কিংবা"——

ভক্তের নিদারুণ মনোব্যথা ও রোদন দেখে, ভগবান্ তখন আকুল-ভক্তকে এই বলে সান্ত্বনা দেন;—"আগে যা বলেছি তা সত্য বটে—কিন্তু কি জান, তোমার জন্য ও নিয়ম নয়। আরে কাঁদ কেন? আমাকে দেখে? এযে আমার মুখস্-পরা মুখ—ইহারই নাম তো মায়া! মায়া যে তোমাদের দাসী—তোমরা মায়া দেখে বিহ্বল হও কেন? এস এস, তোমরা আমার কাছে বস—তোমরা যে আমার অন্তরঙ্গ, প্রাণের প্রাণ!—আমি কি তোমাদের ফেলে কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি,—না তোমাদের বিপদ্ দেখে স্থির থাকতে পারি? ভয় নেই, ভয় নেই; "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" তোমরা আমার শরণাগত; তোমাদের আবার ভয় কি? পাপ তাপ, ছাইভস্ম, সব থেকে তোমাদের মুক্ত করে দিব এখন, তোমরা বর নাও!" তখন ভক্ত আশ্বস্ত হয়ে বলে "প্রভো বর এখন থাক্, এখন একবার তোমার জগৎ-আলো-করা মুখখানি একবার দেখি! আবার কি ভয়ই দেখিয়ে ছিলে—প্রভু আর এরকম ভয় দেখিও না—তোমার মায়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বুঝতে পারেন না—আমরা তো কি ছার! প্রভো দয়া করে আমাদের ওই পদ সেবার অধিকার দাও—আর কি বর চাইব"—ভক্ত এইবলে প্রেমাশ্রু দ্বারা ভগবানের যোগিজন-বাঞ্ছিত, কমলা-সেবিত পা দুখানি অভিষিক্ত করিয়া দেন—ভগবান্ তখন প্রেমবিগলিত-হৃদয়ে ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাণে কাণে বলেন—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ,
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

এই সংসার আর এই মোক্ষ। উভয়ত্রই তিনি আমাদের নিজজন—এই জেনে সংশয়শূন্য হয়ে থাক। তাঁ'র শরণাগত হও, তন্মনা-তচ্চিত্ত হও, তাঁ'র ভজনশীল হও, তাঁ'কে নমস্কার কর, আর কিছুর জন্যই ভাবতে হবে না?

———

প্রেমোন্মাদিনী।

পয়োধর-পরিসরে মরকত-হার
কৃশ-তনু রাধিকা মানত ভার॥
সরস সুরভি ঘন চন্দন-পঙ্কা।
বিষ অনুভাবই বিরহাতঙ্কা॥
ঘন ঘন বহতহি দীঘল শ্বাস।
গাত দহই জনু আনলরাশ॥
দলিত মৃণাল পর নয়ন নলিন।
ঢারত জল-কণ বাম দখিণ॥
শেজহি কোমল কমল-কলাপ।
খেণে খেণে বাড়াওত মরম কি তাপ
সব খণ করতল কপোল নিধান।
সাঁঝ কি অচপল চাঁদ সমান॥
বিরহে পরাণ অব ছোড়ন-কামা।
"মাধব! মাধব!" জপতহি বামা॥
ভুজঙ্গ ভন—জীয়ে চাতকী-প্রাণ।
নব জলধর যব করু বারিদান॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শ্রীভারতী তীর্থ মুনি-প্রণীত সানুবাদ

বৈয়াসিক ন্যায়-মালা।

উপোদ্ঘাতঃ।

প্রারিপ্সিতগ্রন্থস্যাবিঘ্নেন পরিসমাপ্তয়ে প্রচয়গমনায় শিষ্টাচারপরিপালনায় চ বিশিষ্টেষ্টদেবতাতত্ত্বং গুরুমূর্ত্ত্যুপাধিযুক্তং নমস্কৃত্য গ্রন্থং প্রতিজানীতে।

আরব্ধ গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্তির জন্য এবং শিষ্টদিগের আচার প্রতিপালনার্থ গুরুমূর্ত্তিরূপ উপাধিযুক্ত ইষ্ট-দেবতাকে (গুরুকে) নমস্কার করিয়া গ্রন্থের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাতীর্থরূপিণং।
বৈয়াসিক-ন্যায়মালা শ্লোকৈঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটং॥

শ্রীবিদ্যাতীর্থ-রূপধারী (শরীরধারী) পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া ব্যাসকৃত বেদান্তবাক্যার্থের নিশ্চায়ক অধিকরণ সকল মালার মত ক্রমে ক্রমে শ্লোকের দ্বারা পরিষ্কাররূপে সংগ্রহ করিতেছি।

একো বিষয়সন্দেহ—পূর্ব্বপক্ষাবভাষকঃ।
শ্লোকোঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ॥ ২

প্রতি অধিকরণে দুইটী করিয়া শ্লোক আছে, তাহার এক শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা বিষয় এবং সন্দেহ বলা হইবে, পরার্দ্ধ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলা হইবে। অপর শ্লোকটীর দ্বারা সিদ্ধান্ত বলা হইবে। ইহার প্রত্যেক অধিকরণ বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ, সংগতি, সিদ্ধান্ত এই পাঁচ অবয়বযুক্ত হইবে। সংগতি প্রত্যেক অধিকরণে পৃথক্ ভাবে সংগ্রহ করা হইবে না, কারণ একবার যাহার সংগতি জ্ঞান হইয়াছে সে স্বয়ংই সংগতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়; কাজেই প্রতি অধিকরণে বলা নিষ্প্রয়োজন। ২

সঙ্গতিং বিভজ্য ব্যুৎপাদয়তি—

শাস্ত্রেঽধ্যায়ে তথা পাদে ন্যায়সঙ্গতয়স্ত্রিধা।
শাস্ত্রাদি বিষয়জ্ঞাতে তত্তৎ সঙ্গতিরুহ্যতাং॥ ৩

সংগতি বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন যথা—

শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য অধ্যায়-প্রতিপাদ্য পাদ-প্রতিপাদ্য অর্থ জানিলে শাস্ত্র-সংগতি

অধ্যায়-সংগতি এবং পাদ-সংগতি এই তিন প্রকার ন্যায়-সংগতি নির্ণয় করা যায়। ৩

শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যং অধ্যায়-প্রতিপাদ্যং চ দর্শয়তি—

শাস্ত্রং ব্রহ্ম-বিচারাখ্যমধ্যায়াঃ স্যুশ্চতুর্বিধাঃ।
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনঞ্চ ফলং তথা॥ ৪

শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ও অধ্যায়-প্রতিপাদ্য বিষয় দেখাইতেছেন যথা—

ব্রহ্ম-বিচারাখ্য (বেদান্ত) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বিষয় তাহাতে চারিটী অধ্যায় আছে,—সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন, ও ফল (ফল বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মেতে পর্য্যবসান; ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ে বিরোধ-পরিহার, তৃতীয়ে বিদ্যাসাধন-নির্ণয়, চতুর্থে বিদ্যাফল-নির্ণয়)।

তত্র প্রথমাধ্যায়গতপাদার্থান্ বিভজতে—

সমন্বয়ে স্পষ্টলিঙ্গমস্পষ্টত্বেহপ্যুপাস্যগং।
জ্ঞেয়গং পদমাত্রঞ্চ চিন্ত্যং পদেষমুক্রমাৎ॥ ৫

প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের পদার্থ বিভাগ করিতেছেন। যথা—

সমন্বয় অধ্যায়ের (প্রথম অধ্যায়ের) প্রথম পাদে স্পষ্ট লিঙ্গ * যুক্ত বাক্যসকল বিবেচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গ † এবং উপাস্য ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসমূহ বিবেচিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যসকল বিবেচিত হইয়াছে। চতুর্থে অব্যক্ত পদ ও অজা পদ সন্দিগ্ধ পদের বিচার করা হইয়াছে। ৫।

দ্বিতীয়াধ্যায়গতপাদার্থান্ বিভজতে—

দ্বিতীয়ে স্মৃতি-তর্কাভ্যামবিরোধোহন্যদুষ্টতা।
ভূতভোক্তৃ শ্রুতেলিঙ্গ শ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা॥ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাদার্থবিভাগ—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে (সাংখ্যযোগ কানাদ প্রভৃতি) স্মৃতির সহিত এবং তর্কের সহিত বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যাদি মতের দোষ দেখাইছেন। তৃতীয় পাদের পূর্ব্ব ভাগের দ্বারা পঞ্চ মহাভূত

---

* কেবল ব্রহ্মপরিচায়ক যে পদ তাহাই স্পষ্টলিঙ্গ যথা—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতি।

† ব্রহ্ম এবং জীববোধক যে পদ তাহা অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ যথা—মনোময়ত্বাদিতি।

শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। উত্তরভাগ দ্বারা জীববিষয়ক শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর শ্রুতির পর পর বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। ৬।

তৃতীয়াধ্যায়গতপদার্থান্ বিভজতে—

তৃতীয়ে বিরতিস্তত্ত্বং পদার্থপরিশোধনং।
গুণোপসংহৃতির্জ্ঞানবহিরঙ্গাদিসাধনং॥ ৭

তৃতীয়াধ্যায়ের পাদার্থ বিভাগ—

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচার করিয়া বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের পূর্ব্বভাগে 'ত্বং'পদার্থ (জীব) নিরূপণ, পরভাগে 'তৎ'পদার্থ (ব্রহ্ম) নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যার গুণের উপসংহার, এবং নির্গুণ ব্রহ্মেতে অপুনরুক্ত পদসমূহের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে নির্গুণ জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদি এবং অন্তরঙ্গ সাধন শমদমাদি নিরূপণ করা হইয়াছে। ৭

চতুর্থাধ্যায়গতপাদার্থান্ বিভজতে—

চতুর্থে জীবতো মুক্তিরুৎক্রান্তে গতিরুত্তরা।
ব্রহ্মপ্রাপ্তি-ব্রহ্মলোকাবিতি পাদার্থসংগ্রহঃ॥ ৮

চতুর্থাধ্যায়ের পাদার্থবিভাগ—

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবন্মুক্ত নিরূপণ। দ্বিতীয় পাদে মৃত ব্যক্তির উৎক্রমণপ্রকার নিরূপণ। তৃতীয় পাদে সগুণ ব্রহ্মবিদের মৃত্যুর পর যে উত্তরমার্গ দ্বারা (ব্রহ্মরন্ধ্র) উৎক্রমণ হয় তাহা নিরূপণ করা হইয়াছে। চতুর্থ পাদের প্রথম ভাগে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর বিদেহকৈবল্য বা পরামুক্তি বলা হইয়াছে। পরভাগে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপণ করা হইয়াছে। এইরূপে পাদার্থ সংগ্রহ করা হইল॥ ৮॥

সত্যেবং শাস্ত্রাধ্যায়পাদপ্রতিপাদ্যা অর্থাঃ—কিং তত ইত্যত আহ—

উহিত্বা সঙ্গতীস্তিস্রস্তথাবান্তরসঙ্গতিঃ।
উহেদাক্ষেপদৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাদিকাঃ॥ ৯

এইরূপে শাস্ত্র অধ্যায় এবং পাদ প্রতিপাদ্য অর্থ নিরূপণ হইলেও তাহা দ্বারা কি হইল তাহা দেখাইতেছেন—শাস্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি এবং পাদ-সঙ্গতি জানিলে আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি প্রভৃতি যে সকল অবান্তর অর্থাৎ তাহার মধ্যবর্ত্তি সঙ্গতি আছে তাহা অনায়াসে নিজেই বুঝিতে

পারা যায়। যথা—ঈক্ষত্যধিকরণে, "তদৈক্ষত" এই বাক্য কি সাংখ্যোক্ত প্রধানপর অথবা ব্রহ্মপর ইহাই বিচার্য্য। সেই বিচার ব্রহ্মবিষয়ক, অতএব ব্রহ্মবিচার শাস্ত্র-সঙ্গতি। এই বাক্যের ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্য অতএব সমন্বয়াধ্যায়-সঙ্গতি। চেতন ব্রহ্ম ভিন্ন অচেতন প্রধানের ঈক্ষণ (দর্শন) সম্ভব নাই, অতএব কেবল ব্রহ্ম-প্রতিপাদক স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ রূপ প্রথম পাদ-সঙ্গতি। এইরূপ সকল অধিকরণেই সঙ্গতি-ত্রয় জানিবে ॥ ৯ ॥

সেয়মবান্তরসঙ্গতিব্যুৎপন্নেনোহিতুং শক্যতে অতস্তাং ব্যুৎপাদয়তি—

পূর্ব্বন্যায়স্য সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে।
পূর্ব্বপক্ষস্য যুক্তিঞ্চ তত্রাক্ষেপাদি যোজয়েৎ ॥ ১০

এই সঙ্গতিত্রয়ের অন্তর্গত যেসকল অবান্তর সঙ্গতি আছে, তাহা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি স্বয়ং বুঝিতে পারেন, তথাপি মন্দমতিদিগের জন্য বিশেষভাবে দেখাইতেছি—

পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তযুক্তি এবং পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষযুক্তি দেখিয়া অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপাদি সঙ্গতির যোজনা করিবে, যথা—প্রথমাধিকরণে ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত ইহা সিদ্ধান্ত, যেহেতু তাহাতে সন্দেহ আছে এই যুক্তি, দ্বিতীয়াধিকরণে জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না এই পূর্ব্বপক্ষ, জন্মাদিজগতের ধর্ম্ম ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। অতএব তাহার লক্ষণ হইতে পারে না এই যুক্তি ব্রহ্ম-সন্দিগ্ধ, অতএব ব্রহ্মবিষয়ক বিচার করা উচিত তাহা বলিতে পার না, কারণ জগতের ধর্ম্ম জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, অতএব লক্ষণাভাবে ব্রহ্মের অভাব (অর্থাৎ ব্রহ্মই নাই) লক্ষণশূন্য বস্তুর সন্দেহও হয় না বিচারও হয় না, অর্থাৎ কিছুই হইতে পারে না, ইহাই আক্ষেপসঙ্গতি। দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিও এ স্থলেই আছে। যেরূপ ব্রহ্মসন্দিগ্ধ অতএব তাহা বিচারের বিষয়; সেইরূপ জন্মাদি জগতের ধর্ম্ম; অতএব তাহা ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, এই দৃষ্টান্ত, সঙ্গতি। ব্রহ্ম বিচারের বিষয় ইহাতে যেমন কারণ আছে (সন্দিগ্ধত্বরূপ কারণ) কিন্তু ব্রহ্মের লক্ষণ আছে ইহাতে তেমন কোন কারণ নাই, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। ইত্যাদি সঙ্গতি সকল অধিকরণেই এরূপে বুঝিতে হইবে ।১০।

সাংখ্য-বেদান্ততীর্থোপনামক—শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ক) সম্পাদকীয় কথা।

এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সদ্রূপ বা সত্তা এই দৃশ্য জগতে অতি স্থূল পদার্থ হইতে অতি সূক্ষ্ম বস্তুতে সতত বিদ্যমান আছে। অতএব সকল সময়েই তাঁহার সত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হয়, সমস্ত পবিত্র বস্তুতে কিংবা তীর্থাদিতে তদীয় বিভূতি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান বলিয়া সে সকল পদার্থে আর্য্যগণ তাঁহার উপসনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আরাধনা ব্যতীত কোন মানব ঐশী শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। যেরূপ ধেনুর শরীরে দুগ্ধ সতত বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা দোহন না করিয়া অপর কোন উপায়ে লাভ করা যায় না, সেইরূপ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকারও আরাধনা বা ধ্যান, অর্চ্চনা, ধারণা, সমাধি, স্তুতি-নতি ভিন্ন লাভ করিতে পারা যায় না। সন্ধ্যাবন্দনও দ্বিজাতি প্রভৃতির প্রধান আরাধনা, বিশেষতঃ যে সময়ে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন সংস্কার হয়, সে সময় হইতে তাঁহার দৈনন্দিন ত্রিসন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়। প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য,—না করিলে ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। দীর্ঘকাল গায়ত্রী-সন্ধ্যা-বর্জ্জিত হইলে ব্রাহ্মণের গুরুতর পাতিত্য জন্মে। ত্রিসন্ধ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ভ্রম প্রমাদ বা বিপদ্‌ বশতঃ কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকেন। আর্য্যজাতির বেদাদি-শাস্ত্র প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানব অনেক জন্ম সুদীর্ঘকাল কঠোর সংযম সহকারে গুরুর নিকট শাস্ত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে জ্ঞাত আছেন যে, ভারতীয় মহর্ষিগণ মনুষ্যত্বের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক চরম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া-ছিলেন। বাহ্য পার্থিব উন্নতি কতকটা মানবের সহজ চেষ্টাসাধ্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক সমুন্নতি সুকঠোরসংযম, ত্যাগ, শ্রীভগবৎ-আরাধনা ও তপস্যা লভ্য। আর্য্যগণ দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা, কঠোর সংযম, দুঃসাধ্য তপশ্চরণ দ্বারা আধ্যা-ত্মিক সমুন্নতি সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া, বহুসহস্র বৎসরের পরও নানাবিধ প্রাতিকূল্য আচরণে তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক ভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে

না। প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দন অনুষ্ঠিত হইলে, ভগবদ্ভাবের আবির্ভাব হয়। সংপূর্ব্বক ধ্যৈ ধাতুর উত্তর অঙপ্রত্যয় বা ড প্রত্যয় করিয়া সন্ধ্যাশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সন্ধিকালে উপাস্যদেবতা কিম্বা অনুষ্ঠেয় কার্য্যকে ব্যবহারতঃ সন্ধ্যা বলা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে একরূপ কালের পরম্ভাবী অন্যরূপ কালের আহ্বানে, দিনরাত্রির মধ্যবর্ত্তী যে কাল বা দিবার শেষ দণ্ডের সহিত, রাত্রির প্রথম দণ্ডাত্মককালই প্রাতঃকাল। সন্ধ্যার উপাস্যা পরমাদেবী, যথা পুরাণে "ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী"। শাস্ত্রে সন্ধ্যা, সাবিত্রী ও গায়ত্রীকে ত্রিলোকের, ত্রিগুণের, ত্রিবেদের, ত্রিকালের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কথিত হন। অনেকে বলেন, "তিনি ত্রিলোকাদির সর্ব্বসূক্ষ্ম সন্ধিতে দেবতারূপে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহাকে 'সন্ধিনী' দেবী বা সন্ধ্যা নামে অভিহিত করা হয়। স্মৃতিতে সন্ধ্যার লক্ষণ উক্ত আছে। "অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য-নক্ষত্রবর্জ্জিতঃ। সা সন্ধ্যা-সমখ্যাতা......।" "সূর্য্য ও নক্ষত্রবিহীন দিন এবং রাত্রির যে সন্ধি, তাহাই সন্ধ্যা নামে খ্যাত। ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্যত্র কথিত আছে,—

"ত্রয়াণাং চৈব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমঃ।
সন্ধিঃ সর্ব্বপুরাণাঞ্চ চতে সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥"

ব্রহ্মাদি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) তিন দেবের এবং অপর দেবতাগণের যে সমাগমের (সম্মিলনের) কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্যত্র উক্ত আছে যে,—

"যা সন্ধ্যা সৈব গায়ত্রী দ্বিধাভূতা ব্যবস্থিতা।
সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন হ্যুপাসিতা॥"

যেই সন্ধ্যা, সেই গায়ত্রী; উভয় এক হইয়াও দুইভাবে ব্যবস্থিত আছেন। যে ব্যক্তি সন্ধ্যোপাসনা করে, সে ভগবান্ বাসুদেবেরও উপাসনা করে।

ত্রিসন্ধ্যার কাল স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

"পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে স নক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সমসূর্য্যোঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি॥"

প্রাতে যখন আকাশে দুই একটী নক্ষত্র বিদ্যমান থাকে, তখন প্রাতঃসন্ধ্যার কাল; এবং সায়ংসময়ে যখন দুই একটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তখনই সায়ংসন্ধ্যার কাল। এবং যে সময়ে সূর্য্য সমরেখায় পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয় তখন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কাল। অপর কোন স্মৃতিতে কথিত আছে যে, "নক্ষত্রযুক্ত প্রাতঃকালে অর্থাৎ আকাশে দুই একটী নক্ষত্র থাকিতে, এবং দুই একটী নক্ষত্র উদিত হইলে

সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। উক্ত কালত্রয় প্রাতঃ এবং সায়ংসন্ধ্যার প্রশস্ত। সপ্তম মুহূর্ত্তের পর অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা প্রশস্ত। এইভাবে উত্তম মধ্যম অধম কালভেদে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে।" এই শ্রুত্যুক্ত সন্ধ্যা-শব্দার্থ তেজোময় সূর্য্য-মণ্ডলে সম্যক্‌স্ফুরিত চিৎশক্তিরূপ দেবতা, সেই দেবতার ধ্যান করিবে। মহর্ষি-গৌতম বলিয়াছেন,—

যা সন্ধ্যা সা জগৎসূতি র্মায়াতীতা হি নিষ্কলা,
ঈশ্বরী দেবতাশক্তিঃ তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা।
ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বুধঃ॥"

যেই সন্ধ্যা সেই জগৎজননী চিন্ময়ী, মায়াতীতা নিষ্কলা, ঈশ্বরী, দেবতা ও তত্ত্বত্রয়-সম্ভূতা—অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম এই ত্রিগুণ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিবেদ,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তিনে অভিব্যক্ত। সেই জগৎ-দেবতাকে অর্কমণ্ডলে অভিব্যক্ত আদিত্য শব্দবাচ্য পরব্রহ্মস্বরূপ চিৎশক্তি বা শ্রীভগবৎশক্তিই সন্ধ্যাদেবতা। 'সন্ধ্যা'পদের মুখ্যবৃত্তি দ্বারা এই চিৎশক্তিকে বুঝাইলেও, "সন্ধৌ ভবা সন্ধ্যা" ইতি ব্যুৎপত্তি দ্বারা উপাসনা-পরত্ব হইতে পারে। মহর্ষি ব্যাস বলেন,—

"উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাই সন্ধ্যাপদবাচ্য, সেই উপাসনা হেতু মনীষিগণ তাহাকে সন্ধ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মহর্ষি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে 'সন্ধ্যা' শব্দে সন্ধ্যোপাসনাকে বুঝায়, যথা—

"সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদ্‌গতে রবৌ।"

পূর্ব্বোক্ত 'সন্ধি' সময়েই সন্ধ্যোপাসনা করিবে, সূর্য্যের উদয় হইলে কিংবা অস্ত গমন করিলে, নয়। যদিও এইমতে 'সন্ধ্যা'শব্দে সন্ধ্যা-ক্রিয়াকে বুঝায়, তথাপি সেই, সন্ধ্যা-ক্রিয়া অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী চিচ্ছক্তিস্বরূপ দেবতার ধ্যান করতঃ আরাধনা করিবে। অপর কাহারও মতে সন্ধ্যা উপাস্য দেবতা হইলেও তদ্দ্বারা উপলক্ষিত যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া গ্রহণপূর্ব্বক পর্য্যবসিত যে সন্ধ্যাপদ তাহা ক্রিয়াপর জানিবে। বাস্তবিক তাহা নয়, "সন্ধিতে জাত সন্ধ্যা" এইরূপ বাক্যে সন্ধ্যা পদের সাক্ষাৎ ক্রিয়াপরত্ব সম্ভব হইলে, পরম্পরা সম্বন্ধে তাহার ঔচিত্য দেখা যায় না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মুখ্য কাল ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

"সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসিত আজ্যোতিষো দর্শনং সন্ধিঃ।" অদ্ধ অস্তমিত সূর্য্য দর্শন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র উদয় কাল পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই সন্ধি, এই সন্ধিকালে সায়ং সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র তীর্থ-শাস্ত্রী।

(খ)—সান্তরাম স্বামীর কথা।

আমি। 'সন্ধি' চৈতন্যের কথা যাহা বলিলেন তাহাতে তৎসম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা হয় না।

স্বামী। না হইবার ত' কথা। উহা যে ভগবানের শুদ্ধ, নিষ্কল, গুণাতীত অতীন্দ্রিয় ভাব। ঐ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলেন—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।"

উহা বিরজা। কেননা উহাতে ব্যক্তের বা ক্রিয়ার লেশ নাই। উহা অব্যক্ত, অথচ—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং।" 'ধারণা' না হইলেও প্রকৃত সন্ধ্যা করা হয় না। পরে দেখিবে যে, সন্ধ্যার ক্রমগুলিও ঐ ভাব ফুটাইবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশলে সন্নিবেসিত।

আমি। কথা ত' সহজ, কিন্তু বুঝিতে পারা যায় না কেন?

স্বামী। না পারিবার কারণ অনেক, তন্মধ্যে কতকগুলি তোমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছি।

প্রথম, সাধারণতঃ জীবের দৃষ্টি ও চৈতন্যের স্পন্দন-শক্তি বাহিরের দিকেই থাকে। *"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ" জীবের দৃষ্টি বাহিরের দিকে করিয়াই ব্রহ্মা* জীবকে সৃষ্টি করেন। সেই জন্য বাহিরের বস্তু, বাহিরের শক্তি, বাহিরের খেলা বুঝা যত সহজ, জীবের নিজক্ষেত্রে অভিব্যক্ত শক্তিগুলি বুঝা তত সহজ নহে। বিশেষ চেষ্টা করিলেও বাহিরের ভাব। বা সংস্কার থাকিয়া যায়। এই বাহিরের ভাবটীকে অন্তর্মুখী করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। তারপর আমাদের অহঙ্কারগত একটী প্রতিবন্ধক আছে। ভেদবিশেষ ও ছিন্ন অভিমানী অহং-জ্ঞানটী আপনার অনুরূপ ভাবেই দেখিতে ও বুঝিতে পারে। যেমন 'আমি' তেমনি তা'র দৃশ্য, শক্তি ও বোধ। বিশেষের দিকে দৃষ্টি থাকাতে, আমরা এমন কি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অবিশেষ সামান্য তত্ত্বগুলি (principles) বুঝিতে কষ্ট পাই, ঘন সমরূপী চৈতন্য ত' দূরের কথা। এইজন্য পাতঞ্জলে উক্ত হয় যে—'ক্ষিপ্ত' ও 'মূঢ়' এই দুই অবস্থায় যোগ সম্ভবে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধনা আরম্ভ হইতে পারে। এই বিক্ষিপ্ত চিত্তের ভাবটী ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক।

আমি। বিক্ষিপ্ত অর্থে ত' বিশেষরূপে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল?

স্বামী। না, সাধারণে ঐ রূপ ভুলই করে। বিক্ষেপে চিত্তের "উপসর্জ্জন" রূপ ক্রিয়া হয়। "উপসর্জ্জন" অর্থে এক সামান্য অর্দ্ধপরিস্ফুট উপাধি বা একত্ব জ্ঞানের উপর বৃত্তিগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় যখন প্রবাহিত হয় তাহাকে 'উপসর্জ্জন' বলে। সমুদ্র দর্শনে দৃষ্টি প্রধানতঃ তরঙ্গগুলির উপর থাকিলেও, উহার তলে একটী সামান্য সমুদ্রবুদ্ধি থাকে। ইহাই একত্বের প্রথম বিলাস। তোমার বন্ধু রামকে লইয়া তোমার একটী সামান্য একত্ব বুদ্ধি আছে। কিন্তু ঐ বুদ্ধির সহিত 'রাম'-চৈতন্যের উপসর্জ্জন বা তরঙ্গায়িত ভাবগুলির সহিত কোনও সম্বন্ধ নির্ণয় কর না। রাম আজ সংসারী ও সচ্চরিত্র, কাল যদি সে অসচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে তুমি ক্ষণিক বিস্মিত হও বটে; কিন্তু ঐ বিপরীত ভাবটী স্বীকার করিয়া লও। পরশ্ব সে যদি ধার্ম্মিক হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া যায়, তাহা হইলেও তোমার ঐ প্রকার বোধ হইবে। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ অপর তরঙ্গের সহিত বিভিন্ন হইলেও, তাহাতে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না, ও তরঙ্গগুলির মধ্যে যে কোন নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে যাই না। এইরূপ ভাবে আমরা সমস্ত জগৎ বস্তুর ভিতর এক সামান্য বস্তু-বুদ্ধি-রূপ একত্ব লইয়া থাকি। ইহাই পঞ্চশিখাচার্য্যের "একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্"। আমাদের একবুদ্ধি একটী খ্যাতি বা concept লইয়া খেলে। কিন্তু তাহাতেও তাহার বিশেষ তরঙ্গগুলিতে উপসর্জ্জিত হইয়া যাই।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং" রূপ তরঙ্গায়িতরূপ ভাব দেখিয়াও আমরা প্রত্যেকে আপন আপন অপরিস্ফুট অমরত্ব কল্পনা করি। "একাগ্র" অবস্থায় তরঙ্গায়িত বৃত্তিগুলি 'অগ্র' গুলি এক হইয়া আসে।

আমি। বৃত্তির আবার 'অগ্র' কি?

স্বামী। 'অগ্র' শব্দে প্রত্যেক বিশিষ্ট বৃত্তির ভিতর উর্দ্ধ বা পরা-গতি লক্ষ্য, প্রবৃত্তি, প্রবণতা, বা প্রকৃতি বুঝায়। ঐ গতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। রাম যে শূদ্রবংশে জন্মিয়াছে তাহারও একটা 'উৎ'+দিশ্য, বা উদ্দেশ্য বা লক্ষণা আছে। শূদ্রত্ব রূপ ভাবটী সেই পরা ভাবের দিকে যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। তাহার সন্তান হইল না; ইহাও এইরূপ এক উর্দ্ধ গতি উপরিস্থিত ভাবকে দেখায়। এই উর্দ্ধ গতি বা প্রবণতাকে 'অগ্র'তা বলে। সেই গতিগুলি যখন এক মহাভাবের দিকে প্রধাবিত হয়, তখনই একাগ্রতা আসে। একাগ্রতা অর্থে 'কসরৎ' করিয়া মনস্থির করা বুঝায় না। ভগবানের পরা-

ভাবের আকর্ষণের ব্যঞ্জনা হইলে, যোগিগণের হৃদয়ে এক অভিনব ব্যাপার সংসাধিত হয়। যমুনার জল আর শুধু জল রহিল না, কালিন্দীর নীলিমা তখন ভগবানের বর্ণের দিকে ধাবিত হইল। নবনীতের কোমলতা তখন শ্রীঅঙ্গের কোমলতায় মিশিয়া তাঁহারই দিকে প্রধাবিত হয়। এইরূপে প্রত্যেক বিশিষ্ট ভাবগুলির ভিতর এক অভিনব পরা গতির অভিব্যক্তি হইয়া, উহারা একের দিকে যাইতে লাগে, ইহাকে প্রত্যাহার বলে,—প্রতি+আহরণ। প্রত্যেক বস্তুর বিভিন্নতা, বৃত্তির পার্থক্যগুলি আর আপন আপন ভাবে বিশিষ্ট ছিন্ন বোধরাশি উৎপন্ন করিতে যাইল না। পরন্তু সবগুলি হইতে একেরই ভাষা ফুটিতে লাগিল। 'প্রতি' অর্থ অনেকগুলি ভাব আছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তু হইতে 'প্রতি' বা 'বিপরীত' ভাবে বা অবিশেষ পরা-ভাবে, 'প্রতি' বা পুনরায় আহরণকে 'প্রত্যাহার বলে। তামাকখোরদের ভাষায় ইহাকে বলে 'ঢেলে সাজা'। যে ভাবে যেরূপে জগতের জ্ঞান লইয়া তুমি এত দিন তৃপ্ত ছিলে, সেই ভিন্ন ভাব ত্যাগ করিয়া এক সমের ভাবে-বস্তু ভাবের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহারা যে একতার ব্যঞ্জন এই বিপরীত ভাবে—যখন তাদের সহিত রমণ করিতে পারিবে, তখনই এ ভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু জীবনে কোনও প্রকার মহাভাব না ফুটিলে, প্রত্যাহার বা প্রত্যাহরণ সিদ্ধ করা বড়ই কঠিন। ইহাই তৃতীয় তত্ত্ব।

আমি। এক কথার প্রত্যাহারের স্বরূপ কি? আর সন্ধ্যাতত্ত্বে তাহার কি প্রয়োজন আছে?

স্বামী। সেই কথা বুঝাইবার জন্যই এতগুলি কথা কহিলাম। পাতঞ্জলে আছে :—

"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥"

ইন্দ্রিয়গুলি যখন আর আপন আপন ছিন্ন বিষয়ের দিকে পরিসমাপ্ত না হইয়া, বা নিজ নিজ বিষয় দেখাইয়া, ক্ষান্ত না হইয়া চিত্তের স্বরূপের অনুকরণ করে,—অর্থাৎ চিত্ত যেমন সর্ব্বার্থ ও পরার্থ তদ্রূপ একদিকে 'সর্ব্ব'ভাবে একত্বের ইঙ্গিত করিয়া পর' বা পুরুষের দিকে ধাবিত হয়, তখন সেইপ্রকার আহরণকে 'প্রত্যাহার' কহে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য ছিন্ন বস্তুভাবে পরিসমাপ্ত হইতে চায়। রূপ-তত্ত্ব বলিতে গেলে তুমি অমনি রূপবান্ বা রূপবতীর কল্পনা করিয়া বস। ইহার নাম বিষয়ে সম্প্রয়োগ বা বিষয় ভাবে সম্পূর্ণ রূপে ও প্রকৃষ্টরূপে প্রয়োগ, ইহার বিপরীত ভাবকে অসম্প্রয়োগ বলে। ইহাই "দৃষ্টিস্থিরা, যস্য বিনাবলম্বনং" কথায় ইঙ্গিত করা হয়। বস্তু দেখিতে গেলাম; কিন্তু আর

বস্তু দেখা হইল না ; চিত্ত বস্তু ছাড়িয়া, অন্য কোথায় চলিয়াগেল। যেমন বুদ্ধদেবের রোগী ও মৃতদেহ দর্শনে, তাঁহার দৃষ্টি রোগ ও মৃত্যু ছাড়াইয়া, কেমনে অল্পে অল্পে, শাশ্বত পদের আভাস পাইয়া তৃপ্ত হইল। প্রত্যাহার বুঝাইয়া দেয় যে ইন্দ্রিয় বিষয় মাত্রেরই ভিতর দিয়া এক পরা ভাবের 'ইঙ্গিত' বা 'ইশারা' আছে, ও ঐ ভাবে ইঙ্গিতের ভাষায় বিশিষ্ট বিষয়গুলিকে দেখিতে হইবে। 'ইঙ্গিতটী কা'ব' ইহাই বুঝাইবার জন্য অগ্রে বলিয়াছি যে এই ব্যাপারে এক মহাভাবের আবশ্যকতা আছে। ঐ মহাভাবের বশেই আমরা বাহ্যিক বিশেষ ভাবগুলিকে অতিক্রম করিয়া ইঙ্গিতের ভাষায় বস্তু বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রত্যাহার ক্রিয়া আছে বলিয়াই, আমরা রামের মৃত্যু, শ্যামের মৃত্যু, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাব ও তাহাদের বিশেষ মৃত্যুরূপ পরিণাম এই দুইটী ভাবই ত্যাগ করিয়া ঐ ছিন্ন বিশেষগুলিকে এক অবিশেষ জ্ঞানে সংযোজিত করিয়া বলি—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা।"

(Newton) নিউটন সাহেব যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ঐ বোধে বিশিষ্ট 'আপেল্‌টী' বা অন্য কোন ও ঘর দুয়ার বাড়ী প্রভৃতি বিশেষ ভাবের চিহ্নও রহিল না।

প্রথমে এই আহরণ ক্রিয়া তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করিয়া খেলে। নিম্নতর তত্ত্বের খেলা হইলে, তারপর উর্দ্ধতন তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। যখন তত্ত্বের অন্তরতম প্রদেশে, সেই পর পুরুষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনি প্রকৃত পস্তাবে প্রত্যাহার সিদ্ধ হয়। একত্ব বুদ্ধির স্থাপনার নামই 'ধারণা' ; ইহার ফল কি বুঝিতে পারিলে ? প্রত্যাহার ও ধারণার কৌশল জীবের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তখন এক অভিনব দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে। ঐ দৃষ্টির ফলে বিশেষ ও ছিন্ন জ্ঞান ও বোধগুলি ঘন ও সমরসে মিশিয়া যায়, ও ভিতরে স্বতঃসিদ্ধ ঘনানন্দময় ভগবৎপদের বোধটীকে যেন ঘন করিয়া তাহার আকরতা সম্পাদন করে। দয়ার কার্য্য প্রথম করিলে হৃদয়ে সুখবোধ হয় ; দ্বিতীয় বারেও তা'ই হয়, কিন্তু বারে বারে অভিসন্ধিশূন্য হইয়া দয়ার আচরণ করিলে, ভিতরে দয়াময়ের ঘনানন্দময় ভাবের অঙ্কন ও স্থাপনা হয়। যে কৌশলে চিত্রকর আমাদের নিকট ছিন্ন ও বিশিষ্ট তুলিকাপাত (Touches) দ্বারা অভিনব একত্ব ভাবের ভাবটী ফুটাইয়া তুলেন, প্রত্যাহারের মূলে সেই কৌশলই বর্ত্তমান আছে।

সন্ধ্যার অনেকগুলি অঙ্গ আছে। যথা—আচমন 'আপোমার্জ্জন,' 'অঘমর্ষণ',

প্রভৃতি। যতক্ষণ তোমরা এই অঙ্গ বা স্তরগুলিকে ছিন্ন বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বলিয়া বুঝিবে, ততদিন যেন সন্ধ্যা করিতে যাইও না। আজকাল কয়েকজন লোক ঐ গুলিকে 'স্তর' বা ক্রম অভিব্যক্তির 'পাদ' বলিয়া বুঝিয়া, একইসূত্রে সবগুলিকে গ্রথিত করিয়া ক্ষুদ্র মহৎ জ্ঞানের মোহ ও অভিসন্ধি মহাভাববশে ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা করিতে পারেন? যদি পাদগুলির দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখ, তাহা হইলে একটী অপরটীতে মিশিতে পারিবে না; ইহা প্রথম বিপদ। তারপর প্রত্যেকটীকে ঐরূপে ভিন্ন করিয়া লইলে, তোমার জাগ্রত চৈতন্যের বাহিরে যাইতে পারিবে না; ইহা দ্বিতীয় বিপদ। তারপর যদি কোনও মহাভাবের বশে আকর্ষণে বা স্রোতে না পড়িতে পার, তাহা হইলে কোনও কৌশলে জাগ্রতবুদ্ধি ত্যাগ করিলেও প্রত্যেক পাদটী লইয়া স্বপ্ন-চৈতন্যের খেলা-হইবে। তুমি 'আপোমার্জ্জন' করিতে গিয়া পরবশভাবে খৃষ্টিয়ানদিগের জল দিয়া Baptism এর কথা মনে করিয়া ফেলিবে। এইরূপ প্রত্যেক পদের সহিত যে প্রাকৃতিক স্মৃতির সাহর্য্য (association) আছে, সেই স্রোতে পড়িয়া তোমার চিত্ত প্রধাবিত হইবে, তোমার সন্ধ্যা করা হইবে না। 'অতি জাগ্রত' হইয়া সন্ধ্যা করা যায় না; স্বপ্নশীল হইলেও হয় না। তা'ই বুঝি ভগবান্ গীতায় বলিলেন—

"ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥"

তবে যে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির হৃদয়ে 'অন্ত' দেখিবার—সর্ব্ব বিশিষ্ট পদার্থ যেখানে গিয়া শেষ হইয়া মিশিয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, যিনি আর বস্তু ক্রিয়া ও তত্ত্বগুলির শক্তি প্রভৃতি লইয়া আর খেলিতে চাহেন না, যিনি এই সব পদার্থকে শ্রীভগবানের পাদ-বিক্ষেপ বা পদচিহ্নরূপে বুঝিতে পারেন, যাঁহার হৃদয়ে ভগবানে আকর্ষণ ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে বলিয়া যিনি সেই পরম পদের জন্য প্রাণে প্রাণে লোলুপ হইয়াছেন, তাঁহার ঐ মহাভাব নিমেষ মাত্র বিশেষ ভেদ-বুদ্ধি, জ্ঞান ও স্মৃতি প্লাবিত করিয়া তাঁহার চিত্তকে "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে" করিয়া লইয়া যায়। পাছে এই মহাভাবটী হারাইয়া ফেলি বলিয়াই, উহা লইয়া সন্ধ্যার প্রারম্ভ। ইহাই আচমন মন্ত্রের রহস্য,—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং ॥" (ক্রমশঃ)

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

বুদ্ধিতস্থ চিদাভাসৌ স্বরূপো ব্যাপ্নুতো ঘটম্
তত্রাজ্ঞানং ধিয়ানশ্যেদাভাসেন ঘটস্ফুরেৎ ॥
আত্মন্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
ফলব্যাপ্তত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভি র্নিষিধ্যতে ॥" পঞ্চদশী

ইহাতে এই সিদ্ধ হইল সামান্য জ্ঞান অজ্ঞানের বাধক না হইয়া, বরঞ্চ সাধক বা প্রকাশক হইয়া থাকে। কিন্তু বৃত্ত্যারূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান এই অজ্ঞানরূপ মায়াকে সমূলে নাশ করে। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ; সুতরাং আবরণ নাশ হইলে স্বয়ং প্রকাশিত হন। মহাকবি কালিদাসও কুমারসম্ভব নামক গ্রন্থে এ বিষয়টী লিখিয়াছেন।

"আত্মানমাত্মনা বেৎসি, সৃজস্যাত্মনমাত্মনা।
আত্মনাকৃতিনা চ ত্বমাত্মনেব প্রলীযসে ॥" কুমারসম্ভব।

সুতরাং এই সিদ্ধ হইল কোন প্রমাণ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ কার্য্যকে প্রকাশকারী যে সামান্য অগ্নি তাহা কুঠারাদি লৌহে স্থিত হইলে সেই কাষ্ঠকে ছেদন করে, সেইরূপ এই আত্মা দেব সাক্ষীরূপে সেই মায়ার সাধক হইলেও, মহাবাক্য-জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তিতে স্থিত হইয়া সেই মায়ার বাধক হইয়া থাকেন। এই কারণেই বেদবেত্তা পুরুষ এই অনাদি মায়াকে নাশ করিবার জন্য এক মহাবাক্য-জন্য আত্মজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার রূপ উপায় কথন করিয়াছেন। সেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ আত্মজ্ঞান বিনা অবিদ্যা নাশের অন্য কোন উপাই নাই। শ্রুতি ভগবতী —কহিয়াছেন। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হি অয়নায়"। হে মৈত্রেয়ি। এই কারণে এই আত্মা দেব অদ্বিতীয়রূপ। এরূপ অদ্বিতীয় আত্মাতে মন স্থির করিবার যোগ্য যে দৃষ্টান্ত তাহা আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্র চিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

এক্ষণে প্রপঞ্চের স্থিতি-কালে আত্মার অদ্বিতীয়-রূপতা সিদ্ধ করিবার জন্য দৃষ্টান্ত করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! ইহা লোকে তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক এই

তিন প্রকার পদার্থ বিদ্যমান আছে। সেই সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব স্থিতি কালে এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকার অর্থে তোমার সম্যক্ ভাবনা করাইবার জন্য আমি যাজ্ঞবল্ক্য ভেরী, শঙ্খ, বীণা এই তিন দৃষ্টান্ত কথন করিতেছি। তুমি সাবধান-চিত্তে শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহলোক প্রসিদ্ধ যে ভেরী শঙ্খ বীণা এই তিন প্রকার বাদিত্র আছে সেই ভেরী আদি তিন প্রকার বাদিত্র দণ্ড এবং মুখের বায়ু আদি নিমিত্ত বশতঃ, ক্রূর মধ্যম এবং মুঞ্জল এই তিন প্রকার শব্দ নির্গত করে। সেখানে বীররস-প্রকাশক যে ভেরী আদির শব্দ তাহার নাম ক্রূর শব্দ। আর ভয়ানকরস-প্রকাশক যে ভেরী আদির শব্দ তাহার নাম মধ্যম শব্দ। আর শৃঙ্গাররস-প্রকাশক যে ভেরী আদির শব্দ তাহার নাম মধ্যম মুঞ্জল শব্দ। এই তিন প্রকার শব্দ ও উচ্চ নীচ ভেদ প্রযুক্ত অনেক প্রকার। হে মৈত্রেয়ি! ভেরী শঙ্খ বীণা এই তিন বিশেষ শব্দ ক্রমশঃ ভেরী-শব্দত্ব, শঙ্খ-শব্দত্ব, বীণা-শব্দত্ব, এত তিন ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়াতে তিন প্রকার। সেখানে ভেরী-শব্দত্ব শঙ্খ-শব্দত্ব বীণা শব্দত্ব এই তিন ধর্ম্ম যদ্যপি ক্রমশঃ ক্রূরভেরী-শব্দত্ব, মধ্যম-ভেরীশব্দত্ব, মুঞ্জল-ভেরী শব্দত্ব; ক্রূর-শঙ্খশব্দত্ব, মধ্যম শঙ্খ-শব্দত্ব মুঞ্জল-শঙ্খশব্দত্ব, ক্রূর-বীণাশব্দত্ব, মধ্যম-বীণাশব্দত্ব, মুঞ্জল-বীণাশব্দত্ব, মুঞ্জল বীণা শব্দত্ব এই সমস্ত ধর্ম্মের অপেক্ষায় সামান্য ধর্ম্ম; তথাপি সকল শব্দের মধ্যে বর্ত্তমান যে শব্দত্ব রূপ সামান্য ধর্ম্ম, সেই শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের অপেক্ষায় ভেরী-শব্দত্ব শঙ্খ-শব্দত্ব বীণা-শব্দত্ব এই তিন বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই ভেরী-শব্দত্বাদি তিন বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানশব্দত্ব রূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান বিনা হইতে পারে না। কিন্তু এই জীবের যখন প্রথমে শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হইবে, তাহার পরই ভেরী-শব্দত্ব শঙ্খ-শব্দত্ব বীণা-শব্দত্ব এই তিন বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হইবে। এখানে অধিক স্থানে (দেশে) যে ধর্ম্ম থাকে তাহার নাম সামান্য ধর্ম্ম, আর অল্প দেশে যে ধর্ম্ম থাকে তাহার নাম বিশেষ ধর্ম্ম। সেখানে, ভেরী-শব্দ শঙ্খ-শব্দ বীণা-শব্দ এই তিন প্রকার শব্দে শব্দত্ব ধর্ম্ম আছে। কিন্তু ভেরী-শব্দত্বরূপ ধর্ম্ম কেবল ভেরী শব্দে আছে; শঙ্খ বা বীণা শব্দে নাই; এবং শঙ্খ শব্দত্বরূপ ধর্ম্মও কেবল শঙ্খ শব্দেই আছে, ভেরী বা বীণা শব্দে নাই; এবং বীণা-শব্দত্বরূপ ধর্ম্মও কেবল বীণা শব্দে আছে, ভেরী বা শঙ্খ শব্দে নাই। সুতরাং শব্দত্ব রূপ সামান্য ধর্ম্মের দেশ অপেক্ষায় ভেরী-শব্দত্ব, শঙ্খ-শব্দত্ব, বীণা-শব্দত্ব এই তিন ধর্ম্ম ন্যূন দেশে থাকে। এই কারণে এই তিন ধর্ম্ম শব্দত্ব রূপ সামান্য

ধর্ম্মের অপেক্ষায় বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে। এই প্রকার ক্রূর ভেরী শব্দ, মধ্যম ভেরী শব্দ, মুঞ্জল ভেরী শব্দ এই তিন শব্দে ভেরী শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম অনুগত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রূর ভেরী শব্দরূপ ধর্ম্ম কেবল ক্রূর ভেরী শব্দে আছে। মধ্যম বা মুঞ্জল ভেরী শব্দে নাই। এবং মধ্যম ভেরী শব্দত্বরূপ ধর্ম্মও কেবল মধ্যম ভেরী শব্দে আছে, ক্রূর বা মধ্যম ভেরী শব্দে থাকে না। সুতরাং ভেরী শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের অধিকরণ অপেক্ষায় ক্রূর ভেরী শব্দত্ব, মধ্যম ভেরী শব্দত্ব, মুঞ্জল ভেরী শব্দত্ব এই তিন ধর্ম্ম ন্যূন দেশে বিদ্যমান থাকে। এই কারণে ভেরী শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের অপেক্ষায় ক্রূর ভেরী শব্দত্বাদি তিন ধর্ম্ম বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে। এই প্রকার শঙ্খ শব্দে ও বীণা শব্দে জানিবে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, যেরূপ শব্দত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান বিনা ভেরী শব্দত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না। সেইরূপ এই স্বয়ং-জ্যোতি আত্মার অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান বিনা ইহলোকে কোন বিশেষ পদার্থের জ্ঞান হইবে না। কিন্তু অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞানের পর এই জীবের ঘটাদি বিশেষ পদার্থের জ্ঞান হইবে। এক্ষণে অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপ আত্মা বিষয়ে সামান্য রূপতা স্পষ্ট নিরূপণ করিবার জন্য প্রথমে সর্ব্বত্র আত্মার অনুগত-ভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে যে পদার্থ প্রত্যক্ষরূপে গ্রহণ করা যায় এবং যে পদার্থ পরোক্ষরূপে গ্রহণ করা এবং যে পদার্থ সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় এবং যে পদার্থ অসত্যরূপে গ্রহণ করা যায় যায় এবং যে পদার্থ 'অহং'-রূপে গ্রহণ হয় এবং যে পদার্থ 'মম'-রূপে গ্রহণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থ চেতন আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই সমস্ত পদার্থ চেতন আত্মারূপই। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ রজ্জু রূপ অধিষ্ঠানে যে সর্প, দণ্ড, মালা, জল-ধারাদি পদার্থ প্রতীত হয় ও সেই কল্পিত সর্পাদি রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানই অজ্ঞানবশতঃ সর্প দণ্ডমালা জলধারা আদি নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে যে আকাশাদি প্রপঞ্চ প্রতীত হয় সেই প্রপঞ্চ সেই অধিষ্ঠান আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই অধিষ্ঠান আত্মাই অজ্ঞানবশতঃ আকাশাদি জগৎ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ সামান্য ধর্ম্মের অপেক্ষায় সেই আকাশাদি পদার্থ আত্মার বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে। সেই বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান দ্বারাই হইবে। হে মৈত্রেয়ি! সেই চেতন আত্মার বিশেষ-রূপ যদ্যপি অনেক প্রকার, তথাপি সংক্ষেপে সেই আত্মার বিশেষরূপ দুই প্রকার।

একতো 'যুষ্মদ্' শব্দের অর্থরূপ আর দ্বিতীয় 'অস্মদ্' শব্দের অর্থরূপ। সেখানে 'ইদং এতদ্' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে পদার্থ কথন করা যায় সেই পদার্থ যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ হইয়া থাকে; আর 'অহং মম অনিদং' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে পদার্থের কথন হইয়া থাকে, সেই পদার্থ অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপ হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়ি! অন্তঃকরণাদি-সংঘাত বিশিষ্ট চেতন অস্মদ্ শব্দের বাচ্যার্থ। আর বাহ্য ঘটাদি পদার্থ-বিশিষ্ট চেতন যুষ্মদ্ শব্দের বাচ্যার্থ। তথায় যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের বাচ্যার্থের যদ্যপি পরস্পর ভেদ আছে, তথাপি সেই দুই শব্দের ভাগ ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা প্রতীত যে চেতনমাত্ররূপ লক্ষার্থ, সেই চেতনমাত্ররূপ লক্ষার্থ সেই দুই শব্দের মধ্যে একই। সুতরাং যে অর্থকে যুষ্মদ্ শব্দ কথন করে, সেই অর্থকে অস্মদ্ শব্দ কথন করিয়া থাকে। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য প্রথমে যুষ্মদ্ শব্দের অর্থে অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপ যে অন্তর আত্মা, তাঁহা হইতে ভিন্ন যত কিছু বাহ্য শব্দাদি জড় পদার্থ এবং পুরুষাদি চেতন পদার্থ, তাহারা সমস্ত জড় চেতন পদার্থ যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ। পরন্তু সেই শব্দাদি জড় পদার্থ যখন চেতন পুরুষের রাগাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শব্দাদি জড় পদার্থ নানাপ্রকার শব্দ করাতে চেতন ব্যবহারের যোগ্য হইতেছে। এবং চেতন পুরুষের শরীরের সহিত তাদাত্ম্য অভিমান প্রাপ্ত হইয়া সেই শব্দাদি অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপ আপনার আত্মাকে, যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ বাহ্য পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে জ্ঞান করে। এইরূপে যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ প্রসিদ্ধ, যে পুরুষাদি চেতন পদার্থ তাহারাও অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপ আপনার আত্মাকে, যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ অন্য পদার্থ হইতে ভিন্নরূপে জ্ঞান করে। সুতরাং যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপ যে শব্দাদি জড় পদার্থ এবং পুরুষাদি চেতন পদার্থ তাহারাও অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপ হইতে পারে। শঙ্কা।—হে ভগবন্। শব্দাদি জড় পদার্থের চেতন পুরুষের সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে এরূপ কোন পদার্থ নাই যে পদার্থকে চেতন পুরুষ আপনার আত্মারূপে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এই সমস্ত জড় পদার্থকে চেতন পুরুষ আপনার আত্মারূপেই গ্রহণ করেন। সেখানে সকল পদার্থের মূল কারণ যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যাকে সেই পরমাত্মা-দেব আপনার শরীররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর সেই অবিদ্যার কার্য্য গত সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, সেই সমষ্টি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চকে এই হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ আপনার শরীররূপে গ্রহণ করেন। আর সেই অবিদ্যার কার্য্য-রূপ যত স্থূল

প্রপঞ্চ, সেই সমষ্টি স্থূল প্রপঞ্চকে এই বিরাট্ ভগবান্ আপনার শরীররূপে গ্রহণ করেন। আর ব্যষ্টিরূপে প্রসিদ্ধ যে জড় পদার্থ সেই জড় পদার্থকে এই অনেক মনুষ্যাদি চেতন পুরুষ আপনার শরীররূপে গ্রহণ করেন। এই প্রকারে সমস্ত জড় পদার্থ চেতনের আশ্রিত। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে ইহলোকে নিয়মপূর্ব্বক কোন পদার্থে যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা নাই, এবং নিয়মপূর্ব্বক কোন পদার্থে অস্মদ্ শব্দেরও অর্থরূপতা নাই। কিন্তু এক অন্যের অপেক্ষায়, এই জড় চেতন পদার্থ বিষয়ে যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা আছে। যে পদার্থকে এই পুরুষ আপনার আত্মারূপে জ্ঞান করে, সে পদার্থে অস্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা আছে। আর যে পদার্থকে এই পুরুষ আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন-রূপে জ্ঞান করে সেই পদার্থে যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা আছে। যেরূপ দেবদত্ত নামক পুরুষের অপেক্ষায় যজ্ঞদত্ত নামক পুরুষ বিষয়ে যুষ্মদ শব্দের অর্থরূপতা আছে। আর যজ্ঞদত্ত নামক পুরুষের অপেক্ষায় দেবদত্ত নামক পুরুষের যুষ্মদ্ শব্দের অর্থরূপতা আছে। হে মৈত্রেয়ি! মন-বাণীর অবিষয় রূপ যে এই আনন্দস্বরূপ আত্মা, সেই আত্মা-দেব আপনার অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে সমস্ত অনাত্ম পদার্থের অধিষ্ঠান রূপ। এই কারণে এই আত্মাদেব কোন শব্দের বাচ্যার্থ নহে। কিন্তু সেই আত্মাদেব সেই যুষ্মদ্ অস্মদাদি সর্ব্ব শব্দের লক্ষ্য অর্থরূপ। সুতরাং চেতন আত্মারূপ লক্ষ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দ একই অর্থ বোধন বা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ যুষ্মদ্ অস্মদ্ এই দুই শব্দের ভাগ ত্যাগ লক্ষণা-দ্বারা যখন এক চেতন আত্মারূপ অর্থ সিদ্ধ হইল তখন সেই যুষ্মদ্ অস্মদ্ শব্দের অর্থের ব্যাপ্যরূপ যে অর্থ সেই অর্থ প্রকাশকারী যে ইদমাদি-শব্দ, সেই ইদমাদি শব্দেরও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা এক চেতন আত্মাই অর্থসিদ্ধ হইবে। সেই চেতন আত্মা কিরূপ? তিনি আপনার অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে সর্ব্বপদার্থে স্ফুরণ হন। এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিরও সেই আত্মাদের জ্যোতিরূপ। এরূপ আনন্দস্বরূপ আত্মা বিষয়ে এই আকাশাদি বিশেষ পদার্থ অজ্ঞানী জীব আরোপ করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়ি! ইহা বলাতে এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, যেরূপ শব্দস্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের জ্ঞান হইবার পর ভেরী-শব্দত্ব, শঙ্খ-শব্দত্ব, বীণা-শব্দত্ব, ইত্যাদি বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় সেইরূপ অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ আত্মার স্ফুরণ হইবার পরেই এই জীবের অহং ত্বং প্রভৃতি বিশেষ ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। আনন্দস্বরূপ আত্মার স্ফুরণ বিনা ইহলোকে কোনও ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং আপনার স্থিতিকালে এই সম্পূর্ণ জড়চেতন-রূপ জগৎ অদ্বিতীয়

আত্মারূপই। হে মৈত্রেয়ি! এই অদ্বিতীয় আত্মা আমি পূর্ব্বে প্রিয়তমরূপে তোমাকে বলিয়াছিলাম। এই পর্য্যন্ত জগতের স্থিতিকালে আত্মার অদ্বিতীয়রূপতা সিদ্ধ করা গেল। এক্ষণে জগতের উৎপত্তিকালের পূর্ব্বেও আত্মার অদ্বিতীয় রূপতা সিদ্ধ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ জগতের স্থিতিকালে এই আনন্দস্বরূপ আত্মা সর্ব্বভেদরহিত অদ্বিতীয় রূপ, সেইরূপ জগতের উৎপত্তিকালেও এই আনন্দস্বরূপ আত্মা সর্ব্বভেদরহিত অদ্বিতীয় রূপই। এই অর্থ বিষয় তুমি দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গাদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বভেদ-রহিত যে প্রজ্বলিত অগ্নি, সেই প্রজ্বলিত অগ্নি হইতেই সেই অগ্নির ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট বিস্ফুলিঙ্গ এবং অঙ্গাররূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়; সেইরূপ প্রপঞ্চরূপ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্ব্বভেদরহিত যে অদ্বিতীয় আত্মা আছেন, সেই সেই আত্মা হইতে এই জড় চেতনরূপ সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়ি। সেই পরমাত্মাদেব হইতে হিরণ্যগর্ভ দ্বারা যে প্রকারে এই স্থূল জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অনেক শ্রুতিস্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি;—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"; অর্থ,—সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মাদেব জগতের উৎপত্তিকালে সূর্য্য চন্দ্রমা প্রভৃতি সমস্ত জগৎকে পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় রচনা করিয়াছিলেন। স্মৃতি;—'তেষাং চ নাম রূপাণি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্মমে স মহেশ্বরঃ।' অর্থ;—জগতের উৎপত্তিকালে সেই পরমাত্মাদেব আকাশাদি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকে বেদের শব্দ হইতে উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য্য এই যে "ভূ" এই বেদের শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই পরমাত্মাদেব পৃথিবীকে উৎপন্ন করিলেন। এবং "আকাশ" এই বেদের শব্দ উচ্চারণ করিয়া সেই পরমাত্মাদেব আকাশকে উৎপন্ন করিলেন। এই প্রকার সমস্ত জগৎকে উৎপন্ন করিলেন। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার অনেক শ্রুতি স্মৃতির বচন হইতে এই আকাশাদি জগতের উৎপত্তি তুমি আপনিই জানিবে। সুতরাং এস্থলে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। পরন্তু ঋগ্বেদাদি শব্দ প্রপঞ্চের উৎপত্তি তুমি আপনি জানিতে পারিবে না। সুতরাং ঋগ্বেদাদি রূপ শব্দপ্রপঞ্চের উৎপত্তি যে প্রকারে আত্মাদেব হইতে হইয়াছে, সেই প্রকারকে তুমি শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়ি। যেরূপ ইহলোকে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা এবং আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা যুক্ত যে প্রজ্বলিত অগ্নি, সেই অগ্নি হইতে বিলক্ষণ (স্বতন্ত্র) ধূমের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা দেব হইতে এই বিলক্ষণ শব্দ রূপ বেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শঙ্কা;—হে ভগবন্! ঋগাদি

বেদকে যদি ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি অঙ্গীকার করা যায় তবে সেই বেদরূপ শব্দ লৌকিক শব্দের ন্যায় পৌরুষেয় শব্দ হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে তো বেদরূপ শব্দকে অপৌরুষেয় কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেই শাস্ত্রের বিরোধ ঘটিবে। সমাধান ; – হে মৈত্রেয়ি ! যে শব্দ উচ্চারিত হইবার পর, সেই শব্দের অর্থ নিশ্চয় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অপেক্ষা থাকে সেই শব্দ সেই অর্থ বিচারপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। অর্থ বিচার বিনা সেই শব্দ উৎপন্ন হইবে না। যেরূপ ইদানীন্তন কালের লোকের শব্দ অর্থ-বিচারপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বেদরূপ শব্দ যে পরমাত্মাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অর্থ-বিচার-পূর্ব্বক উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু যেরূপ যত্ন বিনাই এই পুরুষ হইতে শ্বাস প্রশ্বাস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কোন প্রযত্ন বিনা সেই পরমাত্মাকে দেব হইতে সেই বেদরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়। শ্রুতি ;—"তস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতঃ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ব্বাঙ্গীরসঃ"। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে, পুরুষ দ্বারা উচ্চারিত যে বচন, সেই বচনের নাম পৌরুষেয় বচন। কিন্তু এই পুরুষ আপনার মনে অর্থ-বিচার করিয়া যে বচন উচ্চারণ করে, তাহার নাম পৌরুষেয় বচন। এরূপ পৌরুষেয়পণা বেদের বচন নহে। এই কারণে সেই বেদ অপৌরুষেয়। শঙ্কা ;—হে ভগবন্! অর্থ বিচার বিনা পুরুষ যে সমস্ত বচন উচ্চারণ করে সেই সমস্ত বচন যদি কখন অপৌরুষেয় বলিয়া গণ্য হয়, তবে ইদানীন্তন কালে লৌকীক পুরুষ অর্থ বিচার বিনা যে সকল বাক্য উচ্চারণ করে তাহাও বেদ-বচনের ন্যায় অপৌরুষেয় হওয়া উচিত। সমাধান ;—হে মৈত্রেয়ি ! এই জীব ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত। সুতরাং এই জীব অর্থবিচার বিনা যে যে বাক্য উচ্চারণ করিবে, সেই বাক্য উন্মত্ত পুরুষের ন্যায় আপনার অর্থ হইতে ব্যভি-চারীই হইবে। এখানে যে বচনের অর্থের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বাধ হইবে, সেই বচন আপনার অর্থ হইতে ব্যভিচারী হইবে। যেরূপ কোন লোক 'অগ্নি শীতল' এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে ; সেই বচনের অর্থ রূপ যে অগ্নি বিষয়ে শীতলতা থাকে তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বাধিত , সুতরাং অগ্নি শীতল এই বচন আপনার অর্থ হইতে ব্যভিচারী। হে মৈত্রেয়ি ! এই মনুষ্য-লোকের কথা ত দূরে থাক, যদি কখন এই জীব ব্রহ্মলোকে থাকিয়াও অর্থ বিচার বিনাই কোন বাক্য উচ্চারণ করে সেই তাহার বাক্য ও উন্মত্ত পৌরুষেয় বাক্যের ন্যায় আপনার অর্থ হইতে ব্যভিচারীই হইবে। পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাদেব ভ্রম-প্রমাদাদি দোষরহিত। সুতরাং সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অর্থ বিচার বিনা যে বেদ-

বচন উচ্চারণ করিয়াছেন সেই বেদবচন আপনার অর্থ হইতে ব্যভিচারী হইবে না। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে বেদবচনের আপনার অর্থ সিদ্ধির জন্য কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এবং বেদবচনের আপনার অর্থ হইতে ব্যভিচার হইবে না। সুতরাং বেদবচন প্রত্যক্ষাদি সর্ব্বপ্রমাণের মধ্যে রাজা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

সাধনায় বিঘ্ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ন্যাসী আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি সন্ন্যাসীর এই অমানুষী ক্ষমতা দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল, কেহ কেহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি নানাবিধ উপদেশে কদাপি বা ভয় প্রদর্শনে একজন ব্যতীত সকলকেই প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। একজন তরুণ যুবক কোন প্রকারেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আমার সঙ্গী হইতে হইলে, তোমাকে বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তুত আছ?" যুবক স্থিরসংকল্প। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বনিবৃত্ত কতিপয় ব্যক্তিও সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের জন্য যে কোন পরীক্ষা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বেশ, আমার সঙ্গে আইস।" কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই পথি পার্শ্বস্থ একটী কর্ম্মকারের আলয়ের সম্মুখে উপনীত হইলেন। প্রবল বায়ু স্রোতঃসন্ধুক্ষিত তীব্র অনলে লৌহদণ্ড সন্তাপিত হইতে ছিল। সহসা সন্ন্যাসী সেই অনলস্রাবী লৌহদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা প্রদানেচ্ছুগণকে বলিলেন, "আইস, ইহা হস্তে ধারণ কর।" সেই শ্বেতাভ রক্তবর্ণ লৌহখণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপ বহুদূর হইতেই অনুভূত হইতে ছিল। কেহই এ পরীক্ষা প্রদানে অগ্রসর হইল না; কেবল সেই যুবক অম্লান বদনে হস্তদ্বয় বিস্তার করিল। সন্ন্যাসী উজ্জ্বল প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ

যুবককে যেন অভিষিক্ত করিয়া তাহার হস্তে সেই কালানলস্রাবী লৌহদণ্ড অর্পণ করিলে ভয়ে বিস্ময়ে দর্শকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু যুবক স্থির, ধীর, নিরুদ্বেগ; সন্ন্যাসীর আদেশে সেই লৌহদণ্ড লইয়া পুনরায় উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" বলা বাহুল্য, যুবকের হস্তে কোন প্রকার যন্ত্রণা অনুভূত হয় নাই। এই আপাততঃ অসম্ভব ব্যাপার অনেকের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রবিশ্বাসী আর্য্যসন্তান কি জানেন না?—

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং তপঃ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা অগ্রে ধাবতি ধাবতি॥"

এই অদ্ভুতকর্ম্মা যুবককে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে যুবক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দ নামে অভিহিত হইলেন। অনেকের মতে এই 'পূর্ণানন্দই' উত্তরকালে বিখ্যাত তান্ত্রিক গ্রন্থ "শ্যামারহস্য" প্রণয়ন করেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

রজনী আসন্ন প্রভাতা। মণিকর্ণিকার মহা শ্মশানে একটী বৃদ্ধা মৃত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া করুণ সুরে বিলাপে দিগন্ত আকুলিত করিতেছে। বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র অন্তিমের অবলম্বন আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। এক তরুণ বয়স্ক যোগী জাহ্নবী-নীরে অবগাহন করিয়া উঠিলেন; বৃদ্ধার করুণ ক্রন্দনে তাঁহার কোমল হৃদয় আকৃষ্ট হইল। বৃদ্ধার শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন? এবং যোগের অমানুষী শক্তির প্রভাবে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সেই মৃত শরীরে প্রাণের পুনঃ সঞ্চার করিলেন। এ ব্যাপার তাঁহার গুরুর অগোচর রহিল না, তিনি শিষ্যের এবম্বিধ আচরণে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং শিষ্য সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাকে দূর হইতে আদেশ করিলেন। শিষ্য গুরুর পাদপদ্ম ধারণপূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন—কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। এই গুরু শিষ্য আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দ।

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গিনীদ্বয় প্রিয় শিষ্য পূর্ণানন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বামীর পদ সেবাকালে পূর্ণানন্দের কৃতকার্য্যের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। ব্রহ্মানন্দ পুনঃ পুনঃ অস্বীকৃত হইলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া সঙ্গিনীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"তোমরা দূর হও।" নিমেষ মধ্যে যুবতীদ্বয় অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মানন্দের অধঃপতন আরম্ভ হইল; রোষে, ক্ষোভে, উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ সংক্ষুব্ধ ও কলুষিত হইয়া উঠিল। তাঁহার তপস্যা, সাধনা, ঈশ্বর চিন্তা একে একে তিরোহিত হইল, অচিরে আত্মবোধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

বারাণসীর অনতিদূরে একটি কৃষকপল্লীর একখানি জীর্ণ কুটীর মধ্যে একখণ্ড ছিন্নমলিন কন্থার উপর জনৈক রোগক্লিষ্ট প্রৌঢ় ব্যক্তি যন্ত্রণায় লুণ্ঠিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যের রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া 'আহা' বলিবারও কেহই নাই। এই ব্যক্তি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন স্ত্রীলোকের সহিত এই পল্লীতে আসিয়া, কায়িক পরিশ্রমে নির্ভর করত এই কুটীরে বাস করিতেছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে রমণীর মৃত্যু হইয়াছে, পুরুষ রোগ-শয্যায় শায়িত। পাঠক কি অনুমান করিতে পারেন যে এই দুর্ভাগ্যই আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত সাধকপ্রবর ব্রহ্মানন্দ স্বামী? তিনি সমুচ্চ সাধন-সোপান হইতে অধঃপতিত হইয়া এই দশায় উপনীত হইয়াছেন। হায়, কি শোচনীয় অধঃপতন।

যৎকালে এই পদস্খলিত সাধকপ্রবর এই শোচনীয় অবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সেই উপেক্ষিত শিষ্য মহাযোগী পূর্ণানন্দ গুটিকা আরোহণে * শূন্যমার্গ অতিক্রম করিতে ছিলেন, তিনি সেই কুটীরের ঊর্দ্ধভাগে উপনীত হইলে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যোগনেত্রে সমস্ত অবলোকন করিলেন, এবং ভূতলে অবতরণ করত একটী বিল্বপত্রে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র লিখিয়া গুরুর হস্তে প্রদান করত অন্তর্হিত হইলেন। সহসা যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহস্পর্শে ব্রহ্মানন্দের জড়বৎ শরীরে অলৌকিক চৈতন্যের আবির্ভাব হইল; পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহসা তাঁহার অন্তরে উদ্ভাবিত হইয়া উঠিল। উদ্‌ভ্রান্ত সাধক পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া আবার শান্তিমার্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার নব জীবনে নূতন সৌন্দর্য্য, অভিনব আলোক উদিত হইল, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন।

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

---

* তান্ত্রিকগণের অবলম্বিত শূন্যমার্গে পরিভ্রমণের উপায়বিশেষ। বিস্তৃত বিবরণ তন্ত্রগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।—লেখক।

শিখিধ্বজ ও চূড়ালা।

(যোগবাশিষ্ঠ অবলম্বনে)

একমাত্র পুত্র-বিয়োগে রাজা শিখিধ্বজকে বড়ই কাতর দেখিয়া, পত্নী চূড়ালার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। রাজার আর রাজ্যে মন নাই, সতী চূড়ালার সাহচর্য্যে আর সুখ নাই, রাজশ্রীর সেবায় আর তৃপ্তি নাই। উৎকট বৈরাগ্য ব্রতই তখন রাজার অবলম্বন। রাজ-ভোগ তখন অগ্নি-শিখার মত দাহকর, ধনরত্ন বিষ্ঠার মত হেয়, প্রজাপালন তিক্ত ঔষধের মত অপ্রীতিকর। চূড়ালার অনিন্দ্যরূপ, অনবদ্য যৌবন, মুক্তাচ্ছায়া তরল লাবণ্য স্বামি-সেবায় আর লাগিল না। সতী মনে প্রমাদ গণিল। স্বামী যৌবনে অতুল বিভব বিষোপম মনে করিয়া বনে বনে ভ্রমণই জীবনের ব্রত করিতেছেন, শুনিয়া সাধ্বী পতিকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহা বৃথাই হইল। শোকতপ্ত অন্তঃকরণে সান্ত্বনায় কোন ফল ফলিল না।

রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালাকে পার্শ্বে বসাইয়া প্রীতিস্নিগ্ধস্বরে কহিলেন—"চূড়ালে, অনেক দিন ত রাজ্যভোগ করিলাম, যাহা ভোগ্য বস্তু বলিয়া সকলে জানে, তাহার সকলগুলিই ত' ভোগ করিলাম। কিন্তু আর তাহাতে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, অরুচি হইয়াছে। আর কেন! এ সংসারে এখন আর কোন সুখ নাই, তখন আর কেন এ কারাগৃহে বদ্ধ থাকিব। ইচ্ছা, বনে বনে ভ্রমণ করিব; প্রকৃতির উদ্যানে অকৃত্রিম রমণীয়তায় মুগ্ধ হইব। সেখানে প্রজা পালনের দায়িত্ব নাই, বিচারে কঠোরতা নাই, যুদ্ধে নরহত্যা নাই। এ অগ্নিবেষ্টিত গৃহ ছাড়িতে পারিলে যেন বাচিয়া যাই, শান্তস্নিগ্ধ নিরুপদ্রব তপোবনে বাস করিতে পারিলে বোধ হয় স্বস্তি পাই। একদিন তোমার রূপে চন্দ্রের কমনীয়তা, তোমার অঙ্গে মাধবীর লাস্যলীলা, তোমার প্রেমে অমৃতের আস্বাদ পাইতাম। তোমার পানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু আমার বিস্মৃত-নিমেষ হইত। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। শোকে কাতর শতধা-ভিন্ন অন্তঃকরণে আর সে পূর্ব্বের খেলা চলে না; আর সে "অবিদিত গতযামা রাত্রি" পোহান আর সাজে না। কি বল চূড়ালা?

স্বামী সুখের রাজ্য—সতীর স্থাপিত নূতন প্রেম-রাজ্য ছাড়িয়া বনবাসে যাবেন এ কথা শুনিলে কোন্ সতী স্থির থাকিতে পারে? চূড়ালা ছিন্নতার

বীণাস্বরে পতিকে কহিল—"প্রভু, আপনি দাসীর সেবা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? দেবতা আমার, ভক্তের হৃদয় ভিন্ন আপনার চরণ-ক্ষেত্রের আর স্থান কোথায়? উপাসিকার প্রেমপুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত আর কোন্ বস্তু আপনার তৃপ্তিপ্রদ হইবে? না স্বামী,—আমি আপনাকে ছাড়িব না। অর্দ্ধাঙ্গিনী দাসীর অধিকার আছে, সেই অধিকারে আপনাকে ছাড়িব না।"

রাজা। না সতী, আমাকে বাধা দিও না। আমি বনবাসে সুখেই থাকিব। আর আমাকে তিক্ত আস্বাদময় ভোগসুখের প্রলোভনে ভুলাইও না। বনরাজি সত্যই আমার নিকট তোমার অপেক্ষাও এক্ষণে অধিক প্রীতিকর। ঐ লতার শোভা অধিক উন্মাদক। ঐ যে বনরাজি—দেখ চূড়ালা, মানস চক্ষুতে চাহিয়া দেখ, শাখা-কর বাড়াইয়া, পত্র-শিব কাঁপাইয়া আমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, বায়ু-চালিত শনশন শব্দ দ্বারা অস্ফুটভাবে আহ্বান করিতেছে। চূড়ালে হাসিমুখে বিদায় দাও! তোমার চক্ষুতে অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিলে, তোমার মুখে বিষাদরেখা অঙ্কিত দেখিলে, আমার এ সুখ-প্রস্থান বিষাদ-মিশ্রিত হইবে?

চূড়ালা। দেখ স্বামী, কে বেশী সুন্দর? এই সজীব মূর্ত্তি, প্রেমময়ী, তোমার দাসানুদাসী চূড়ালার পানে তাকাও, আর ঐ নির্জ্জীব নিঃস্নেহা বনরাজির দিকে লক্ষ্য কর? বল, কে বেশী সুন্দর? তুমি চলিয়া যাইলে ঐ বনরাজি কি তোমার অপেক্ষা করিবে? তোমার বিষণ্ণ দৃষ্টি দেখিলে ঐ হৃদয়হীনার চক্ষু কি অশ্রুময় হইবে? তোমার সুখের জন্য সমস্ত প্রাণ কি হাসিতে হাসিতে দিতে পারিবে?

রাজা। চূড়ালা, মনে দুঃখ করিও না! একদিন বটে তোমার শোভার কাছে বিশ্বের সকল শোভাই হার মানিত। কিন্তু আজ সত্যই ঐ বনরাশি বড় সুন্দর? পুত্র-শোকে কাতর রমণী, এখনও সংসারসুখে এত লোভ? এততেও কি বিতৃষ্ণা জন্মিল না? ঐ দেখ, বনরাজি মনোমোহিনীর বেশে আমার সম্মুখে মানসচক্ষুর উপর দণ্ডায়মানা। পুষ্পগুচ্ছক পয়োধর, রক্তোৎপল-দল করপল্লব, শুভ্রচপল মেলখেলা অংশুক, বায়ুচালিত পুষ্পপরাগ অঙ্গরাগ, কুসুমনিচয় অলঙ্কার, চিক্কণ শিলাতল উপভোগ্য নিতম্বতট। ঊর্ম্মিমালামুক্তা গ্রথিতা তরঙ্গিণী মুক্তামালার মতই অবস্থিতা, পুষ্পাচ্ছাদিতা নবলতিকা যৌবন-শোভিত অঙ্গের মতই প্রীতিকর। বনরাজি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে না? আমি যেমন ভালবাসি, তেমনই ভাবে সেও কি সাজিবে না? বসন্তে শরতে,

হেমন্তে নিদাঘে, শীতে বর্ষায়, নবনব সাজে কি দেখা দিবে না? আমি গ্রীষ্মতপ্ত হইয়া তলায় বসিলে মৃদুমৃদু ব্যজন করিয়া কি তাপ দূর করিবার চেষ্টা পাইবে না? ছায়া-আতপত্র দ্বারা রৌদ্র নিবারণে যত্ন লইবে না? সত্য চূড়ালা, তোমার মতই উহার প্রাণ কোমল, ভালবাসাময়। ঐ দেখ, মৃগগণকে কত আদর করিয়া ভোজন করাইতেছে, ঐ দেখ, পক্ষিগণকে মাথায় করিয়া রহিয়াছে, এ দেখ, মানবগণকে ফল ফুল, শস্য মূল দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঐ স্বচ্ছ নদীজল তোমার অধরামৃত অপেক্ষাও অধিক মিষ্ট, ঐ বনবাজিমাঝে পতিত নবসূর্য্যকর তোমার বর্ণের চেয়েও বেশী মনোহর, ঐ শশাঙ্ককর রজতধারা তোমার উচ্ছ্বসিত যৌবন-লাবণ্যকেও পরাভূত করিয়াছে। চূড়ালা, পতির শুভ ইচ্ছায় বাধা দিও না, সতী সাধ্বী রমণীর এ দুর্ব্বলতা, এ ভোগবিহ্বলতা, এ স্বার্থপরতা সাজে না।

চূড়ালা। দেবতা, এতদিনে চূড়ালাকে এই বুঝিলে? আমি আমার এই তুচ্ছ রূপ-যৌবনের গর্ব্ব করি না, এই জড়পিণ্ড-দেহের গৌরব রাখি না। তবে এই তুচ্ছ অনুপিণ্ড, মাংসময় অশুচি দেহ, রূপযৌবন আপনার ভাল লাগে, তাই সার্থক মনে করিতাম,—কীট দেবতাসংসর্গে ধন্য হইয়াছে মনে করিয়া অসীম আনন্দ লাভ করিতাম। এই তুচ্ছ নশ্বর দেহ আপনারই দাসীর, আপনারই সেবায় উহা উৎসর্গীকৃত। আপনার চক্ষুতে মিষ্ট লাগিত, সেই ভরসায় যা' কিছু গৌরব, যা' কিছু গর্ব্ব। এ গৌরব এ গর্ব্ব নিজের জন্য নহে, আপনারই জন্য। আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, সতী রমণী স্বামীর জন্য কি দিতে না পারে? জল ও অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, পায়ের কাঁটা বুক পাতিয়া লইতে পারে, ইষ্টদেবতার সুখের জন্য সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে? চূড়ালা সঙ্কীর্ণ-হৃদয়া রমণী নহে। স্বার্থপর হৃদয় লইয়া সে পত্নীত্ব গ্রহণ করে নাই, নিজের ভোগের জন্য সে লালায়িতা নহে তবে বারণ করিতেছি প্রভু, সে শুধু আপনার জন্য, আপনার কষ্টের জন্য। যে শির রাজমুকুটে সর্ব্বদা অলঙ্কৃত থাকিত, তাহা কি জটার ভার সহ্য করিবে? চূড়ালার বাহুউপাধানে শুইয়াও যাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হইত, কর্কশ কঠিন শিলাতলে কি তাঁর শয়নের স্থান হইবে? বৈতালিকের সুখের সঙ্গীতে যাঁর নিদ্রা ভাঙ্গিত, উপাদেয় রাজভোজ্য অন্নেও যাঁর তৃপ্তি হইত না, শত পরিচারিকার সংবাহনেও যাঁর অঙ্গের শ্রান্তি দূর হইত না, তিনি কি নিরাশ্রয় জীবন যাপনে সমর্থ হইবেন? তিনি কি আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন?

রাজা। পারিব চূড়ালা। তুমি যাহা অসম্ভব মনে করিতেছ, আমার তাহাই বড় প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে। বহুদিন অবশ পরাধীন জীবন যাপন করিলাম, এক্ষণে স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিব। ভগবানের উপাসনায় ঋষিবালকগণের বেদপাঠ শ্রবণে মহাপুরুষের উপদেশে আমার সময় সুখেই কাটিয়া যাইবে।

চূড়ালা। প্রভু, এই বৈরাগ্য পুত্রশোকোদ্ভূত। ইহা হয়ত একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস। আপনি আর কিছুদিন গৃহে থাকুন, রাজ্যশাসন করুন, জনকঋষির মত নির্লিপ্ত হইয়া সংসার করুন। বনে যাইবার প্রয়োজন কি? এই শ্মশান-বৈরাগ্যের মত কয়েকদিনমাত্র স্থায়ী এই বিতৃষ্ণা বন্যার জলের মত আপনিই সরিয়া যাইবে। তখন এই রাজ্য আবার কামনার বস্তু, চূড়ালা আবার নয়নানন্দদায়িনী, সংসার আবার প্রীতিকর বোধ হইবে। আপনার অভাবে প্রজাগণ পিতৃশূন্য অনাথ হইয়া হাহাকার করিবে, যুবতী পত্নীর চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত হইবে, ইহা কি ধর্ম্ম? দয়াময়, এত নিষ্ঠুরতা আপনার স্বাভাবিক নহে, এ আগন্তুক। এ বৈরাগ্য আপনার চিরস্থায়ী নহে, ও সাময়িক। আপনার সুখলালিত অঙ্গে বনবাস-ক্লেশ কোনমতেই সহ্য হইবে না। মহারাজ, আপনার যৌবনকাল এখনও যায় নাই, এ বয়সে কি বনবাস শোভা পায়? বসন্তকালেই ফুলের শোভা, শরৎকালেই চাঁদের শোভা, বর্ষাকালেই মেঘের শোভা। বাল্যকাল খেলার জন্য, যৌবনকাল ভোগ ও কর্ম্ম করিবার জন্য ও বার্দ্ধক্য নিবৃত্তির জন্য। জরাজীর্ণ দেহই বনবাসের উপযুক্ত। আপনি জ্ঞানী পণ্ডিত, আপনাকে আর আমি কি বুঝাইব। যুবক যুবতীর জন্য বনবাস ত ব্যবস্থিত নহে। ঐ বয়সে কি মহারাজ, জটাবল্কল সাজে? আর অসময়ে এই রাজ্যত্যাগে রাজার কি পাপ হইবে না? বার্দ্ধক্য আসুক, তখনই বিষয়বৈরাগ্য প্রকৃতই স্বাভাবিক হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। তখনই আমরা এই রাজ্য ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে বনে যাইতে পারিব। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, ভোগলালসার বহ্নি এখনও ধূমায়িত হইয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বর্ত্তমান।

রাজা। চূড়ালা, আমি স্থির-সংকল্প। তুমি আমাকে বাধা দিও না, বাধা দিলেও আর আমি শুনিব না। তুমি কর্ত্রী হইয়া সংসার কর, রাণী হইয়া প্রজাপালন কর, আমি চলিলাম। বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কালক্ষেপ করিবার আমার অবসর নাই।

চূড়ালা গমনোন্মুখ পতির পা দুখানি ধরিয়া, কম্পিত বক্ষের উপর তাহা টানিয়া লইয়া প্রার্থনা জানাইল "প্রভু, যদি একান্তই সংসার ত্যাগই করিবেন, তবে চূড়ালাকে সঙ্গে লউন। পাদপচ্যুতা লতিকার মত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংসারের প্রাঙ্গণে আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না, যৌবনেই কুসুমকে বৃন্তচ্যুত করিয়া অগ্নিদগ্ধ করিবেন না। এ দাসী ছায়ার মত আপনার সঙ্গের সাথী হইবেই। যৌবনে অনন্যআশ্রয়া পত্নীকে সঙ্গে লওয়াই পতির ধর্ম্ম।

রাজা। চূড়ালা তুমি বালিকা। বনবাস-কষ্ট তোমার সহিবে না। আর তোমার রূপ-যৌবনই যে তোমার শত্রু। বনবাসে পথের মধ্যে আমি কি শক্তি-সাহায্যে তোমাকে রক্ষা করিব।

চূড়ালা। প্রভু, আমি বালিকা নহি। বালিকা হইলে কি শিখিধ্বজের মত অগাধগাম্ভীর্য্য মহারাজাকে এতদিন ভুলাইয়া রাখিতে পারিতাম। বালিকা নই মহারাজ; আপনার মহিষী চূড়ালাকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার আছে। ছলনা করিবেন না। আশ্রিতা শিষ্যাকে লোভ দিবেন না। আর চূড়ালা পতিপ্রাণা সতী, আত্মরক্ষা সে করিতে জানে?

রাজা। বনবাস পুরুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য, দুর্ব্বলা রমণীর কথা কি? রমণী যতই শক্তিমতী হউক না, বনগমন বা বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে নিতান্ত অপারগ। জনকতনয়া সীতা অযোধ্যা হইতে দুই চারি পা গিয়াই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, "বন আর কতদূর?" বনজ কুসুমমঞ্জরী, উপবনের কুসুমমঞ্জরী অপেক্ষা কঠিনা হইতে পারে, তাহা বলিয়া অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে পারে না। স্বামীর অবর্ত্তমানে স্বামীর কুটুম্বভরণ, রাজ্যরক্ষা, প্রভৃতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য। তুমি তাহাই কর?

রাজা শিখিধ্বজ এই বলিয়া বেগশালী বায়ুর মত দ্রুত প্রস্থান করিলেন। বায়ুচালিত পত্রের মত কম্পিতাঙ্গী চূড়ালাও পতির অনুসরণ করিল। রাজমহিষী অলোক-সামান্য প্রভা আজি রাজ-তপনের অনুগামিনী হইল। রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে পতিবিরহ-বিধুরা চূড়ালা অনেকদূর অগ্রসর হইলে পর অন্ধকারাঞ্চলা শ্যামা যামিনী ধীরে ধীরে বনভূমিকে ভস্মধূসর করিয়া ফেলিল। আকাশ-সৌধতলে তারাদল নিক্ষিপ্ত লাজাঞ্জলির মত ফুটিয়া উঠিল। রাজা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন চূড়ালা, রাজমহিষী আদরের প্রণয়িনী বিলাসসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতির অনুগামিনী। সেই বিজন অরণ্যে অন্ধকার-ভীষণ বনের মধ্যে চূড়ালাকে রাজা কহিলেন, "চূড়ালা, এখনও আমার অনুগমন করিতেছ?"

চূড়ালা কহিল, "প্রভু, কায়ার পশ্চাতে ছায়া, তপনের সহিত প্রভা, পতির অনুসরণে পত্নী ইহা বিধাতার নিয়ম।"

এখন রাজা সন্ধ্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া প্রিয় চূড়ালা সহ শিলাতল-শয্যায়ে শয়ন করিলেন। পরিশ্রমক্লান্ত-দেহ নিদ্রার কোমলস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিঃসজ্ঞ হইয়া গেল। উদ্বেগাকুল শিখিধ্বজের মধ্য রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখেন, পার্শ্বে তাঁহাকে জড়াইয়া পত্নী চূড়ালা পদ্মমধুপানরতা ভ্রমরীর মত নিশ্চেতনা। রাজার ক্লিষ্ট অন্তর বহিয়া একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস নাসাপথে বাহির হইল। কুসুম-কোমলা চূড়ালাকে সেই নিশীথে বিজন অরণ্যে ছাড়িয়া যাই'ত রাজা কৃতসংকল্প হইলেন। নচেৎ চূড়ালা জাগরিতা হইলে তাঁহার আর যাওয়া হইবে না। রাজা নলও একদিন এইরূপে অন্ধকারময় নির্জ্জন অরণ্যে পত্নী দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যান। রাজা শিখিধ্বজও তাহাই করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

পাগলের পত্র।

পূজনীয়—

ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় এই অনন্ত বিশ্বমাঝে আমরা কোথায়। যেন অসীম সমুদ্র মধ্যে একটি সামান্য বুদ্‌বুদ্। কিন্তু আবার সেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ লইয়াইত সমুদ্রজীবনের প্রকাশ। যেন সেই ছোট বড় ঢেউগুলির মাথার উপর মণির মত কত রংয়ের জলবিন্দুগুলির ভিতর দিয় সমুদ্রভাবটি আরও কত সুন্দর ও মধুর হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে! সেই রকম এই বিশ্ব-সংসার যে মহাভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য অনন্ত রূপ ধরে রয়েচে—আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও সেই মহাভাবেরই বুদ্‌বুদ্।

নদীর ঘূর্ণি যেমন নদীরই জল, অথচ কেমন যেন একটু ভিন্ন ভাবে দাঁড়িয়ে নদীর বেগ-শক্তির মহিমা প্রকাশ করে। আমাদের জীবনকেও সেই বিশ্ব অতীত মহাভাবের প্রকাশমুখীন্ করিতে হবে। সেই ভাবস্রোতে ঘূর্ণি হয়ে তারই মহিমা ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে, ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অনন্তের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। Light on the Path যথার্থই বলিয়াছে "Grow as the

flower grows unconsciously but eagerly anxious to open its soul to the air.

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে পথে ছুটেছে, আমরাও সেই পথে চলেছি। বিশ্ব জীবনের যে গতি আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেরও সেই গতি।

"All are parts of one stupendous whole,
Whose body nature is, and God the soul."

আবার গীতায় বলে "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু.

এইটি আমাদের বুঝতে হবে এই ভাবে মজ্‌তে হবে। এই বুঝতে হবে বিশাল সংসারে আমরা একা নই। এমন নয় যে দুদিনের জন্য কোথা হতে এলাম, আর তারপর সব ফুরাইয়া গেল। যে মহাশক্তি এই বিশ্বকে জড়িয়ে নিয়ে রয়েছে আমরাও সেই শক্তিরই প্রকাশ। Sir Oliver Lodge অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন, "As islands are all based upon a common ground, so we may be likened to floating lonely icebergs, our crest above the ocean, with deeply submerged portions united by the sea."—"Man and the Universe" আরও বলিয়াছেন, "Each of us has a great region of the subconscious . . , let us not cut ourselves of from its sustaining power."—*Ibid.* বড় সুন্দর কথা। কিন্তু এই ভাবটি জীবনে ধরতে হবে, জীবনে খাটাতে হবে—এইভাবে জীবনকে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। তখন তবে বুঝবো জীবন কত মধুর—কত সুন্দর! Prof Myers ও ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন, "Perhaps, indeed, in this complex interpenetrating spirit, our effort is no individual, no transitory thing. That which lies at the root of us, lies at root of the cosmos too. Our struggle is the struggle of the Universe itself, and the very Godhead finds fulfilment through our upward striving soul."—Human Personalty.

জীবনের সবই থাক্‌বে—সেই কামনা, সেই প্রবৃত্তি, সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা, সেই গৃহ-সংসার, সেই সমাজ, সেই জন্মভূমি—তাদের মাঝে থাকবে না কেবল আমাদের ক্ষুদ্র "আমি"। ঠিক যেন

"কি হ'ল, বুঝি বা সখি হৃদয় আমার হারিয়েছে।

তখন তবে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে
নমস্তস্যৈ .নমোনমঃ। গে'য়ে

প্রাণ মন মে'তে উঠবে, আর চোখের জলে বুক ভেসে যাবে।

আর তখন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রে"। "যদ্বৎ নদ্য" সমবসতয়া সাগরত্বং হ্যবাপ্তা।

তবেত আমাদের ধর্ম্ম-জীবন হবে।

ইংরাজীতে য়াকে আজকালে Religion বলে আমাদের "ধর্ম্ম" বল্‌তে ঠিক তাহা বুঝায় না। আমাদের সমস্ত জীবনটি লইয়াই ধর্ম্ম। সেই জন্ত আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি, আবার আহার বিহার, গৃহ-সংসার সমাজ ইত্যাদি, একই ভাবের উপর স্থাপিত ও সকলেরই লক্ষ্য এক—সেই শ্রীভগবান্। এই কারণেই হিন্দু-জীবনের এত বাঁধাবাঁধি।

একটি উদাহরণ দ্বারা আমরা এইটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। একটি সুন্দর চিত্র। চিত্রকরের মনের ভাবই চিত্ররূপে প্রকাশ। একভাবে দেখিতে গেলে কাগজ রং প্রভৃতি লইয়াই চিত্র। কিন্তু চিত্রকরের মনের ভাবটি কাগজ রং প্রভৃতি উপকরণগুলিকে জড়িয়ে, কেমন এক সুন্দরভাবে সাজিয়ে চিত্ররূপে প্রকাশ হয়! এখানে চিত্রকরের মনের ভাবটি হল চিত্রটির ধর্ম্ম; আর সকল উপকরণগুলিকে সেই ভাবেই লয় দিয়া মিশে যেতে হবে। চিত্রকরের মনের ভাবটি যেমন ছবিখানির সমস্তটির ভিতর দিয়া ফুটে উঠে, কোন একটু স্থান বাদ দিতে গেলে যেমন ছবিটির সৌন্দর্য্যের হানি হয়—আমাদের জীবনেও ঠিক সেইরূপ। আমরা এরূপ বল্‌তে পারি না জীবনের এই সময়টুকুতে "ধর্ম্ম" করা যাইতে পারে, আর জীবনের এই সময়ে বা কাজে বা চিন্তায় ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন দেখি না। কেননা যে ভাব লইয়া জীবনের খেলা সে ভাবে সর্ব্বদাই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে; সকল সময়েই তাতে মজে থাক্‌তে হবে; সকল চিন্তা ও কার্য্যের ভিতর দিয়া তার মহিমা ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। তবে ত আমাদের "ধর্ম্ম" করা হবে। তবে ত দেখ্‌বো জীবনের ছোট ছোট কার্য্যের মধ্যে কত সুন্দর ভাব লুকান রয়েছে। তখন বুঝ্‌বো মানব-হৃদয়ে, প্রবৃত্তি কামনার পাতায় ঢাকা, এমনই কি মধুভরা ফুল লুকান আছে! তখন বাস্তবিকই

"We feel that we are greater than we know."

পৃষ্ঠা —



মহাবিদ্যা—ষোড়শী।

M. I. WORKS

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] আষাঢ়, শ্রাবণ; ১৩২২। [৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

মহিমা।

তোমারি করুণা ধীর প্রবাহে
মবত মরুভূ মাঝে বয়।
সাধু ভকতজন তাহে অবগাহে
আনন্দে নিমগন হয়॥
তোমারি প্রেমবারি সুশীতল সমীরে
তোমারি স্নেহরাশি বহে ধীরে ধীরে—
তোমারি মঙ্গলগানে কত সুধাঢালে প্রাণে;
প্রকৃতি তোমারি কথা কয়॥
তোমারি আশিস্ ধরাবুকে নামি,
তৃণ শস্য ফল ফুল রেখেছে সাজাইয়া
তোমারি সে সুধাহাসি বিতরে পুলকরাশি
মুগধা ধরণী চেয়ে রয়॥
তোমারি বিজ্ঞান পুরাণ দরশন
তোমারি রবি শশী গ্রহতারা অগণন
তোমারি শাসন নীতি তোমারি গৌরব গীতি—;
নিখিল জগৎ প্রকাশয়॥

শ্রীশশধর মৈত্র।

প্রাণনাথেরপ্রতি প্রশ্ন।

(বল) কতদিনে আর হইবে আমার
মায়ার বন্ধন মোচন ?
(আর) কবে বল মম মন্দ মোহ তম
নাশিবে, মদনমোহন ?
(বল) কতদিনে নাথ যাবে কামক্রোধ
বিষয় বাসনা ছলন ?
(আর) কবে বল মম যাবে ভব-ভ্রম
ঘুচিবে বিষয় লাঞ্ছন ?
(বল) আর কতদিন রব অচেতন,
মমতা-সাগরে মগন ?
আর) কতদিনে বল ভুলিব সকল
তব পদে লব শরণ ?
(কবে) ত্যজিব এ ছার প্রপঞ্চ মায়ার,
ভজিব ও রাঙ্গাচরণ ?
(হব) তব নামামৃত পানে পুলকিত
প্রেমে উছলিত নয়ন ?
(ওহে) অনাথ-বৎসল কবে হবে বল
আমার সুদিন এমন ?
(পাব) তব দরশন অমিয় প্লাবন
জুড়াব তাপিত জীবন ?
(আর) হেরি প্রাণারাম জ্যোতি অবিরাম
হৃদিমাঝে মুদি নয়ন ?
(আমি) সব জ্বালা ভুলে রব প্রেমে গলে
প্রেমময় প্রাণরমণ ?

গোবিন্দলাল।

যম ও যমুনা।

প্রেমময়ের যুগলচরণে দুইটী অনাদি অনন্ত স্রোত ওতপ্রোত ও অবিচ্ছিন্নভাবে নিত্য প্রবাহিত রহিয়াছে;—একটী কাল, অপরটী প্রেম। ইহাদের প্রত্যেকটীই অপরটীতে পর্য্যবসিত; পরন্তু ইহাদেব নামে মানব-হৃদয়ে সমকালে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত ভাবের উদয় হয়। একটীর অধিষ্ঠাতৃদেবতা কালপুরুষ বা যম, ও অপরটীর অধিষ্ঠাত্রী কালিন্দী বা যমুনা। প্রথমটী সংহৃতি ও দ্বিতীয়টী স্থিতি শক্তির নামান্তর মাত্র। দুয়ের সম্মিলনেই সৃষ্টি। সৃষ্টি ও লয় স্থিতিশক্তিরই দুইটী সীমান্ত। কালে সৃষ্টি, কালে লয়, প্রেমে স্থিতি। এই সৃষ্টি স্থিতি সংহৃতি শক্তির সুমধুর সংমিশ্রণই হিন্দুর সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক পরমদেবতা। যম বলিলে নিয়তির অধীশ্বর, প্রেম বলিলে হ্লাদিনী-শক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা বুঝায়। ইহাদের বিভিন্ন জ্ঞান নিতান্তই ভ্রান্ত ও বিচিত্র। সকল বস্তুরই সত্তা ও চৈতন্য ব্যক্ত অথবা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, পরন্তু সকলই যে প্রেমপ্রবণ অর্থাৎ আনন্দকেন্দ্রাভিমুখে দ্রুতপতনশীল ইহা ধ্রুবসত্য ও স্বতঃসিদ্ধ। উৎপত্তি নিবৃত্তি, উত্থান পর্য্যবসান, স্থিতি বিলয়, সকলেরই সেই এক বস্তুতে; তাই পুরাণকারেরা বলেন যম ও যমুনা দুইটী যমজ ভাই বোন। প্রকৃতি-পুরুষের এই দুইটী চিরশিশু লীলাময়ের পদপ্রান্তে নিয়ত ক্রীড়াশীল। কালের প্রবল স্রোতে নিখিল বাহ্যব্রহ্মাণ্ড সতত প্রবাহিত, আর যমুনার প্রেমপ্লাবনে অন্তর্জগৎ অনুক্ষণ পরিপ্লাবিত। পবিত্র প্রেমামৃতাপ্লুত ভক্তহৃদয়ের নিভৃতনিলয়ই পুরাণের যমুনাপুলিন; ঈদৃশ স্থানই প্রকৃতি-পুরুষের প্রিয়তম নিত্যলীলাভূমি। বাহ্যজগৎ প্রকৃতি, ও অন্তরাত্মা যদি পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মিলন বিহার এই যমুনাতটেই হইয়া থাকে। প্রাণে যে ভাবের আবির্ভাব হইলে অন্তর বাহির এক হইয়া যায়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যবধান ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আইসে, ছায়া ও কায়ার আর পৃথক্ উপলব্ধি হয় না, জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ ঘুচিয়া যায়, সত্যে কল্পনা ও কল্পনায় সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, তাদৃশ ভাবসুধালহরীতেই ভক্ত-হৃদি-প্রবাহিণী প্রেমশান্তিস্রোতস্বিনী যমুনা স্বতঃই সতত উচ্ছ্বসিতা। সে উচ্ছ্বাসেব সহিত যে নিজ শ্বাস মিশাইতে পারিয়াছে, সেই কালের কাল কালার প্রেমে মজিয়াছে, ডুবিয়াছে, মরিয়াছে ও মরিয়া অমরত্বলাভ করিয়াছে। এরূপ মরণ মৃত্যুঞ্জয়েরও চিরবাঞ্ছিত। এই যমুনায় কত অসংখ্য কোটী গোপ-ললনা পাগলপ্রাণে ঝাঁপ দিয়াছে ও

মরিয়াছে, তাহাদের মরণে প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়া সেই গোপশিশু হাসিতে হাসিতে অবিরাম বাঁশী বাজাইতেছেন, ও যমুনাতরঙ্গের সঙ্গে সমতালে রঙ্গেভঙ্গে হেলিতে দুলিতে খেলিতেছেন। তাঁহার লীলাখেলা তিনিই জানেন, তিনিই বুঝেন, আমরা মৃত্তিকাব পুত্তলী, হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকি। হু হু শব্দে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কত শত সহস্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাসিয়া গেল, আমরা ত কোন্ ছার ? যমুনার শীতল স্রোতে গা ভাসান দিয়া পড়িয়া থাক, একদিন না একদিন সেই প্রেমের উৎসের চরণতলে গিয়া মিলিবে, উজান বাহিতে যাইও না, তাহা হইলেই তলাইয়া যাইবে।

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কে আছে এমন।

জগতের অন্তরালে কে আছে এমন মোর,
যাঁহাব চরণ-তলে বাঁধা এ জীবন-ডোর ?
যাঁহার আলোক-বিন্দু প্রকাশিছে রবিশশী
উজলি ত্রিলোক সদা উজলি পূর্ণিমা-নিশি।
শিশির-শীকর সিক্ত বিকচ কুসুম রাশি
শোভিছে অরুণ রাগে মাখি যাঁর মৃদু হাসি।
বসন্তে কোকিল গীতি, নিকুঞ্জে পাপিয়াতান,
যাঁহার বারতা আনি উদাস করিছে প্রাণ।
দখিণ মলয়বায়ে যাঁহার পরশ পাই,
বিপদে কাতর কণ্ঠে যাঁহার অভয় চাই।
যামিনী যাহার লাগি পরি তারকার হাব
চাঁদ-সিঁদুর ভালে আসে যায় বারবার।
উন্নত হিমাদ্রিশির যাঁহারে দেখিতে চায়,
জলধি-তরঙ্গ-ভঙ্গ যাঁহারে খুঁজিতে ধায়।
মায়ের আদর স্নেহ, প্রেয়সীর ভালবাসা,
পিতার বাৎসল্য ভাব, অধীনের প্রিয়ভাষা,
গুরুতে বিমলা শ্রদ্ধা, মহানন্দ সাধনাব,

এ সংসারে অবিরত　　প্রকাশিছে ভাব যাঁর।
সকল ভিতরে যিনি　　নিজেতে নিজে বিভোর,
ধরিতে হেরিতে নারি,　　বিশ্ববাসি-মনচোর।
নিখিল রস-সরসে　　যিনি মধু শতদল,
সাধন-ভজন শক্তি　　যিনি ভক্তি পরিমল।
সান্তভাবে জীব যিনি,　　অনন্তে মহান্ শিব,
যাঁর মহামায়া মুগ্ধ　　আপামর সর্ব্ব জীব।
চৈতন্য যাঁহার খেলা　　বুদ্ধি যাঁর সাড়া পায়,
'অহম্' যাঁহার পানে　　নিঃশেষে মিশিতে যায়।
প্রভু সখা, পিতা, মাতা,　　হৃদয়সর্ব্বস্ব নিধি,
যেবা হও, ওগো 'তুমি'　　রেখো বেঁধে নিরবধি।

শ্রীবিধুভূষণ সেন গুপ্ত।

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্ববারে ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে গিয়া অপরিস্ফুটভাষায় এক মহান্ তথ্যের নিকট উপনীত হইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ভাগবৎ জীবনের নহে। অন্যান্য শাস্ত্রে সাধ্য অবস্থা জীবের কর্ম্ম প্রযত্ন ও:সাধনার উপর নির্ভর করে বলিয়া উপদিষ্ট হয়। ঐ সকল উপদেশে জীবের কর্তৃত্ব আরোপিত হয়। জীবভাবটী সত্য ও স্বতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইয়া, কি উপায়ে সে স্বতন্ত্র-সত্য জীবকে সাধনার ভিতর দিয়া পরিচালিত করত অল্পে অল্পে পরিষ্কৃত করিয়া সালোক্য সারূপ্য আদির উপযোগী করা হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল উপদেশে জীব কর্ত্তা, সার্ব্বজনীন ভাবে কৃত সাধনাই 'ক্রিয়া,' ও জীবের 'আমি' ভাবের অতীত অপর একটী স্বরূপ অবস্থাই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য; সুতরাং মোক্ষতত্ত্ব বা ভগবৎ প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ নহে। সাধনা ও আকাঙ্ক্ষাদ্বারা উহা সিদ্ধ করিতে হয়। কামক্রোধাদি বৃত্তিনিচয় দ্বারা মোহ উৎপন্ন হয় বলিয়া এ পথে সেই সকল বর্জ্জন করা আবশ্যক। কারণ তৎসমুদয় বর্জ্জন না করিলে জীবের ছোট 'আমি' ভাবটী

বস্তুর আকর্ষণে ডুবিয়া যাইতে পারে। সেই জন্য জীবকে সতত 'বিবিক্ত' বা বস্তুবুদ্ধি হইতে পৃথক্ ভাবে থাকিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ বিবেক হইলেই শুধু হইল না, ক্রিয়ারও আবশ্যকতা আছে। তবে এ ক্রিয়া আর বস্তু-পর নহে। বস্তুর আকর্ষণ মাত্রই ব্যবহার করিতে হইবে। বটে, কিন্তু প্রাকৃত জনের ন্যায় স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে চলিবে না, উহাদের সহিত বিপরীতভাবে মিশিতে হইবে। লোকে যেমন মুদ্গরাদির ভার (weight) কৌশলপূর্ব্বক ব্যবহার করত তদ্দ্বারা স্বকীয় দেহের সবলতা সাধন করে, তদ্রূপ কৌশলপূর্ব্বক বাহ্য আকর্ষণ সমূহকে এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে তাহাতে 'আমি'টির স্ব-তন্ত্রতা সিদ্ধ হয়। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং।

এই স্তরের সাধনার মূল তথ্যটী বুঝিয়া লওয়া যাউক; কারণ আমরা অনেকেই এখনও এই স্তরেই প্রতিস্থাপিত রহিয়াছি। চৈতন্যের ত্রিগুণাত্মিকাশক্তি লইয়াই এই সাধনা। সুতরাং ত্রিগুণ কি, তাহা না বুঝিলে সাধনার রহস্য উপলব্ধি হইল না। চৈতন্যের প্রত্যেক ব্যাপারে তিনটী অভিনব গতি বা প্রবণতা (Tendency) দেখিতে পাওয়া যায়, এই গতিত্রয়কে আমরা Three laws of consciousness বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। প্রথম গতি বা প্রবণতাকে স্থিতি-শীলতা (Stability) বলে। কোনও ভাব ভিতরে ফুটিলে সেই ভাবটী চৈতন্যের ক্ষেত্রে স্থির হইতে ও বিশেষ মূর্ত্তি গ্রহণের চেষ্টা করে; যৌবনে প্রেমভাব জাগরিত হইল, কিন্তু ঐ ভাবটী শুদ্ধ অপরিস্ফুট ভাবরূপে না থাকিয়া মূর্ত্তি গ্রহণপূর্ব্বক বস্তুরূপে পরিসমাপ্ত হইতে, স্থির হইতে প্রয়াস পায়। সেই জন্য আমরা যতক্ষণ সেই প্রেমের অধিষ্ঠানভূত বন্ধু, প্রণয়িনী বা অন্য পাত্র না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রেমের আকাঙ্ক্ষাটী স্থির হয় না। বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শিশু মানব ভাবটিকে হারাইয়া ফেলে। হয়ত উপন্যাসাদি পাঠে প্রেমভাব উদ্রিক্ত হওয়ার পরক্ষণেই, অন্য ভাব-বশে প্রেমভাবটী চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া যায়। আমাদের বস্তুসমূহকে ভাবের 'নোঙ্গর' বলিলে চলে। পত্নীভাবটী স্ত্রীতে নোঙ্গর করিয়াছি বলিয়াই, তাহাকে দর্শন করিবা মাত্র সেই ভাবটীর পুনরুন্মেষ হয়। সেই জন্য সাধনমার্গে মানবরূপধারী গুরুরও আবশ্যকতা সিদ্ধ হয়। তবে কে কি প্রকারে ভাব-সমূহকে বাহিরে ন্যস্ত করিবে, তাহা তাহার 'আমির' পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমরা আমিটিকে ছোট ও বিশিষ্ট বলিয়া ভাবি বলিয়াই, মনে হয় যেন, পারিপূর্ণতা ও স্থৈর্য্য 'আমির' বাহিরে অবস্থিত। আমিটাকে আকারবান ভাবি বলিয়াইত'

পরিপুষ্টির জন্য বাহিরের আকারবান বস্তুর অনুসন্ধান করি; এই জন্যই স্থূলাভিমানী জীব স্থূলবস্তুর, সূক্ষ্মাভিমানী জীব সূক্ষ্মবস্তুর অন্বেষণ করে। এই জন্যই ভাবুক কবির নিকট বস্তুগুলিও ভাবময় হইয়া যায়। আমাদের আমিটী কি অবস্থায় আছে বা কতদুর উন্নতি করিয়াছে জানিতে চাহিলে, তোমার জগদ্ভাব কোন্ অবস্থায় আছে,—তুমি কি প্রকার বস্তু লইয়া, তাহার সহিত কি ভাবে মিশিয়া থাকিতে ভাল বাস—তাহা বুঝিয়া দেখ, তোমার জগৎ যেখানে তোমার আমিও সেখানে; তোমার জগৎ যেরূপ তোমার আমিও সেরূপ। পক্ষান্তরে যদি রমণীতে কেবল কামবুদ্ধির পরিসমাপ্তি না দেখিয়া, সৌন্দর্য্য ও প্রেমভাব দর্শন করিতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার আমিটীও ক্রমশঃ কাম হইতে মুক্ত হইবে। হিন্দু শাস্ত্রের ইহা একটি প্রধান কৌশল। পিতাকে কেবল Governor বলিয়া ভাবিলে তোমার আমিটী ছোট থাকিয়া যাইবে, সেই জন্য শাস্ত্র তমোগুণাভিভূত জীবকুলের উদ্ধারকল্পে পিতারূপ বাহ্য বস্তুকে মহাভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। পিতা সামান্য মনুষ্য নহেন:—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

সেইরূপে জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী, শুধু progenitor নহেন। স্ত্রী শুধু কামোপভোগ্যা নহে, তাহার দেহও বাহিরের বস্তু নহে, ধর্ম্মাচরণে সুবিধা হইবে বলিয়া এক সঙ্গে প্রেমের কমনীয়তা ও জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা সিদ্ধ করিবার জন্যই যেন ভগবান্ একই জীবকে দুই দেহে প্রকাশ করিয়াছেন। পতি ও পত্নী একই জীবের অভিব্যক্তি ক্ষেত্র বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী। পুত্রও অবশ ও আকস্মিকভাবে বীর্য্যপাতের ফল নহে—সে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। আমিটী যে জগৎরূপে বিকীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে, ইহা বুঝিবার আবশ্যক। স্থাবর ও জঙ্গম জগতেও এই উপদেশ সম্যক্ প্রযুক্ত। গোমেদ (মণিবিশেষ) মঙ্গলের ক্ষেত্র, তুলসীপত্রে নারায়ণ তৃপ্ত, বৃষভ মহাদেবের বাহন, প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপদেশনিচয়, দেখ কি আশ্চর্য্য কৌশলে বাহ্য, তথা-কথিত তুচ্ছ বস্তু সমূহকেও ধর্ম্মের অনুকূল করত উচ্চ আদর্শে উত্তোলিত করিয়া দিতেছে। ইহাই তমোগুণের সাধন' বা নিত্যসিদ্ধ আত্মার স্থিতিশীলতার বিকাশ।

রজোগুণ—অর্থে ক্রিয়াশীলতা বা ক্রিয়ার প্রবণতা বুঝায়। জগতের কোনও বস্তু বা ভাব যে আপনা আপনি শুদ্ধভাবে থাকিতে পারে না, অনন্ত, অপর সকল বস্তু ও ভাবের সহিত সদাই ওতপ্রোত ভাবে মিশিতে চাহে,—ইহাই

রজোগুণের কার্য্য। প্রত্যেক ছিন্ন ক্ষুদ্রবস্তুটীই যেন কি এক আকুল পিপাসার বশে স্বকীয় ছিন্নভাব পরিবর্জ্জন করত ও অন্যান্য ভাবের সহিত আপনাকে সম্পর্কিত করিয়া সকলে আপনাকে এবং সকলকে আপনাতে পাইতে চেষ্টা করে। জড় ভরতের উপাখ্যানে ভাগবত রজোগুণের খেলাটি অতি পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মৃগশাবকটীকে ছিন্ন-বোধে ভেদ-ভাবে গ্রহণ করত কিরূপে ঐ মৃগ-বুদ্ধি ভরত রাজার বিমল চিত্তক্ষেত্রে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার জীবনকে মৃগময় করিয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রজোগুণ আছে বলিয়াই বিজ্ঞানবিৎ এক বিষয়ের উপলব্ধ জ্ঞানকে বিষয়ান্তরে প্রয়োগ করত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন। রজোগুণ অনুকূলভাবে খেলে বলিয়াই সাধক সাধনলব্ধ জ্ঞানটীকে সাংসারিক জীবনে প্রতিফলিত করত সাংসারিক জীবনটীকে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়েন। ভগবানের আভাস প্রাপ্ত হইয়া কি কৌশলে সাধক সাংসারিক বিপদ্‌রাশি উত্তীর্ণ হয়েন। তাহার পক্ষে বিপদ্ আর শুধু কর্ম্মজন্য নহে, বিপদ্-ভাবটীও ভগবদ্‌ভাবে সংক্রামিত হয়; ও ভগবৎ-প্রেম-পিপাসু ভক্ত বিপদ্‌কেও ভগবানের অসীম প্রেমের অংশ-স্বরূপে বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে তাহা বহন করিতে সমর্থ হয়েন। তা'ই সাধক বলেন—

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবলই দয়া তব জেনেছি মা ভবদারা।

তা'ই সাধকের ভগবানও বলেন—যস্যানুগ্রহমিচ্ছামি তস্য সর্ব্বং হরাম্যহম্। তোমার বস্তুবুদ্ধি ও ভাবগুলি কি ভাবে ক্রিয়াশীল জানিতে পারিলে তোমার 'আমি'টির অবস্থাটী সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তোমার কল্পনা, তোমার ধারণা, তোমার চিন্তাশক্তি কিরূপভাবে খেলে তাহা হইতে বুঝিয়া লও তোমার 'আমি'টি কোথায় আছে? বিপদের সময় স্বতঃই কি ভগবানকে মনে পড়ে? স্বপ্ন চৈতন্যবিকাশের সময় কি তোমার ভগবৎ প্রেম-পিপাসা জাগ্রত থাকে। যদি থাকে তবে জানিও এইবার—তোমার ভিতরে রজোগুণ উরুক্রমের পথে যাইতে উপক্রম করিতেছে। আর যদি না যায়, তবে জানিও তোমার সাধানায় কোনও ফল হয় নাই। তোতা পাখীর ন্যায় অনর্গল রাম নাম করিতে পারিলেও শমনরূপ মার্জ্জারের কবলে পতিত হইয়া রামনাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না। যে কৌশলে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে মধ্যে ভগবানকে আনিতে পারা যায়, ও প্রত্যেক ব্যাপারনিচয় তদভিমুখে প্রয়োগ

করিতে পারা যায়, তাহাই প্রকৃত রজোগুণের প্রসার বা পরিমার্জ্জনা। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার বা অনুষ্ঠান। প্রাকৃত ভাবগুলিকে সংস্কৃত করে বলিয়াই 'সংস্কার', ও তাহার অভ্যন্তরে ভগবানকে অনুরূপে স্থাপিত করে বলিয়াই, উহা 'অনুষ্ঠান'। পরস্পর অঙ্গসঙ্গ অভিলাষে 'রেজিষ্ট্রারের' নিকট গিয়া যুবক-যুবতির বিবাহসূত্রে বন্ধন ও ভগবৎ সমীপে, দেব, দ্বিজ, পিতৃ ও এমন কি আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত সমগ্র জগৎ পরিতৃপ্ত করত, ধর্ম্মভাব পরিস্ফুরণের জন্য, দুইটী অংশ-চৈতন্যের একত্র মিলনের জন্য বিবাহ ;—এই দুইটী এক বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক এক নহে। একটীতে কামেরই বিকাশ, অন্য কিছু নহে, অপরটী (উৎ+বাহ, বা বি+বাহ) ঊর্দ্ধে বা পরম-বিশেষের দিকে জীবকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে বলিয়াই এই স্রোতরূপ গতিকে 'উদ্বাহ' বা 'বিবাহ' বলে। তমোগুণে যেমন ভগবান যে এক ও স্থির, ইহাই আভাস পাওয়া যায়,—তদ্রূপ রজোগুণে ছিন্ন বহুগুলি যে একেরই বিকাশ তাহা বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক বস্তু ক্রিয়া ও ভাবের ভিতর এক সর্ব্ব-সংপ্রসারিণী, সর্ব্ব-সংযোগিনী প্রবণতা প্রস্ফুরিত করিয়া দেয়। বস্তুর আকর্ষণটী রজোগুণ বটে; কিন্তু উহাকে অত ছোট করিয়া দেখ কেন? একখণ্ড লৌহ যেমন তড়িৎ-প্রবাহ-কুণ্ডলীর (Electrie coil) মধ্যে পতিত হইলে একদিকে (Positive) অপর দিকে (Negative) ভাবে প্রকটিত হয়, ও এই দুই ভাবের খেলা স্বত্বেও প্রাণে প্রাণে উভয় ভাবই মিশিয়া, সুষুপ্ত হইতে চাহে, তদ্রূপ মহাযোগিনী মহামায়ার প্রভাবে জীব কুণ্ডলীস্থ হইয়া এক এক চক্রে এক এক প্রকার আনন্দ অনুভব করে, ও তদনুরূপ জগদ্ভাবের বিকাশ করিয়া থাকে। এইরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ হইলেও সে পুনরায় এক হইবার জন্য সর্ব্বরূপে সর্ব্বভাবে সর্ব্বের সহিত আপনাকে সম্পর্কিত করত সর্ব্বস্থ হইতে প্রয়াস করিতেছে। যে কামনা সংসার বন্ধের কারণ, তাহাই বৈষ্ণব করিয়া লালসা রূপে ভগবানে মিসাইয়া দেয়। তবে ছোট কাম বা ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভাল নহে। যদি চাহিতেই হয়, তবে সবটাই চাহি না কেন। মারিত' 'হাতী, লুঠিত' ভাণ্ডার ; দেখিবে যাওয়া পাওয়া মিটিয়া যাইবে। যেমন আমরা দৃষ্টির কার্য্যমাত্রই চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া বুঝি, শুদ্ধ ভাবাপন্ন জীব আর সেরূপ বুঝিবে না। সে প্রত্যেক ব্যাপারে ষড়চক্রের কর্ণিকাস্থিত কোনও এক দেবতার কার্য্য অনুভব করিবে। 'চ'খে দেখিলাম না বলিয়া সে বলিবে 'ইন্দ্র দেবের কৃপায় আজ ইহা দর্শন হইল।'

এ প্রকারে তাহার ভিতরে যেরূপ সত্ত্ব গুণের ক্রমে উন্মেষ হইবে, সে ক্রমে ক্রমে কিন্নর বা কিম্পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের সত্ত্বা অনুভব করিতে পারিবে। সে রজোগুণের সাহায্যে দেবতাগণের সহিত সূক্ষ্ম চৈতন্যের কার্য্যসমূহ বুঝিতে পারিয়া বাহ্যজগতে ও অপর মানবের চিত্তে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবে। 'অ আ' প্রভৃতি বর্ণমালাকে আর বর্ণ না দেখিয়া, দেবতা বা কেন্দ্ররূপে বুঝিতে পারিয়া, তাহাদের খেলার আধার-ভূতা মাতৃকা শক্তিকে চিনিতে পারিয়া, সমস্ত অবয়বই যে সেই মাতৃকা-শক্তির খেলা ইহা বুঝিতে পারিবে ; এবং তমোগুণের সাহায্যে বাহ্যবস্তু প্রভৃতি অনায়াসে যোগ-বলে প্রস্তুত করিতে পারিবে। সত্ত্বগুণের সাহায্যে ঋষ্যাদি দেবতা প্রভৃতি ন্যাস হয় ; যাহার ভিতর সূক্ষ্ম 'আমি' ও তদনুরূপ দেবতা বুদ্ধির বিকাশ হয় নাই তাহার দ্বারা ঐ ন্যাস হইতে পারিবে না। সূক্ষ্ম ভাবে রজোগুণের বিকাশ ও তাহার ফল স্বরূপ (Organic life) বুদ্ধি সিদ্ধ না হইলে বাহ্য মাতৃকা-ন্যাস হইতে পারে না। তমোগুণের সূক্ষ্মভাব সিদ্ধ না হইলে সাধক সূক্ষ্ম জগতের সত্ত্বার অনুভব হইতে পাবে না। মাতা পুত্রকে কঠিন রোগ-গ্রস্ত দর্শনে হতাশ হইয়া শ্রীশ্রীতারকেশ্বরের দ্বারে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিল। কারণাতীত দেবদেবের কৃপা হইলে, ঐ কৃপা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত তমোগুণের সাহায্যে ঔষধাদিরূপে পরিণত হইয়াই তদায় হস্তে উপস্থিত হয়। যাহার মনে এই সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ের বোধ হয় নাই, যে সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, সে দৈবলব্ধ ঔষধ 'পাই পাই' করিয়াও পায় না। অপর পক্ষে যাহার বুদ্ধি এত পরিমার্জ্জিত যে ভগবৎ কৃপাই তাহার পক্ষে একমাত্র বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়,—যিনি রসিক, তিনি এক মহান্ একত্বের উপর কাম শক্তি পরিস্থাপিত দেখিতে পান, ও তখন বলেন "কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।"

এইবার সত্ত্বগুণের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ। একটি বিশিষ্ট খেলা হইতে চৈতন্যময় কোন পদার্থের বিজ্ঞান যাহাতে হয়, তাহাই সত্ত্বগুণ। ইংলণ্ডে এক প্রকার ক্ষুদ্র লতিকা আছে তাহাকে (pansy) প্যান্সি লতা বলে। আমাদের মত লোক ঐ লতা দেখিলে সাধারণ লতাই বুঝিবে। কিন্তু কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিকট এই ক্ষুদ্র বল্লরী মানবের অমৃতত্বের কাহিনী ঘোষণা করিল। ইনি প্যান্সী দেখিয়া বলিলেন,—

The pansy at my feet,
The same tale repeat.

(Yew) ইউ বৃক্ষ দেখিয়া তিনি মহান সত্তা (Presence) অনুভব করিলেন। ইহাই সত্বগুণের কার্য্য। সত্বগুণে পুরুষ আদি সত্ত্বর অববোধ হয়। উহা কাব্যে রস, চিন্তায় ভাব, বহুত্বে ধর্ম্ম বা একীকরণ শক্তি, সুখে অন্তর্মুখী আকর্ষণ, দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে বিভিন্ন ছিন্ন সত্তার অন্তরালে, এক মহান্ ঐক্যের যবনিকারূপে প্রকাশিত হয়। উহা স্নায়ুমণ্ডলীতে কেন্দ্র centre) বা (Ganglion),—অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রে 'দেবতা' প্রভৃতি বুদ্ধির কারণ। উহা ব্যক্ত হইলে 'পর' হইলেও) ব্যক্তের সহিত coneএর মত সম্বন্ধ। বুঝা গেল তমোগুণে বস্তু বুদ্ধি (definition) রজোগুণে শক্তি ও কার্য্যের (effect) সাপেক্ষ্য (cor-relation) ও সত্বগুণে কেন্দ্র বা অভিমানী দেহিবুদ্ধি (centre of consciousness) ভাব সকল প্রসূত হয়।

একণে সাধারণ ভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আচরণের কি ফল, তাহা দেখা যাউক। সাধারণ জীব অহঙ্কারের অধীন; সুতরাং একদিকে ত্রিগুণের খেলা ও অপরদিকে বিশিষ্ঠ অহংবুদ্ধি সর্ব্বব্যাপারেই পসূত হয়। মনে কর রাম সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করিতে সক্ষম; তাহার ভিতর তিন গুণের খেলায় কি ফল হইবে?

আমরা শারীরিক ব্যাপারে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র বা স্নায়ু-কেন্দ্র দেখিয়া ফেলি, আত্মার অভিব্যক্তিকে স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়ের খেলা বলিয়া ভাবি, এবং অপর পক্ষে স্নায়ু বা ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে খেলা দেখিতেই পাই না। তাহার কারণ কি? কেন যোগ-মার্গে বা ভগবৎ আরাধনা করিতে গিয়া বিবিধ লোক, শক্তি ও ব্যবহারিক খেলা দেখিয়াই আমাদের প্রযত্নের পরিতৃপ্তি হয়। সত্য বটে প্রাকৃতিক তিন গুণের খেলা হইতেই হইবে, এবং চৈতন্যের বিকাশের ফলে দ্রব্য ও বস্তু বুদ্ধি, রজোগুণে ক্রিয়া বুদ্ধি ও সত্বগুণে ভাব বা সত্তার উপলব্ধি না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির বিলাসের যে ক্রম আছে ও যাহা গীতোক্ত 'ভূমি আপ্' প্রভৃতি অষ্টভাবে ব্যবস্থিত হয়, সেই ক্রমের-বশে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রকাশ হইবে। যেমন ভুক্ত অন্ন বা খাদ্য মাত্র পরিণত হইলে মাংস হইতে বীর্য্য পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ যতদিন জীব প্রকৃতির অন্তর্গত থাকিবে ততদিন প্রত্যেক প্রযত্নের ফলে সপ্ত-ধাতুময় তত্ত্ব-মালার সংস্থান থাকিবে। কিন্তু অপরিণত খাদ্যাংশ মলমূত্র প্রভৃতি রূপে বাহির হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় উহাই আমাদের ভেদাত্মক জগৎ-বুদ্ধি। যে যতটুকু জগদ্ভাব

স্বরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাহাতে আর সে ভাবে জগৎ-জ্ঞান হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্যের বিলাসের ফলও তিনটী মাত্র ভাবে পরিণত হয়। প্রথমটী ভুক্ত খাদ্যের অপরিণতি,—সাধারণ জীব এই স্তরে থাকে; স্ত্রী পুত্রাদি বস্তু সকলকে জীব ভোগ করিতে যায়, কিন্তু বস্তুর সবটুকু ভোগ করিতে পারে না, তাহার অংশ বা একদেশ মাত্র লইয়াই জীবের তৃপ্তি হয়। এইরূপে সামান্য ও ক্ষুদ্র 'আমার সুখ' 'আমার দুঃখ' এই বোধ লইয়া ভোগ করিতে গিয়া, সংসারের হাটে সুখ দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া লইয়া থাকে। একটু হাসি কান্নার খেলায় পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন যাপন করে। সুতরাং ভুক্ত খাদ্যের অপরিণত অংশগুলি জগদ্-বস্তু রূপে থাকিয়া যায়, ও জীবকে পুনঃ পুনঃ ত্রিলোকের মধ্যে জন্ম-মরণ দোলায় চড়িয়া 'যাওয়া আসা' করিতে হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, সৌভাগ্য ক্রমে, মহাজন বা ভগবান কৃপায়, জীবের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান ফুটিতে আরম্ভ হয়। তখন জীব কেবল বস্তু লইয়া খেলা করিতে তৃপ্তি লাভ করে না। তখন কবিবর Wordsworthএর ন্যায় শিশু মানব দেখিতে পায় যে প্রকৃত ভোগ করিতে গেলে, বস্তুর বিশেষ ভাব আর থাকে না; যেন বস্তুগুলি ধরিতে গেলে 'হাত ফস্‌কাইয়া' কোথায় মিশিয়া যায়। ইহাই তাঁহার "The fallings of and vanishings of things।" স্ত্রী বা পুত্রের স্বরূপ বুঝিতে গেলে, আর বিশেষ বিশেষ নাক-মুখযুক্ত দেহী স্ত্রীপুত্রের ভাব থাকে না। আম্রের স্বাদের উপপত্তি হইতে গেলে, আর আম্রের আকারের দিকে দৃষ্টি প্রধানভাবে থাকে না। তখন জীব বলিয়া উঠে "কেবা আমি কেন মোদের জ্বারে তাপত্রয়।" তখন সে বুঝিতে পারে যে ভোগ্য বস্তুগুলি এক এক সামান্য ভাবের উপর স্থাপিত। সকল স্ত্রীর ভিতর দিয়া এক স্ত্রীস্বরূপ সামান্য স্ত্রীর জ্ঞান আছে, সকল পুত্রের ভিতর এক পুত্রত্ব বুদ্ধি আছে। ঐ বুদ্ধির বশে আমরা জন্ম জন্মান্তরে শত শত স্ত্রী পুত্র লইয়া খেলা করিয়া আসিতেছি; এবং যতদিন বুদ্ধির সহিত আমাদের 'আমির' প্রকৃত সম্বন্ধ না বুঝিতে পারি, ততদিন ঐ বুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয় না। জীব অনেক প্রকার আম্রের স্বাদ গ্রহণ করিয়াও আম্রের স্বরূপ বুঝিতে পারে না; কারণ তাহার দৃষ্টি স্বরূপের বা তত্ত্বের দিকে নাই; ভোগই তাহার সর্ব্বস্ব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আম্রের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিয়া দুই চারিটী আম্র খাইয়াই তাহার আম্র তত্ত্বের অবরোধ হয়। জগৎ জুড়ে লোক এতদিন চর্ব্ব্য-চোষ্য খাদ্য-বস্তু ভোগ

করিয়াও শরীর বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং তত্ত্বাববোধ না হইলে দ্বিতীয় স্তর বা মার্গে উপনীত হওয়া যায় না। তখন দেহ মন প্রভৃতি অষ্ট প্রকৃতির ভাব কিছু কিছু বোঝা যায়; তখন জগতের বিচিত্রতায় মধ্যে একতার জ্যোতির রশ্মি মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাও প্রাকৃতিক। এইরূপ জ্ঞান ও প্রযত্নের ফলে জীব উচ্চ উচ্চ লোক ও তত্ত্বের সত্ত্বা বুঝিতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা ব্যক্ত বা প্রকাশ ভাবের উপরে যাইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রোক্ত 'দেবযান' মার্গ; এবং ইহাতে সিদ্ধ জীব উচ্চ হইতে উচ্চতর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ঋষি পিতৃরূপে ব্রহ্মার সৃষ্টি ব্যাপারের সহায়তা করে, এবং জগতের আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু এ পথেও পুনাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না। "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"। অশরীরী আত্মার দর্শন না হইলে উপনিষদ্ মতে মুক্তি নাই।

ভাগবতের পথটী বুঝিতে গেলে আমাদের আমির সহিত ত্রিগুণ ও তাহাদের বিকারের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের রহস্য অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের 'আমি' জ্ঞান ও জগৎ জ্ঞানের মধ্যে এক ঘন সম্বন্ধ আছে। একথার ইঙ্গিত পূর্ব্বে করিয়াছি; কিন্তু কথাটা একটু বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। জীবনের অভিব্যক্তির মূল মন্ত্র (Formula or Equation) এইরূপ।

আমি = জগৎ (সত্ত্ব + রজঃ + তমঃ)

যাহার 'আমি' স্থূল-ভাবাপন্ন, তাহার জগতের ভাবগুলিও স্থূলে অবস্থিত; তমোগুণের বস্তু বুদ্ধি তাহাকে স্থূলরূপে লইয়া যায়। রজোগুণের ক্রিয়া-বুদ্ধি তাহাকে অন্যবস্তু ও মানবের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত দেখাইয়া দেয়, এবং সত্ত্বগুণে বিশেষ স্থূল জ্ঞানের উৎপত্তি করে। কিন্তু আমি সূক্ষ্ম বা কারণ ভাবাপন্ন হইলে, জগৎ ভাবের রূপান্তর হইয়া যায়। অতএব আমরা জগতের অভিব্যক্তির প্রথম নিয়ম বুঝিতে পারিলাম; যেমন আমি, তেমন জগৎ। আমি ছিন্ন ও ভেদ ভাবাপন্ন বলিয়া, আমাদের জগৎ ছিন্ন ও ভেদভাবাপন্ন হইয়া যায়।

অপর পক্ষে আমাদের জগৎ জ্ঞান যেরূপ, 'আমি' জ্ঞানও সেইরূপ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি কোন কারণে সূক্ষ্ম বস্তু সকল দেখিতে পান ও তাহাদের লইয়া খেলা করিতে পারেন, তাহার 'আমি' জ্ঞানও অল্পে অল্পে স্থূলত্ব ছাড়িয়া সূক্ষ্ম হইয়া যায়। এই জন্য শাস্ত্রে পুরুষ, দেবতা, পিতৃ প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের কথা বলা হয়। ঐ সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে গিয়া, মানব আপনার সূক্ষ্ম ভাব

দেখিতে পায়। সুতরাং দ্বিতীয় নিয়মটী এই,—যেমন জগৎ, তেমন আমি। জগৎটীকে বড় কর, তুমিও বড় হইবে; জগতের ভিতর একত্বা স্থাপনা কর, তোমার ভিতরও ঘন একত্বের স্থাপন হইবে। জগতের প্রাণীর প্রতি প্রেম কর, তোমাব ভিতরও প্রেমময়ের আভাস ফুটিবে।

এইরূপে "আমিকে" লইয়া ত্রিগুণের খেলা। এই খেলা ব্যক্ত সর্ব্বলোকে আছে। যেমন বীজ আপনাকে বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত করিয়া ফলপুষ্পছায়ায় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে,—সেইরূপ যতক্ষণ আমাদের আমিতে একটুমাত্র ভেদবুদ্ধি থাকে ও বাহিরে আসিয়া অভিব্যক্ত হইবার প্রবৃত্তি থাকে—যতক্ষণ "আমি"টীর অসম্পূর্ণতা পূর্ণ প্রয়াস থাকে,—যতক্ষণ জগৎরূপ সংস্থা বা Seriesএর সাহায্যেই পরিপূর্ণতার অন্বেষণ করিতে হয়—ততক্ষণই ত্রিগুণের খেলা থাকিবে। জীব বা পুরুষ চৈতন্যকে আমবা ভাব রূপে কল্পনা করিতে পারি। এই ভাবটী যাহার সাহায্যে চিত্ররূপে বাহিরে অঙ্কিত হয় তাহাকেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি বলে। সুতরাং ভেদভাবে থাকিয়া, জীব যতই উন্নত বা ধার্ম্মিক হউক না কেন—তাহার ফলে তাহাকে জগৎরূপে অবস্থিত হইতে হইবেই হইবে।

নিঃশ্রেয়স বা পবমার্থ লাভ কবিতে হইলে, ত্রিগুণের উপরে যাওয়া আবশ্যক। কি প্রকারে যাওয়া যায়—তাহা লইয়াই ষড়্‌দর্শন। জগৎ ভাবটিকে ঈশ্বরার্থে প্রয়োগ করা 'ন্যায়' শাস্ত্রেব উপদেশ। এরূপ ভাবে সাধনা করিলে "আমি"টীও ঈশ্ববেব দাস বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাতে ত' জগৎ ভাবের অবসান হয় না। উহাও ত' খেলার কথা। কাম-ক্রোধাদির বশ হইয়া বস্তু লইয়া খেলা করা, আর জগতের ভিতরে ঈশ্বরের নিয়ম প্রভৃতি দেখিয়া খেলা করা ত', একই প্রকার। সত্য বটে, তখন জীব অতন্দ্রিত হইয়া খেলা করিতে পারে, কিন্তু তখনও ত বস্তু বুদ্ধি গুণ কর্ম্ম প্রভৃতির ভ্রান্তি ঘুচে নাই ও সেইজন্যই স্বরূপের উপলব্ধি হয় নাই। জীবের স্বরূপের সহিত জগতের স্বরূপের মিলন হয় নাই। এক জনকের সন্তান বলিয়া দুই ভ্রাতার ভিতর যে সৌহার্দ্দ্য থাকে, তাহাত' স্বরূপগত নয়। সুতরাং সাংখ্য-মতে জগৎরূপের খেলার ভিতর পুরুষের প্রয়োজন বা স্বার্থ দেখিতে হয়; শুধু খেলার সম্বন্ধ দেখিলে আর চলে না। জগতের অভিব্যক্তি যে কেবল আমার আমিটিকে দেখাইবার জন্য, ইহাই সাংখ্যের দৃষ্টি। তাহার ফলে, পুরুষ খেলার অন্তরালে আপনার স্বরূপ খুঁজিতে যায়। কিন্তু এমতেও দোষ রহিয়া যায়। যদি তুমি

পুরুষই হইলে, তবে আর তোমার খেলার প্রয়োজন কি? যদি তুমি শুদ্ধ বিবিক্ত চৈতন্য মাত্র হইলে, তবে প্রকৃতির দিকে আড়নয়নে প্রয়োজন দেখিবার কি আবশ্যক আছে? সুতরাং এ অবস্থাতেও পুরুষকে প্রয়োজন বা স্বার্থ-সিদ্ধির রজ্জুতে প্রকৃতির সহিত সংবদ্ধ থাকিতে হয়। ইহা প্রোজ্ঝিত-কৈতব সাধন নহে, ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত নহে। সত্য বটে আর ক্ষুদ্র কামনা নাই,—কিন্তু দৃষ্টিতে ত কাম রহিয়া গেল, ভেদ রহিয়া গেল, অপূর্ণতা রহিয়া গেল। প্রকৃত পুরুষবুদ্ধি যদি ফুটে, তবেই ত প্রকৃতির দ্রষ্টা হইবে? কিন্তু পুরুষবুদ্ধি ফুটে কি প্রকারে?

তখন বেদান্ত আসিলেন এবং প্রকৃতির খেলার ভিতর সর্ব্বাত্মিকা বিস্তার বীজ প্রদান করিলেন,—বলিলেন "বিশ্বাত্মিকা সার্ব্বজনীনভাবে অবস্থিতা প্রকৃতি ত' শুধু রাম শ্যামের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য খেলে না। কত কোটী রাম শ্যাম বুদ্বুদের মত উৎপত্তি হইয়া লয় হইয়া যাইতেছে, তবুও ত প্রকৃতির খেলা থামে না। অতএব ও ক্ষুদ্র দৃষ্টি ত্যাগ কর। দেখ প্রকৃতি সকল আত্মার জন্যই খেলিতেছে।" ইহাই বেদান্তের প্রথম স্তর। সবই ব্রহ্ম—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তোমার আপনার ক্ষুদ্র পুত্র-শোকটীকে শুধু "আমার বন্ধন ছেদ করিতে হইতেছে" বলিয়া ভাবিও না; দেখ সকল জীবেরই এই প্রকার দুঃখ ভোগের বীজ আছে। 'দুঃখ' আছে বলিয়া যাহাকে ভাব—সেও দেখ সার্ব্বজনীন তত্ত্ব; সার্ব্ব-জনীন বলিয়াই উহা ক্ষুদ্র 'রাম শ্যাম' পুরুষবুদ্ধির প্রসূত নহে। উহার ভিতর এক মহান্ চৈতন্য ও তাঁহারই খেলা আছে। তোমার "আমি"টী যে সর্ব্বপ্রকার বস্তুও ত্যাগ করিয়া বেশ থাকিতে পারে, ইহা দুঃখ রোগ শোক মৃত্যু না থাকিলে কি বুঝিতে পারিতে? তোমার আমিটী যে আত্মা, উহা যে সব ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে—ইহাই ত' দুঃখের উপদেশ। প্রাকৃতিক বিলাস মাত্রই ক্ষণস্থায়ী ও তোমার আত্মার একদেশস্থিত; ইহাই ত শিখাইবার জন্য দুঃখ আসিতেছে। সার্ব্বজনীন তত্ত্বে তোমার ক্ষুদ্র 'আমির' কি স্বার্থ থাকিতে পারে?

তারপর আর এক স্তরে উপনীত হইয়া দেখ "সবই ত' আত্মা, সবই ত' তোমার প্রকৃত "আমি"—পুত্রটীও তোমার প্রকৃত আমি। তোমার "আমি" বলিয়াই ত', সে কেবল বাহিরে থাকিয়া, বস্তুরূপে থাকিয়া—আর আমির বিরহ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, মৃত্যু-পথে "আমির" সহিত মিশিয়া যাইতেছে। এত সাধের পুত্র দেখ বস্তুরূপ ত্যাগ করিয়া স্মৃতিরূপে তোমাতে রহিল। তারপর স্মৃতিরূপও ত্যাগ করিয়া, প্রজ্ঞানের ভিতর দিয়া তোমার

'আমির' স্বজাতীয়রূপে—তোমার ভিতর আসিতেছে। তোমার আমি জ্ঞানটীও সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ও উচ্চতর ভাবে অবস্থিত হইতেছে। তারপর বাহ্যলীলাটীও যে তোমার "আমি" ছাড়া আর কিছুই নহে—ইহা দেখাইবার জন্য অবশেষে তোমার আমিতেই ত জগৎবুদ্ধির অবসান হইয়া যাইতেছে। বালককে যেরূপ অনেকগুলি অঙ্ক কসাইয়া অঙ্কের মূল তত্ত্বটী তাহার ভিতর প্রকটিত করান হয়, সেইরূপে 'সবই আত্মা' এই অঙ্কটী লইয়া কসিতে কসিতে, সকল বস্তুই যেই বৃহৎ ব্রহ্মেরই আভাস ও প্রতিষ্ঠা ইহা বুঝিতে পারিবে, জগৎ ব্রহ্মরূপে তোমারই ভিতর প্রবেশ করিবে। ভিতরে তাঁহাকে চিনিতে না পারিলে, বাহিরে ত' তাঁহাকে চেনা যায় না। সেই জন্যইত বেদান্ত, ভিতরে সাধনার জন্য "আমি বুদ্ধির" নির্ম্মলতা সাধারণের জন্য বলিলেন 'সোহহম্' "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" 'হে জীব তুমিও তাই।' পল্লবগ্রাহী বৈদান্তিকেরা ও তাহাদের প্রতিপক্ষেরা এই রহস্যটী বুঝিতে পারে না। বাহিরের বেলা বেদান্ত বলিলেন 'সবই ব্রহ্ম' আর ভিতরের বেলা বলিলেন "তুমিই তিনি"। বাহির তাঁহাকে "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" নির্দোষ সম ঘন একরকম অথবা পরাভাবের গাঁতরূপ, ঘনরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিছুই ছোট ক্ষুদ্র বস্তু নহে। দেখ দেখ উহা হইতে বৃহত্তর মহত্তর সম বা একরস ভাব নাই। উহা সর্ব্ববস্তুর সহিত সমন্বিত ও সম্পর্কিত; উহা বৃহৎ 'ব্রহ্ম' ভাবাপন্ন বলিয়া চিনিয়া লও। তাহার কারণ এই যে বাহিরের খেলা ত বহুত্বের খেলা সংখ্যার খেলা। উহা একতা জ্ঞানেই-পরিসমাপ্ত হইতে পারে; ঘন সমরস, এক বুদ্ধিতেই উহার নিবৃত্তি হয়। দেখ ছিন্ন বস্তু নাই, দ্রব্য বা বস্তু মাত্রেই সেই অদ্বৈত বা একতার বিকাশ। দেখ ছিন্ন ক্রিয়া নাই; কারণ ক্রিয়ামাত্রেই বিভিন্নপ্রায় দুইটী বস্তুকে কি কৌশলে মিশাইয়া পুনরায় একত্বের স্থাপনা করিতে প্রয়াস করিতেছে। দেখ ছিন্নভাব বা সত্তা নাই, থাকিলে কি বস্তু আর তুমি মিশিয়া এক হইতে পারিতে? বস্তু কি, সুখ-স্বরূপে আত্ম-স্বরূপে তোমাতেই পরিসমাপ্ত হইতে পারিত? জীবনের রহস্যের ভিতর তোমার ভেদাত্মক আমির কাজগুলি দেখিতে যাইও না। উহা যে ভগবানেরই ব্রহ্ম-ভাবের বিকাশ, তাহা দেখিতে শিখ।

এস ভিতরে এস, আর এক ভাব দেখিতে পাইবে। 'আমির' দিকে চাহিয়া দেখ; উহাতে সর্ব্বভাবের পরিসমাপ্তি হইলেও, দেখ সতত কিরূপে শুদ্ধ অবিকৃত সত্তা সর্ব্বভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই থাকিতে চাহিতেছে। ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত খেলা লইয়া খেল; অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবে যে ব্রহ্মাণ্ডের খেলাও সেই

আমি একক্ষণের তৃপ্তিও সাধিত করিতে পারে না। পরক্ষণেই দেখ তোমার আমিটী সেই এইভাবের খেলা ত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনিই মিশিয়া যাইবে। পাঠক! দিনভোর নানাপ্রকার আমোদের ভিতর তরঙ্গায়িত হইয়া, নাচিতে নাচিতে, দেখ তোমারই মনে কি এক পরাভাব জাগিয়া উঠিল, যে তুমি অন্তর্মুখী হইয়া ভাবিয়া ফেল "এ, কি হইতেছে"? ওই দেখ আর খেলা-তরঙ্গ তোমাকে নাচাইতে পারে না। রতিবিলাসে মন্মথের প্রকট বিভবে তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া, পরক্ষণেই তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? সাধের খেলা ও বিভ্রম পড়িয়া গেল ও একমুহূর্ত্তের জন্য তুমি দেখিতে পাইলে যে এত আনন্দের, এত সুখের, স্রোতের বিভ্রমও তোমার আমির একদেশে স্থিত। বলিতে পার কাহার প্রকাশে মন্মথও মূর্চ্ছিত হইয়া গেল? কাম গায়িত্রীর ব্যাহৃতিগুলি, গায়িত্রী শিরের ভিতর দিয়া, দেখ, তোমায় কোথায় লইয়া গেল? বাহির ভিতর মিলিয়া গেল, স্বপ্রকাশতত্ত্ব আনন্দস্বরূপ ভগবানই রহিয়া গেলেন।

ইহাই বেদান্তের প্রকৃত ভাষা। ইহা নীরস তর্কবিজৃম্ভিত মায়াবাদ নহে। ইহাই জীবহৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্য ভাগবতের উপদেশ।

প্রথম প্রশ্নের সমাধান "সর্ব্বকে" লইয়া। "সবই যে ব্রহ্ম"। দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানে বুঝিতে হইবে "তুমিও সেই"। এই দুটি ভাবের কথা আজ-কাল বোধ হয় সকলেই জানেন; কিন্তু এ দুটির ভিতরে রহস্য যে কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারিয়াছেন বা বুঝিতে চান, তাহা বিশ্বাস হয় না। 'সবই ব্রহ্ম' ইহা এই ভাবের উপলব্ধি করিতে হইলে, 'সর্ব্ব' কথাটির ভিতর একটি ঘন একত্বের আনন্দময়ত্বের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া চাই। শুধু "যা পঞ্চ মিলে বা" বলিয়া ঘাড় ধরিয়া সর্ব্বভাবটিকে এক অপরিজ্ঞাত ব্রহ্মভাবের সহিত একই স্থানে রাখিলেই হইবে না। কিংবা ইহা ভাবিলে চলিবে না যে, যে কোন একদিন কোন বাহ্যিক (external) আকস্মিক (accidental), শক্তির বশে হঠাৎ সর্ব্ববুদ্ধিটি ঝাঁ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম অর্থেও আমরা সচরাচর একটা কিম্ভুত কিমাকার অনির্ব্বচনীয় পদার্থ বলিয়া ভাবি। আমাদের 'সর্ব্ব'ও কতক-গুলি বিশেষভাবের পুঁটুলিমাত্র। কাজেই দুইটি অপরিজ্ঞাত অননুভূত পদার্থের একীকরণ (Equation) করাই যেন আজকার সাধনা। সুতরাং এই মহা-ভাব বা মহাবাক্যের মূলে যে কোন স্বাভাবিক সতঃসিদ্ধ সত্ব বা শক্তি আছে, তাহা না বুঝিতে পারিলে, কি করিয়া 'সর্ব্ব' ভাবটিকে ব্রহ্মপদে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

তারপর "আমিও তাই" এ কথাটিও প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইবে। সুতরাং "আমি" শব্দের ভিতর ডুব্ মারিয়া দেখিতে হইবে যে তাহার ভিতর কোন স্বরূপে মিশিবার পরণতা, প্রবৃত্তি, শক্তি বা সামর্থ্য আছে কিনা। যদি না থাকে, তাহা হইলে মানবের এই প্রয়াস বাস্তবিকই মিথ্যা ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রথমে আমরা সর্ব্বের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব, ও তৎপর বারে 'আমি'র সহিত সর্ব্বের সম্বন্ধ ও পরে আমির কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"—'এই সবই ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য উচ্চারিত হইলে আমাদের মনে হয় যে 'এই' বা ইদং' নামধেয় বস্তু সকল ব্রহ্ম। আমি একটী মানুষ দেখিতেছি, আর তুমি বলিয়া উঠিলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। যদি দৃষ্ট অবয়বী ছিন্ন মানুষটীই ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে 'খলু' শব্দের অর্থ থাকে না। 'খলু' শব্দে বুঝা যায় যে আপাততঃ যে ভাবে দৃষ্ট হউক না কেন, সে দৃষ্টভাব লইয়া শাস্ত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে চলিতেছেন না। যাহা সকলেই দেখিতে পায়, তাহার স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের আবশ্যকতা নাই। 'খলু' শব্দে শাস্ত্র আমাদিগকে দৃষ্টভাবের পশ্চাতেই অন্বেষণ করিতে বলিতেছেন। তারপর 'সর্ব্ব' শব্দের প্রয়োগ কি? শুধু 'ইদং খলু ব্রহ্ম' বলিলেই ত' চলিত। 'খলু' শব্দে যেমন এক অপরিজ্ঞাত ভাষায় বা গতির ইঙ্গিত করিল। যেমন ব্যক্তভাবের অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া গীতা—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।

ব্যক্তের পশ্চাতে এক মহত্তর অব্যক্ত সত্তায় উপলব্ধি করিতে উপদেশ দিলেন, তদ্রূপ 'সর্ব্ব' শব্দে কি ইঙ্গিত করা হয়? কিন্তু হায়! কয়জন ব্যক্ত ছাড়িয়া অব্যক্তে প্রাণ ঢালিতে পারে, কয়জন বাস্তবিকই অব্যক্তের জন্য প্রয়াসী; কয়জন প্রত্যেক বস্তু সর্ব্বভাবেই দেখিতে চায়? কৃষকের স্বার্থসিদ্ধি যতটুকু পরিমাণে মেঘের দ্বারা সিদ্ধ হয়, সে মেঘ অর্থে ততটুকুই বুঝে। মেঘের ভিতর যে অশনিশক্তি আছে, তাহা গ্রহণ করিতে বলিলে সে পিছাইয়া যায়। সুতরাং কি করিয়া তদ্দ্বারা মহাবাক্য সিদ্ধ হইতে পারে? যে বস্তুর সবটী লইতে পারে, বস্তুকে সর্ব্বভাবে পাইতে যাহার সাহসে কুলায়,—যে

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মিত্রঃ করুণ এবচ।"

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

যো ন হৃষ্যতি নদ্বেষ্টি প্রাপ্যাপ্রাপ্য শুভাশুভং।

সেইত—'সর্ব্ব' ভাব বুঝিবার অধিকারী। ইহাই 'সর্ব্ব'শব্দের প্রথম স্তরের অর্থ।

মানব ইহা লইতে চায় না বলিয়া শাস্ত্র বস্তুর অর্থ বাড়াইয়া দেন ; একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ছিল পিতা, হইল—' পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।" বস্তুর সর্ব্বভাব লইতে শিখ, সাময়িক প্রয়োজন বশতঃ যে ছিন্ন জ্ঞান হয়, তাহা লইয়া তৃপ্ত থাকিও না। এইরূপে হিন্দু সামান্য বস্তুব ভিতব 'পিতা দেবতা' প্রভৃতি উচ্চতর শক্তিব বিলাস দেখিতে শিখিত, এবং তদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বভাবেব ভিতব দিয়া অনুস্যূত একত্বেব বুদ্ধি অল্পে অল্পে ফুটিত। এই মহাভাব শিখাইবার জন্য সুখের পশ্চাতে দুঃখ, আলোকেব পশ্চাতে আঁধাব, ও জীবনের পশ্চাতে মৃত্যুর ব্যবস্থা হইয়াছে। তুমি হাজার চেষ্টা কব না কেন, তোমাকে বস্তুর সবটা লইতেই হইবে। স্বাধীন প্রেমেব অনুশীলন করিতে গেলে, তাহাব সহিত নানাবোগের ভার লইতে হইবে। আমবা মুখে বলি 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' কিন্তু কাজে কেবল সুখটাই লইতে চাই।

এইরূপে বস্তুর সর্ব্বভাব লইতে গেলে দেখিবে যে, যাহাকে 'ইদং' ভাবে বর্ণিত করিতে, তাহার ভিতব কি এক মহত্তব ভাব আছে। উহা ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্তু নহে ; উহার সহিত তোমার সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও এমন কি ভগবৎ প্রাপ্তির সম্বন্ধ আছে। সামান্য ক্ষুদ্র Microbe টীব সহিত দেখ তোমার জীবনের কি ঘন সম্বন্ধ। বিষয়স্তরে বস্তুগুলিব ভিতবেও এই একত্বের আভাস দেখিতে হইবে। এই স্তবে থাকিয়াই লোকে বহুরূপী নানাত্বব উদ্ভব-স্থান বা একত্ব খুঁজিতে যায়। এই প্রয়াসেব বশে প্রথমে মহাভূত, তার পব ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমোন্নত একত্বের আভাস পাওয়া যায়। এইরূপে ভিতবে ও বাহিবে সর্ব্বাত্মক একত্বের আভাস পাইয়া জীব বুঝিতে পারে, যে পত্যেক ছিন্ন বস্তুগুলি এক অনির্ব্বচনীয়, অপরিজ্ঞাত, মহান্ হইতে মহত্তর, ব্যাপকের ব্যাপক, ঘন ভাবের বিলাস মাত্র। ব্রহ্মশব্দে প্রথমে বৃংহণশীল মহত্তর গতিকে বুঝায়। সকল বস্তুই যে সেই গতিব আভাস মাত্র, ইহাই বুঝার নাম "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সর্ব্বভাবে সর্ব্বাবস্থায় যিনি এই মহত্তব ভাবের কথা ভুলেন না, যিনি শোকে দুঃখে, সুখে ও হর্ষে, পাপে পুণ্যে, ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, এই মহত্তব সত্তায় বা গতির ইঙ্গিত পান, এবং বিশিষ্ট বস্তু মাত্রকেই সেই মহত্তব ভাবের অভিব্যক্তি স্থান বলিয়া বুঝেন, তিনিই এই 'সর্ব্বের সাধনায়' ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন।

প্রথমেই মানব ভিতরে ভগবান বা 'আমি'র সত্তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া এই ভাব সাধনা করিতে আরম্ভ করে। দুঃখ আসিল ও দুঃখকে দুঃখ বলিয়াও বোধ হইল ; কিন্তু তত্রাচ সাধক বলে—"না, তাহা হইতে পারে না, এই দুঃখের

ভিতরে নিশ্চয়ই তিনি আছেন।" এইরূপে প্রত্যেক ব্যাপারে সুকৌশল প্রযত্নের সাহায্যে, সে পর একত্বের ভাবটীকে ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। ইহা 'অহং'-পর বা 'জীব-পর' সাধন। জীব চেষ্টা করিয়া এই ভাবে সিদ্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাগবত জীব-পর নহে। ভাগবতের মহত্তর ভাব জীবের প্রয়াসের উপর নির্ভর করে না। পুনরায় দেখা যায় যে তন্ত্রোক্ত সাধনা মতে মন্ত্র প্রভৃতি শক্তির বলে, পঞ্চ মকারাদি সাধন করিলে, তাহার ফলে ঐ সকল বস্তুকে আসক্তি না জন্মাইয়া সাধকের চৈতন্য তদতীত মহত্তর ভাবের আভাস পায়। এ ক্ষেত্রে মহত্তর ভাবের প্রকাশ, সাধনায় বিশেষ কৌশলের উপর নির্ভর করে। ভাগবত কি এইরূপ ভাবের কোন কৌশলের উপদেশ দেয়? না। ভাগবতের উপদেশ কৌশল-পর নহে। আবার অনেকে ভাবেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাম মন বুদ্ধি প্রভৃতি একে একে ফেলিয়া দিতে পারিলে, চিত্ত স্বরূপ ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাতঞ্জল দর্শনের ভিতর এরূপ ভাবের সাধনার কথা আছে। এ সকল সাধনা ক্রিয়া-পর। ক্রিয়া বা সাধনা না করিলে এ ভাব ফুটিবে না। এইরূপে দেখা যায় যে মানবের সাধনা দ্রব্য, কৌশল, ক্রিয়া ও অহং-পর হইয়া যায়। এ সকল ভাবের সাধনার আমরা কোন নিন্দা করি না। পরন্তু এ সকল সাধনার মূলে যে সত্য ভাব আছে, তাহা ভাগবতের মূল সত্যের অনুকরণ বলিয়াই বুঝি।

তবে এ বিষয়ে ভাগবতের উপদেশ কি? ভাগবত বেদান্তেরই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মহাবাক্যের স্বরূপটী ফুটাইবার জন্য বলেন, যে মানব 'ইদং' ভাবের পশ্চাতে ভগবানের সত্তায় কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়া, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া, যে কোন বৃত্তি যদি ভগবানের দিকে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভিতর ভগবানের ভাব ফুটিবেই ফুটিবে। তা'ই ভাগবত বলেন—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমেকং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১০।২৯।১৫

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, কোন প্রকার সম্বন্ধ-জনিত যে কোন প্রকার বৃত্তি শ্রীহরিকে নিত্য বিশেষভাবে প্রয়োগ করিলে দেহিগণ তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করেন। ইহাই ভাগবতের মূল উপদেশ;—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের প্রকৃত প্রয়োগ। আমরা আগামী বারে ভাগবত হইতে এই ভাবের বিকাশগুলি উদ্ধৃত করিয়া, ইহার রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

অবিনাশী।

কি ভয় আমার কি ভয় আমার
কি ভয় আবার মোর গো,
অনন্ত আকাশ জুড়ে বিশ্বভবে
এইত জীবন মোর গো ॥
তোমরা ভাব এ দেহ 'আমি'
আমি কিন্তু আকাশগামী
জন্ম মৃত্যু কিছুই মোর
কভু নাহি হয় গো ॥
দেহের জনম, দেহের মরণ ;
আমার নাইক জনম মরণ ,
আমি নিত্য-শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ
আমার কোথা ক্ষয় গো ?
সাগরের ঢেউ কূলে লাগে
তাতেই কূলে জীবন জাগে,
দেহের কূলে জীবনের ঢেউ
লাগছে সদাই দেখ্ গো ॥
কূল যদি বা ধসে যায়
সাগর কি তাই ক্ষয়ে যায় ?
সে যেমন ছিল তেমনি থাকে
তার কমি বেশী নাই গো ॥
আকাশ থেকে জীবন আসে
আকাশেই এ জীবন মেশে,
জন্ম মৃত্যুর কতই খেলা
ক্ষণে ক্ষণেই হয় গো ॥
যখন তটটা ভেঙে পড়ে
তখন ভাবি গেলাম মরে ,
জনম মরণ আছে কিরে
আমি মৃত্যুঞ্জয় গো ॥
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম
যত খেলাই দেখতে পাও,
সবার মাঝে সেই মহাকাশ,
এই কথাটি বুঝতে চাও ॥
সেই ভানুর সোনার করে
জগৎ আলো করে যায়,
সেইত চাঁদের স্নিগ্ধ করে
সুধার ধারা বেয়ে যায় ॥
অগ্নিতে তা'র দীপ্তি ফোটে,
বায়ুতে তা'র বইছে প্রাণ,
অপের মাঝে জীবন রূপে,
কর্‌ছে জীবের জীবন দান ॥
ক্ষিতিতে তার অপার শক্তি
দেখে চমক ভেঙে যায়,
ফুলেতে যে গন্ধ শোভা
মাটি থেকেই কেমন পায় ॥
ওষধি ও বৃক্ষ মাঝে
কতরূপ এই ফুলে ফলে
অপূর্ব্ব তার গুণের বিকাশ
দেখে নয়ন ভাসে জলে ॥
মায়ের বুকে স্নেহের ধারা
চলেছে কেবা দিবস রাত ?
নর নারীর চোখে চোখ
এ কার হেরি আঁখি পাত ?

কার্ জীবনের জোয়ার এসে
মোদের জীবন ভরে উঠে,
কোন্ প্রাণের ঢেউ অসেছে নিতুই
লাগছে সবার দেহতটে ॥
দেহতট তো নইকো "আমি"
দেহের বাইরে পরব্যোম্ ,
সেইত আমার "পরম আমি"
সেই "আমির" নিকেতন ॥
আমার 'আমি' দেহেতে নাই
আমার আমি বিশ্বময়,
প্রাণ-সাগরের ঢেউ লেগেছে
তা'তেই দেহ প্রাণময় ॥
ঢেউরের স্বভাব আসা যাওয়া
তাতেই জন্মমৃত্যু হয়।
ভেবে দেখ শ্বাসে শ্বাসে
কতই জন্ম, কতই লয় ॥
মরণ কেন বলচ তারে
শ্বাসের শেষতো মরণ নয়,
মহাকাশ যে পূর্ণ প্রাণে
শ্বাসরূপে সে দেহে বয় ॥
উর্দ্ধ অধঃ সকল দিকে
প্রাণেভরা মহাকাশ,
সেই আকাশে দেখ আমার
অরূপ সত্বার নাইকো নাশ,
দেহের মাঝে নইত শুধু,
আমি ব্যাপ্ত বিশ্বময়
নিত্য অবিনাশী আমি
চিদানন্দ জগন্ময় ॥

ভগবৎ কৃপা।

'ভগবৎকৃপা' অতিশয় প্রচণ্ড এবং সুস্পষ্ট। তাহার সর্ব্বত্রই যে মধুরতা আছে, তাহাও নহে। মধ্যে মধ্যে মাধুর্য্যের ছড়াছড়ি আছে বটে, কিন্তু তাহার ভীষণতা ও প্রচণ্ডতার কথা মনে করিলে, সময়ে সময়ে হৃৎকম্প হয়। আজ আমরা আরাম-চেয়ারে বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয়ে উদর পূর্ত্তি করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত বঙ্গদেশের বিষয় যদি আলোচনা করি, তবে দুর্ভিক্ষের সত্যরূপটি আমাদের কাছে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। দুর্ভিক্ষের কি ক্লেশ, তাহা অনশনক্লিষ্ট না হইলে তাহার তীব্রতা অনুভব করা এক প্রকার অসম্ভব। তবে যে আমরা সংবাদ পত্রে পড়িয়া শোক প্রকাশ করি বা দুর্ভিক্ষফণ্ডে কিছু দান করি, বা প্রতিবেশী-দিগের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পাঠাইয়া দিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করি তাহার অনেকটাই কল্পনা ও কবিত্ব। সহানুভূতিটা যে একেবারে ষোলআনাই মিথ্যা, তাহা বলিতেছি না। আমার যখন ক্ষুধা পায়, তখন আমার ঘরে যা কিছু থাকে, তাহাই দিয়া আমি আমার ষোলআনা ক্ষুধাই

মিটাইয়া থাকি। নিজের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য কাহারও যেমন পরামর্শ চাহিতে হয় না, সাহায্য চাহিতে হয় না ; নিজেই ষোলআনা ব্যবস্থা করি, সেরূপ অপরের দুঃখ মিটাইবার প্রয়াসের মধ্যে তখনি ষোলআনা মিটাইবার ইচ্ছা জন্মে যখন তাহার দুঃখটাকে সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি! সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারাই, সম্পূর্ণ অনুভূতি। তখন দু চার পয়সা চাঁদা দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করি না, বা লোকের বাড়ী চাঁদার খাতা বহিয়া বহিয়া লোককে উত্যক্ত করিয়া বেড়াই না। সক্ষম হৃদয়বান্ ব্যক্তি প্রথমেই চাঁদার খাতা লোকের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত করে না। সে সর্ব্বাগ্রে তাহার সর্ব্বস্ব লুটাইয়া দিয়া, পরে প্রয়োজন হইলে পরের দ্বারে হস্ত পাতিয়া থাকে। বাস্তবিকই যে নিজের সর্ব্বস্ব দিতে না পারে, সে অপরকে সে কাজের ভার গ্রহণ জন্য অনুরোধ করিতে পারে না। কার্য্যোদ্ধার বা সুবিধা অসুবিধা তো আসল কথা নহে। আসল কথা হৃদয়ের নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভাব! তাহার যদি বিকাশ না হয়, তবে সে তো "অকর্ম্ম"। সন্ন্যাসে বা ত্যাগে যিনি অভ্যস্ত—তিনিই ভগবৎকৃপার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন।

আমি একটা বিপদে পড়িয়াছি, আর তিনি সেই বিপদটি উদ্ধার করিয়া দিলেন, —ইহাতেই সে ভগবৎকৃপায় পরাকাষ্ঠা দেখিতে পায় সে নিতান্তই দীনাত্মা, কারণ এমনও তো অনেক সময় আসে, যখন প্রার্থনা করিলেও বিপদের আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায় না। বিপদে উদ্ধার লাভ বা মনস্কামনার চরিতার্থই যদি তাঁর কৃপার লক্ষণ হয়, তবে এসময় তার চিত্ত যে বিদ্রোহী হইবে না তাহাই বা কে বলিল? সুখ দুঃখের মধ্যে সর্ব্বদা যাঁহার চিত্ত নির্ব্যাকুল তিনিই তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে পারেন। ভক্তের ভগবানের প্রতি এমনই প্রবল আকর্ষণ জন্মে যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সে কোন বিপদ্‌কেই বিপদ্ বলিয়া মনে করে না। যাহার হৃদয় ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় কাতর সে কিরূপে তাহা ষোলআনা পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে। ভক্তও কখন ভগবান্ এবং সংসারের সহিত রফা করিয়া লইতে পারে না। সে যখন তাঁহাকে চায়, তখন ষোলআনা প্রাণ দিয়াই তাঁহাকে চায় ; সংসারের পানে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে না ; সংসার-থাক বা যাক্, তাহাকে সে কিছুগণ্য করে না। ভক্তের ভগবানের প্রতি কেমন টান যেমন জননীর প্রতি শিশুর হইয়া থাকে। শিশুকে জননী যদি মারেন, তবুও সে জননীকেই আঁকড়িয়া ধরে; তাঁহাকে ছাড়িয়া সে সুখও পায় না শান্তিও পায় না। ভক্ত ও ভগবানকে এইরূপ ভালবাসেন। "তাঁহার হাতের বেদনার দান" পাইয়া সে বিচলিত হয় না বা তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ইহারই নাম অহৈ-

ত্তকা প্রেম! ভগবানকে ভক্তি করিলেই যে পুনঃ পুনঃ বিপদাপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, এরূপ নহে। হয়ত এত আকস্মিক এবং অবিচ্ছিন্ন বিপদের বাত্যা বহিতে আরম্ভ করে, যে প্রাকৃত ভক্তের পক্ষে তাহা ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করাই অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত দুঃখে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখে বিগতস্পৃহ। তাঁহ উপর্য্যুপরি বিপদ্‌পাতেও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না। যদি সমস্ত জীবনেও এই বিপদ্ বাত্যার বিন্দুমাত্রও হ্রস্বতা না ঘটে, তথাপি ভক্ত অণুমাত্র তাঁহার কৃপায় সন্দেহ করেন না। তাই ভক্ত হাফেজ'ক বলিতে শুনি "প্রেমিকদিগকে অনলে বিসর্জ্জন করা বন্ধুর অনুগ্রহের অভিপ্রায় হইলে, যদি আমি 'কউসর' নামক স্বর্গীয় সরোবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে আমি ক্ষীণদৃষ্টি ও মন্দ-ভাগ্য।' ভক্ত সম্পদেও যাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া গত-সন্দেহ, বিপদেও তাঁহার জগজন-মনোহর মুখ-শোভা দেখিয়া একেবারে সংশয়-শূন্য! কিন্তু ভগবৎ-কৃপা সময়ে সময়ে কি সুভীষণরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা স্মরণ করিলেও চিত্তে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। প্রহ্লাদকে অগ্নিকটাহের মধ্যে প্রক্ষেপ করিতেছে; ভক্ত প্রহ্লাদ আপনার জীবননাথকে আত্মসমর্পণ করিয়া তখনও বিশেষ ব্যাকুল নহে। এ যে কত গভীর বিশ্বাস ও দৃঢ় নির্ভরতার পরিচায়ক, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। একটি অঙ্গুলির কোণ মাত্র দগ্ধ হইলে, আমাদের চিত্ত যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে, আর ঠিক আমাদেরই মত একটি প্রাণী সশরীরে সজ্ঞানে ভগবানের প্রেমের জন্য আত্মহারা হইয়া এইরূপ ভয়ঙ্কর যাতনাকে যখন স্বীকার করিয়া লয়, তখন তাহার চিত্তের মধ্যে এক সাধারণ অননুমেয় শক্তির প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তের এ মহিমা, এ মনোবল, অভক্ত আমরা কিরূপে বুঝিব? যাহারা চিরকাল আরাম খুঁজিয়া বেড়ায়, একটু কষ্টও যাহাদের নিকট অসহ্য, তাহারা কখনও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বা ভগবান রামচন্দ্রের বনবাস-ক্লেশের কথা কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ যিনি ভগবানকে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া অধৈর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না। কল্পনার জোরে বা পুঁথি পড়িয়া মানুষের এ প্রবল তিতিক্ষা আসে না। ইহা তাহারাই পক্ষে সম্ভব যে সত্যস্বরূপকে আপনার হৃদয়-গুহার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছে। ইহা তাহারই পক্ষে সম্ভব, যাহাকে তিনি বরণ করিয়াছেন। ধ্রুব প্রহ্লাদের নারদাদি ভক্তের জীবনে দেখিতে পাই তাঁহারা ভগবানের জন্য বত কষ্ট সহ্য করিতেছেন, কত তপস্যা করিতেছেন, ভূরি ভূরি দুঃখভার ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন—সুখেও যেমন, দুঃখেও তেমন,

একবারে সংশয়হীন, প্রশান্ত, প্রসন্ন-মুখ! জগতের লোকে যাকে সুখ বলে সেরূপ সুখ ঐশ্বর্য্যও তাঁহারা জীবনে পরে লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এমনও অনেক জীবন আছে, যাহাদের অদৃষ্টাকাশ দুঃখের মেঘেই ঢাকা; একদিনও সুখসূর্য্যের উদয় হইল না। কষ্টের উপর কষ্ট, যাতনার উপর যাতনার অবসান নাই। তবুও তাঁহারা তাঁহারই পদারবিন্দ মনে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন। একদিনের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। কারণ তাঁহার পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুতে তাঁহার মন নাই। অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী লোকেরা ভাবিতে পারে "আহা এরূপ সাধু পুরুষের জীবনে এরূপ কষ্ট কেন? সমস্ত জীবন ভরিয়া এত দুঃখ দুর্য্যোগ কেন? ইহা ভগবানের কিরূপ বিচার, বা ইহার পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল?" ইহা তাহার কর্ম্মফলও নহে, ভগবানের দুঃখ দেওয়াও নহে। কর্ম্মফল নহে এইজন্য যে,—যখন হৃদয়ে যথার্থ ভগবৎ-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, তখন কর্ম্ম তো দগ্ধ হইয়া গিয়াছে. সুতরাং তাহার আবার কর্ম্মানুরূপ ফল কি? ভগবানের দুঃখ দেওয়াও নহে, কেন না তাহাতে তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজনাভাব! তবে যে ভক্তের নিকট দুঃখের এই নিয়তিশয় প্রকাশ, ইহা ভক্তেরই কল্যাণের জন্য। আলোক এবং অন্ধকার না থাকিলে যেমন দর্শন-কার্য্য অসম্ভব হইত, তদ্রূপ ভক্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাইত না যদি সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহাকে না দেখিত। যিনি আনন্দ স্বরূপ, তিনিই আবার ভীষণং ভীষণানাং—সুতরাং যিনি সুখস্বরূপ, দুঃখ মূর্ত্তিও যে তাঁ'র, তাহা না দেখিলে দেখা কি প্রকারে সম্পূর্ণ হইত? ভক্তানুগ্রহকারী ভগবান্ তাঁহার পূর্ণ-রূপ ভক্তের কাছে প্রকাশ করিয়া দেখান বলিয়াই, ভক্তের নিকট তাঁহার দুটি বিভাবই প্রকাশ পায়। ইহাতেই ভক্ত ভগবানকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারে। প্রাকৃত জনেরা ভগবানের একটা দিক্ দেখে মাত্র! তাই তাহারা সুখের মূর্ত্তি দেখিলে যেমন হাসিয়া উঠে, দুঃখ দেখিলে তদ্রূপই শিহরিয়া উঠে। একটার মধ্যে আশ্রয় পায়, আর একটার নিকট হইতে তাহাদের চিত্ত সরিয়া দাঁড়ায়। ভক্ত যিনি তিনি সুখ ও দুঃখ দুয়েরই মধ্যে দেখিতে পান যে এ দু'টি অবস্থা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ভক্তের জীবনবল্লভ; সুতরাং ভক্তের দুঃখেও বিদ্বেষ নাই, সুখের প্রতিও অত্যধিক লোলুপতা নাই। দক্ষিণ হস্ত যাঁহার, বাম হস্ত তাঁহারই, ভক্ত দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতে পান; এবং দেখিতে পান বলিয়াই তিনি বিগত-শোক। ভক্তকে দেখিয়াই ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হয়। ভক্ত অকূল বিপদ্-সাগরে মগ্ন, তদবস্থাতেও

সে ভগবানকে ভুলিয়া নাই ; ভগবানও রুদ্র মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু ভক্তকে বিস্মৃত নহেন। ভক্ত-হৃদয়ের সরস সৌরভে তখনি মন মুগ্ধ হয়, তখনি ভক্তের ভগবানের পাদপদ্মে চিত্ত লুণ্ঠিত হয়, যখন দেখি বত্রিশ বাজারের বেত খাইয়াও ভক্ত হরিদাস অপরাধীদের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য আকুল। পাছে ভক্তের দুঃখে ব্যথিত হইয়া ভক্তবৎসলের রোষ সঞ্চার হয়, তাই তিনি তাহাদের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন, যেন স্বয়ং তিনিই অপরাধ করিয়াছেন। ভক্ত যে ভগবানকে ডাকে বলিয়া যাতনা পাইবে না, তাহা নয়। প্রাকৃত লোকের সঙ্গে দুঃখ ভোগের এখানে তাঁহার কোন তফাৎ নাই! কিন্তু তিনি যে তাহা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে পারেন, এবং পীড়নকারীদিগকেও ক্ষমা করিতে পারেন, এইটীই ভক্তের বিশেষত্ব, এবং ভক্তের এই যে শক্তি ইহা তাঁহার চরণ-কমল সেবারই ফল! এ আর কিছুতে হইবার নহে। ভাগবতে ঋষি বলিতেছেন—

"তিরস্কৃতা বিপ্রলব্ধাঃ শপ্তাঃ ক্ষিপ্তা হতা অপি।
নাস্য তৎ প্রতিকুর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবোঽপি হি" ॥

ভগবান্ ভক্তকে যে ভক্তির আস্বাদন দিয়াছেন, তাহাতেই ভক্ত বিভোর, তন্ময় ; প্রভুও সেবকের জন্য নিশ্চিন্ত। ভক্ত কখনও, বিপদ্ হইতে মুক্ত কর বলিয়া প্রার্থনা করেন না, যদি কখনও কিছু প্রার্থনা করেন তাহা শুধু এই বলিয়া " অবিস্মৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ"। ভক্ত বলেন "আমার প্রতি মুহূর্ত্তের অবস্থিতির জন্য তোমার কত যত্ন লইতে হয়, ইহা ভাবিলেই আমি লজ্জায় মরিয়া যাই, আবার প্রভো প্রার্থনা করিব কোন্ লজ্জায় ?"

ভক্তের বিশ্বাস এত গভীর এত পরাভিমুখ, এমন বিশ্বব্যাপী, যে তিনি বলেন—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লঞা আমি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ ॥

ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবানকে বলিতেছেন "তোমার বীর্য্যরসে আমার চিত্ত মগ্ন সুতরাং আমার জন্য কোন ভাবনা নাই। এই অসুর বালকেরা ভগবদ্বিমুখ ; ইহাদের কিছু উপায় না হইলে, আমি একার জন্য মুক্তি ইচ্ছা

করি না।” ভক্ত কাঁদিয়া তাঁহার প্রভুকে বলেন “আমার হৃদয়ের সমগ্র শোণিত-কুম্ভ নিপীড়িত করিলে যদি এক জনেরও দাঁড়াইবার স্থান শীতল হয়, তবে না হয় আমার শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হউক!” এরূপ মহিমময়ী বাণী ভক্তেরই উপযুক্ত। ভগবৎকৃপা সম্বন্ধে ভক্তের কোন সন্দেহই নাই; মাতাকে যেমন শিশুর সন্দেহ হয় না। সেই জন্য ভক্ত সমস্ত নির্য্যাতন-কেও ভগবৎ-প্রসাদ রূপে গণ্য করেন, আবার যখন সুখ-সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনও তিনি তাহাতে বিচলিত হন না; তাহাতে ভগবানের অপার করুণা-বিমণ্ডিত সুকোমল হস্তের স্পর্শ-লাভ করিয়া ভক্ত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন।

নিবেদন।

কই তুমি সখা, দাও মোরে দেখা, পূরাও অতৃপ্ত বাসনা,
আড়ালে থাকিয়া কত যে কাঁদাবে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত জন্ম যাবে,
(শেষে) মানস-আসনে বসাতে তোমারে কভু কি সখা পারিব না॥
ঐ নভনীলিমায়, ঐ সাগরের গায়, কা'র মধুর হাসি,
চপলার মত ক্ষণিক হাসিয়ে,
অনন্ত নীলিমায় যায় মিলিয়ে,
(শেষে) হৃদি-তার ছিঁড়ে, মর্ম্ম-তল বেড়ে, প্রাণেতে লাগায় গো ফাঁসি॥
দিবারাত্র বসি, বাজাও ও বাঁশী, কে তুমি আমার হৃদয়ে?
আমি সারা বিশ্ব খুঁজে খুঁজে, সখা,
যদি পেয়েছি এবে হৃদয়ে দেখা,
(তবে) মোহ-যবনিকা, তুলে লও সখা, দেখি গো পরাণ ভরিয়ে॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল।

ভাবোচ্ছ্বাস।

১।

তুমি' 'আমি' একই বস্তু
সর্ব্ব রূপে সমান সমান,
ভিন্ন কেবল ভুলি বলে
'আমির' মাঝে 'তুমির' টান।

২।

'সর্ব্ব' রূপে তোমায় ভাবি,
ভাবি কিন্তু আমায় ছেড়ে।
তুমি কিন্তু সর্ব্ব রূপে
আছ সদাই আমায় ধরে।

৩।

প্রেম-রসে আর কাম-রসে
রসটা মূলে এ কি প্রকার,
তৃপ্তি চাহি উভয়তেই
তফাৎ কেবল 'তোমার' 'আমার'।

৪।

মিষ্ট-রস, কৃষ্ণরস, সমান বটে দুইই;
আস্বাদনে সবাই বুঝে বল্লে বুঝেনা কেহই।

—চিন্তা—

সুখ ও দুঃখ।

সন্দেহ ও প্রয়োজন না থাকিলে জিজ্ঞাসা হয় না। পরিস্ফুট আলোকে কোনও বস্তু বর্ত্তমান থাকিলে, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ও মনঃ-সংযোগ সত্ত্বে 'উহা কি' এইরূপ প্রশ্ন কেহ করিয়া থাকেন না। কারণ ঐ প্রত্যক্ষতঃ দ্রষ্টা ব্যক্তির সেই বস্তুসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই, প্রয়োজন না থাকিলে কেহ জিজ্ঞাসা

করেন না। 'কাকের কয়টী দাঁত আছে,' উহা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন? তবে তাদৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকিলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এখন বুঝিতে পারা গেল যে তত্ত্বদর্শী মহাত্মা কপিল "দুঃখত্রয়াভি জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা" ইত্যাদি সূত্র করাতে এই বিষয়ে সন্দেহ ও প্রয়োজন আছে। আবার তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখও নির্দিষ্ট করিয়াছেন। বাস্তবিক মনের শান্তিই সুখ, সুখ ও দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। যখন আমাদের মনের মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে তখন আমরা যাহাই দেখি তাহাতেই আমোদ পাইয়া থাকি, তখন আমরা প্রকৃত সুখরাজ্যে উপস্থিত হইতে সমর্থ হই, যখন পার্থিব বিষয় আমাদিগকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। তখনই সুখের বাতাস আমাদের জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, এবং আমরা স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। কিন্তু এই প্রকার মানবের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে না। আমরা সংসারে যাহাই কাজ করি না কেন, কেবল সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। তবে নিষ্কামী হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে বিড়ম্বনা ঘটে না। গীতাতেও উল্লেখ আছে—

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

আকুল পূরিত স্থির অচঞ্চল, সমুদ্রে জল প্রবেশে যেমন।
তদ্বৎ বাসনা প্রবেশে যাহাতে, সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন॥

পার্থিব ধন-সম্পত্তির সঙ্গে প্রকৃত সুখের অতি অল্পই সম্বন্ধ। মানব এই সমস্ত হইতে যে সুখ পাইয়া থাকে, তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা মোহ মাত্র। কিন্তু যখন এই সমস্ত পরিবর্ত্তনশীল সামগ্রী চলিয়া যাইবে তখন, মানব যষ্টিহীন অন্ধের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। আমরা পার্থিব বিষয় হইতে সুখ পাই বটে, কিন্তু তাহা অতীব সামান্য; তাহা আমাদের জীবনের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে না। কিন্তু যে সুখ প্রকৃত, যাহা পাওয়া অবধিই আমাদিগকে দুঃখের ভ্রূকুটি, ক্ষণেকের তরেও বিচলিত করিতে পারে না তাহা প্রকৃত জ্ঞান হইতেই উদ্ভূত।

সংসার অতি বিষম স্থান; আমাদের চারিদিকে কত প্রলোভন আসিয়া

আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচালিত করিতে চেষ্টা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের মনকে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত করিতে না পারিলে আমাদের জীবনের সুখ অচিরেই অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা। সৎপথ অবলম্বন করিয়া যদি আমরা জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে পার্থিব বাধা, পার্থিব মোহ আমাদিগকে কিছুতেই হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। আমরা জীবনের প্রথমভাগে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি, তখন কিসেই বা আমাদের ভাল হইবে, কিসেই বা আমাদের মন্দ হইবে, তাহা আমরা জানি না। পিতা মাতা আমাদিগকে যেই পথই দেখাইয়া দেন, তাহা অবলম্বন করিয়া জীবনারণ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু সচরাচর আমাদের অসাবধানতার কারণেই বিপদে পড়ি, এবং পিতামাতার অভীপ্সিত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া থাকি।

মানবের অন্তঃকরণ সুন্দরের দিকেই ধাবিত হয়। মানব এমনই পার্থিবমোহে আচ্ছন্ন যে সকলেই আপাত-মধুর বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা ইহার পরিণামফল একবারের তরেও ভাবিয়া দেখে না,—শেষে এইরূপ সময় আসিয়া উপস্থিত হয় যখন নিজকে আসন্নবিপদ্ হইতে রক্ষা করা সম্পূর্ণ কষ্টকর হইয়া উঠে। মোহান্ধ মানব এইরূপ প্রকৃত সুখের বিষয় অবগত না হইয়া অসৎ পথ অবলম্বন করে, শেষে বাঞ্ছিত ফলে নিরাশ হইয়া জীবনে কোন সুখ নাই বলিয়া মনে করে, এবং আপনাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে। জীবনে সুখ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ইহা সৎপথের অনুধাবন ভিন্ন অন্য কিছুতেই নহে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদয়াকাশের আঁধার দূরীভূত হয়, তখন হইতেই আমরা সুখের বিমল কিরণে আপনাকে সুশীতল করিতে পারি। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মোহান্ধকার চিরদিনের তরেই ধূমাবশেষেই পর্য্যবসিত না হইবে, ততদিন আমরা প্রকৃতসুখের পন্থা চিনিতে না পারিয়া পশু পক্ষীর ন্যায় নীচ ভাবেই জীবন যাপন করিব। যে শান্তি সুখের একমাত্র কারণ, যে শান্তির বাতাস একবার আমাদের জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেই আমাদের তপ্ত জীবন সুশীতল হয়, কোথা হইতে সেই প্রাণ-তোষিণী শান্তির উদ্ভব? যাহার সুধা-ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তাহা কদাপি পার্থিব নহে। তাহা স্বর্গের কোন নিবিড় গহ্বরে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মোহাচ্ছন্ন মনে অপূর্ব্ব শান্তির সঞ্চার করিয়া থাকে। এই অপার্থিব ধনও আমরা স্বকার্য্যের দ্বারা নিজের করিতে পারি। ভগবান্ আমাদিগকে শুধু খাইয়া মরিবার জন্য সৃজন করেন নাই। আমাদের সম্পাদনের জন্য

কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের ফলেই আমাদের মনে শান্তির উদয় হইয়া থাকে। ইহাতেই আমরা সুখ পাইয়া থাকি। কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমাদের মনে যে বিমল আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত সুখ। অতএব জীবনারণ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিজের প্রতি, জগতের প্রতি এবং জগৎপিতা পরমেশ্বরের প্রতিই বা আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা ঠিক করিয়া যদি কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করি, এবং তদনুযায়ী কাজ করিতে পারি, তাহাতেই আমরা সুখ ও শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ব্যাকরণতীর্থোপনামক শ্রী তারাপদ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীকালী।

আমার সে ভাবি মজার লোক্।
আমায় হাস্‌তে দেখ্‌লে কেঁদে ফেলে
হেসে মরে দেখ্‌লে শোক॥
পাছে বসি কারো কাছে,　　সদাই ঘোরে পাছে পাছে,
তা'কে ধর্‌তে গেলে বুকে ঢুকে,
ঢেকে ধরে দুটো চোক্॥
চাইনে তারে বলি যত,　　ঘেঁসে ঘেঁসে আসে তত,
তাড়িয়ে দিলে জড়িয়ে ধরে
তার ভালবাসার এমনি ঝোঁক্॥
একটু প্রেম পাবার তরে,　　ভিখারীর মত ঘোরে
প্রাণ ভ'রে প্রাণ দেব তারে
'দেবার' মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক॥

'দেবা।'

স্বীকার।

তুমি যে নিকটে নাই
মান্‌ব না তা মান্‌ব না।
তুমি যে হৃদয়ে নাই
শুন্‌ব না তা শুন্‌ব না॥
আজ সবার সাথে বল্'ব আমি
আছ তুমি,—আছই তুমি,
তুমি মম কাছেই আছ প্রাণেই আছ
ভুল্'ব না তা ভুল্'ব না॥
নাই বা ধরা দিলে মোরে
তুমি আমার হৃদ্ মাঝারে
আমার সব খানিকে পরশ করে
এতো গোপন করা যাবে না॥

নাই বা কথা কইলে ঠাকুর
কাছেই আছ নও বেশী দূর
বিশ্ব মাঝে তোমার যে সুর
তার পানে বিমুখ হয়ে থাকব না॥
কাণে শোনে নয়ন দেখে
কার পরশ এ গায়ে ঠ্যাকে
সাড়া দেয় প্রাণ কাহার ডাকে
তাকে চিনেও আবার চিন্‌বে না,
একি প্রভু, বেশ পরেছ
সবার মাঝে সব হয়েছ
চোখে ধূলি দিয়ে আমার
ভুলালেও সে ভুলবে না॥

তৃষিত।

শুনি লোকে বলে ছড়ান ভূতলে কত সে রতন রাশি,
যত পা'য় জনা লুঠে সেই থ'না,—অভাব আঁধার নাশি'
জ্বলে কত আলো; সুধাময় ফল মানব মানস বাসে
তৃষিতে তৃষা, ক্ষুধিতের ক্ষুধা, ব্যথিতের ব্যথা নাশে।
আদর-আকর * বিলাস-নধর সুধার আধার ধরা;—
ললাটের দোষে মরি আপশোষে সকলি বেদনা ভরা;—
কাঁদিতে কাঁদিতে একলা নিশীথে তুলিতেছি কোলাহল,
ক্ষুধা, তৃষা, ব্যথা পাগল আমারে করে, কি করিব বল'॥
মিটাতে পিয়াসা ভালবাস-আশা লভিয়ে সকল গ্লানি,
সংসারের পাকে কি ঘোর বিপাকে ঘুরিয়ে চলেছি আমি।
অসার সংসার মরু-মরীচিকা ভুলাইছে মোরে কত,



তারা।

কতবার তুঁ'র বালুকাকণায় দহনে কত না ক্ষত
মেরেছে আমার হৃদয়-শরীর, ভেঙেছে সকল সাধ,
আশা-ভরসায় কাহারে স'পিয়া আবার রয়েছি আধ।
তখন সে কা'র কুসুম কোমল করুণাপ্রলেপে আমি,
ভুলেছি সকল পাপ, তাপ, ছল, আবার দিবস যামি,
"বিভব গৌরব মায়া মমতার পিছনে পিছনে ছুটি
কোন্ পথে গিয়া" কাহার প্রেরণে আঁধারে এসেছি জুটি।
আঁধারে আলোক নিরাশায় আশা একেলা পথের সাথী
সহসা উদিয়ে, তখনি মিলিয়ে, গিয়েছে সে দীপ ভাতি।
তিলটী হারা'লে খুঁজি সারা ঘর আর হায় হউবিধি!
খুঁজিয়েছি মনে একবার কিগো! সেই সে হারাণ নিধি?
হাসিয়া পশেছি সংসার-সমরে নবীন আমোদে মাতি,
আবেশে, আলসে, আকাশ-কুসুম রচিয়া দিবস-রাতি।
ক্ষণেকে আবার অবশ করেছে বিষম যাতনা-জ্বর;
'আমার' 'আমার' 'আমার' করিয়া আমারে করিনু পর;—
তৃষা সে দারুণ পুন' শতগুণ—তখন বুঝিনু মরি।
পিপাসা মিটাতে শুধু হায় জল পিয়েছি হৃদয় ভরি';—
তৃষাত মিটে না, আশাত' মিশে না আলোত' দেয় না দেখা,
শুধু সে কঠিনে হৃদয় পাষাণে শতেক দাগের রেখা;—
কবে সে পাষাণে দেবতা পশিবে, চেতনা পাইবে জড়,
কবে ভেদি' তা'রে করুণা-ঝরণা বহিবে নিঝর ঝর,
পাপ-তাপ ব্যথা ভাসিয়া যাইবে, জাগিবে পুরুষ নারী,
লভিবে তৃষিত তৃষা-নিবারণ শীতল অমৃত বারি?

'প্রসাদ'।

ঘুম-ভাঙ্গা।

এতদিনে জীবন শেষে
মরণ সাগরকূলে

বুঝিয়াছি অনাথশরণ
তুমি বিনা আপনার জন
কেহ নাহি এ অভাগার
লয়গো কোলে তুলে,
তাইতে ডাকি আকুল স্বরে
থেকোনা আর ভুলে ॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী।

পাগলের পত্র।

ভাই—

… … … তোমার শরীরের কোন স্থানে যদি আমি চিম্‌টি কাটি, তোমার সমস্ত শরীরটী যেন তার বেদনা অনুভব কোরবে। তোমাদের সুখ-সংসার-যন্ত্রের যদি একটী কোমল মধুরতার ছিঁড়ে যায়, তার বেদনা কি আমার প্রাণে বাজ্‌বে না? তোমাদের স্নেহমাখান সংসারের সুন্দর অফুটন্ত ফুল যদি কেহ ছিঁড়ে লয়, তা হলে তোমাদের চোক্ষের জলের সহিত কি আমারও চোখের জল মিশিবে না?

কিন্তু দাঁড়াও, এই যে এতক্ষণ কত স্নেহ মাখিয়ে "দাদা" "দাদা" বলে ডেকে প্রাণকে বিভোর ক'রে তুলছিল—আর নাই? কোথায় লুকালো? না, লুকায়নি তো—ঐ যে স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে রয়েচে; ঐ যে ঠিকইত, সবইত রয়েচে? বুঝেচি বোন্‌, শরীর ছিল বলে যেন বাহিরে বাহিরে ছিলে; এখন একেবারে হৃদয়ের মধ্যে এসেচো। স্মৃতিওত কালে পুঁছে যাবে; তখন তোমায় কোথায় পাব? তবে কি এই আমি? না, তা' হতে পারে না। পাহাড় থেকে যেমন জল চুইয়ে চুইয়ে নদীরূপে কতদেশ উব্‌চিয়া পড়বে, কত সুন্দর দৃশ্য ছড়িয়ে, এক মনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলে যায়—তুমিও বোন্‌, সেই রকম আমাদের হৃদয়ে স্নেহের ধারা বহিয়ে ঐ যে ছুটে পালিয়েচো," আর বোলচো "সেই সমস্ত সমগ্র আবার সব মেশামিসি হতে"… … বেশ, বুঝেছি তুমি আমাদের স্নেহের সীমা অনন্তের দিকে ছুটিয়ে দিবার জন্য "বোনটি" সেজে এসেছিলে। যেমন ছোট ছেলেকে প্রথম চাঁদ দেখাতে গেলে আমরা বলি "ঐ যে গাছ দেখ্‌চিস্‌, তা'র পিছনে ঐ যে সোণার থালার মত

রয়েচে, ঐটে হল চাঁদ।" তুমিও বোন্, যেন ঐ গাছের মত স্নেহের আড়ালে সেই চাঁদকে দেখিয়েছিলে এখন সরে পালিয়েছো, ভাল ক'রে চাঁদ দেখ্‌তে পাব বলে ঠিক তাইত বটে। বুঝেচি বোন্, তুমি কত মধুর, কত নিকটের জিনিস ? তোমার শরীর নাই ব'লে আর কাঁদবো না। তুমি যে তোমার আধার ভেঙ্গে সেখানে অনন্তের আধারকে ধরিয়ে দিয়েচো। তাই, মৃত্যু কি তবে এত মধুর ! বোন্ তো পালায়নি, রাস্তা ভুলে গিয়েছিলাম বলে তাই স্নেহের আলো এনে ঠিক্ রাস্তায় আগিয়ে আগিয়ে গিয়েচ। তাই, কেঁদোনা ভাল কোরে বোঝ, আর ভুলে যাও ! ভীষণ মৃত্যুর ভিতরেও সেই মোহন-মূর্ত্তি ! কি মজা বল দেখি ভাই ?

'মস্ত পাগল।'

নিত্যনূতন ! নিত্যসুন্দর ! নিত্যমধুর !

সংসারে সকল শ্রেণীর লোকই নূতন, সুন্দর ও মধুর বস্তুর জন্য লালায়িত। দুঃখের বিষয় সংসারে কিছুরই প্রকৃতপক্ষে নূতনত্ব, সুন্দরতা ও মধুরতা নাই, অথচ তত্তদাভাসের স্থায়িত্বও নাই। আজ আমি শিশু। মা বাপের আদরে ও নিজের আবদারে কত খেলনা পাইতেছি। নূতন ও সুন্দর দেখিয়া তাহা লইয়া কত রঙ্গ করিতেছি। আজ যাহা নূতন ও সুন্দর দেখিয়া আপ্যায়িত হইলাম, কাল তাহা পুরাতন ও বিরূপ হইয়া গেল; সুতরাং নিত্য নূতন ও অধিকতর সুন্দর ক্রীড়নকের জন্য আমি লালায়িত হইলাম। আমার দুষ্পূরণীয় বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হইল না। আজ আমি বিদ্যার্থী। কত সুন্দর ও মধুর ভাবপ্রসূ, কত সুকুমার বিদ্যা অধ্যয়ন করিলাম; কিন্তু দিন দিন উচ্চতর বিদ্যার জন্য আমার মন তৃষিত হইতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া গেল। আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। আজ আমি বিলাসী সুন্দরী, নবযুবতী পাইয়া তাহাকেই হৃদয়ের পুতুল করিলাম; কিন্তু যাই যৌবনে ভাঁটা পড়িল অথবা হঠাৎ কোনও সাংঘাতিক পীড়া সুন্দরীকে বিরূপ করিল, অমনি আমার মন আর তাহাতে তৃপ্ত থাকিল না। একে একে কত অবলম্বন করিলাম, কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। আজ

আমি ধনী—মানী, স্তূপীকৃত 'রূপচাঁদ' দেখিয়া ও বিবিধ সম্মান পাইয়া কত আনন্দ-লাভ করিতেছি; তবু আমার দিন দিন নূতন নূতন স্তূপ ও নব নব সম্মানের লাভের বাসনা হইতেছে। আজ আমি নিরক্ষর নির্ধন নগণ্য পরমুখাপেক্ষী। হঠাৎ আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। আমি সুন্দর ঘর বাড়ী করিলাম, কত লোকের কর্ত্তা হইলাম; তবু আমার বাসনার স্রোত রুদ্ধ হইল না। কয়টীমাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা নিদর্শন করিলাম। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নব নব, সুন্দর সুন্দর, মধুর মধুর বিষয় উপভোগ করিতে চায়। একটী বিষয়ে অধিকক্ষণ আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। শত সহস্র বিষয় সম্ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন; আজ যাহা সুন্দর, কাল তাহা কুৎসিত; আজ যাহা মধুর, কাল তাহা তিক্ত। আমার বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়গণ সংসার-ভাণ্ডারের নূতন, সুন্দর ও মধুর বস্তুগুলি একে একে গ্রাস করিয়া ফেলিল; তবু তাহাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হইল না,—আমার অশান্তির সীমা রহিল না।

সংসার-কাননে এইরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত, বিভ্রান্ত জীব ভাগ্যক্রমে কোনও মহতের শ্রীচরণসমীপবর্ত্তী হইতে পারিলে, তাঁহার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়া যায়। তিনি স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করেন, অথবা সদ্‌গুরু পাওয়ার উপায় বলিয়া দিয়া কৃতার্থ করান। জীব সদ্‌গুরুর কৃপালাভে ভ্রান্তিজাল হইতে মুক্তি পাইয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে ভজনক্রিয়া করিতে করিতে নিত্যনূতন, নিত্যসুন্দর ও নিত্যমধুর বস্তুর খবর পায়। সেই বস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্। সাধক প্রেমের চক্ষে হৃৎকমলে সেই নিত্য-নব-নবায়মান, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের খনি শ্রীভগবদ্রূপ সন্দর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করেন। শ্রীহৃষীকেশের কৃপায় তখন তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় তর্পণ ও সর্ব্বাঙ্গস্নপন হয়; তিনি প্রকৃত সুখ ও শান্তির অধিকারী হন। সাধকের চক্ষু সেই ভুবনমোহন রূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। কর্ণ হৃদয়েশের অমৃতময়ী বাণী ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পায় না। নাসিকা হৃদয়বল্লভের শ্রীঅঙ্গসৌগন্ধ বিনা আর কিছুই আঘ্রাণ করে না। রসনা তাঁহার অধরামৃত বিনা আর কিছুই আস্বাদন করে না। ত্বগিন্দ্রিয় জীবিতবল্লভের শ্রীচরণকমল-স্পর্শজনিত সুখ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করে না। বাক্যে তাঁহার লীলা কথা ব্যতীত আর কিছুই আসে না। হস্ত তাঁহার সেবা কাজ ব্যতীত আর কিছুই করে না। পদ যেখানে রসিকভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া রসরাজের লীলা-গীতিকা গান করেন, সেইস্থলে অথবা তদ্রূপ ভাবানুকূল স্থান

বিনা আর কোথাও গমন করে না। মন তাঁহার পদারবিন্দে অবিচ্ছেদে রমণ করে। স্বভাবসুন্দর বস্তুর সকলই সুন্দর ও মধুর। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা যত সুন্দর ও মধুর, তত সুন্দর ও মধুর আর কিছুই নাই। সেই জন্যই সাধকের আর কিছুতেই রুচি হয় না—আর কিছুই ভাল লাগে না। শ্রীগুরুর কৃপায় ভাগ্যবান সাধক ক্রমশঃ ভগবানের নামে, রূপে, গুণে ও লীলায় সমাধিলাভ করিয়া দিবানিশি প্রেমানন্দ-সাগরে সাঁতার দেন। পৃথিবীর সকল নরনারী সেই নিত্যনূতন, নিত্যসুন্দর ও নিত্যমধুর বস্তুলাভ করিয়া ও পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইয়া। গো, ব্রাহ্মণ ও জগতের হিতকারী, পতিতপাবন, পতিত-প্রেমদ, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, মঙ্গলনিকেতন, অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বক্ষেমময় শ্রীহরি—সকলের মঙ্গল ও আনন্দ বিধান করুন।

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

———:০:———

বন্দে শ্রীমদ্রামং কেশবমতিশান্তিসীতয়াশ্লিষ্টম্।
কামাদিরাক্ষসারিং ভবজলধৌ তত্ত্ববোধসেতুকরম্॥

টীকা। পরমশান্তি (নির্ব্বিকল্প বৃত্তি) রূপ সীতা সংযুক্ত; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসর রূপ রাক্ষসদিগের শত্রু, সংসাররূপ সমুদ্রে তত্ত্ববোধ রূপ সেতুবন্ধনকারী, এবং ব্রহ্মবিদ্যারূপ শ্রীদ্বারা শোভায়মান শ্রীরামচন্দ্র রূপ, আমার ব্রহ্মবিদ্যার গুরু শ্রীকেশবানন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নমস্কার।

যে প্রকার শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত সংযুক্ত ছিলেন, সেইরূপ শ্রীকেশবানন্দ নামক আমার সদ্গুরু পরম শান্তি (নির্বিকল্প সমাধি) রূপ সীতা সংযুক্ত। যে প্রকার শ্রীরামচন্দ্র রাবণাদি রাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার সদ্গুরু কাম ক্রোধাদি সকল জয় করিয়াছেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্র আপন সেনাদিগকে সমুদ্রের পর পারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার গুরু মুমুক্ষুদিগকে সংসার রূপ সমুদ্র হইতে পার করিবার জন্য তত্ত্ববোধরূপ সেতু প্রদান করেন, এবং যে প্রকার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মী দ্বারা শোভায়মান ছিলেন, সেইরূপ আমার গুরু ব্রহ্মবিদ্যা আদি নানা সদ্গুণে বিভূষিত

আছেন। এই সমস্ত কারণে আমি শ্রীকেশবানন্দ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি।

পঞ্চীকরণব্যাখ্যাং সুখবোধার্থং করোম্যহং সবলাম্।
সংস্কৃতবাগজ্ঞানাং বঙ্গীয়ভাষয়া মুমুক্ষূণাম্॥

টীকা। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ পরন্তু সংসারসাগর হইতে উদ্ধার হইতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা আছে, এরূপ বিবেকাদি সাধনসম্পন্ন জিজ্ঞাসু মহাত্মাদিগের বিনা আয়াসে পঞ্চীকরণ বোধ করাইবার জন্য আমি সরল বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন ইহাদিগের নাম অনুবন্ধ। এই চারি অনুবন্ধ যে গ্রন্থে থাকে তাহাতে বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যদি এই গ্রন্থে অধিকারী আদি চারি অনুবন্ধের অভাব হয়, তাহা হইলে ইহা পাঠে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিবে না, সুতরাং এই গ্রন্থাবস্তুই নিষ্ফল হইবে। যদি এই শঙ্কা কাহারও মনে উদয় হয় তাহার নিবৃত্তির জন্য অনুবন্ধের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মোক্ষেচ্ছা এই চারি সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে পঞ্চীকরণের অধিকারী কহা যায়। তন্মধ্যে বিবেক লক্ষণ :—আত্মস্বরূপ নিত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই অনিত্য ; এই নিশ্চয়ের নাম বিবেক। বৈরাগ্য লক্ষণ—ইহ, অমুত্র ফলভোগের ইচ্ছা ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। শমাদি সম্পত্তি—(১) সর্ব্ব বাসনা ত্যাগের নাম শম। (২) শব্দাদি সর্ব্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহের নাম দম। (৩) সংসারস্থ সর্ব্ব প্রপঞ্চের নিবৃত্তির নাম উপরতি। (৪) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্বধর্ম্ম সহিষ্ণুতার নাম তিতিক্ষা। (৫) ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু এবং বেদান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। (৬) চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান কহে।

মুমুক্ষুতা লক্ষণ—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাকে মোক্ষেচ্ছা কহে। উপরিউক্ত চারি সাধনসম্পন্ন পুরুষ অধিকারী নামে প্রসিদ্ধ।

এই গ্রন্থের বিষয় জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন। তাহা ইহার অনেক স্থানে নিরূপণ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ও ব্রহ্মের প্রতিপাদক-প্রতিপাদ্য ভাব রূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই গ্রন্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। এই গ্রন্থ প্রতিপাদক এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য।

ঐ প্রকার জ্ঞানের ও পঞ্চীকরণের জন্য জনক-ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ জ্ঞান জন্য এবং পঞ্চীকরণ বিচার দ্বারা সেই জ্ঞানের জনক হইতেছে। যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাকে জন্য এবং যে উৎপন্ন করে তাহাকে জনক কহে।

ঐ প্রকার অজ্ঞান এবং জ্ঞানের নিবর্ত্ত্য-নিবর্ত্তকতা সম্বন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে এবং জ্ঞান উহাকে নিবৃত্ত করিবে। যাহা নিবৃত্তি হয় তাহাকে নিবর্ত্ত্য কহে এবং যে নিবৃত্তি করে সে নিবর্ত্তক ইত্যাদি।

অজ্ঞান সহিত জন্মাদি অনর্থ নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্তি এই গ্রন্থের প্রয়োজন।

এই প্রকারে এই গ্রন্থের প্রারম্ভ সফল হইতেছে।

প্রথম প্রামাণ্য বিষয়।

অবিদ্যোপাধিক প্রত্যগাত্মা যে জীব তাহার অনাদিকাল হইতে ভ্রম চলিয়া আসিতেছে এজন্য জীবমাত্রেই স্ব স্ব দেহকেই, স্ব স্ব স্বরূপ জ্ঞান করে। জীবের এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি অনাদি সিদ্ধ। স্বরূপতঃ এই জীবাত্মাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, উহা দেহ নহে। ভ্রমবশতঃ 'আমি দেহ,' 'আমি মনুষ্য', 'আমি ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া জীবাত্মা চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে জন্ম-মরণ-চক্রে নিপতিত হইয়া ফিরিতেছে। ১

ভ্রম দ্বারা বিপরীতবুদ্ধি বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে অনেক ভাং খাইয়া, উহার নেশাতে এত উন্মত্ত হইয়াছিল যে স্বকীয় ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হইয়া আমি শূদ্র, আমি বৈশ্য, আমি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি নানা বিপরীত বাক্য কহিতে লাগিল। নেশার প্রতাপে মুখে কহিতে লাগিল বটে; কিন্তু তৎকালে সে বাস্তবিক ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রাদি ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। তৎপরে তাহার কোন হিতকারী মিত্র উহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া তাহার নেশা ছাড়াইবার নিমিত্ত তাহাকে দধি কিংবা ঘৃত খাওয়াইয়া দিল। ঘৃত পান করিয়া ব্রাহ্মণের নেশা ছুটিয়া গেল। তখন তাহার, "আমি ব্রাহ্মণ" এই স্বাভাবিক জ্ঞান রহিল। 'আমি শূদ্র' ইত্যাদি জ্ঞান তাহার কল্পনায়ও আসিল না। কারণ যতক্ষণ নেশা ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। নেশা ছাড়িয়া গেলে সেই বিপরীত বুদ্ধি আর রহিল না।

এই প্রকারে আত্মা স্বীয় অজ্ঞানরূপা নেশার প্রভাপে অবিদ্যাকল্পিত স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ কল্পিত সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিয়া, স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপও বিস্মৃত হইয়া, নানা বন্ধনে নিপতিত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, আমি গৃহস্থাদি চারি আশ্রমস্থ, আমি ত্যাগী, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি জন্মবান্, আমি মরণধর্ম্মশীল, ইত্যাদি অনন্ত বিপরীত কল্পিতাকল্পিত ভেদাভেদ তাদাত্ম্য সমবায়াধ্যাস পূর্ব্বক কর্ম্মজালে জড়ীভূত হইয়া পড়েন। প্রকৃত পক্ষে জীব স্বয়ং দেহাদি অন্তরাত্মা, বস্তুর দ্রষ্টা সাক্ষী ব্রহ্মরূপ; কিন্তু অবিদ্যা বশতঃ স্বরূপাভিজ্ঞ নহেন।

যৎকালে ঐ অজ্ঞানী জীব সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ রূপ ঘৃত বা দধি পান করিয়া স্বীয় অজ্ঞানরূপা নেশা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন, তৎকালে তাঁহার আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি মনুষ্য, আমি দেহস্বরূপ ইত্যাকার নানা মিথ্যা অধ্যাস ত্যাগ হইয়া গিয়া, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না এইরূপে জ্ঞান হইবে, সে পর্য্যন্ত অনাদি ভ্রম বশে আমি দেহ এই প্রকার দেহাধ্যাস অর্থাৎ দেহে আত্ম বুদ্ধি থাকিবে।

সিংহের রাম-ছাগল রূপ অধ্যাসের দৃষ্টান্ত।

কোন এক মেষপালক কোন পাহাড়ের তরাই হইতে একটী নবজাত সিংহ-শাবক আনিয়া তাহাকে প্রতিদিন দুগ্ধ খাওয়াইয়া পালন করিতে লাগিল। সিংহ-শাবক দুগ্ধ খাইয়া বড় হইলে, ছাগপালের সহিত জঙ্গলে যাইত, খেলা করিত, দৌড়াদৌড়ি করিত, জল পান করিত এবং সন্ধ্যা হইলে সমস্ত ছাগ-পালের সহিত মেষপালকের গৃহে প্রত্যাগমন করিত। মেষপালকও উহাকে ছাগলের সহিত খোয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিত।

বহুকাল এই প্রকারে ছাগদলের সহিত থাকিয়া সিংহ-শাবকের এই রূপ নিশ্চয় হইয়া গেল যে 'আমি বখ্‌রা।' মেষপালকও তাহাকে বখ্‌রা নাম করিয়া ডাকিত, একদিনও সিংহের নামে ডাকিত না।

এই প্রকারে ছাগদলের সহিত থাকাতে সিংহ-শাবকের নিজ সম্বন্ধে ছাগল জ্ঞান দৃঢ় হইয়া গেল। পরে একদা যখন ঐ সিংহ-শিশু অন্যান্য ছাগদলের সহিত জঙ্গলে চরিতে ছিল, সেই সময়ে পর্ব্বতের উপর হইতে আর একটী সিংহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে এই সিংহ-শিশুকে

ছাগ-দলের সহিত চরিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিল। পাহাড়ী সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া, এই পালিত সিংহশিশুও অন্যান্য ছাগদলের সহিত পলায়ন করিতে লাগিল। উহাকে পলাইতে দেখিয়া পাহাড়ী সিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'হে মিত্র দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমি তোমাকে একটী কথা বলিব।' তাহার কথা শুনিয়া সিংহশিশু দাঁড়াইল। তখন পাহাড়ী সিংহ উহার সমীপে যাইয়া কহিল 'ভাই হে। তুমি সিংহ হইয়া ছাগদলের সহিত কেন থাক?' তখন ছাগ-সাথী সিংহ বলিল 'আমি ত সিংহ নহি; তুমি সিংহ; আমি ত বথ্রা, খবরদার তুমি পুনর্ব্বার কখন আমাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না, তুমি কেন্ কখন আমাকে সিংহ বলিও না।'

এই প্রকারে উহার বিপরীত বচন শুনিয়া, পাহাড়ী সিংহ আপন মনে বিচার করিতে লাগিল,—"যখন হইতে এ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতে আজ পর্য্যন্তও ছাগলের সহিত চরিতেছে; এবং মেষপালকও উহাকে বথ্রা বলিয়া ডাকে। এই কারণে উহার ছাগরূপ মিথ্যা অধ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; এজন্য উহা আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছে। এক্ষণে আমার উচিত যে ইহাকে উপদেশ দিয়া ইহার মিথ্যা অধ্যাস দূর করিয়া দিই।" এই প্রকার ঐ পাহাড়ী সিংহ আপনার মনে এই রূপ স্থির করিয়া সেই ছাগাধ্যাসী সিংহকে কহিল, 'ভাই হে, তুমি বিচার করিয়া দেখ যে ঐ ছাগ সকল ছোট কিন্তু তুমি কত বড়, তবে তুমি বথ্রা কিরূপে হইতে পার?' তখন সেই অজ্ঞানী সিংহ বলিল, 'উহারা ছোট বথ্রা আমি বড় বথ্রা'। তাহাতে পাহাড়ী সিংহ বলিল, 'ভাই, তুমি আর একবার আমার দিকে দেখ, আমি নিজে সিংহ; আমার সমস্ত লক্ষণ তোমার সহিত ঐক্য হইতেছে কিন্তু, ঐ বথ্রার একটী লক্ষণও তোমার সহিত মিলে না। এই দেখ বথ্রার দুই দুই খুর; আর তোমার ও আমার পায়ে পাঁচ পাঁচ নখ আছে; এই হেতু তুমি বথ্রা নহ। আরও দেখ বথ্রার ছোট ছোট লোম বায়ুভরে ফুর ফুর করিতেছে; কিন্তু তোমার ও আমার গাত্রের লোম কত লম্বা; এজন্য বলিতেছি তুমি বথ্রা নহ।' এই প্রকারে যখন সেই পাহাড়ী সিংহ উক্ত অজ্ঞানী সিংহের সহিত বথ্রার সমস্ত লক্ষণ বিপরীত-সিদ্ধ করিয়া উহাকে তাহার সিংহের স্বরূপ দেখাইয়া দিল, তখনও উহার বিশ্বাস হইল না; তখনও পর্য্যন্ত কহিতে লাগিল "তোমার কথা ত ঠিক, কিন্তু আমার মনে নিশ্চয় হইতেছে না।" তখন ঐ পাহাড়ী সিংহ, নিকটবর্ত্তী কোন কূপে তাহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া জল মধ্যে তাহার নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে বলিল, এবং

কহিল 'দেখ আমার ও তোমার মুখ একই সমান কিংবা কিছু ভেদ আছে? বথ্‌রার মুখ লম্বা, কিন্তু আমার আর তোমার মুখ তাহার বিপরীত, গোল। তোমার গলা মসৃণ, কিন্তু বথ্‌রার গলাতে দুইটী গুচ্ছ ঝুলিতেছে। তোমার কোমর, কেশ, কাণ, এবং শরীরের বর্ণ ইত্যাদি একটীও বথ্‌রার সহিত ঐক্য নহে; কিন্তু আমার সহিত সমস্তই ঐক্য হইতেছে। বথ্‌রার মস্তকে শিং আছে, কিন্তু আমার ও তোমার মস্তকে তাহা নাই। এই প্রকারে যখন তোমার একটী লক্ষণও বথ্‌রার সহিত মিলিতেছে না, কিন্তু আমার সমস্ত লক্ষণ ও স্বরূপ তোমার সহিত ঠিক ঐক্য হইতেছে, তখন তুমি সিংহ নহ। ইহার কি কারণ?'

তখন সেই অজ্ঞানী সিংহ কহিল যে 'তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, পরন্তু যদি আমি সিংহই হইতেছি, তবে বথ্‌রা কিরূপে হইয়াছিলাম, এবং নিজের স্বরূপই বা কিরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।'

পাহাড়ী সিংহ কহিল 'তুমি যে আপনাকে বথ্‌রা করিয়াছিলে, তাহার কারণ এই যে জন্মাবধি তুমি বথ্‌রার সহিত ছিলে, আর মেষপালক তোমাকে 'বথ্‌রা' বলিয়া ডাকিত। এই নিমিত্ত তোমার মিথ্যা অভিমান বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তুমি "আমি বথ্‌রা" এই মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করিয়া "আমি সিংহ" এই তোমাকে স্বরূপকে নিশ্চয় কর।' পাহাড়ী সিংহের বাক্য শুনিয়া এবং সমস্ত লক্ষণগুলি বিচার করিয়া দেখিয়া সেই অজ্ঞানী সিংহশিশু স্বীয় বথ্‌রা রূপ মিথ্যা-অধ্যাস ত্যাগ করিয়া আপনাকে সিংহ বলিয়া নিশ্চয় করিল, এবং ইহা বলিয়া মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিল যে "এত দিন পর্য্যন্ত ছাগদলের সঙ্গে থাকিয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে বথ্‌রা জ্ঞান করিয়া মিথ্যা বন্ধনে পড়িয়াছিলাম। এখনে আমি কদাচ ছাগ-সঙ্গ করিব না, প্রত্যুত ছাগবৃন্দকে নাশ করিব।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই কৃতার্থ সিংহ-শিশু ছাগ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সিংহের দলে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত।

এই প্রকার দেহের দ্রষ্টা আত্মাতে অনাদি কাল হইতে যে স্বরূপের অজ্ঞান রহিয়াছে, সেই কারণে এবং কাম-কর্ম্মাদির সম্বন্ধ হেতু অবিদ্যা-কল্পিত দেহ ইন্দ্রিয়াদি সমুদায় রূপ ছাগদলে আসিয়া উহার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ, জীব এই আপনাকে মনুষ্য, স্ত্রী, পুরুষ, ব্রাহ্মণ আমি বর্ণী ও ব্রহ্মচারী, আমি

আশ্রমী ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান করিয়া রহিয়াছেন এবং স্বকীয় যথার্থ স্বাভাবিক স্বরূপ সাক্ষী, দ্রষ্টা সচ্চিদানন্দাত্মা বিস্মৃত হইয়া জন্ম-মরণ-পথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। মেষপালকের সমান, ভেদবাদী গুরু এই উপদেশ দিতেছেন 'যে তুমি সংসারী, দেহ-স্বরূপ, কর্ত্তা ভোক্তা'। এই প্রকার বিপরীত জ্ঞান শুনিয়া দেহাধ্যাস আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে; এবং এই অধ্যাস দৃঢ় হইলে অজ্ঞানী নীচ আপনাকে দেহমধ্যে কর্ত্তা ভোক্তা জানিয়া নানা প্রকার কর্ম্মরূপী বনে বিচরণ করিতেছেন, এবং বারম্বার গমনাগমনরূপ জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইতেছেন।

পরন্তু অজ্ঞানী জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত অনন্ত পুণ্য-কর্ম্ম ফল-প্রদানোন্মুখ হইলে, সেই পুণ্য-কর্ম্মের ফল-প্রদাতা জগদীশ্বরের কৃপায় যখন বেদান্ত শাস্ত্রের যথার্থ বেত্তা কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু উপস্থিত হইয়া, উহার উত্তম লক্ষণ এবং মুমুক্ষুতা অবলোকন করিয়া যে প্রকার উপবিউক্ত পাহাড়ী সিংহ সেই অজ্ঞানী ছাগদলে অবস্থিত সিংহ-শিশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে :—

গুরু—তুমি কে? তুমি কি ব্রহ্মস্বরূপ জান?

শিষ্য—আমি মনুষ্য, আমি ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে জানিব?

গুরু—হে শিষ্য। এই তোমার দেহ মনুষ্য, তুমি এই দেহের দ্রষ্টা, আত্মা সদা দেহ হইতে ভিন্ন। তুমি মনুষ্য নহ, তুমি ব্রহ্ম। তুমি অজ্ঞানবশতঃই কহিতেছ আমি ব্রহ্মস্বরূপ কি প্রকারে জানিব?

শিষ্য—হে ভগবন্! আপনি বলিতেছেন "তুমি ব্রহ্ম', কিন্তু আমি ব্রহ্ম কিরূপে হইতে পারি? আমি ত সংসারী, কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী। আমি ত আপনার উপদেশ বিন্দুমাত্রও অনুভবে আনিতে পারিতেছি না।

গুরু—হে মুমুক্ষো! তুমি বিচার করিয়া দেখ যে এই তোমার দেহাভিমানই তোমাকে সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তুমি ঐ সকলের দ্রষ্টা। দেহের একটী লক্ষণও তোমার সহিত ঐক্য হয় না, যে প্রকারে দৃষ্টান্তে বখ্‌রার একটী লক্ষণও সিংহের সহিত ঐক্য ছিল না। এবং ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সমস্ত লক্ষণ তোমার আত্মার সহিত ঐক্য হয়; যে প্রকার দৃষ্টান্তে পাহাড়ী সিংহের সমস্ত লক্ষণ অজ্ঞানী সিংহ-শিশুর সহিত ঐক্য ছিল। যে প্রকার ব্রহ্ম সত্য, সেই প্রকার তুমিও জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতে সত্য, যে প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ, সেই প্রকার তুমিও তিন অবস্থার জ্ঞাতা, এই হেতু তুমিও জ্ঞানরূপ। যে প্রকার ব্রহ্ম আনন্দরূপ, সেই প্রকার তুমিও পরম প্রেমাস্পদ ও এই হেতু আনন্দরূপ। তুমিও ব্রহ্মের

সমান; এবং "অস্তি" প্রভৃতি ষড়্ বিকার রহিত। এই তোমার দেহ দৃশ্য, অসত্য, জড় দুঃখরূপ এবং অস্তি প্রভৃতি ষড়্-বিকারাত্মক। এই দেহের সহিত তোমার কোন বাস্তবিক সম্বন্ধ নাই। কেবল আপনার স্বরূপের অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত তুমি সুখ দুঃখ কর্তৃক, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্মকে ভ্রমবশে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। বাস্তবিক তুমি সমস্ত বিকাররহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম, তোমাতে সংসারের নাম মাত্রও নাই।"

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন।—

শোক-হর্ষ-ভয়-লোভ মোহ-স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ॥

অর্থ। শোক (দুঃখ), হর্ষ (প্রসন্নতা), ভয়, লোভ, মোহ, স্পৃহা (ইচ্ছা), জন্ম, মৃত্যু আদি শব্দ দ্বারা অভিব্যক্ত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব আদি সর্ব্ব ধর্ম্ম অহঙ্কারে দৃষ্ট হয়, আত্মাতে উহা নাই।

কারণ এই যে সুষুপ্তি সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতে আত্মা আছে, কিন্তু অহঙ্কার লীন হইয়া যায় এই নিমিত্ত সুখ দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতীতি হয় না। কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে অহঙ্কার আছে, এই হেতু সুখ দুঃখ আদি প্রতীত হয়। এই কারণে উপরিউক্ত সমস্ত ধর্ম্ম অহঙ্কারে আছে; কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার।

এই প্রকারে যখন সদ্গুরু জ্ঞান দান করেন, তখন শিষ্য দেহাধ্যাস ত্যাগ করিয়া "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ নিশ্চয় করত সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু দৃষ্টান্তে যেরূপ পাহাড়ী সিংহের উপদেশ বিনা উপরিউক্ত অজ্ঞানী সিংহের ছাগ-জ্ঞানরূপ অধ্যাস জন্মিয়াছিল, সেই প্রকার অজ্ঞান জীবাত্মা ও সদ্গুরুর উপদেশ বিনা অনাদি কালের ভ্রম-বশতঃ আপনাকে দেহ-জ্ঞান করিয়া থাকেন।

অতএব প্রামাণ্য বিষয়ের পূর্ব্বার্দ্ধে লিখিত অনাদি কালের অজ্ঞান প্রযুক্ত জীবের দেহাধ্যাস হইয়া থাকে। উহা বর্ণিত হইল।

জীবাত্মা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দেহাধ্যাসবশতঃ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছেন এবং বারংবার জন্মমরণ প্রাপ্ত হইতেছেন। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

সাধক সর্ব্বানন্দ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারা।

অরূপ-সরূপ শিবা শিব-সীমন্তিনি
তোর বিশ্বরূপ কোথা লুকালি জননি !
এ কি মা অরূপ-রূপ বাঙ্মন অতীত
মহোজ্জ্বল ঘোরতম তম পরতীত ;
অর্ব্বুদ নিখর্ব্ব কোটী তপনের জ্যোতি
জিনি সমুজ্জ্বল মহা তমোময় দ্যুতি,
বিশিষ্টের ছন্দ-গন্ধ-হীন সর্ব্বনাশি
কি মহা কলন রঙ্গে খেল এলোকেশি,
সকল গ্রাসিয়া শ্যামা নিষ্কলা শঙ্করি,
রূপাতীতা নির্ব্বিশেষে ঘোররূপ ধরি,
কোথা কোন উর্দ্ধে কোন পরাভিমুখিনী,
উষ্ণিক্ ছন্দেতে নাচি কালী উন্মাদিনী
অন্তরে অন্তরতম 'পর'কেন্দ্র পানে
উন্মাদিনী তব গতি 'উষ্ণিকের' গানে !
রূপ গুণ সমুদয় করি সংহনন
বাহিরে দেখায়ে রূপ দারুণ ভীষণ
অন্তরে কল্যাণী ঘন মধুরস সার,
কৃপাময়ি কেবা আর সমান তোমার !
নাহি দক্ষ নাহি বাম, নাহি রূপ গুণ নাম,
সম্মুখ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধ আর আদি ধাম,
নাহি কর পদ নাহি ইন্দ্রিয় আভাস ;
দ্রব্য-ক্রিয়া-ভাবাদ্বৈত বিশুদ্ধ বিলাস ,
দলনী কলনী কালী গ্রাসিনী সকল
নির্ব্বিশেষ নিরাকার অরূপা নিষ্কল ,

সর্ব্বকলয়িতা কালে করিয়া কলন
বিপরীত রতিরঙ্গে করি আকর্ষণ,
বাহির হইতে টানি' কামের ভাষায়
'গতি'রূপে দ্রব হয়ে কোথা মিশে যায়
বাহিরে যা' মুণ্ডমালা মরণের লীলা,
ভিতরে যে তা'ই প্রীতি-মল্লিকার মালা,
মরি কি, মল্লিকা মালা বাহিরে ভিতরে
সূক্ষ্ম পর গতি রূপে কিবা শোভা ধরে!
পরাৎপর হৃদে মাগো আনন্দরূপিণী
ললিত মাধুরী মরি কি খেল জননি।
জীব হৃদি পুরে সাজি ব্রজেন্দ্রনন্দন
বেণু-তানে সবাকারে করি আকর্ষণ
বাহিরে কালিকা করি সকল কলন
পরা-গতি রূপে শিবে কর আলিঙ্গন।
দয়াময়ী তব সম বলকে এমন।
বাহিরে আরক্ত আঁখি, স্নেহসিক্ত মন।
অখণ্ড অদ্বৈতানন্দ রসস্বরূপিণী
কি বলে ডাকি মা তোরে পরমা জননি।

বলিতে বলিতে তথা, সমুদ্রে সৈন্ধব যথা
সমরসে 'সর্ব্বানন্দ' হইয়া আপ্লুত,
যথা হুতবহ গত, কনক সুকান্তি যত
উঠে তার দেহে ভাতি জ্যোতি অদভুত;
লঘু ঊর্ম্মি সহ যথা জলধির বিশালতা,
ঊর্ম্মির অজ্ঞাতে রহে জাগি নিরন্তর।
সর্ব্বকালে সরবত্ত দেখি কালি বিরাজিত,
তাহাতে ডুবিয়া 'সর্ব্ব' হইল বিভোর
ধরি 'পূর্ণ' 'সর্ব্ব' করে, কহে দেখ হৃদি পুরে
কালী রূপে যারে তুমি দেখিছ বাহিরে
দেখ 'সর্ব্ব' দেখ এই অন্তরে রাজিত সেই
জগতজননী শিবা তারা রূপ ধরে।

দেখ— .

কিবা রূপ ঢল ঢল   নীল ইন্দু নিরমল
অতুল উজ্জ্বল মহাজ্যোতির আগার,
কলনী কলন রতা   শশিকলা পঞ্চযুতা
অবিশেষ ভালতট সর্ব্বজ্ঞানাধার !
পরমা পরমেশ্বরী   অবিশেষ শিরোপরি
আভা রূপে জটা বেড়ী শোভে নাগরাজ
ঊর্দ্ধরতি পরাগতি   পরা নীল-সরস্বতী
পরাৎপরা রাজে ধরে 'পুরুষের' সাজ ।
পরাবিদ্যা স্ব স্বরূপে   বিশেষতঃ 'আমি' রূপে
সর্ব্বভাব, ক্রিয়া দ্রব্য করিয়া কলন,
কি অচিন্ত্য রূপে মাগো   আত্মসাৎ করি জাগো
অব্যক্ত অচিন্ত্য ব্রহ্মে করি আলিঙ্গন ।

তাই মা তো

নহে আর দিগম্বরী,   পুরুষের রূপ ধরি
লম্বোদরী বিরাজিতা হর-হৃদাসনে,
কটিতটে বাঘছাল,   কণ্ঠেতে কঙ্কাল-মাল,
বিভূষিত চতুর্ভুজ ভুজঙ্গ-ভূষণে ।
সকল কলন করি,   যাম্যে বামে অস্ত্রধর
সর্ব্ব দ্বন্দ্ব, ভাল মন্দ, করিয়া নির্ম্মূল,
ইন্দিবর এক করে   অপরে কর্ত্তৃকা ধরে,
বিনাশ করিছে 'সর্ব্ব' ছিন্ন ভিন্ন ভুল.
নীলবর্ণা করালাস্যে   লোল জিহ্বা অট্টহাস্যে,
ত্রিনয়ন-বিভূষিত সুচারুবদনা
ভালে পঞ্চ ঢল ঢল   জ্ঞানকলা নিরমল,
নাগিনী জড়িত একজটা বিভূষণা ।
হের নীলসরস্বতী   নাগযজ্ঞ উপবীতী
'আমি' রূপে সর্ব্বভূতে যাঁর অধিষ্ঠান,
সকল কলন করি   'আমি'তে বেধেছে ধরি
নির্ব্বিশেষ কি অব্যক্ত, ভাব করি দান

বাহিরে কালিকা যিনি, হৃদে রাণী সে তারিণী
এক ছন্দে বাঁধা দেখ বাহিরে ভিতরে
এই ত কল্যাণী শিবা পরা গতিরূপে কিবা
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মরূপে নিয়ত বিহরে।

ষোড়শী।

পূর্ণ— সে পরা অপরা-সাজে
আসিয়া প্রকৃতি মাঝে,
আদি-কামরূপে সাজি জগত জননী
'একোঽহং বহু স্যাম,'
ভাবে লয়ে রূপ নাম,
'বহু'রূপে আপনারে আস্বাদে আপনি।
দেখ সর্ব্ব দেখ মরি
কিবা পদ্মাসন করি,
শঙ্কর-সুসুপ্তি মাঝে শতদলাসীনা।
পাশাঙ্কুশ ধনুঃ শর
চাবি করে মনোহর
রতন ভূষিতা চারু রক্তবাস পরা
ধৃত পঞ্চদেব-শিরে
পঞ্চভুজাসন পরে
বিশ্বারূপে বিশ্বাবাসে রাজে মনোহরা!

সর্ব্ব— এ'যে বহু; কোথা এক?
ভিন্ন ভিন্ন পরত্তেক
সকলের মাঝে এক মহা আকর্ষণ
এ উহার পানে ধায়
সবাই সবারে চায়
সর্ব্ব মাঝে বহে এক আকুল স্পন্দন!

ঐ যে— বিশ্বের মরম করিয়া মথন
কি আকুল গান উঠিছে জাগি'
এ মধুর তানে কে কাহারে টানে
বিয়াকুল কা'র অনুরাগ লাগি' ?
মাধুরী মণ্ডিত সুষমা-ভূষিত
নয় হৃদয় আলিঙ্গনে ভরে,
মোহন পরশে বাঁধিবার আশে
বাহু পসারিয়া কাহার তরে ?
এই ঢল ঢল এই সমুজ্জ্বল
এই কাঁচা রূপে লাবণি মাখিয়া
পতঙ্গের প্রায় রূপের শিখায়
বলগো কাহারে দিবেগো দহিয়া ?
এত কোমলতা এত মধুরতা
এত ছল-ছল ললিত লীলায়
বলগো কাহারে এ রস সাগরে
রাখিবে ডুবায়ে—তোমার হিয়ায় ?
সৌরভ ছড়ায়ে দিগন্ত জড়ায়ে
ছাপায়ে জগত-গগন-অঙ্গন
বল কার তরে সুগন্ধ ছড়িয়ে
পাঠায়ে দিয়েছ মাতায়ে ভুবন ?
সর্ব্ব অঙ্গে মাখি' সর্ব্বেন্দ্রিয় সার
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-ভার,
আবতি করিতে বলগো কাহার
সাজায়ে রেখেছ বিপণী সম্ভার ?
প্রকৃতি রূপিণী শিবা
স্বাদিতে স্বরস কিবা
কামেণী ষোড়শীরূপ করিয়া ধারণ,—
অখণ্ড হইয়া খণ্ড
পরকাশি ব্রহ্ম-অণ্ড
আদিরসে রস-লীলা কর আস্বাদন ?

বাসনা অঙ্কুশে টানি
সবারে টানিয়া আনি
দৃঢ় মোহপাশে জীবে বাঁধিয়া নিদয়ে ;
ধ'রে পঞ্চ তীক্ষ্ণ শর
দূর-ভেদী ভয়ঙ্কর।
কি সাজে সেজেছ ওমা ! দেখে মরি ভয়ে।
মত্ত গজরাজ প্রায়
এ উহার পানে ধায়,
আকর্ষিয়া এ উহারে ভীম আস্ফালনে ;—
কি দারুণ মহারোল,
কি ভীষণ কোলাহল,
উঠিয়াছে 'সর্ব্ব' মাঝে ভীম গরজনে।
কি ভীষণ বেগে ধায়
লক্ষ লক্ষ্য প্রতি হায় !
ইন্দ্রিয়, বাসনা, মন, অঙ্কুশ-তাড়নে
বুঝি সব ভেঙ্গে যায়
হ'ল সবে চূর্ণ প্রায়
ধূলি হ'য়ে উড়ে যায় গগনে সকলে।
একি তায় সর্ব্বনাশি,
অধরে মধুর হাসি
লাগাও মোহের ফাঁসি সকলের গলে ?
কি এই তোমার রীতি
একি নিদারুণ প্রীতি
অমৃত বলিয়া তুমি খাওয়াও গরলে ?"

পূর্ণ— একি। 'সর্ব্ব' একি ভুল ?
এ'যে ভুক্তি মুক্তি-মূল,
আদি-বিদ্যা কামরূপা ষোড়শীরূপিণী
সৃজনে যে সৃষ্টিরূপে,
অন্তেতে সংহৃতি রূপে
অবিদ্যা ও বিদ্যারূপে খেলেরে জননী !!

বিশাল 'সোঽহং' জ্ঞানে
পুরুষ নিমগ্ন ধ্যানে
পরিপূর্ণানন্দ নাহি প্রকাশ তাঁহার,—
তা'ই তাঁরে করি খর্ব্ব
আপনি সাজিয়া 'সর্ব্ব'
তা'রে হংস রূপে লয়ে খেলায় সাঁতার।
অদ্বয় সে পূর্ণতম
নহেত সহিতে ক্ষম
অতিরিক্ত দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব আভাস।
তেঁই পূর্ণ সদাশিব
'হংস' রূপে শুদ্ধজীব
'সর্ব্বেরে' করিতে আত্মা করিছে প্রয়াস।
অবিদ্যা স্বরূপে তা'রে
ধরিয়া হৃদয়াধারে
লীলারসে সর্ব্বময়ী সরসী ষোডশী,
উছলিয়া নানারঙ্গে
নানা ভাবে নানা ভঙ্গে
রস-পুষ্ট করি কিবা খেলিতেছে হাসি !
ত্যজি বহির্ম্মুখ গতি
হয়ে 'সর্ব্ব' ! শুদ্ধ মতি,
ধ্যানযোগে জননীরে কররে দর্শন
রসময়ী কি লীলায়
সুমধুর কি খেলায়
সর্ব্বরূপা আত্মা সহ করিছে রমণ ?"
পুলক রোমাঞ্চ কায়
নেত্র জলে ভেসে যায়
গদ্গদ বচনে 'সর্ব্ব' কহিছে তখন,—
"পূর্ণা দাদা একি হেরি
সর্ব্ব মাঝে শুভঙ্করি
করুণা কোমল-কান্তি ধরেছে কেমন ?

বিদ্যারূপে এ'যে বালা
মরি কি লীলার খেলা
ছড়ায়ে দিয়েছে রূপে অমৃতের সার
মরি কিবা ঢল ঢল
কাঁচা কান্তি নিরমল
প্রেম অনুরাগে মাখা লাবণি সম্ভার।
অমৃতাদি ষড়দশ,
জ্ঞান-কলা পূর্ণ রস
আদিরস রূপে সর্ব্ব রসের আধার,
ঢল ঢল নিরমল,
ভাল তটে সমুজ্জ্বল,
দেখাইছে কিবা পর আনন্দ আগার।
আকর্ষি অঙ্কুশে ধরে
সর্ব্বে দেয় 'আত্ম'করে
'আমির' বাহিবে তা'ই রবেনাত আর ;
ভেদ ভাব যাহা রয়
সকলি করিছে লয়
মধুর প্রেমেতে বাঁধি, করি একাকার।
করে তীক্ষ্ণ পঞ্চশর,
কে বলে ও ভয়ঙ্কর,—
ও যে শুদ্ধ জীব—আত্মা—প্রণবের রূপে ;
থাকি তাঁর চারু করে
মরি কিবা শোভা ধরে
সগুণ-কুঞ্চিত—'সর্ব্ব'-ধনুকের রূপে।
অপরা-প্রকৃতি পুরে,
জীব-কেন্দ্র মণিপুরে,
অধিষ্ঠান করি জীব নাভি শতদলে
অলুপ্ত-শকতি-ময়,
হেলায়ে নয়নত্রয়
খেলে রঙ্গে শিব সঙ্গে আধারের ছলে।

পরব্রহ্ম সদাশিব
সেত' নহে ভ্রান্ত জীব
নিদ্রা, তন্দ্রা, মোহ, ভ্রান্তি, নাহিক তাঁহাতে,—
তবে যে সুপ্তির লীলা
ও সুধু লীলার খেলা
সাজিয়াছে সাজায়েছে তিনি যেই মতে।
'একোহহং বহু স্যাম'
যেই ভাবে আদি কাম
বহুরূপে করিয়াছে আত্মাকে বিতত ;—
তাই দেখি এই এ' যে
সর্ব্ব-রসেশ্বরী সেজে
পঞ্চীকৃত রস মাঝে হইয়া পুটিত
প্রণব-কামের মাঝে
ঐং হ্রীং স্ত্রীং বাজে
পঞ্চশর সাজি নিজে পরমা যোগিনী
এই ল'য়ে সে আত্মাবে
নিভৃত নিকুঞ্জ-দ্বারে
রাস-অভিসারে ধীরে চলে কাত্যায়নী

তখন—

'পূর্ণানন্দ' পূর্ণানন্দে
হাসি কহে 'সর্ব্বানন্দে'
"সর্ব্বেশ্বরী এল যদি ব্রজগোপী-বেশে,
চারু পঞ্চশর ধরি
আদি বিদ্যা কামেশ্বরী
দেখরে কি খেলা খেলে আত্ম-ধামে বসে।"
ডগমগ পূর্ণানন্দে,
সর্ব্ব কহে 'পূর্ণানন্দে'
"পূর্ণাদাদা! দেখরে বেটীর রঙ্গ খেলা

বেদেনী—বেদের মাতা,
কত রঙ্গের পুষ্প, লতা
বেঁধে অঙ্গে, চলছে রঙ্গে, সঙ্গে শরের মেলা'।
শরের সঙ্গে জুড়ে শব,
করে দীর্ঘ দীর্ঘতর,
উচু ডালের পাখী সব বিঁধ্‌ছে অবহেলে।
পাখীগুলি এম্‌নি হায়
উড়ে এসে পড়্‌তে চায়,
বিঁধ্‌লে শরে, ধ'র্‌লে করে, জাতের বুলি ভোলে।
প্রথম শরের তিনটী 'থাকে'
এক করে ভাই বিঁধ্‌ছে যা'কে
শরের সঙ্গে সরল হয়ে পড়ছে এসে পায়।
সর্ব্বনাশি ঐ ওঁ শরে
আনছে সকল আপন করে
সুবের মত শর যে ওটী প্রণব ধ্বনি গা'য়।
তাহার অপর শর
দেখ কিবা মনোহর
কত যে মধুর রঙ্গ করে অভিনয়
আসরেতে 'ভুলো'র সাজে,
বিস্তার সঙ্গিনী সেজে
ইসারা ইঙ্গিতে তা'র কাজ সেবে লয়।
ঐংকার ইঙ্গিতে অয়ি
সে যে গুরু-শক্তিময়ি
ইঙ্গিতে এ'হতে সে যে ব্রহ্মকে দেখায়।
'এ'ত তাঁ'র কিবা কিছু
ঐ যে তাহারি পিছু
স্বরের ঝঙ্কারে ভণে কিবা ইসারায়।
এক ছাঁদে কথা তা'র
ভাবেতে বুঝায় আর,
'নেতি' ব'লে 'ইতি' মাঝে বুঝায় তাহারে,

যেন সে নটিনী দূতী,
আঁখি ঠারি ইতি উতি,
বিস্তার বিলাস কহে সুন্দর নাগরে।

যত ভাব এ সংসারে
তার মাঝে কি বিশেষ ক'রে
কাজলা দুটি আঁখির ঠারে
দেখাও তুমি কা'রে গো!
এরি মাঝে তোমার ঠারে
মনে যেন পড়ছে কারে
দেখছি যেন চারি ধারে
সবাব মাঝে তাঁ'রে গো।

যা কিছু মোর আসছে কাছে
ঐ যে রাঙ্গা—তারি মাঝে
ঠোঁট বাঁকায়ে মুচ্‌কি হেসে
বাঁকা চোখের ঠাবে গো
সেই সকলের তলে তলে
তাঁর কথাটি ছলে ব'লে
অন্ধ আঁখি দিচ্ছ খুলে
কাজল কাঠির ধারে গো।

এত—　শর নহে—লীলা কলা ;
কি রঙ্গে করি'ছ খেলা
'হ্রীং'কারে সাজিয়া শ্যামা জগতরঙ্গিণী
সকল বর্ণের মাঝে,
'অ'-রূপে কি চারু সাজে
সর্ব্ব ব্যঞ্জনাতে গুপ্ত সে বরবর্ণিনী।*
হিরণ্ময় পর কোষে
'হ'রূপেতে পরকাশে
অ-রূপা বিশ্বাদ্য বীজ বিশ্বপ্রসবিনী

জুড়ি অপ-মহাপ্রাণ
তারি মাত্রা বিদ্যমান
আদিস্বর মহাপ্রাণ সহ অহঙ্কারে
বহ্নি'র' বীজে হাসি,
সকল বিশেষ গ্রাসি
অব্যক্তে লুকায় শক্তি 'ঈ'কার টঙ্কারে।
'মায়া'-বীজ বলি তাই
বাহিরে প্রকাশ যাই
কিন্তু সে বাহিরে নাই, রহে অন্তঃপুরে,
লজ্জা সে বাহিরে ঢাকি
থাকে সদা অন্তর্ম্মুখি,
খুলে সে সহাস্য মুখ নাথের গোচরে।
শর সম দ্রুত ধায়,
ভিন্ন পথে নাহি যায়,
একলক্ষ্য গতি ভর্ত্তা প্রভু পানে চ'লে
সর্ব্ব বিশ্ব চাপে তায়
সূক্ষ্ম শক্তিমান্ হয়
লীলা-কলা পরপারে যায় 'হরি' বলে।
সর্ব্ব বাহ্য দগ্ধ ক'রে
ভক্তে বহ্নি-পূত করে
শ্রীং বীজে শ্রীবিদ্যা ল'য়ে আপন আবাসে,
ভক্তে কর আত্মবৎ
দৈব সুসম্পদে যত
পুণ্যশ্রীতে সাজাইয়া পাঠাইতে 'রাসে'।
তটস্থা বিহ্বলা জীবে
বুঝাইতে সদা-শিবে!
নারায়ণি! কানে কানে কহ আসি হাসি;—
তাঁহার সোঽহং বীজে
সে যে তাঁর কণা নিজে,
জীব যে তাঁহারি নিত্য চরণের দাসী।

দেখাইয়া নিত্য ধাম
শুনাইয়া শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া পশিয়া মরমে,—
বিয়াকুল কর তারে
ধৈর্য্য সে ধরিতে নারে,
চলে অভিসারে, দলি সরম ভবনে।
হৃদে হরি-গুণগ্রাম,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে তাঁরি নাম
ক্লীং বীজে পরকাম মন্মথ-মদন
সর্ব্বতঃ হইতে আসি
অধরে মধুর হাসি
নিভৃত নিকুঞ্জবাসে করে আকর্ষণ।
ক্লীং মন্ত্র কল-তানে
মরম ধরিয়া টানে
বাজারে অধর-সুধা-সিক্ত সুধা বাঁশী
মথিয়া মন্মথ মন
করি তারে আলিঙ্গন
যে পর-পুরুষ হাসে হৃদি পুরবাসী॥
জাগ রাজ-রাজেশ্বরি!
কাত্যায়নী কামেশ্বরি
কামতত্ত্ব কামরূপা জীবহৃদি পুরে
ষোড়শী মুরতি ধরি
পর-ব্রহ্ম লক্ষ্য করি,
ছাড় পঞ্চকলা শর 'সর্ব্ব'চাপে জুড়ে।
সুপ্তজীব শিব ক্ষেত্রে
দেখুক সে দীপ্ত নেত্রে
বহির্ম্মুখী ক্ষুদ্র 'হংস' নহে সেত' আর;
তাহার সোহহং মন্ত্র,
সে যে শুদ্ধ 'পর'তন্ত্র
তা'রি তরে খোলা তাই রাস-কুঞ্জদ্বার।

ধরিয়া তাহারি গলে,
কাল-রূপে কালী খেলে
সবব অতীত পর শ্রীরাস-মণ্ডলে,
সবে এক একে সব,
সম রূপে অনুভব
'তাষাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ; রস-পুষ্টি ছলে।

শ্রীচিন্তা—

দুঃখ শান্তির উপায় কি ?

জীবে যখন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জীবনাবসান রূপ দৃশ্যের শেষ-যবনিকায় দাঁড়াইতে যায়, তখন একবার ভাবিতে ইচ্ছা করে দুঃখ শান্তির উপায় কি ? আধি-ব্যাধির ঘাত-প্রতিঘাতে পরিদৃশ্যমান সংসার-যাতনায় যখন কাতর হয়, তখন একবার ভবিতে ইচ্ছা করে দুঃখ শান্তির উপায় কি ? আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয় ছাড়িয়া, কোন অজ্ঞানিত প্রদেশে যাইতে হইবে যখন মনে হয়, তখন একবার ভাবিতে ইচ্ছা করে "দুঃখ শান্তির উপায় কি ?" কিন্তু অগণিত সম্পত্তি ও উন্নত অট্টালিকার বাহ্য-চাকচিক্যে মগ্ন হইয়া, যখন পৌনঃপুনিক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর লাভেই জীবনী শক্তি ব্যয়িত করে, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে, আপাত-প্রিয়দর্শনা, পরিণামে কাল-ভুজঙ্গিনী, বিলাসিনীর বিলাসে যখন আসক্ত হয়, তখন একবার ভ্রমেও ভাবে না, যে মানবজীবন সংসার-জলদ-জালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর ; আত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত ভোগ্য বিষয় বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার, বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন হিম-বিন্দুর ন্যায় অচির-স্থায়ী ; ভোগসমূহ জলকণার মত ক্ষণিক। তখন জীব ভাবে না, "আজ যে দেহে পুনঃপুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য ব্যাকুলতা,—কল্য তাহার পরিণাম শ্মশান-ক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ ; আজ বিলাসিনীর যে কলেবরে এত রমণীয়তা,—কল্য তাহার পরিণাম শ্মশানপ্রান্তরে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যবিশেষ।" জগতের এই পরিদৃশ্যমান পরিবর্ত্তনতাই—পৌরুষপ্রযত্নের উদ্বোধক হইয়া জীবকে "দুঃখ শান্তির উপায় নির্ণয়ে" প্রবর্ত্তিত করে।

পৌরুষপ্রযত্নে মনকে যে ভাবে উপনীত করা হয়, অভ্যাসের দৃঢ়তায় মন

"ঠিক" সেই ভাবেই উন্নত হয়। পৌরুষবলেই জীবের শান্তিবর্দ্ধক ইষ্টপ্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তক অনিষ্ট পরিহারের পথ পরিষ্কৃত হয়। চিত্ত-জয়ের পক্ষে পৌরুষই পরম হিতপ্রদ। পৌরুষবলে বেদ-বিহিত বিশুদ্ধতা, স্মৃত্যুক্ত পবিত্রতা, পরমার্থ-চিন্তনে নৈষ্ঠিকতা, ইত্যাদি ধর্ম্ম-সাধনায় রত হইলে, চিত্ত-বিকল্প-জনিত ভ্রান্তি দূরে যায়, আত্মবোধক শাস্ত্রবিচারের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সত্যের সারূপ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়। প্রথমাবধি এবম্বিধ পৌরুষপ্রযত্নে মনকে উন্নত করা হইলে,— জীবনাবসান দৃশ্যের শেষ যবনিকায়—অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কোলে বসিয়া জীবকে 'দুঃখ শান্তির উপায় কি' এই চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় না, বিলাসিনীর বিলাসে অমূল্য আয়ুও ক্ষয়িত হয় না। অতএব সময় থাকিতে "দুঃখ শান্তির উপায় কি" প্রশ্নটী অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লইয়া গিয়া অসাধারণ প্রজ্ঞার সাহায্যে চিন্তা করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্যের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গস্বরূপ। পরন্তু এই কর্ত্তব্য পরিপালনই হিন্দুর রীতি নীতি সাধুতা ও সৎকর্ম্ম নিষ্ঠার পরিচায়ক। তদ্দ্বারা হিন্দু শাস্ত্রের মহত্ব ও পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে অগ্রবর্ত্তিতা অবগত হইলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে :—

সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরম-পিতা পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তিই আধ্যাত্মিক আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্মূলের পরমোপায়। জীব ভোগের নিমিত্ত অত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত ভোগ্য বস্তু আহরণে অনায়াসেই সক্ষম হয়, দূরপ্রবা-হিনী সমুদ্রের পারে যাইবার নিমিত্ত বুদ্ধি-নৈপুণ্যে অর্ণব পোতাদি নির্ম্মাণে তৎপর হয়, দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কারের উপায় করে;—কিন্তু 'আমি কে',—'জগৎ কি,'—'ঈশ্বর কাহাকে বলে' ? এই প্রশ্নত্রয়ের নির্ণয়োপলক্ষে বুদ্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি পরাহত হইয়া উঠে। কিন্তু ভক্তির নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নাই। ভক্তির কণা মাত্র উদ্রিক্ত হইলে, দুরাচারজনিত দুর্ম্মতি দূরে গিয়া "ভগবদনুগ্রহে" উল্লিখিত প্রশ্নত্রয়ের সুমীমাংসায় ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়।

অতএব মিথ্যা জ্ঞান, অধর্ম্ম শক্তি, হেতু, চ্যুতি ও পশুত্ব-মূল এই পঞ্চবিধ আত্মজ্ঞানাবরোধক "হয়" মল—(ইহা পাশুপত তন্ত্রের মত),—মল, কর্ম্ম, মায়া, বোধশক্তি বা ঈশ, বল, কর্ম্মও মল এই চতুর্ব্বিধ "নানা যোনি পরি-ভ্রমণের কারণস্বরূপ" পাশজাল বা অর্থ পঞ্চক (ইহা শৈব-দর্শনের মত);— বহুবিধ দুঃখের কারণস্বরূপ চপলত্ব, ঘনত্ব, আর্দ্রত্ব ইত্যাদি মৃত বা বদ্ধসূচক (ইহা রস দর্শনের মত),—চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন স্ত্যান, প্রতিকূল,

জ্ঞানজনিত সংশয় পরম পদ পরিজ্ঞানের বিঘ্নপ্রদায়িনী প্রমাদ, ধর্ম্ম বিষয়ে অপ্রবৃত্তি প্রযুক্ত আলস্য, বিষয়াভিলাষজনিত অবিরতি, অসদ্বস্তুতে বস্তু-বুদ্ধি-জনিত ভ্রান্তি, তজ্জন্য সমাধি-ভূমির অপ্রাপ্তিতে অলব্ধ ভূমিকত্ব, ভূমি লাভ হইলেও তাহাতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা নিবন্ধন অনবস্থিতত্ব প্রভৃতি অবিদ্যা-সম্ভূত অন্তরায় অপসারিত করিয়া পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে ঐকান্তিকী ভক্তির সহিত অদ্বিতীয় নিরঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি না জন্মে তাবৎ জীবের সংসার রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা বাসনাও ঘুচেনা। অতএব ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম!

শাস্ত্রাদিতে এই ভক্তিপ্রতিপাদক একই পর্য্যায়ের অন্তর্ভূত কতকগুলি শব্দের ব্যবহার বর্ণিত আছে, যথা, অনুরাগ, আনুরক্তি, রস, ভাব, মহাভাব ইত্যাদি। এই শব্দগুলি একার্থবোধক ;—অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ে অন্তঃকরণের যে একান্ত 'অনুরাগ' তাহার নাম ভক্তি ;—আরাধ্য বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধির নিমিত্ত অন্তঃকরণের যে আনুরক্তি তাহার নামও ভক্তি,—আরাধ্য বিষয়ের আবির্ভাবজনিত অন্তরে যে আনন্দ'রসের' আস্বাদ হয় তাহার নামও ভক্তি,—আরাধ্য বিষয় প্রণিধান নিমিত্ত অন্তরে যে "ভাবের স্রোত" প্রবাহিত হয় তাহার নামও ভক্তি,—ভাবের দৃঢ়তায় যে "মহাভাব" তাহার নামও ভক্তি। মহাভাবে নিরতিশয় আনন্দ আছে; তাহা অনন্য-প্রয়োজন-বিশিষ্ট অনুপম ও শাশ্বত।

আবার ভক্তি পরিপক্কাবস্থায় 'প্রেম' নামে অভিহিতা হয়। প্রেমের আবির্ভাবে জীব সর্ব্বভূতে প্রেমবান্ হইয়া সর্ব্বত্র সম দর্শন করে, জগৎ প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়ায়; মৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভের অধিকারী হয়। তখন অন্তঃ-করণ ঘৃণা-শূন্য হয়, আত্মপরভেদ দূরে যায়, অনর্থ-দায়িনী বিষয়বাসনাও অপনীত হয়। 'আমি আমার' জ্ঞান লোপ পাইয়া তদীয়তা লাভ হয়, সারা জীবনের সমস্ত সাধনা পূর্ণ হইয়া যায়, কাজেই জীব আদ্যন্ত-বিহীন পরম পদে অবস্থিতি করে। এবম্ভূত ভক্তি বা প্রেম মানব-ইচ্ছার অধীন নহে, বা কোন কারণান্তরের অপেক্ষা করে না। ইহাকে ক্রিয়াত্মিকা করিলে বা সমবায়ী অসম-বায়ী নিমিত্ত, জন্য, হেতু ইত্যাদিতে কোন কারণান্তরের অপেক্ষায় রাখিলে ইহা "স্বয়ং সিদ্ধ শক্তি সম্পন্নার" অভাব হেতু বিনশ্বর হইয়া পড়ে। ভক্তি-জনিত মুক্তির প্রমাণ যাহা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহারও নশ্বরত্ব স্বীকার করিতে

হয়। কারণ যাহা নিরপেক্ষ বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, যাহাতে অপেক্ষা-বুদ্ধি-জনিত সংশয় থাকে, তাহা মুখ্যে অবাস্তর বিধায় বিনশ্বর হয়। মহর্ষি জৈমিনীমতে তাহা স্বতঃ প্রমাণ না হইয়া "সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবৎ"। শ্রুতিমতেও তাহা সিদ্ধ প্রমাণ নহে। কারণত্ব কল্পনায় প্রতিবন্ধক দোষাদির সমবধান প্রামাণ্য নিশ্চয় নিরর্থক হইয়া, "কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের তুলনায় তাহা অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশী হয়। সুতরাং ক্রিয়াত্মিকা ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী নহে।

অতএব ভক্তির ভাব অনন্ত ও অবিনশ্বর রাখিতে হইলে, উহাকে ক্রিয়ার "জন্য" দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। এমন কোন নিরপেক্ষ, স্বয়ংসিদ্ধ বস্তুর সহিত অভেদ করিতে হইবে, যাহা দ্বারা ভক্তিও স্বয়ং-সিদ্ধা মধ্যে পরিগণিতা হইতে পারে ও দুঃখ নাশনের অবশ্যম্ভাবী শক্তি তাহার থাকে, সেই বস্তুই জ্ঞান। জ্ঞানের সহিত ভক্তি অভেদ হইলেই আমরা দেখিতে পাইব, যে কোন পৃথক্ হেতু ভক্তিতে নাই। ভক্তিই ভক্তির হেতু, ভক্তিই ভক্তির কারণ ও প্রয়োজন, ভক্তিই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা, মনের অবিচ্ছিন্না গতিমাত্র। দেবী-ভাগবত মতে "চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা"। এবম্বিধ ভক্তিই পরমা শান্তি-দায়িনী ও সর্ব্ব দুঃখ-প্রশমনী। অতএব যে বস্তুর আনুকূল্যে ভক্তি ও জ্ঞানের 'এক' একত্ব বা অভেদত্ব উপলব্ধি হয়, সেই বস্তুর আশ্রয়ই দুঃখ-শান্তির পরমো-পায়, সে বস্তু "জ্ঞান।"

শ্রীরঙ্গলাল দেবশর্ম্মা।

শিখিধ্বজ ও চূড়ালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পতির অলস-মুগ্ধ আলিঙ্গন-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, পুষ্পপেলব উন্মাদক স্পর্শ প্রস্তর-কঠিন কর্কশ বলিয়া বোধ হইল, বড় সাধের আবেশময়ী তন্ময়তা ইন্দ্রজালের মত মিলাইয়া গেল। পত্নী নিদ্রালস শঙ্কাতুর বিহ্বল নয়নে চাহিয়া দেখিল, পতি পার্শ্বে নাই; শয্যা শূন্য, শুভ্রাকাশ ছাড়িয়া পূর্ণেন্দু কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সুপ্তা রাণী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রি গভীর।

প্রকৃতি নিস্তব্ধতাময়ী। বাহ্যশান্তির স্বপ্নময় আবরণে বনস্থলী আচ্ছন্ন। নিজের হৃদয়ের পানে সাধ্বী তাকাইয়া দেখিল—মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন জমিয়া আছে, অশান্তির হাহাকার, ভীতির গুরুভাব সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে—কেবলই অন্ধকার। অন্ধকারের উপরে, ভিতরে, পার্শ্বে, পশ্চাতে অন্ধকার। যুবতীর রক্তিম মুখখানি তুষার ক্লিষ্ট-কহ্লারের মত ম্লান যৌবনোৎফুল্ল দেহযষ্টি নীহারধূসরা দিনশ্রীর মত শোচনীয়-দর্শনা। বিজন অরণ্যানী—সম্মুখে মহাসাগরবৎ বিস্তৃত অন্ধকার—রমণী রাজান্তঃপুরবাসিনী রাজ্ঞী তথায় একাকিনী উপবিষ্টা।

তখন সাধ্বী চূড়ালার অন্তরে চিন্তার প্রবল তুফান উঠিয়াছে—"কোথায় যাই, কোথায় দাঁড়াই। পতির অন্বেষণে যাইলে ত পতি ফিরিয়াও চাহিবেন না, উপরন্তু বিরক্ত হইবেন। রাজ্যে যাইব, পতির রাজ্য রক্ষা করিব।" সতী দিব্য চক্ষুতে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, তাহার নারীজীবনের একমাত্র দেবতা খড়্গহস্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। পরক্ষণেই দেখিল, পতি পূর্ণানন্দময় মঠে মুক্তি-পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সতীর প্রাণ আশ্বস্ত হইল। পতিব্রতা তখন অন্তরের বেদনাভার কোনমতে চাপিয়া, কঠোর কর্ত্তব্য-পথ লক্ষ্য করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। কাতর দুর্দ্দমনীয় চিত্ত সংযম-রজ্জু বদ্ধ করিয়া রাজরাণী ভিখারিণীর মত রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। বনপথ আলো করিয়া যখন চূড়ালা যাইতেছিল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন বনদেবী বনপথের শোভা দেখিবার জন্য মূর্ত্তি-ধারিণী হইয়াছেন।

পুরবাসীরা নবোদিত চন্দ্রকলার মত রাজ্ঞীকে অভিনন্দিত করিল, দশভুজা প্রতিমার মত রাজসিংহাসনের চণ্ডীমণ্ডপে বসাইল। প্রচারিত হইল, রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ কোথায় গমন করিয়াছেন। কুসুমকোমলা রাজ্ঞীর মাথায় গুরুভার রাজ্যের চাপ পড়িল, পুষ্পপেলব হস্তে ন্যায়ের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিল। প্রজাগণকে মায়ের মত পালন করিয়া, অনাথ রুগ্ন পুরবাসীকে কোলে টানিয়া, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণকে মৃদুতীক্ষ্ণ দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, রাজ্ঞী রাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। সমদর্শিনী নীতি স্নেহ-কোমলাকারে সারা রাজ্যে দেখা দিল। তপস্যার মত এই রাজ্যকার্য্য এক অপূর্ব্ব পুণ্যশ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজা রাজ্যে নাই, তজ্জন্য প্রজাদের কোন অসুবিধা ছিল না; রাজ্ঞীর স্নেহ অজস্রধারে প্রজাদের শিরে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছিল। আকাশে চন্দ্র নাই, তাই বিদ্যুৎ-সুন্দরী স্থিরপ্রভা লইয়া আজ বিশ্বের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা।

চূড়ালার বুদ্ধি হীরকের জ্যোতিষ্কণার মত তীক্ষ্ণ অন্তর চন্দ্রকিরণের মত স্বচ্ছ, প্রাণ মহাসাগরের মত বিস্তৃত। চূড়ালা কখন বিনিদ্র-নয়নে সমস্ত রাত্রি স্মৃতি-নিদ্রায় কাটাইয়া দিত, কখন ইষ্টমন্ত্র জপে চিত্তটিকে নিযোজিত রাখিয়া, তপস্বিনী উমার মত উপাসিকা সাজিত, কখন বা কম্পিতকরে বীণাটি ধরিয়া তাহা হইতে বৈদিক গীতির নব নব ঝঙ্কার তুলিত।

এইরূপে কত দিন, পক্ষ মাস কাটিল। অষ্টাদশ বৎসর চূড়ালার সুকুমার দেহের উপব কত অত্যাচার করিয়া চলিয়া গেল। অমন পরিপূর্ণ যৌবনের কি শোচনীয় পবিবর্ত্তন সাধিত হইল। যৌবনভার লইয়া প্রেমময়ী পতিব্রতা বৃথাই এতকাল প্রতীক্ষা করিল, দেবতার করুণা হইল না।

সহসা একদিন চূড়ালার উদ্বোধ হইল যে, পতিদেবতায় উৎসর্গীকৃত দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, পতি-পূজার সুগন্ধি কুসুম রূপ-লাবণ্য ম্লান, শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, লোভনীয় চন্দনসুরভি যৌবন শোভা হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে। সতীর মনে হইল—একদিন না একদিন যে পতিব সহিত মিলন ঘটিবে; যদি দেবতার কামনা-বহ্নি অন্তরের গুপ্তদেশে ধূমায়িত ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন যদি তিনি আমার নারীজীবনের পূজা অপেক্ষা করেন, তখন কি আমি পর্য্যুসিত গন্ধহীন কুসুম দিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিব। যে আশায় এতদিন এত কষ্টে হৃদয়বৃন্তে প্রাণ-কলিকাকে বিধৃত রাখিয়াছি, তাহা কি বৃথাই হইবে? আমার দেবতা কি বাসনা সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন? সেই সুখলালিত মহারাজা সত্যই কি ভোগেব সূক্ষ্ম বীজটিও হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ উত্তোলিত করিতে সক্ষম হইবেন?

তখন সাধ্বীর পতি-প্রত্যাগমনাশা ক্রমেই ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া আসিল; রাজকার্য্য, পূজা জপ, পতিচিন্তা, শাস্ত্রচর্চ্চায় অধিকতর মন দিল। আর্দ্রবল্কলে যৌবনের শেষ ক্ষীণ শোভা ঢাকিয়া ফেলিল, চিক্কণ কেশ-কলাপে জটা রচনা করিল, বিশীর্ণ বাহুদেশে অক্ষমালা জড়াইয়া রাখিল।

চূড়ালার প্রণয়লীলায় বালিকামূর্ত্তি দেখা গেল। সরলা কিশোরী পতির বনবাস রহিত করার জন্য অনেক কাঁদিল, পতিকে কত অনুরোধ করিল। পতির বিরহ-বহ্নিতাপে কিশোরীর মল্লিকাস্নিগ্ধ অন্তর দগ্ধ হইয়া গেল। আরও দেখা গেল, তাহার পতিপ্রণয়বিহ্বল যুবতীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে কি উন্মাদয়িত্রী মোহকর বর্ণবৈচিত্র্য, বসন্তবায়ুর মনোহারিতা আর পরিপূর্ণসলিলা তরঙ্গিণীর বিহ্বলতা, একাধারে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া গেল। আর দেখা গেল,

রাজ্যপালনে মহীয়সী প্রৌঢ়া মূর্ত্তি। মহাসাগর হইতেও গম্ভীর, নীলাকাশের চেয়েও উর্দ্ধ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বিস্তৃত, এই প্রৌঢ়ভাব দেখিয়া বিস্মিত হওয়া গেল। পতির নিকট পত্নী চিরদিনই বালিকা কিশোরী ও যুবতী; সন্তানের নিকট মাতা চিরকালই প্রৌঢ়া।

পাঠকবর্গ, এইবার দেখুন অন্যমূর্ত্তি। জ্ঞানে, তপস্যায়, পাণ্ডিত্যে, তর্কে, অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্যে আর অলৌকিক কার্য্যকলাপে অপূর্ব্ব অভিনব মূর্ত্তি দেখুন। দেখিয়া বলুন—এ সৃষ্টি অলৌকিকী হইতে পারে; কারণ লৌকিক-জগতে এ চিত্রের কল্পনাই অসম্ভব। বেদে উপনিষদে, পুরাণে, তন্ত্রে নাই, কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যে ইহার ক্ষীণ আভাস নাই।

চন্দ্রকর শরীরবিশিষ্টই হউক, চম্পক গঠনোপযোগী কাঠিন্য প্রাপ্তই হউক, দ্বিরদরদ সুকোমলস্পর্শই হউক, চূড়ালা নির্ম্মাণের উপাদান হইবার ইহাদিগের সম্ভবনা ছিল না। ইহার একমাত্র সাদৃশ্য বিশ্বের কোন রমণীতে সম্ভব না হইলেও এ কল্পনার কি কোন মূল নাই? বেদান্তের মায়ার সহিতই চরিত্রের সাদৃশ্য। বেদান্তের মায়াই যেন শরীর ধরিয়া মর্ত্ত্যে লীলা করিতে আসিয়াছে। মায়ার মতই ইহার চরিত্র ও গতি দুর্ভেদ্য রহস্যজালে আবৃত।

মহাদেবের কালিকা, ব্রহ্মার গায়ত্রী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী, মদনের রতি, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণের সমস্ত উপাদান-গুলি দিয়া এই চূড়ালা গঠিত হইয়াছে। ইহা অলঙ্কারের ছটা নহে, কবি-কল্পনার কুহক নহে। ইহা যোগবাশিষ্ঠকার ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবেরই মানসী-প্রতিমা, স্বহস্ত-গঠিতা সজীব মূর্ত্তি।

সৃষ্টির রহস্যই এই যে, আজ যে বড় সুন্দর, কাল সে কুৎসিত। কাল যাহা ভীষণ, আজ তাহা প্রীতিপ্রদ। যে চূড়ালাকে স্বচ্ছসলিলা মৃদুনাদিনী ক্ষুদ্রকায়া বন-নদীর মত দেখা গিয়াছিল, কালই তাহাকে বিশালোরস্কা, প্রখর-স্রোতা মহানদীর মত দেখিতে হইবে। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীর চরিত্রে মনুষ্যত্বের যে সূক্ষ্ম বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহাই দেবত্বের মহামহীরুহরূপ আকারে দাঁড়াইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। মায়া যেমন সৎ ও অসৎ, সদসদ্বর্জ্জিতা অঘটনঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য কার্য্যকলাপা; চূড়ালাচরিত্রে ক্রমেই এই মায়াভাবই পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-বাচস্পতি কাব্যতীর্থ।

আভাস।

(১)

মুক্তা-গাঁথা আকাশ হ'তে
আস্‌ছে ছুটে গান,
পাগল-পারা দীপ্ত আলো
শান্ত মধুর তান ॥
ক্ষিপ্ত সাগর মূর্চ্ছে পড়ে
বিশাল তীরের পায়,
সোণার ছবি প্রভাত রবি
আঁক্‌ছে গগন গায় ॥
মুগ্ধ শশী বিমল তেজে
ছুট্‌ছে অসীম পানে,
শান্ত মধুর কিরণ-ধারা
কাঁপ্‌ছে ঝিল্লির তানে ॥

(২)

সৃষ্টি-বাঁধন সিক্ত করি
ছুট্‌ছে কাহার সাজ,
অন্ত-ছাড়া কান্তি-মালা,
ফুট্‌ছে জগত মাঝ ?
আশা সেথায় জীর্ণ পারা
কাঁপ্‌ছে প্রবল ত্যাগ,
বিশ্ব জগত-বক্ষ হ'তে,
ফুট্‌ছে প্রেমের রাগ ॥
রৌদ্র জলে বিশ্ব-প্রাণে
মহান্ প্রাণের ভাষ,
আস্‌ছে ছুটে আবাহন,
রুদ্ধ জগত-শ্বাস ॥

(৩)

বিশ্ব জগত ছুট্‌ছে যেন
কালের ঐক্য তালে,
আস্‌ছে নেমে অসীম আভাস
ক্ষুদ্র সসীম কোলে।
সোণার আভা অঙ্গে মেখে
ছুট্‌ছে বিরাট্‌ প্রাণ।
দীপ্ত-ধারা বিশ্ব ভ'রে
দগ্ধ অভিমান॥
'আমি' যেন বিশ্ব-ছাড়া
অসীম জুড়ি রয়।
মুক্ত আকাশ পূজার আশিস্‌
বর্ষে বিশ্বময়॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

ভিক্ষা।

যত ইচ্ছা, নাথ! কায্‌ দিয়ো মোরে
সংসার মাঝে সতত
বাঁধিয়া রাখিও তব মায়া-ডোরে
স্নেহের বাঁধনে শত।
সব ব্যথা তাপ বেদনা আঘাত
লব আমি শিরে ধ'রে
শোকেরি অঙ্কুশ, তোমারি হে নাথ!
হানিও হৃদয় পরে।
এক ভিক্ষা শুধু মাগি তব কাছে
সকল ভিক্ষার সার

তুমি ল'বে মম যত কিছু আছে
পূর্ণ অসীমে তোমার।
আমার ক্ষুদ্রতা মহান্ সে হ'বে
তব মহিম পরশে
অজ্ঞান্ আঁধার কিছু নাহি র'বে
জ্ঞান-আলোক দরশে।
সব কায মোর তোমারে সে দিন
করিব হে সমর্পণ
তোমারি অসীমে হইয়ে বিলীন
লভিব নব জীবন।
শোক তাপ হ'বে মাথার ভূষণ,—
তব উপহার দান,—
তোমার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ রতন
জাগাতে সবার প্রাণ।
দুদিনের মোর ক্ষুদ্র এই গেহ
উঠিবে ভরি পুলকে
পূত হ'বে মম প্রিয়জন স্নেহ
লভিয়া তব আলোকে।
সব দুঃখ মাঝে তোমারে হেরিব
আমার আপন করি
সব কর্ম্ম মাঝে তোমারে সেবিব
আমার হৃদয় ভরি।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।

শ্রীভারতীতীর্থ-প্রণীত সানুবাদ

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

অথেদানীং প্রত্যধিকরণমবয়বচতুষ্টয়ং শ্লোকাভ্যাং সংগৃহ্যতে।—

প্রথমং ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বাধিকরণং।

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসানিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্হতি ॥১১॥
অধ্যাসোঽহং বুদ্ধিসিদ্ধো সহংব্রহ্মশ্রুতীরিতং
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্মবেদতঃ ॥১২॥

অনু। এখন প্রত্যেক অধিকরণের, বিষয়, সন্দেহ, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত এই অবয়বচতুষ্টয় দুইটী দুইটী শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন যথা—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" অরে-মৈত্রেয়ি! শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পারা যায়। এই শ্রুতি বাক্য বিষয়। ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত কি না, এই সন্দেহ। ব্রহ্ম-বিষয়ক কোন সন্দেহ নাই; কারণ, তাহার কি ব্রহ্মরূপেতে সন্দেহ, না আত্মরূপেতে সন্দেহ? ব্রহ্মরূপে বলা যায় না; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মাকারের নিশ্চয় করা আছে। আত্মাকারেও বলা যায় না; 'আমি আছি কি না' এরূপ আত্মবিষয়ক সন্দেহ কাহারও হয় না। যদি বল, লৌকিক আমি-জ্ঞান ভ্রান্ত, অর্থাৎ দেহাদিতে আরোপিত, অতএব সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে; তাহাও বলিতে পার না, কারণ, অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, অতএব আলোকের ভ্রম অন্ধকারে হয় না এবং অন্ধকারের ভ্রমও আলোকে হয় না, সেইরূপ দেহ ও আত্মা নিতান্ত বিরুদ্ধ পদার্থ, ইহাদের পরস্পর

---

* ১। বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্মেতে তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য তদনুকূল ন্যায় বিচারের নাম 'শ্রবণ' "আত্মাবাহরে," ইত্যাদি বাক্য এই বিচারের বিধান করিতেছেন, অতএব এই বাক্য অধিকরণের বিষয়। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে এই বিষয় বাক্য অধিকরণ দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই, অতএব পঞ্চাবয়বাত্মক অধিকরণ হইল কিরূপে? এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ সন্দেহ দ্বারাই বিষয় বাক্য সংগ্রহ হইয়াছে।

২। সর্ব্বত্র পূর্ব্বপক্ষের ও উত্তরপক্ষের যুক্তিই সন্দেহের বীজ জানিবে। 'সঙ্গতি' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক অধিকরণে আর বলা হইবে না। উপোদ্ঘাতের শ্লোকে সঙ্গতি স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে।

ভ্রম হইতে পারে না। কাজেই শ্রুতিতে অহং-প্রত্যয় দ্বারা আত্ম-পদার্থ নিশ্চিত আছে। নিশ্চিত বিষয়ের বিচার হয় না; যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাই বিচার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। যাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। এবং ইহার প্রয়োজনও নাই; যেহেতু এই রূপ লৌকিক আত্ম-জ্ঞান থাকিলেও, মুক্তি দেখা যায় না। অতএব ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র (বেদান্ত শাস্ত্র) আরম্ভ করা উচিত নহে। ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ।

ব্রহ্ম-বিচার বিষয়ক শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত, কারণ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই শ্রুতি অসঙ্গ ব্রহ্মকে 'আত্মা' বলিয়া উপদেশ করিতেছেন। আর "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাকার অহং-বুদ্ধি দেহ-তাদাত্ম্যাধ্যাসবিশিষ্ট আত্মাকে বিষয় করিতেছে। অতএব শ্রুতি এক অহং প্রত্যয়ের বিরুদ্ধতা নিবন্ধন ব্রহ্মবস্তুতে সন্দিগ্ধ; সন্দিগ্ধ হইলে তাহা বিচারের বিষয় হইবে। তুমি বলিয়াছিলে অধ্যাসের নিরূপণ করা যায় না। তাহার উত্তরে বলিতেছি অধ্যাসের (ভ্রমের) নিরূপণ না হওয়াই, তাহার অলঙ্কার। কারণ ভ্রম-জ্ঞান কালে এই 'জ্ঞান ভ্রমাত্মক, বাস্তব নহে' এইরূপ জ্ঞান থাকিলে তাহার ভ্রমত্বই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রয়োজনও আছে; আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় হইলে মুক্তি হয়, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন; এবং শুক ব্যাসদেব প্রভৃতি বিদ্বানগণ অনুভব করিয়াছেন; অতএব মুক্তি প্রয়োজন। ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, "আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপ আত্মজ্ঞান সকলেরই আছে, ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, ইহার কোন ফল ও নাই। এ বিষয়ের আবার বিচারের দরকার কি?" সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "তাহা বলিতে পার না, কারণ 'আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি আত্মজ্ঞান দেহাদি-বিশিষ্ট আত্ম-বিষয়ক, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য শুদ্ধ আত্ম-বিষয়ক নহে। অতএব সেই শুদ্ধ আত্ম-বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহার বিচার করা আবশ্যক।"

দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো লক্ষণাধিকরণং।*

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিংবাস্তি, নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্রাক্‌স্রগ্‌ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি॥

---

* "যল্লক্ষণং স্বরূপানন্তর্ভূতং সৎ পদার্থান্তরব্যবস্থাহেতুস্তত্তটস্থলক্ষণং।" লক্ষ্যের অন্তর্ভূত না হইয়া যাহা ইতর ব্যাবর্ত্তক হয়, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। "স্বরূপমেবলক্ষণং স্বরূপ-লক্ষণং" যাহার স্বরূপই লক্ষণ তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বলে,—যথা জ্ঞানাদি ব্রহ্মের লক্ষণ।

অনুবাদ—দ্বিতীয়াধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি. তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,"। "যাঁহা হ'তে এই সকল ভূত সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা উৎপন্ন ভূতসকল জীবিত আছে এবং প্রলয়ে আবার যাঁহাতে লয় হইবে, সেই বস্তু জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং ব্যাপক।" এই দুইটী শ্রুতি হইল এই অধিকরণের বিষয়। এই শ্রুতি দুইটী ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে কি না, এই সন্দেহ। "যাতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি বাক্যোক্ত জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ, অথবা 'সত্যং জ্ঞানমি'ত্যাদি বাক্যোক্ত সত্যাদি ব্রহ্মের লক্ষণ। জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ জন্মাদি জগতের ধর্ম্ম, তাহা জগতে থাকে, ব্রহ্মে থাকে না; অতএব একের ধর্ম্ম অপরের লক্ষণ কিরূপে হইবে? এবং সত্যাদিও ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পাবে না; যেহেতু লোক-প্রসিদ্ধ ব্যবহারিক সত্যজ্ঞানাদি ব্রহ্মেব লক্ষণ হইলে, তাহাব অখণ্ড এক-রসত্ব সিদ্ধ হয় না। আর ইহা ভিন্ন কোন অপ্রসিদ্ধার্থক সত্যজ্ঞানাদিও লক্ষণ হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ, কোন লক্ষণই হইতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

জন্মাদি জগতের ধর্ম্ম হইলেও ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে, যেহেতু জন্মাদির কারণ ব্রহ্ম। যেরূপ 'যাহা সর্প, তাহা মালা' এই স্থলে সর্পত্ব রূপে জ্ঞান থাকিলেও এই বাক্যান্ত মালার বোধ জন্মায়, সেইরূপ যে জগৎ কারণ সে ব্রহ্ম, এই কল্পিতকারণত্ব দ্বাবাও, ব্রহ্ম ইতর পদার্থ হইতে পৃথক্, ইহা জানা যায়। অতএব জগজ্জন্মাদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। পিতা পুত্র ভ্রাতা জামাতা ইত্যাদি ভিন্নার্থক শব্দের প্রতিপাদ্য যেমন এক দেবদত্ত হয়,—সেইরূপ লোকসিদ্ধ ভিন্নার্থক 'আদি' শব্দ অখণ্ড একরস ব্রহ্মের প্রতিপাদক, অতএব সত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হইতে পারে। এইরূপে উভয় লক্ষণই সঙ্গত হইল। ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, "জগজ্জন্মাদি, জগন্নিষ্ঠ অর্থাৎ জগতের ধর্ম্ম, এবং সত্যাদিও অপ্রসিদ্ধ। অতএব জন্মাদি এবং সত্যাদি কিছুই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না।" সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'রজ্জু দেখিয়া সর্প ভ্রমানন্তর, 'তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সর্প নহে, কিন্তু রজ্জু' এরূপ আপ্তবাক্য দ্বারা সর্পভ্রম বিদূরিত হইলে, পূর্ব্বদৃষ্ট সর্প-স্বরূপই যেমন রজ্জুর স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ যাহা জগতের কারণ তাহা ব্রহ্ম, এরূপ কল্পিত জগৎ-কারণত্বই, ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। এবং যেরূপ এক দেবদত্ত পিতা পুত্র জামাতা প্রভৃতি নামেতে অভিহিত হয়

হয়, সেইরূপ লোক-সিদ্ধ সত্যাদিই অখণ্ড ব্রহ্মের প্রতিপাদক অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ।

তৃতীয়াধিকরণস্ত প্রথমবর্ণকম্।

ন কর্তৃব্রহ্ম বেদস্য কিংবা কর্তৃ, ন কর্তৃতৎ।
বিরূপমিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ॥
কর্তৃনিঃশ্বসিতাদযুক্তো নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্‌ভবেৎ॥

অনুবাদ—তৃতীয়াধিকরণে ব্রহ্মের বেদকর্তৃত্ব এবং বেদৈকমেয়ত্ব নিরূপণ— "অস্যমহতো ভূতস্য নিশ্বঃসিতমেতদৃগ্বেদযজুর্ব্বেদঃ সামবেদ" ইতি। এই বাক্য বিষয়, ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ প্রভৃতি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃশ্বাসেব মত অযত্ন-সাধ্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। এস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা কিনা! "বাচা বিরূপনিত্যয়া" এই মন্ত্রে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন 'হে বিরূপ, নিত্যয়া বাচা স্তুতিং প্রেরয়', অর্থাৎ নিত্যবাক্য (বেদ) দ্বারা স্তুতিকর। এই শ্রুতি বেদকে নিত্যবাক্য বলিলেন; এবং বেদের নিত্যত্ব-সাধক স্মৃতিও আছে।

অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ"

সৃষ্টির আদিতে উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত নিত্য বেদরূপ দিব্যবাক্য সকল ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যাহা হইতে সকল ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব শ্রুতি স্মৃতি, উভয়দ্বারাই দেখা যাইতেছে বেদ নিত্য; অতএব ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহে। এই পূর্ব্ব-পক্ষ।

অপ্রযত্নে নিঃশ্বাসের মত ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" সকল যজ্ঞের ফল-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ঋগ্‌বেদ সামবেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এই শ্রুতি স্পষ্টই ব্রহ্মের বেদ-কর্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অতএব ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা, অর্থজ্ঞান-পূর্ব্বক ব্রহ্ম বেদ রচনা করেন নাই; কিন্তু বিনাপ্রযত্নেই নিঃশ্বাসের মত তাহা হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। কাজেই কালিদাসাদির বাক্যের ন্যায় পৌরষেয়ত্ব হইল না। প্রত্যেক সৃষ্টিতে পূর্ব্বমতই বেদ হইতেছে; অতএব প্রবাহরূপে (ধারাবাহিক-রূপে) তাহার নিত্যতা। সকল জগদ্ ব্যবস্থার প্রকাশক বেদের কর্ত্তা ব্রহ্ম। অতএব তিনিও সর্ব্বজ্ঞ।

ভাবার্থ—"বাচা বিরূপনিত্যয়া" এই মন্ত্রে বেদের নিত্যত্ব বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহেন, কারণ কর্ত্তা থাকিলে তাহা নিত্য হইতে পারে না ইহা পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কা। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "নিঃশ্বাসের মত বিনাপ্রযত্নে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যেরূপ বেদ ছিল, এই সৃষ্টিতেও সেইরূপই আছে; অতএব তাহার নিত্যত্বের ব্যাঘাতও হইল না, এবং সকল জগৎ প্রকাশক বেদের কর্তৃত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মার সর্ব্বজ্ঞত্বও সিদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় বর্ণকং।

অস্ত্যঙ্গমেয়তাহপ্যস্য কিংবা বেদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাদ্ ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে॥
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্যমান্তরযোগ্যতা।
ত্বং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা॥

অনুবাদ—দ্বিতীয়বর্ণক দ্বারা ব্রহ্ম যে বেদমাত্র গম্য, তাহা দেখাইতেছেন। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" 'তোমাকে এখন উপনিষদ্-বেদ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি', এই বাক্যে এই বর্ণকের বিষয়। ব্রহ্ম কি কেবল বেদ গম্য, না প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায়, ইহা সন্দেহ। যাহা সিদ্ধ বস্তু, তাহা সকল প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতে পারে। যেমন ঘটপটাদি। আর যাহা সাধ্য অশ্বমেধাদি, তাহা কেবল বেদগম্য; কারণ বেদ দ্বারাই তাহার সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মও সিদ্ধ বস্তু; অতএব তাহা প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মে রূপরসগন্ধ প্রভৃতি কোন গুণ নাই; অতএব কোন ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় ব্রহ্ম হইতে পারেন না। এবং হেতু না থাকিলে, তাহাতে অনুমানও প্রবর্ত্তিত হয় না; ব্রহ্মের কোন হেতু নাই, কাজেই তিনি অনুমানেরও অবিষয়। কিন্তু "উপনিষৎস্বেবাধিগতঃ" "নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং" "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"—'উপনিষদ্ দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়', 'বেদবিদ্ ভিন্ন সেই বৃহৎ পদার্থকে কেহ জানে না।' "তোমাকে উপনিষদ্-বেদ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই সকল শ্রুতি, ব্রহ্ম বেদমাত্র-গম্য এই উপদেশ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম কেবল বেদ দ্বারাই জানা যায়, অন্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, ইহাই সিদ্ধান্ত। যদি বল ভাষ্যকার "শ্রুত্যাদয়োহনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহপ্রমাণং" ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতি

এবং অনুভবাদি সকলই যথাসম্ভব প্রমাণ, এ কথা কিরূপে বলিলেন? তাহার উত্তরে বলিতেছি, প্রথম বেদদ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হইলে, পশ্চাৎ অনুভবরূপে অনুমানাদিও ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। অতএব ব্রহ্ম বেদমাত্র গম্য।

ভাবার্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, "যাহা সিদ্ধ বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণগম্য হয়, যেরূপ ঘটাদি। ব্রহ্মও সিদ্ধ বস্তু 'অতএব প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণগম্য' কেবল বেদগম্য নহে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "ব্রহ্মের রূপাদি নাই, অতএব তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং লিঙ্গদর্শসাদৃশ্যজ্ঞান প্রভৃতি না থাকায় ব্রহ্ম অনুমান কিংবা উপমানের বিষয় নহে। অতএব "নাবেদবিন্মনুতেতং বৃহন্তং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম কেবল বেদগম্য।

বেদান্তানাং ব্রহ্ম-পরত্ব নিরূপকং চতুর্থাধিকরণস্য প্রথমং বর্ণকং।

বেদান্তাঃ কর্তৃদেবতাদিপরা ব্রহ্ম-পরাউত।
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ॥
* ভিন্নপ্রকরণাল্লিঙ্গষট্‌কাচ্চ ব্রহ্মবোধিকাঃ।
সতি প্রয়োজনেঽনর্থহানেঽনুষ্ঠানতোঽত্র কিম্॥

অনুবাদ—বেদান্ত বাক্যসকল এই অধিকরণের বিষয়। বেদান্তবাক্য সকল কর্ত্তা দেবতা ও যজ্ঞ সাধনের (দধ্যাদির) প্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মের প্রতিপাদক ইহা সন্দেহ। বেদ বাক্যসকল ক্রিয়ার্থক, অতএব ক্রিয়ার্থক ভিন্ন বেদ নিরর্থক বা অপ্রমাণ। অতএব বেদান্ত ও বেদের প্রামাণ্য রক্ষার জন্য ইহারা ক্রিয়া-পর বলিতে হইবে। ক্রিয়ার্থক হইলে, ক্রিয়ার উপযোগী কর্ত্তা, দেবতা, সাধন (যাহাদ্বারা যাগ করা হয়) ইত্যাদির আবশ্যক। অতএব জীব-প্রকাশক বাক্য কর্ত্তার বোধক; ব্রহ্ম-প্রকাশক বাক্য দেবতার বোধক; এবং সৃষ্টি-প্রকাশক বাক্য যজ্ঞ-সাধন দধ্যাদির বোধক বলিতে হইবে। এরূপ অর্থ হইলে বেদান্ত বাক্য সকল অনুষ্ঠান-পর অর্থাৎ ক্রিয়ার্থক হইতে পারে। শুদ্ধ ব্রহ্ম-পর হইলে, তাহার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, কাজেই প্রয়োজনও কিছু থাকে না। অতএব বেদান্ত বাক্য কর্ত্তা দেবতা ও সাধনের প্রতিপাদক। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

বেদের দুইটী প্রকরণ—কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। কর্ম্ম-কাণ্ডে জ্যোতিষ্টোমাদি সকল কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। আর জ্ঞান-কাণ্ডে বেদান্ত-বাক্য সকল বলা হইয়াছে। অতএব ভিন্ন প্রকরণে পঠিত বেদান্ত বাক্যের কর্ত্তা ও দেবতাদি প্রতি-

পাদন দ্বারা কর্ম্ম-শেষত্ব প্রতিপাদন করা সঙ্গত হয় না; এবং তাৎপর্য্য নির্ণায়ক উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, ও যুক্তি এই যে ছয়টী লিঙ্গ (১) আছে তাহা দ্বারাও বেদান্ত বাক্যের ব্রহ্ম-পরত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। 'ক্রিয়া-পর না হইলে তাহার কোন প্রয়োজন নাই' এ কথাও বলিতে পার না। কারণ রজ্জুতে সর্পভ্রমানন্তর "নায়ং সর্পঃ" অর্থাৎ 'ইহা সাপ নহে' এইরূপ জ্ঞান হইলে যেরূপ ভয়-কম্পাদির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ভ্রমজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে ভ্রমজ্ঞান-মূলক সকল অনর্থ-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে; ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, "বেদান্তবাক্য সকল অনুষ্ঠান (ক্রিয়ার) উপযোগী কর্ত্তৃদেবতাদির প্রতিপাদক, কারণ তাহা হইলেই তাহার সপ্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হয়; ব্রহ্ম-পর হইলে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই, অতএব নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "বেদান্ত বাক্য সকল ভিন্নপ্রকরণে পঠিত; অতএব কর্ত্তৃদেবতাদি প্রতিপাদনদ্বারা কর্ম্মশেষত্ব প্রতিপাদন করা উচিত নহে। এবং তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ ছয়টী দ্বারাও বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অতএব বেদান্ত ব্রহ্ম পর।"

চতুর্থাধিকরণস্থ দ্বিতীয়বর্ণকং। (২)

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বাৎ তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ॥
নাকর্ত্তৃতন্ত্রেঽস্তি বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরাবোধাদ্ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ॥

---

(১) উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্ব্বতাফলং। অর্থবাদোপপত্তিচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥" উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বত্ব, ফল, অর্থবাদ, যুক্তি, এই ছয়টী তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গ। যথা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই উপক্রম, "এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" এই উপসংহার উভয়ই ব্রহ্মবিষয়ক। অতএব উপক্রম ও উপসংহার এই দুইটী লিঙ্গদ্বারা এই প্রকরণের ব্রহ্মপরত্ব নির্ণয় হইল। একটি বাক্যকে পুনঃ পুনঃ বলার নাম 'অভ্যাস;' যথা—"তত্ত্বমসি" এই বাক্যটী পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে; অতএব ইহা দ্বারা এই প্রকরণের ব্রহ্ম-পরত্ব নির্ণয় হয়, এজন্ম ইহাও একটী তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ। 'অপূর্ব্বত্বং প্রমাণান্তরাগম্যত্বং' ব্রহ্ম প্রমাণান্তরদ্বারা জানা যায় না, অতএব 'অপূর্ব্বত্বরূপ লিঙ্গও' এই স্থলে আছে। এক ব্রহ্ম জানিলে সকল জানা হয়, ইহাই 'ফল'। উৎপত্তি, স্থিতি, প্রবেশ, প্রলয়, নিয়মন, এই পাঁচটী 'অর্থবাদ,' এবং মৃদাদি দৃষ্টান্তই 'যুক্তি,' এই কয়টী লিঙ্গদ্বারাই বেদান্তবাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চয় হয়।

(২) এক অধিকরণে অর্থদ্বয় বুঝাইলে ভিন্নার্থবোধক, এক এক অংশকে বর্ণক কহে।

অনুবাদ—প্রতিপত্তি বিধি-পরও বেদান্ত নহে, তাহা দ্বিতীয় বর্ণকদ্বারা দেখাইতেছেন। বেদান্ত বাক্য সকল এই বাক্যের বিষয়, বেদান্তবাক্য ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধান করিতেছেন অথবা ব্রহ্মেতে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য, এই সংশয়। বেদান্ত জ্ঞানের বিধান করিয়াছেন, কারণ তাহা হইলেই তাহার শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়, এবং "শ্রোতব্যঃ" এই শব্দজ্ঞানাত্মক শ্রবণের বিধান করিয়া পশ্চাৎ "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই অনুভবাত্মক মননাদির স্পষ্টই বিধান করিয়াছেন। অতএব বেদান্ত-বাক্য জ্ঞানের বিধান করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

যাহা কর্ত্তৃতন্ত্র নহে, তাহাতে বিধি হইতে পারে না। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, অতএব তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র নহে, অর্থাৎ কর্ত্তা ইচ্ছামত তাহাতে কিছু করিতে পারেন না। তাহাতে বিধি হইতে পারে না। কেবল অনুষ্ঠেয় বস্তুর শাসনদ্বারাই শাস্ত্রত্বসিদ্ধ হয়, এরূপ নহে, সিদ্ধ-বস্তুর শংসন অর্থাৎ কথন দ্বারাও শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হইতে পারে।

ভাবার্থ। পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন, "বেদান্ত বাক্য সকল ব্রহ্মের প্রতিপাদক নহে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের বিধায়ক। কারণ তাহা হইলেই তাহার শাস্ত্রত্ব উপপন্ন হয়, এবং 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' ইত্যাদি শ্রবণানন্তর মননাদির বিধানও যুক্ত হয়।

শাব্দজ্ঞান হইলে, পশ্চাৎ অনুভবাত্মক মননাদির বিধান করা হইয়াছে, এ কথা বলিতে পার না। কারণ "দশমস্ত্বমসি" এই বাক্য জন্য যেইরূপ অপরোক্ষ-জ্ঞান হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত বাক্য হইতেও অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। এই জন্যই শাব্দ-বোধের পূর্ব্বে অসম্ভাবনাদি নিবৃত্তির জন্য মননাদির বিধান করিয়াছেন। অতএব বেদান্ত বাক্য সকলের ব্রহ্মেতেই তাৎপর্য্য ;—ইহা সিদ্ধান্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

আপোমাৰ্জ্জন।

খুল মা আনন্দময়ি হিরণ্ময় পুরদ্বার,
হৃদয়-মন্দিরে যথা বিরাজিত মা তোমার।
পূর্ণ পূর্ণতম সত্য মর্ম্মের মরম তব,
অবাঙ্মনসগম্য শুদ্ধবোধ অনুভব।
পরম রমণীয় তাঁরে আলিঙ্গন করি,
ব্রহ্মময়ি ব্রহ্মরূপে খেল মা শঙ্করি।

পরাভাবে বিদ্যারূপে না খেলিলে হায়,
তব দীন সন্তানের আছে কি উপায়?
আপোজ্যোতিরসোঽমৃত-স্বরূপা শঙ্করি—
তব মায়া নাটে কত যুগজন্ম ধরি—
ভূর্ভুবঃ স্ব মহ জন তপ সত্যলোকে,
ভ্রমি—ভ্রান্তিরূপা মাগো, ডুবি দুঃখে শোকে।
সর্ব্বাধার মহীতত্ত্ব-স্বরূপে তোমার,
দেখি মা নীরস পাংশু, শৈল স্তূপাকার।
সর্ব্বতৃপ্তিবিধায়িনী আপরসে তব,
কামনায় বহ্নিজ্বালা করি অনুভব।—
শুদ্ধ-জ্যোতি-স্নিগ্ধ পূত জ্ঞানের ভাণ্ডার,
অনুভব করি হিংসা দ্বেষের আধার।
সর্ব্বে বিশ্বে রসময়ি তব আকর্ষণে,
জ্বলি মা পতঙ্গপ্রায় দীপ্ত হুতাশনে।
মা তোর অমৃতরূপ না পে'য়ে দেখিতে,
সমৃদ্ধ বেগেতে ধাই মৃত্যু আলিঙ্গিতে।
দেও মা জাগায়ে তা'ই তীব্র কষাঘাতে,
তোরই দেওয়া মোহ নিদ্রা টুটে যায় যাতে।
খুলি তব অনুরাগপূরিত নয়নে,
দেখুক সন্তান তোর চাহি বিশ্ব পানে।

অরুণের পূর্ব্বরাগে গগনপ্রাঙ্গণ,
ভাতিয়া উঠিছে, ছায় পূষণ-কিরণ।
ভাঙ্গাইয়া তার ঘোর মোহের স্বপনে,
উত্তিষ্ঠ জাগ্রত বলি জাগাও যতনে—
বল মাগো, জাগো জাগো, মোহ-শয্যা ফেলি,
জীবনের প্রাতঃ-সন্ধি যায় পাছে চলি ?
বিদ্যারূপে সর্ব্বহৃদে কর মা প্রেরণ,
যাহাতে বুঝিতে পারে বিশ্ববাসিগণ।
এ জগত কর্ম্মময় কর্ম্মই জীবন—
যা' কিছু জগতে সবই তোমার স্পন্দন।
ধূর্জ্জটীর শিঙ্গারবে করুক শ্রবণ,
জগত-প্লাবিনী গুরু গম্ভীর নিস্বন।
একমাত্র মহামন্ত্র প্রণব ঝঙ্কার—
দৃশ্যে বিশ্বে এ জগতে পূর্ণ চারি ধার।
দ্রব্য ক্রিয়া ভাবরূপে অক্ষয় স্পন্দনে,
জাগরিত মহামন্ত্র চিত্ত-বুদ্ধি-মনে।
বাসনা ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়নিকর,
তাহারি স্পন্দনে সবি জাগ্রত মুখর,
ঋষি তার ব্রহ্ম ছন্দ গায়ত্রী তাহার,
দেবতা পাবক, কর্ম্মে বিনিয়োগ তা'র।
অক্ষয় পরম ব্রহ্মে করুক দর্শন,
সর্ব্বে, বিশ্বে, পরে আত্মে তাহারি স্পন্দন।
জেগে উঠে করে ভূত-বিসর্গ বর্জ্জন,
মহীতল মহাধারে স্থাপিয়া চরণ।
বুঝুক সামান্য নহে—এ ক্ষিতি মহান্,
বিশ্বের আধার-তত্ত্ব মহা গরীয়ান্।
মরি লীলা মরি চারু সমুদ্র-মেখলা,
ধরাধর পয়োধরা ধরণী শ্যামলা।
মহীরূপে এই সেই চৈতন্যরূপিণী,
বিশ্বের আধার হ'য়ে বিরাজিত তিনি।

সুকৃতি দুষ্কৃতি সুখ দুখ আদি দ্বন্দ্ব,
এই ত আধার স্থির, সব ভাল মন্দ॥
উঠি মহীমাতৃ অঙ্কে স্থাপিয়া চরণ,
'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং' পদ করিয়া স্মরণ—
জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানরূপী বিশ্বরূপ পদ,
পশ্যন্তী বাকেতে যাহা বাজে সমন্তত।
সেই মহাবাণী সেই প্রণব রাগিণী,
সমীরে সলিলে তাই অমৃতরূপিণী।
সে পূত সলিলে নিজে করিয়া গাহন,
আপতত্ত্ব রসে সবে করুক মার্জ্জন।
অধঃ, ঊর্দ্ধে, বিশ্বে, সর্ব্বে, আপনে সকলে,
সম্মার্জ্জিত করি সবে সে পুণ্য সলিলে,
সজীব সলিলরূপে চৈতন্যরূপিণী,
হেরি তৃপ্তি রূপে ব্যাপ্ত,—অমৃতের খনি।
গাহ তাই, গাহ এবে খুলিয়া পরাণ,
"নমস্তে শরণ্যে শিবে কর মা কল্যাণ।
জলরূপে নদী হ্রদ তড়াগে বা কূপে,
মরুতে প্রান্তরে কিবা মহা সিন্ধুরূপে।
তুমি ত' সর্ব্বত রাজ বুদ্ধি মন কামে,
পূত রসে করি পূত লহ শিব ধামে।

ছায়াময় দ্রুমদল
পেয়ে শ্রান্ত পান্থদল,
যেইমত ক্লান্তি নাশে করি ছায়া দান,
খেদখিন্ন ম্লান কায়,
যথা শুদ্ধ হয়ে যায়
শীতল সলিলরাশি মাঝে করি স্নান।
যজ্ঞ-হবি যেই মত
হ'বে বেদমন্ত্র যুত
লভয়ে পবিত্রকান্তি পূত নিরমল,

কারণ ও সূক্ষ্ম, স্থূল,
সর্ব্ব পাপ-তাপমূল
ঘুচায়ে, করহ শুচি সেরূপে সকল।
আপ-রূপে ব্যাপ্ত সবে
জগত-ব্যাপিকে, শিবে!
তুমিইত প্রতিষ্ঠিত জীবের জীবনে,
দেও মা খুলি সে আঁখি—
মহা-রমণীয়ে দেখি
খোল সেই হিরণ্ময় পাত্র আবরণে।
স্তন্যভারাক্রান্তা মাতা
চাহে মা সন্তানে যথা
পীযূষপূরিত স্তন্য করাইতে পান,
দিতে তুমি সেইমত
শিবতম রস যত
'সর্ব্ব'রূপে সকলেরে করিছ আহ্বান।
তা'তেই কৃতার্থ মাগো,
আর কিছু চাহি নাগো,
মঙ্গল তোমার দান, সকলি মঙ্গল,
অস্মিতা হউক চূর্ণ
তব ইচ্ছা হ'ক পূর্ণ,
পরাবিদ্যা রূপে খেল, চাহি মা! কেবল।

শ্রীচিন্তা—

(৩) সন্ধ্যাতত্ত্ব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গায়ত্রী-স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদ-পদ্মে যিনি চিন্তা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম ধামে গমন করিবেন। নানা শ্রুতিতে গায়ত্রীর উপাসনা ও তাঁহার ব্রহ্ম-রূপত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা— "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং গায়তি চ ত্রায়তি চ।" যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক দেখিতেছি সে সমুদয় গায়ত্রী বা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাকেই সকলের ত্রানকর্ত্রী, সকল শব্দ ব্রহ্মময়ী সামগীতিকার স্বরূপ জানিবে। এই পরমা-শক্তিই দেবী-সূক্তোক্ত ব্রহ্মময়ী। ইঁহার মাহাত্ম্য সকল বেদোক্ত শ্রীসূক্ত প্রভৃতিতে, এবং স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদিতে এবং সাংখ্যাদি দর্শনে ও তন্ত্রশাস্ত্রে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। ইঁহাকেই সেই সিদ্ধ-যোগিগণ মূলাধারাধিষ্টাত্রী মহাশক্তি কুল-কুণ্ডলিনীরূপে অভিহিত করেন সকল শক্তিস্বের মূল ইহাতে নিহিত আছে। ইনিই বেদান্তে, মায়া সাংখ্যে প্রকৃতি, বেদে গায়ত্রী, গীতায় শ্রীভগবৎ গুণময়ী মায়া শক্তি, পরাবিদ্যা স্বরূপিণী বিশ্বজননী।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ব্যাখ্যায় অপরার্ক-ধৃত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,— "ব্রাহ্মণগণ প্রণব ও ভূঃপ্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেক। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণ, জগতী ছন্দ পূর্ব্বক বৈশ্যগণ গায়ত্রী জপ করিবে। সকল সময়ে সকলে গায়ত্রী জপ করিবে। সন্ধ্যারকাল নানা কারণে অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, আচমনাদিপূর্ব্বক দশবার কিংবা শতবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনঃ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। সন্ধ্যার সময় পূজা প্রভৃতি প্রাত্যহিক কার্য্য সকল দিবসে যথাকালে অনুষ্ঠিত না হইলে, রাত্রীর প্রথম যামে সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করিতে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ আদেশ করিয়াছেন। আপৎ সময়ে, প্রবাসে, প্রত্যন্ত দেশে, সুদূর মরুদেশে, সন্ধ্যা-অর্চ্চনার উপচার সকল পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র নির্ম্মল জল দ্বারা কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে, এবং জলেরও অভাব হইলে মানসিক জপ, প্রাণায়াম, অভিষ্টমন্ত্র স্মরণ, স্তবাদি পাঠ করিবে। দৈবাদি বশতঃ সন্ধ্যা-কার্য্য ঈশ্বরারাধনাদির অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে যেরূপ অপরাধ হয়, সেই সমুদয় কার্য্যে অবহেলা, অবিশ্বাস, ও বিরুদ্ধাচরণ, নাস্তিক্যভাব প্রকাশ করিলে, তাহা হইতে অধিক পাতিত্য জন্মে।

দীর্ঘকাল বৈধ ও নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্য ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরিহার করাতে কালক্রমে শ্রীভগবৎ-ভাবশূন্য হইয়া পাশব-ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়; এবং অজ্ঞান, হিংসা, দ্বেষ, মোহ, রোগ, শোক ত্রিবিধ উৎপাৎ, ত্রিতাপ প্রভৃতি যুগপৎ মানবকে আক্রমণ করে।

মহর্ষি যমদগ্নি বলেন,—

"একদিন কিংবা দুই তিন দিবস যদি প্রমাদবশতঃ সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিতে না পার, তবে পরদিন অহোরাত্র উপবাস করিয়া সহস্রাধিক গায়ত্রীজপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু রাজ্যভঙ্গ, রাজকীয় প্রবল রোষে পতন, দীর্ঘকাল রোগ, জন্ম ও মরণ অশৌচে, সন্ধ্যা-বন্দনাদির বিচ্ছেদ ঘটিলে, বিশেষ প্রত্যবায় হয় না।"

স্মৃত্যন্তরে উক্ত আছে,—

"সন্ধ্যা-বিহীন ব্যক্তি সতত অশুচি বা বৈধকার্য্যে অনর্হ। তাদৃশ ব্যক্তি দেবারাধনাদি যাহা কিছু করে, সে সমুদায়ের ফলভাগী হয় না।" কিন্তু দেব-কার্য্য, হোম, বিদ্যাভ্যাসে ও দীর্ঘকাল ব্যাপক যাগাদি কার্য্য আরব্ধ হইলে, তন্মধ্যে সন্ধ্যার বিচ্ছেদ ঘটিলে গুরুতর দোষ হয় না।' কোন কোন মহর্ষি বলেন, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করিলে কোন পাপ হয় না, কিন্তু সায়ংসন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। অপর কোন ঋষি বলেন 'সন্ধ্যানুষ্ঠানে আনুষঙ্গিক ফল হয়'। অন্যকোন ঋষি বলেন, 'অপর নিত্যকর্ম্মের ন্যায় নিয়ত সন্ধ্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।' শ্রুতিতে উক্ত আছে যে,—

"রাক্ষসগণ সূর্য্যের সহিত, তাঁহার উদয় ও অস্তকালে, ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজাতি প্রভৃতিরা সেই সেই সময়ে শ্রীভগবান্‌কে আদিত্যরূপে আরাধনা করেন।" তথাচ;—

"তস্মাদুত্তিষ্ঠন্তং হৈব তানি রক্ষাংস্যাদিতং যোধয়ন্তি যাবদস্তময়াৎ।" স্মৃতিতে উক্ত আছে,—"একদা মহাবীর্য্য, পরাক্রমশালী ত্রিশকোটী-পরিমিত "সন্দেহ" নামক রাক্ষসগণ সূর্য্যাস্ত সময়ে ভীষণ অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, যে সময় সূর্য্যকে আক্রমণপূর্ব্বক খাইতে আসে, তাহা দেখিয়া, দেব ও ঋষিগণ যে সকল সনাতন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হর্ষ ও নির্ভয় মানসে সেই রাক্ষসসমূহের নাশের নিমিত্ত জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করেন, এবং সে সময়ে সন্ধ্যো-পাসনা করেন। এইরূপে সেই সন্ধ্যাবারির নিক্ষেপে দৈত্যগণ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। এতাবৎ দ্বিজাতিমাত্রেই সেই মন্ত্রে সন্ধ্যা-উপাসনা করেন।"

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে যে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত-কালে রাক্ষসগণের সহিত সূর্য্যের সংগ্রাম কথিত হইয়াছে, তথায় সূর্য্যে পরমেশের সাত্ত্বিক শক্তি, রাক্ষস —বিরোধী তামসিক শক্তি ও অন্ধকার, স্থানীয়। অতএব প্রকাশ-স্থানীয় সত্ত্ব সূর্য্যের' উদয়ে, কৃষ্ণ তামসিক অন্ধকার (আসুর ভাব) বিদূরিত হয় বলিয়া সংগ্রাম-রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার একটী মুখ্যকাল, অপর একটী গৌণকাল। গৌণকালে অনুষ্ঠিত হইলেই গায়ত্রী জপ প্রাণায়ামের প্রয়োজন হয়, মুখ্যকালে হয় না।

অপর মহর্ষি মতে ;—"সন্ধ্যামুপাসীত' 'সন্ধ্যোপাসনা করিবে'। এই শ্রুতি অনুসারে ও আদিত্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সন্ধ্যাখ্য—শ্রীবাসুদেবেরই ধ্যান বুঝায়। অন্যত্র শ্রুতিতে উক্ত আছে,—

"উদ্যন্তমস্তং যান্ত মাদিত্যং অভিধ্যায়ন্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান সকলং ভদ্রমশ্নুতে।"

'যে ব্রাহ্মণ উদয় ও অস্তকালীন সকলভূতপ্রসবিতা আদিত্য দেবকে কায়-মনোবাক্যে ধ্যান করেন, এবং উপাসনা করেন, তিনি ঐহিক কল্যাণ ও পারত্রিক মোক্ষ বা শ্রীবাসুদেবত্ব লাভ করেন।'

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূম্নঃ পাপং তে যান্তি ব্রহ্মলোকং হ্যনাময়ং॥'

যাহারা নিরন্তর (নিয়মপূর্ব্বক) সংযত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করেন তাঁহারা সকল পাপ পরিহারপূর্ব্বক সনাতন (নিত্য) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। মহর্ষি গোভিল বলেন,—

"সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈব হ্যপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"

"যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা জানে না কিংবা জানিয়াও উপাসনা করে না, তিনি জীবদ্দশায় শূদ্রতুল্য ও মরণের পর কুক্কুরত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" উপাসনাকালীন উপাস্যরূপে অনাদি অনন্ত বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের ত্রিমূর্ত্তি ও ত্রিশক্তি, মুখ্যভাবে সাধকগণের কল্যাণ এবং উপাসনার সৌকর্য্যার্থ, শাস্ত্রে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই তিন সময়ে গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী এই ত্রিশক্তি এক এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবকে ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিগুণ, বাহ্য ও আধ্যাত্ম-জগতের শক্তি ও পুরুষরূপে মহর্ষিগণ ভাবনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। যথা,—

"গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে ।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা ॥"

"প্রাতঃকালে উপাস্যা মূর্ত্তি গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়ং সময়ে সরস্বতী ; এই তিনকালে এক পরমা চিৎ-শক্তির সন্ধ্যা রূপ উপাসনা হইয়া থাকে ॥"

"প্রতিগ্রহান্ন দোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥"

অসৎ-প্রতিগ্রহ, অভোজ্য-ভোজনরূপ অন্ন-দোষ এবং পাপ ও উপপাতক হইতে (তাঁহার) উপাসককে (গানকারী) যিনি পরিত্রাণ করেন, তাঁহাকেই পরমা শক্তি "গায়ত্রী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

"সবিতৃদ্যোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা ।
জগতঃ প্রসবিত্রী বা বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥"

যিনি সূর্য্যেরও প্রকাশক কিংবা বিশ্বজগতের প্রসূতী বলিয়া "সাবিত্রী" নামে কথিত হইয়াছেন, তিনিই পুনঃ নিখিল বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপ "সরস্বতী" নামে উক্ত হইয়াছেন।

"গায়ত্রী তু ভবেদ্রক্তা সাবিত্রী শুক্ল-বর্ণিকা ।
সরস্বতী তথা কৃষ্ণা উপাস্যা বর্ণভেদতঃ ॥"

"ত্রিগুণের মধ্যে গায়ত্রী দেবী রজঃ বা রক্ত গুণের আধার, সাবিত্রীশক্তি শুক্ল বা সত্ত্ব গুণের আধার, সরস্বতী অশেষজাড্য-হাবিণী হইয়াও কৃষ্ণ বা তমোগুণের আধার , ইহাই ধ্যানকালীন রূপবর্ণনের রীতি শাস্ত্রে উক্ত আছে। উক্ত ত্রিবিধ শক্তি, কালী, তারা প্রভৃতি নিখিল শক্তির উপলক্ষণ কিংবা নিয়ামিকা জানিবে।

"গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা তু, সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী।
সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা মুক্তিভেদতঃ ॥"

'গায়ত্রী ব্রহ্মস্বরূপ শক্তি ঋগ্‌বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাতে উপাস্যা, সাবিত্রী বিষ্ণু-স্বরূপ শক্তি যজুর্ব্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সরস্বতী মহাশঙ্কর-শক্তি সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এই ত্রিদেব-শক্তি ত্রিকালে উপাস্য দেবতা ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী।

সন্ধ্যাতত্ত্ব—(২)

সান্তরাম স্বামীর কথা।

আমি। আপনি যে আচমনের কথা বলিলেন, তাহাই দেখিতেছি 'সন্ধ্যার' মধ্যে অতি দুরূহ স্তর।

সান্ত। হাঁ, তা'ত হইবারই কথা! উহা সন্ধি-চৈতন্যের স্মরণ ও সন্ধ্যা-ক্রিয়ার মূল ভাষা। ঐ বুদ্ধিটি না ফুটিলে সন্ধ্যার অন্যান্য স্তরগুলি একের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। ঐ ভাবটি ফুটিবার জন্যই ত বলা হয়—

"যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতম্।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥"

ঐ ভাব আনিবার জন্যই প্রাতঃকালে উঠিবামাত্রই হিন্দু. শ্রীগুরুর ধ্যানপূর্ব্বক চিত্তের পরাগতি উদ্রিক্ত করত বলেন—

"লোকেষু চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্তবিষ্ণুভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতরুত্থায় তবপ্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

জীবনের মূল-ভাব, শ্রীভগবানের প্রীতি। সংসারযাত্রায় ব্যাপারগুলি তাহার এক একটী স্তর। জীবনের ভিতর এই এক মহান্ সূত্র আছে। তদভিমুখে লক্ষ্য করিয়া চলিলে, দেখিবে সাংসারিক জীবনও ভগবৎ-সত্ত্বার প্রতিপাদক হইয়া উঠে; আর সুখ দুঃখের তরঙ্গে আন্দোলিত না হইয়া সকল ব্যাপারই শ্রীভগবানের ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাই 'প্রাণায়াম' শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আমি। প্রাণায়াম মানে'ত পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা শ্বাসের জয়ই বুঝি। এ আপনি কি বলিতেছেন?

স্বামী। বস্তুকে ছোট করিয়া লইলে, তুমিও ছোট হইয়া যাইবে,—এ কথাটি যেন ভুলিও না। উপনিষদে 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ'রূপ ভগবানের দুইটী ভাবের কথা বলা হয়। ইহা ইংরাজির nonmenon ও phenomenon (বস্তু ও তাহার অভিব্যক্তি)। সেইজন্য প্রাণকে ব্যক্ত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রাণের সপ্ত-ব্যাহৃতি। প্রাণকে চৈতন্যের ব্যক্ত ভাব বা গ্রহণ শক্তি (Power of response) ও প্রকাশ শক্তি বলিয়া বুঝিলে দেখিবে যে ঐ প্রাণশক্তি সপ্তভাবে ব্যবস্থিত হইয়া খেলে। নিবৃত্তি-পক্ষে ইহাকে ব্যাহৃতি অর্থাৎ

বিশেষ ভাবের আহরণ বলে। যে খেলার বশে বিশিষ্ট ভাবের সংস্থান (series) পুনরায় সত্য-স্বরূপ ভগবানকেই দেখাইতে পারে, তাহাই ব্যাহৃতির খেলা। সুতরাং শুধু ভূর্ভুবঃ স্বঃ বলিলেই হইবে না।

আমি। তা'ই যদি হইল তবে দেবতাগণের উল্লেখের আবশ্যক কি আছে?

স্বামী। ব্যক্ত খেলা মাত্রই ত্রিগুণাত্মক। তমোগুণে চৈতন্য, লোক বা ব্যক্ত ভাবের সংস্থা (series বা plane) রূপে শ্রীভগবানের এক ভাবের ইঙ্গিত করে। যেমন ভূ বা ক্ষিতি-তত্ত্বের ভিতর দিয়া জীব পরম-স্থিতিরূপ (reality) ভাবের ইঙ্গিত পায়। উহা ছবি আঁকার ন্যায়, অন্যান্য ভাবের ভিতর দিয়া মূল ভাবের অঙ্কন বা ব্যঞ্জনা। রজোগুণে কি হয় জান?

আমি। কেন ক্রিয়া—activity—

স্বামী। তোমরা নিজের দিকে না চাহিয়া শাস্ত্র বুঝিতে চাও, ইহাই তোমাদের ভ্রান্তি! তোমার ভিতর রজোগুণের বিকাশে কি কেবল কতকগুলি বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়? রজোগুণে অসংলগ্ন ক্রিয়া বুঝায় না, "ক্রিয়াশীলতা" বুঝায়। সুতরাং ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থিত একটী মূল প্রেরণাকে বুঝায়। যেমন অর্থকামী হইয়া তুমি যে সকল কার্য্য কর, তাহার কোনটাই ছিন্ন হয় না; সকলগুলিই মূল-প্রেরণার সহিত মিলিয়া, সেই এক-তানে মিশিয়া, প্রকট হয়। প্রেরণাকে ইংরাজিতে impulse বলে। এই ক্রিয়া-শীলতাকে আধুনিক, নব্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বক্তা মায়ার্স (Myers) সাহেব irritabilty of consciousness বলেন। সর্ব্বদাই বাহ্যভাবে ব্যবস্থিত 'সর্ব্ব' ভাবের বিকাশের সহিত, ব্যক্ত-ভাবে আপনাকে এক করিবার জন্য, প্রাণের প্রবণতাকে রজোগুণ বলে। ক্রিয়া হয় কেন? ভিতরে অভাব বোধ আছে বলিয়াই, সর্ব্ব ছিন্ন জীব ও বস্তু পুনরায় স্বপ্নানুভূত আত্ম-মহিমা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। মনে কর একজন বড় ঘরের ছেলে; কিন্তু দৈববশতঃ তাহাকে ক্ষুদ্র হইয়া থাকিতে হইতেছে। তাহার ভিতরে অতীতের স্মৃতি সকল জাগরিত হইয়া, যেমন তাহাকে অতীতের মহিমার পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে, তদ্রূপ জীব ব্যক্ত ভাবে—'বিশেষ আমি' জ্ঞানে—সৃষ্ট হয়। বিশেষ 'ব্যক্ত আমি' ভাবের জন্য, আত্মার সর্ব্বাত্মিকা ভাবটি সুপ্ত-ভাবে স্মৃতির মত থাকিয়া যায়। এই জন্য জীবমাত্রেই পুনরায় সেই 'সর্ব্ব' ভাবটীকে পাইতে প্রয়াস করে; অথচ আপনার ব্যক্ত ছিন্ন ভাবটীও ছাড়িতে চাহে না। সে ছিন্ন-ভাবে সব দেখিতে

চাহে, তাহাতে চক্ষু নির্ভিন্ন হয়। যদি স্বরূপ-ভাবে জ্ঞান ও আনন্দাংশে আপনার স্বরূপ দেখিতে চাহিত, তাহা হইলে চক্ষুর আবশ্যকতা থাকিত না। এখন কি একটু বুঝিতে পারিলে কি প্রকারে রজোগুণে ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়? ও কেন উহাকে মায়িক বিলাস বলে? এ দৃষ্টি'ত "মহেরণায় চক্ষসে" নহে। সুতরাং রজোগুণে প্রথমতঃ সর্ব্ব-রূপে অবস্থিতির ইচ্ছা বা শুদ্ধ কামকে বুঝায়। ইহাই সর্ব্বভূতে ইচ্ছা-রূপিণী মহামায়ার প্রকাশ। তৎপরে সেই কামের ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বৃত্তি (functions) উৎপন্ন হয়। তারপর জীব স্থূলে, 'স্থবিষ্ঠ' হইয়া আসিলে, বাহ্য বস্তু সকলও সেই কাম হইতে চৈতন্যময়ীর ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত হয়। শেষ কথাটি এখন বুঝিতে পারিবে না; কিছু পরে বুঝাইয়া দিব। রজোগুণে ক্রিয়া বা সম্বন্ধ ভাবের সাহায্যে ভগবানের পরিপূর্ণতা, সম্বন্ধ বা একত্ব—বিশ্বাত্ম, বিশ্ববীজ, বিরাট্ পুরুষরূপে প্রকট হয়।

আমি। এখন সত্ত্ব গুণের কথা একটু বলুন।

স্বামী। সত্ত্ব গুণটীর মর্ম্ম, আজ কাল অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অস্ত্রেরাই উহাকে Rythm বা Harmony শব্দে লক্ষিত করিতেছেন। Rythm প্রভৃতি ক্রিয়ার ভাব,—উহা রজোগুণের বিকাশ—সত্ত্ব নহে। তমোগুণে, পুত্রবুদ্ধিটী বাহ্য পুত্ররূপে স্থির হইল; রজোগুণে এই পুত্র-বুদ্ধি পুত্রকাম, পুত্রের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি রূপে রহিল, সত্ত্বগুণে পুত্ররূপে ব্যক্ত ভাবের স্বরূপটী বুঝা গেল। পুত্রের স্বরূপ অর্থে ভগবৎ ভাব বুঝিও না;—কারণ উহা'ত পুত্রের স্বরূপ নহে, সর্ব্ব পদার্থেরই স্বরূপ। তবে পুত্রের স্বরূপ শব্দে কি বুঝায়? 'স্বরূপ' শব্দে আমার 'আমির' মত একটী 'আমি ভাবের' বীজ বুঝায়। সেইজন্য যোগমার্গে আসিলে সাধক পুত্র পূর্ব্ব-জন্মে আমার কে ছিল, তাহার কি নাম ছিল, ইহা জানিতে চাহেন। আর একটী দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক, যেমন দয়া। তমোগুণে দয়া অর্থে দয়ার কার্য্যই বুঝায়, সেই জন্য তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ স্থূল কার্য্য না দেখিলে দয়া বুঝিতে পারে না। রজোগুণাত্মক ব্যক্তি দয়া অর্থে প্রেরণাশক্তি (impulse) বুঝে; দয়ার কার্য্য না হইলেও দয়ালু ব্যক্তির মনোভাব বুঝিয়া, সে দয়ার আভাস পায়। সত্ত্বগুণের খেলা অন্যপ্রকার; তখন দয়া ভাবমাত্র হইয়া যায়। সত্ত্ব-গুণাত্মক ব্যক্তি বুঝেন যে প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়া কি এক একতা আছে, যাহার বশে আমরা অপর ব্যক্তিকে আমারই মতন বলিয়া ভাবি। সে আমার মত বলিয়াই, আমার ধনে, ক্রিয়ায় ও ভাবের উপর তাহার অধিকার আছে। সুতরাং সত্ত্বগুণে যে জ্ঞান হইল, সেই

জ্ঞানটি কতকটা আমার 'আমির' জাতীয় একত্ববুদ্ধি।' এইজন্য পাতঞ্জলের ব্যাস-ভাষ্যে উক্ত হয় যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে এক 'সদ্ভূত' অর্থ ফুটিয়া উঠে "সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি"। সুতরাং বুঝা গেল যে সত্ত্বগুণে বাহ্য বস্তুটি কতকটা আমাদের 'আমি'র সমজাতীয় রূপে সাময়িক প্রকাশ হয়, ও প্রত্যেক বস্তুর ভিতর জ্ঞানাত্মক কেন্দ্রের স্বরূপ, এক তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। ঐ কেন্দ্র-জ্ঞানটী অবিশেষ প্রধান, ঐ আমি-ভাবটি কেবল দ্যোতনশীল ও প্রকাশক। উহাতে ভেদ-বিশেষ-বুদ্ধি অতি অল্পপরিমাণেই থাকে। ঐ কেন্দ্র যে এক সর্ব্বাত্মিক তত্ত্ব তাহা যখন বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার দেবতা-জ্ঞান সিদ্ধ হইল।

আমি। এ কথাটি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। প্রাণায়াম বা সন্ধ্যার অন্তস্তবে যে ত্রিগুণেব খেলা দেখা যায়, তাহাতে ভেদ-বিশেষের প্রবৃত্তি অতি ক্ষীণ ভাবে থাকে। চক্ষু অর্থে যতক্ষণ তোমার নিজেব চক্ষু বুঝিবে, ততক্ষণ কি করিয়া চক্ষুর ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত প্রাণকে বিশ্বের প্রাণের সহিত মিশাইতে পারিবে? ঐ মিশানই যে প্রাণায়াম মন্ত্রের মূল, তাহা তোমরা আজকাল ভুলিয়া গিয়াছ। যে ব্যক্তি ভাবে যে দয়ার কার্য্য তাহার নিজেরই ব্যক্তি-গত ভাব হইতে প্রসূত, সেই অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কি প্রকাবে দয়ার অন্তর্গত সর্ব্বাত্মিক ভাব দেখিবে? সর্ব্বাত্মিক ভাব না দেখিলে কি প্রকারেই বা ঐ ভাবকে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে? Oxygen ও Hydrogen একত্র করিলেই জল হয়। ইহা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্বকালে সত্য বলিয়াই, এই জ্ঞানের প্রয়োগ আছে। তাবপর ঐ প্রবৃত্তির কারণভূত বিরাট্ দেহধারী চৈতন্যের স্পন্দনের সহিত যখন তাহার ঐক্য দেখিতে পাইবে, তখনই তোমার চক্ষুস্থ প্রাণকে বিশ্বেব প্রাণেব সহিত মিশাইতে পারিবে। প্রথমে ত্রিগুণের ভিতরে প্রাণায়াম কবিয়া, ত্রিগুণের উপরে যাইবার জন্য প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রথমে সপ্ত ব্যাহৃতি বা ব্যক্ত ভাবেব লীলার সহিত প্রাণের ঐক্য স্থাপন কারতে হয়। কিন্তু মূল আত্ম-ভাবেব চ্যুতি হইলে তাহার সম্ভব হয় না। বিশ্বের অভ্যন্তরে ব্যক্ত বা প্রাণাত্মক 'ওঁ'কারের গতি বুঝিতে পারা চাই। ব্যক্তভাবে ওঁকার এক পরাগতির ভিতর দিয়া অ, উ—ম এই তিন মাত্রায় স্থাপনপূর্ব্বক, পরে গতির সমতায় মিলিত হইয়া "একে" যাইয়া শান্ত হয়। সেই জন্য প্রাণায়াম মন্ত্রেব ভিতর এক মহান্ ব্রহ্মই দ্রষ্টা-ভাব। যে তালে খেলার সুর মিশাইলে জীবের উদ্ধার হয়, সেই গায়ত্রীই ছন্দ; ও 'সর্ব্ব'—ভাব ধ্বংসপূর্ব্বক স্বয়ং-প্রকাশমান অগ্নিই ব্যক্ত-ভাবের দেবতা। তারপর ব্যাহৃতি

সমূহের অভ্যন্তরে সত্যগুণাত্মক কেন্দ্রভাব বা দেবতাবুদ্ধির স্ফুরণ হওয়া আবশ্যক। যেমন অঙ্কশাস্ত্রে Aটী আপন স্বরূপকে a+b+c+d····· অনন্ত ভাবে অভিব্যক্ত করে, তদ্রূপ দেবতাগণও ব্যক্ত বা প্রাণাত্মক, ও তাঁহারা আপনাকে ভূঃ ভুবঃ আদি ভাবের সংস্থা বা ব্যাহৃতি ভাবে অভিব্যক্ত করেন।

আমি। ছন্দগুলি কি এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। যে মূল-ভাব ব্যক্ত-ভাবের সংস্থা-সমূহ আচ্ছাদনপূর্ব্বক মাতৃবৎ তৎসমুদয়কে পুষ্ট করত, পরা বা ভগবৎ-ভাবকে আচ্ছাদন বা ইঙ্গিত রূপে প্রকট করে তাহাকে ছন্দ বলে। যেমন কামের ছন্দ বা মনের ছন্দ। কামের ছন্দে একটু 'রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু' চাই, তবলাতে বাদিত তালের মাত্রাগুলি মত স্পষ্ট স্পষ্ট 'দানা দানা' করিয়া বাহির করা চাই, একটু নাচান চাই ;—অথচ দেখ উহার ভিতর দিয়া একটী গতিই প্রকাশিত হইতেছে। উহা সঙ্গীত শাস্ত্রের ঠুংরির ন্যায়,—

মঞ্জুল কুঞ্জে, সমীরণ সনে, হেলে দুলে, খেলে তরুগণে।
ফোটা ফুল তুলি সাজাইব ডালি
চারু হার গাঁথিব যতনে

মনের ছন্দ সঙ্কল্প ও বিকল্পের ভিতর দিয়া শ্লথ-গতিশীল 'খেয়ালের' ন্যায়। তাহাতেও স্পন্দন আছে বটে, কিন্তু উহা অত নৃত্য-ভাবপ্রবণ অত মাদকতা পূর্ণ নহে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখ। তিনটী সংস্থাগতি (Progression) অঙ্ক-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন ১+২+৩+৪+৫ ···। ইহাতে ঢেউগুলি কেমন এক বিশেষ ভাবে গ্রথিত আছে। কিন্তু ২+৪+৮+৩২.. ইহার গতি অন্যরূপ। এই গতিকে ছন্দ বলে। ছন্দে দেবতা ব্যক্ত রূপে অভিব্যক্ত হয়, ও ব্যক্ত সকল দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। জীবনের প্রভাত সময়ে অনেকেরই প্রাণ ভৈরবী-ছন্দে স্পন্দিত হয়, তাহাঁদের পুরবী ও গৌরীর ভাষা তখন ভাল লাগে না। কারণ উহাতে চৈতন্য অল্পে অল্পে ভোগে বিতৃষ্ণা, প্রাণের অন্তরালে একটী ঔদাস্যের দীর্ঘ নিঃশ্বাস, প্রিয় বিরহের মর্ম্ম-বেদনা, ও শোকের উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস জাগাইয়া দেয়। দেবতা ছন্দ ও লোক সমূহ এই রূপে ব্যবস্থিত।

ছন্দ	দেবতা	লোক
জগতী	বিশ্বেদেবা	ভূঃ
ত্রিষ্টুভ্	ইন্দ্র	স্বঃ

পংক্তি	বরুণ	ভুবঃ
বৃহতি	বৃহস্পতি	মহঃ
অনুষ্টুভ্	সূর্য্য	জন
উষ্ণিক	বায়ু (মাতরিশ্বা)	তপঃ
গায়ত্রী	অগ্নি (ব্রহ্মা)	সত্য।

আমি। প্রাণায়ামে এই ছন্দ দেবতা ও লোকের আবশ্যকতা কি?

স্বামী। ব্যক্ত অহং বা প্রাণ আপনার উপর এক একটি 'দেবতা-মাত্রা' কল্পিত করে, ও তাহার ফলে উপযুক্ত ছন্দের সাহায্যে এক একটি লোক-রূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বলে; বাইবেলের ইঁহাকে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া লক্ষিত করা হয়। 'সৃষ্টি অর্থে অহং মূলক কেন্দ্রের ভাবগুলি 'সর্ব্ব'ভাবে বিতন্বতকর বুঝায়। অহংএর যাহা মাত্রা (coefficient) সর্ব্বে উহা সংস্থা (Series)। অহংএ যাহা স্বরূপের ব্যঞ্জনার ভাব মাত্র বা বিভূতি, সর্ব্বে উহা স্পন্দন বা গতিশীলতা। সাধনা অর্থে গতিশীল 'বহু' ভাবটিকে 'আত্ম'ভাবে স্থির করা, উহা সৃষ্টির বিপরীত। প্রাণায়ামে সংস্থাটিকে ছন্দ ও দেবতাভাবের ভিতর দিয়া সংহরণ করিতে হয়। স্থূল জগদ্বস্তুগুলি ছিন্নভাবে দেখিলে, সর্ব্ব প্রথম স্তরের প্রাণায়াম পর্য্যন্তও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে জগতী ছন্দের ভিতর দিয়া পরিণত করিতে হইবে।

আমি। সে আবার কি? উহা কি প্রকার?

স্বামী। জগতী ছন্দের কথার মূলভাব এই—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

সকল বস্তুই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিন ভাবের ভিতর দিয়া কোথা হইতে আসিয়া বিতন্বত হইয়া, পুনঃ কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্,—

ইহা দেখিয়া ভাবুক আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন,—তারপর যখন বুঝিতে পারেন, যে ভাব-রূপ বিমল সত্য পদার্থ, বিশ্বদেব-রূপ শক্তিগণের আধারে

'মাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্বৰিষ্ঠঃ'—

মাত্রা, স্বর, ও বর্ণের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া বস্তুরূপে অভিব্যক্ত হয় ও পুনরায় বিপরীত ক্রমে অব্যক্তে মিশিয়া যায়। যথাযথরূপে এই স্পন্দন-শীলতার ভাষা বা ছন্দের রস অনুভব করিতে পারিলে, আর আমরা বস্তু লইয়া

তরঙ্গ-গণনার জন্য ব্যগ্র হই না। তখন স্থিতি-শীলভাবের পশ্চাতে শাশ্বত, সত্য, নিত্য পদার্থের আভাস দেখিতে চাহি, গতির অভ্যন্তরে তাহার উদ্ভব ও লয় স্থানরূপ আত্মভাবের পদ-চিহ্ন দর্শন করিতে শিক্ষা করি ও বিশ্বদেবরূপ মাত্রাগণের পশ্চাতে শ্রীভগবানের তত্তৎ-ভাবের বিভূতি দর্শন করিয়া স্থির হই। নিয়ত্তর ভাবেও সাধক, ভাবের প্রকাশ হইলেই বুঝিতে পারে যে একদিন সেই ভাব জগতীছন্দে বস্তুরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে। সুতরাং আর আশার চাঞ্চল্য, বাসনায় আকুল প্রেরণা সাধককে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। তিনি বুঝেন যে যখন প্রাণে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা জন্মিতেছে, তখন সেই প্রাণেরই অভিব্যক্তিতে এক দিন না এক দিন তিনি প্রকট হইবেন।

বিপরীতভাবেও যখন বিশিষ্ট বস্তু ভোগ করা যায়, তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে জগতী-ছন্দে এই ভোগ এক দিন অব্যক্তে মিশিয়া যাইবে, ও সেই জন্য ভোগে আশক্ত না হইয়া ভোগের ভিতর অব্যক্তের পদ-চিহ্ন দর্শনাভিলাষে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। এই ছন্দের ভাষা ফুটিলেই সাধক বুঝিতে পারে যে যাহাকে লোকে দুঃখ বলে, তাহার পশ্চাতেও সেই পর-পুরুষের আকর্ষণ রহিয়াছে। তাহার পর সমগ্র ব্যক্ত জগৎ-পদার্থের ভিতর একই স্রোতের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মহাসমরও তোমার আমির প্রকৃতি ভাব অভিব্যক্ত করিবার জন্য সংঘটিত হইতেছে। বিশ্বমানব (Humanity) সমগ্র জগদ্ব্যাপারের মধ্যে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য যেন অল্পে অল্পে প্রয়াস করিতেছে। এইরূপে চিত্ত জগদ্ভাবের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' মহাভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। হায় কলিকালের দুর্দ্দিনে আর আমরা শাস্ত্র-বাক্য এরূপ ভাবে বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকে ছেলেবেলায় বেলে-খেলার মত করিয়া লইয়া লেচ্‌কার দিয়া বেড়াই; বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাই। ভগবানের রাসবিহারের রহস্য ও ভগবত্তত্ত্ব যৌবন-তৃষ্ণা-বিক্ষুব্ধ যুবকগণের ও বার্দ্ধাক্যে ভোগ-বিলাসের রোমন্থন ব্যাপারে নিয়ত তথা-কথিত বৃদ্ধগণের হৃদয়ে উন্মেষ করিতে চাহি। আজ এই পর্য্যন্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তী।

(এক খানি চিত্র।)

"মা দুর্গে, দুর্গতি-হারিণি! ভাবিয়া যে কোন কূল পাইতেছি না মা! কি করি, কোথায় যাই, দিবাও অবসান প্রায়। শীঘ্র ব্যবস্থা না করিলে সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ ত' এখনও ফিরিয়া আসিলেন না। হায়! তিনি আমাকে কত মতে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'এদেশে বাস করা কর্ত্তব্য নয়, চল অন্যত্র যাই।' কিন্তু, আমি মন্দ-ভাগিনী, শুধু পিতামাতার স্নেহে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কি না বিমূঢ়ার কার্য্য করিয়াছি।

আহা! এই যে, তিনি এদিকে আসিতেছেন। তাঁহার দিকে যে আর চাহিতে পারিতেছি না। তিনি নিশ্চয়ই বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তা' না হ'লে, তাঁহাকে কখনই এত বিমর্ষ দেখাইত না। আমার অপরিণামদর্শিতার ফলে, আজ তাঁহার কি না দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! মুখের দিকে চাহিলে, সহজে তাঁহাকে চিনিয়া উঠা যায় না। চোক্ দুটী দিয়া অবিরলধারায় অশ্রু ঝরিতে ঝরিতে রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ও ওষ্ঠদ্বয় শুষ্কপ্রায়। অহো! চিন্তার তীব্রতা কি এতই ভীষণ? এক দিনের মধ্যেই কি মানুষকে এত বিকৃত করিতে পারে? কোথায় সে ঢল ঢল চোক্ দুটীর অপূর্ব্ব চাহনি ও হাসি-মাখান মুখ-মণ্ডল, আর, কোথায় এই কোটরগত চক্ষুদ্বয় ও বিষাদ-বিমলিন মুখচ্ছবি।" দুঃখ-বিহ্বলা ব্রাহ্মণী এরূপ চিন্তা করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে ব্রাহ্মণের পদতলে পতিত হইয়া করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো! এখন উপায় কি বল? সূর্য্যত পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন, আরত নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; এখনই এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা যে সকলেই প্রাণ হারাইব।"

প্রিয়তমা ভার্য্যার করুণ ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"সাধ্বি! উঠ, উঠ, আর কাঁদিও না, আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছি। আমিই আজ দুরন্ত নিশাচরের নিকট ভোজ্য লইয়া যাইব। আমার বিয়োগে তুমি অধীরা হইও না। দেখ, সংসারে কেহই অমর নয়, সকলই মৃত্যুর অধীন।

একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে। আমার শোকে যদি তুমি একেবারে ব্যাকুলা হইয়া যাও, তা'হলে এই অপোগণ্ড শিশু ও কন্যাটীকে লালন-পালন করিবে কে? তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি রাখিও; ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।" ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রাহ্মণী অধিকতর বেগে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন "স্বামিন্! আপনি আমাকে এরূপ বলিতেছেন কেন? পতিভিন্ন স্ত্রীলোকেব আর কি আছে নাথ! জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীলোকেব একমাত্র গতি ও আরাধ্য-দেবতা। যে রমণী স্বামীকে জীবিত রাখিয়া এ নশ্বর শরীর পরিহার কবত স্বর্গ-গামিনী হয়, তাহার তুল্য ভাগ্যবতী কে? প্রভো! আমাকে আজ এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমিই আজ ভোগ্য লইয়া যাইব। আপনার যাওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নয়। দেখুন, আপনি প্রাণ হারাইলে, আমি কখনই, আমাকে ও ছেলে মেয়ে দু'টীকে পালন করিতে সমর্থ হইব না; সকলেই অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। কিন্তু, আমি যদি ভোজ্য লইয়া গিয়া রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলেও আপনি ছেলে ও মেয়ে দু'টীকে লালন-পালন করিতে সক্ষম হইবেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ক্ষমতার অনেক পার্থক্য আছে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।"

জনক-জননীর মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অল্পবয়স্কা বালিকা বলিতে লাগিল—"মা! বাবা! আপনাবা এত ব্যাকুল হইয়াছেন কেন? আব আপনাদের এ অমূল্য জীবনই বা ধ্বংস কবিতে সংকল্প করিতেছেন কেন? বাবা! আপনার ভোগ্য লইয়া যাওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নয়। মা যে বলিয়াছেন, আপনি প্রাণ হাবাইলে আমরা পথের কাঙ্গাল হইব, ভিক্ষায় অন্নও জুটিবে না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর মা! তুমিও এ সংকল্প ত্যাগ কর। তুমি না থাকিলে যে আমাদের কি দশা ঘটিবে, তাহা কি একবারও ভাবিয়া দেখিতেছ না? খোকাকেত প্রাণে বাঁচানই কঠিন হইবে। অতএব তোমাদের কাহারও রাক্ষস-সদনে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বাবা! আমাকে ভোজ্য সমভিব্যাহারে রাক্ষস-সদনে পাঠানের বন্দোবস্ত করুন। ইহাতে আর আপত্তি করিবেন না।" বালিকার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণদম্পতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। বালিকা, তখন তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! মা! আমার কথায় আপনারা এত অধীর হইতেছেন কেন? আজ না হয়, কিছু দিন পরে ত আপনারা আমাকে ত্যাগ

করিবেনই,—আমিত আপনাদের কোন কাজে আসিব না। আজ ভোজ্য বস্তুর সহিত যাইতে আমাকে অনুমতি করুন। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইবে না; বরং আনন্দিতই হইব। আপনারা জীবিত না থাকিলে খোকাকে মানুষ করিবে কে? তাহাকে লালন-পালনই বা করিবে কে?"

জনক, জননী ও দিদির মুখে এরূপ কথা শুনিয়া ও তাহাদিগকে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে দেখিয়া, তিন বৎসরবয়স্ক ব্রাহ্মণ-কুমার মার কোল হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে একগাছি শুষ্ক তৃণখণ্ড হাতে লইয়া যথা-শক্তি সজোরে চোক্ মুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল—"মা! বাবা! দিদি! তোমরা কার ভয়ে এত কাঁদিতেছ? আর কাঁদিও না! যে তোমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে, আমি এখনি এই তৃণখণ্ডের আঘাতে তাহাকে বধ করিব। চল, সে কোথায় আছে, আমাকে দেখাইয়া দাও।" বালকের মুখে এবম্বিধ কথা শুনিয়া ও তাহার হাব্‌ভাব্ দেখিয়া এই নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও ব্রাহ্মণ-দম্পতীর মুখে হাসি ফুটিল, ও তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করত অজস্র-ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ-দম্পতী ও তাঁহাদের তনয় তনয়ার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে জনৈকা প্রৌঢ়া রমণী বহির্গত হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করত তাঁহাদের এরূপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা! আমাদের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়া ফল নাই। আমরা আজ যে ভীষণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি, এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে কেহ দৈববল ব্যতীত, মানুষী শক্তিদ্বারা রক্ষা করিতে পারিবেন না।" তথাপি সে রমণী, তাঁহাদের দুঃখের কারণ জানিবার জন্য বারংবার বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বাষ্প-বিজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মা! আমাদের এই 'একচক্রা' গ্রাম একদা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী অপেক্ষা হীন ছিল না। গ্রামবাসিগণ পরমানন্দে কাল কাটাইত। কাহারও কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু, আমাদের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে 'বক' নামীয় জনৈক ভীষণকায় দুরন্ত রাক্ষস হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গ্রামাধিপতিকে নিহত করত আমাদিগকে নাশ করিতে উদ্যত হইলে, আমরা সকলে তাহাকে স্তবস্তুতি করিয়া সম্মত করাই যে, আমরা প্রত্যহ তাহাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন, মিষ্টান্ন, পিষ্টক ও দুইটী

মহিষ-সহ একজন মনুষ্য ভোজন করিতে দিব। সেও এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাদিগকে অভয় দেয়। তদবধি গ্রামবাসিগণ পালা করিয়া তাহার আহার যোগাইয়া আসিতেছে। অদ্যকার ভোজ্য-প্রদানের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে অন্ন, মিষ্টান্ন, পিষ্টক ও মহিষাদির যোগাড় করিয়াছি, কিন্তু ভোজ্য লইয়া যাওয়ার মানুষ পাই নাই। কাজেই এখন নিজেদের মধ্যে কে ভোজ্য লইয়া যাইব নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, সকলেই রাক্ষসের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

ব্রাহ্মণের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করত প্রৌঢ়া রমণী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আপনারা আর ক্রন্দন করিবেন না। স্থিরচিত্তে ভোজ্যের অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার ঠিক করুন। আমি মানুষ দিতেছি। ভগবানের কৃপায় আমি পাঁচ পুত্রের জননী; আজ তাহাদেরই একটীর দ্বারা আপনাদের দুঃখ নিবারণ করিব।" রমণীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া, ব্রাহ্মণ, দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন—"মা। তুমি এ কি বলিতেছ? একেত' ব্রাহ্মণ অবধ্য, তাহাতে তোমরা আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে, সেই বিপদ্ হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি কিনা, এখন স্বীয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের জন্য আশ্রিত-বধ ও ব্রহ্ম-বধের পাতকে লিপ্ত হইব। না, মা! তাহা কখন ও হইবে না; আমি এমন পাপজীবন কখনই ধারণ করিতে পারিব না। আর মা! তুমি কোন্ প্রাণে, পরের জীবন রক্ষার্থ স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকে শমনরূপী নিশাচর সমীপে পাঠাইতে চাহিতেছ? এমন অদ্ভুত কথা ত আমি আর কখনও শুনি নাই।" রমণী বলিলেন—"আমি আমার যে পুত্রকে রাক্ষস সদনে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি, আপনারা তাহাকে সাধারণ মানুষের ন্যায় ভাবিবেন না। সে ক্রুদ্ধ হইলে, নিশাচর ত অতি ক্ষুদ্র, দেবগণ পর্য্যন্ত শঙ্কিত হন্। আমার পুত্র রাক্ষস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে, আপনারা এ আশঙ্কা করিবেন না। আমার পুত্রের পরাক্রমে রাক্ষসেরই জীবনান্ত ঘটিবে। কিন্তু, আমার এই অনুরোধটী আপনাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে—"কাহার দ্বারা এই দুরন্ত রাক্ষস নিহত হইল, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে, আপনারা রহস্যভেদ করিবেন না। যদি প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমাদের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।" রমণীর মুখে এরূপ উৎসাহপূর্ণ ও সাহসব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ-দম্পতী অতি আহ্লাদিত হইয়া দুই হাত তুলিয়া ভগবানকে ডাকিতে

লাগিলেন ও তাহার পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ভোজ্য-দ্রব্য-সম্ভার শকটে বোঝাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ-দম্পতীর সম্মতি পাইয়া, পর-দুঃখ-কাতরা রমণী উৎফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, অমিত-বলবীর্য্যশালী মধ্যম পুত্র ভীমকর্ম্মা বৃকোদরকে আহ্বান করত ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপস্থিত বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করণান্তর তিনি যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। মাতৃবাক্য শ্রবণ করত ভীমের আনন্দের আর সীমা রহিল না। যুদ্ধ যাহার চির প্রিয়, ভোজন যাহার অলৌকিক, তাহার পক্ষে এতদপেক্ষা শুভ সংবাদ আর কি হইতে পারে?

সুধী পাঠকগণ বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন যে এ প্রৌঢ়া রমণী কে? ইনি পাণ্ডব-জননী দয়া-স্বরূপিণী কুন্তী। হিংসাবৃত্তি-প্রবণ কূটবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদির ছলনায় কুন্তী দেবী পঞ্চপুত্র সহ বারণাবতে প্রেরিত হইয়া মহাত্মা বিদুরের কৃপায় জতুগৃহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, দীনা হীনা কাঙ্গালিনীর বেশে দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অহো! অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ পাণ্ডুর মহিষী কি না, আজ পঞ্চ পুত্রসহ ভিক্ষালব্ধ অন্নে কাঙ্গালিনী বেশে দিনাতিপাত করিতেছেন।

অতঃপর ভীম কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আজ দুর্বৃত্ত রাক্ষসের আর রক্ষা নাই,—তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যান্, আপনি ব্রাহ্মণকে দ্রব্য-সম্ভার সাজাইয়া আনিতে বলিয়া আসুন। কিন্তু, মা! দাদা যে এখনও ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; নকুল, সহদেব এবং অর্জ্জুনও আসিল না; তাই ভাবিতেছি আপনার নিকট কাহাকে রাখিয়া যাই।" কুন্তী বলিলেন—"বৎস ভীম! তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না। যুধিষ্ঠিরাদি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে। তা' ছাড়া ব্রাহ্মণ-দম্পতীও বাড়ীতে আছেন; কাজেই আমার ভয় কি? সমস্ত দ্রব্য গাড়ীতে উঠান হইয়াছে, যাও বাবা! আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করি তুমি নির্ব্বিঘ্নে রাক্ষস বধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হও। ভগবান্ অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন।" তখন ভীম মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর শকটারোহণপূর্ব্বক পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে নিশাচরের বাসস্থানাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি লইয়া গৃহে আসিয়া জননীকে

প্রণাম করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পর যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখিতে না পাইয়া কুন্তীকে বলিলেন—"মা! ভীম কোথায়? তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন?" তখন কুন্তী একে একে সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। মাতৃবাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা! তুমি এ কি করিলে? জননী হইয়া কোন্ বুকে মা! পুত্রকে রাক্ষসের হাতে অর্পণ করিলে? মা! ভীমের দেহে কি আর পূর্ব্ববৎ শক্তি আছে? ভাই যে আমার পেট ভরিয়া খাইতে না পাইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার মুখের দিকে চাইলে যে, দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়। মা! তুমি কেমন দুর্জ্জয় রাক্ষসের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ যদি ভাই বৃকোদর রাক্ষসের হস্তে নিহত হয়, তাহা হইলে আমিও প্রাণ ত্যাগ করিব। যে ভাইয়ের বলে একদিন হয়ত হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আশা, যে ভাই ভীষণ অরণ্যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, আজ কি না মা! তুমি "মা" হইয়া তাহাকে ভীষণ রাক্ষসের হাতে অর্পণ করিলে।"

যুধিষ্ঠিরকে ভীমের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া কুন্তী তাহাকে সান্ত্বনা-ব্যপদেশে বলিলেন—"বাবা! তোমার মুখে ত' আমি আর এমন কথা কখন শুনি নাই। তুমিত চিরদিনই পর-দুঃখ-কাতর, পরের উপকারার্থে স্বীয় জীবন তুচ্ছ জ্ঞান কর, বিশেষতঃ এ ব্রাহ্মণ আমাদের উপকারী ও আশ্রয়দাতা। তবে আজ এরূপ ব্যাকুল হইলে কেন? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি ভীমের কোন অনিষ্ট হইবে না। ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিবেন, সে নিশ্চয়ই রাক্ষস বধ করিতে সমর্থ হইবে। ভীমের জন্মের সময় দৈববাণী হইয়াছিল যে, ভীম বলে অদ্বিতীয় হইবে ও পৃথিবীতে তাহার ধ্বংস নাই। এমন কি আমিই প্রসবানন্তর তাহাকে কোলে উঠাইয়া স্তন্য পান করাইতে সমর্থ হই নাই। কাজেই ভীম কতদূর শারীরিক শক্তি সম্পন্ন, তাহা তোমা অপেক্ষা আমি অধিক অবগত আছি। যদি দৈববাণী সত্য হয়, যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে রাক্ষস ভীমের কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না।" ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মাতৃমুখে এ প্রকার বাক্যাদি শ্রবণে অতীব প্রীতি হইয়া বলিলেন—"মা! তুমি ধন্য! তোমার মুখেই এরূপ কথা শোভা পায়; মা! তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি। তোমার আশীর্ব্বাদে ভীমের কোন অমঙ্গল হইবে না, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মা! তুমি অপরের দুঃখ

বিমোচনার্থ, নিজ পুত্রকে রাক্ষসের হাতে অর্পণ করিয়া যে মহান্ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছ, তাহা চিরদিন পৃথিবী-বাসীর হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। মা! আমি মূর্খতা প্রযুক্ত তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর।"

শ্রীবিনোদবন্ধু গুপ্ত।

অক্ষয় কীর্ত্তি।

দারুণ অনাবৃষ্টি। পৃথিবী উল্কাপিণ্ডবৎ তপ্ত। প্রখর রৌদ্রের তাপে তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা শুষ্ক হইয়া বিলীন হইয়াছে; কোথাও বা গগনস্পর্শী বৃক্ষকাণ্ড সকল ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দগ্ধ-অট্টালিকার স্তম্ভরাজির ন্যায় হতশ্রী ও প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। জলাশয় সকল শুষ্ক গহ্বরে পরিণত। নদ নদী সকল দেখিলে মনে হয়, কে যেন মেদিনীর বক্ষ অতি নিদারুণ ভাবে বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তট হইতে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত কেবল বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে। শত বৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টি। ধরাতল পশুপক্ষী-শূন্য হইয়াছে; স্থানে স্থানে কেবল মাত্র বৃহদাকার স্থলচর ও জলচর পশু সকলের শুষ্ক-কঙ্কাল দেখা যাইতেছে, কোথাও বা শুষ্ক নর-কঙ্কাল বিকট মুখব্যাদান করিয়া দেহাভিমানী জীবগণকে উপহাস করিতেছে। কি রাজপথ, কি মনুষ্য সকলের গৃহ-প্রাঙ্গণ শ্মশান অপেক্ষাও অতি ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আর এই ব্যক্ত বিশ্বের স্থূল সন্দোর্য্যের, শেষ পরিণতির জ্বলন্ত চিত্র, যেন এক প্রচণ্ড ও জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, নিরন্তর জীবের হৃদয়ে আশঙ্কা ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যেন কোন দেবতার অভি-সম্পাতে এই পৃথিবী দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইতেছে। যেন এ পৃথিবীতে শ্রীভগবানের দয়া নাই, স্নেহ নাই, করুণার কোন চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই। তাই শোক-বিহ্বলা ধরণী বিধবা-বেশে মৃত পুত্রগণের ভস্মস্তূপ কোলে করিয়া শুষ্ক-কণ্ঠ, শুষ্ক-তালু, শুষ্ক-দেহ ও চেতনাহীন কতিপয় ব্রহ্মর্ষি এই বিশুষ্ক মাতৃবক্ষ আলিঙ্গন করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া আজিও জীবিত আছেন। ধন্য তাঁহাদের তপস্যা।

দিবা দ্বিপ্রহর। বায়ু কি অগ্নি-শিখা—কিছুই বুঝা যায় না, সেই অগ্নি-শিখা সদৃশ বায়ু ছুটিল;—ছুটিতে ছুটিতে এক দয়ার আধার—প্রেমের পাথার—

করুণাময় মূর্ত্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই যেন সেই পরম যোগীর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ ভাবে অনুপ্রাণীত হইয়া স্তম্ভিত হইল। যেন মনে হয়, এখানে রৌদ্র আছে কিন্তু তাপ নাই ;—উত্তাপ আছে, কিন্তু তাহাব অনুভূতি এক স্নিগ্ধ-মধুর তত্ত্বে পরিসমাপ্ত হইতেছে। তেজস্তত্ত্বের মধ্যে যেন ভগবানকে আবাহনের দ্বাবায় প্রসন্ন করিয়া সৃষ্টি-অভিমুখী করিতেছেন। অগ্নি হইতেও আপস্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়—সুশীতল জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেন আজি এই উত্তপ্ত পৃথিবীবুকে, কোন তপোধনের আকুল আহ্বানে ও সেই প্রেমময় ভগবানের মহিমায়, মধ্যে মধ্যে অতি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মভাবে, সুশীতল সৃষ্টি-শক্তিসঞ্চারিণী অপ্‌তত্ত্বের খেলা খেলিয়া যাইতেছে। এইখানেই মহাত্মা গৌতম, মেঘ ও জল কামনায়, বরুণ দেবের উপাসনায় মগ্ন। কেমন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা হইবে—কেমন করিয়া ঋষি তপস্বীগণ প্রাণ ধারণ করিবেন—কেমন করিয়া আবাব পৃথিবীবুকে পশু পক্ষী সকল বৃক্ষলতাদিপূর্ণ সরোবরতটে বিচরণ করিবে—কেমন করিয়া এই অপার জীবকষ্টের মোচন হইবে—কেমন করিয়া এই পুণ্যপবিত্রতা-পূর্ণ ধরণীর বুকে আবার ঋতম্ভরা "মধুবাতা" "স্বাহা" "স্বধা", ইত্যাদি সুমধুর বাণী ঋষিকণ্ঠে গীত হইবে—তাহাই চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা গৌতম বরুণদেবের শ্রীচরণে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া ধ্যানপরায়ণ! আজ, পরদুঃখ-কাতরতার ও আত্ম-বিসর্জ্জনের স্নিগ্ধ মধুর ভাবে গৌতম বিভোর! সেই করুণার প্রতিমূর্ত্তি মহাত্মা গৌতমের মুদ্রিত নয়ন-কোণে একবিন্দু প্রেমাশ্রু মুক্তা-কণার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। যে সূর্য্য নদ নদী ও সরোবর সকলের জল ও পশু পক্ষী মনুষ্য ঋষি প্রভৃতির প্রাণ শোষণ করিয়াছেন, সেই সূর্য্য গৌতমের নয়ন-কোণের একবিন্দু বারি শোষণ করিতে বুঝি অসমর্থ! সেখানে যেন পৃথিবীর সমুদায় অপ্‌তত্ত্ব ঘণীভূত!—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় জল-রাশি সেই অশ্রু অন্তরালে গর্জ্জন করিতেছে!—সেই নিভৃত গর্জ্জনে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত, এক স্নিগ্ধ শান্ত করুণাময় আশ্বাস-বাণী, প্রেমের ভাষায় গীত হইয়া নূতন আশার সঞ্চার করিয়া গেল।

মহাত্মা গৌতম যোগ-মগ্ন। দেখিলেই মনে হয় অতি কঠোরকর্ম্ম নিরত,—কিন্তু অন্তর অহর্নিশি এক মধুর ভাবে আপ্লুত। দিনের পর দিন যায় ;—মাসের পর মাস যায়—মহাত্মা গৌতমের বিরাম নাই। এইরূপে ছয়মাস অতি কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত হইল, এখনও সেই যোগি-শ্রেষ্ঠ স্থির। জানি না পূর্ব্বের ন্যায় পরদুঃখকাতরতা তাঁহার হৃদয়ে আছে কিনা,—জানি না জীবের নিত্য-মঙ্গল কামনা এখন গৌতমহৃদয়ে কি ভাবে আছে,—জানি না এখানে মহাত্মা

গৌতমের সঙ্কল্প আছে কিনা। সেই মহাত্মা এখন লয়-বিক্ষেপশূন্য—নিশ্চল;—আরাধ্য দেবতার চরণে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া স্থির;—সমুদয় বাহ্য বিষয় হইতে উপরত। মহাত্মা গৌতমের হৃদয়টুকু মধুর বিশালতায় বিস্তৃত হইয়া এক বিশালতর তত্ত্বের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। হায়! তবে জীবকুলের উদ্ধার কে করিবে? কে এই জীবের দুঃখ শ্রীভগবানের সম্মুখে দুঃখার্ত্ত ও শোকার্ত্ত ভাবে নিবেদন কবিবে?—কিসে ভগবানেব দয়া হইবে?

যেমন অসংখ্য সূর্য্য-বশ্মি একটী সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথ দিয়া মিলিত ও প্রতিভাত হইয়া,—সেই সংমিলিত সূর্য্যের উত্তাপ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করে, তেমনই এই অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট জীবের অশেষবিধ যাতনাবাশি সেই গৌতম হৃদয় দিয়া মিলিত হইয়া অতি তীব্র-ভাবে স্বর্গস্থ দেবতাহৃদয়ে প্রতিফলিত হইল, প্রতিফলিত হইয়াই সেই দেবতাকে প্রেমের আকুল আহ্বানে একবাবে চঞ্চল করিয়া ফেলিল। পরদুঃখ-কাতরতা আব গৌতম-হৃদয়ে নাই, তাঁহাব নিকদ্ধ চিব-বৃত্তিতেও নাই,—সাধনায় নাই; সিদ্ধিতেও নাই; সেই জীব-করুণা তাঁহার আরাধ্য দেবতাব হৃদয়ে, স্বাভাবিক নিয়মে—শ্রীভগবানেব কৌশলে ও মহিমায় প্রতিভাত হইল; আর সেই প্রেমেব দেবতা, একান্ত দয়া-পরবশ ও প্রেম-পববশ হইয়া উদ্বেলিত ও বিচলিত হইলেন। মহাত্মা গৌতম এখন নিশ্চল—আপনি ভুলিয়া, উদ্দেশ্য ভুলিয়া, সঙ্কল্প ছাড়িয়া—নিষ্পন্দ নিশ্চল কিন্তু বরুণদেব কি এক আকুল আহ্বানে ও পুনঃ পুনঃ একান্ত ভক্তি ও প্রেমের আকর্ষণে আকর্ষিত ও আহূত হইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। দয়ার একান্ত আতিশয্যে স্থূল মূর্ত্তি পরিগ্রহ কবিয়া সেই করুণাময় দেবতা "বরং ব্রূহি" "বরং ব্রূহি" বলিতে বলিতে একবারে যেন তাঁহার হৃদয় হইতেই চর্ম্ম চক্ষুব দৃষ্টি-গোচর হইয়া বাহিরে আবির্ভূত হইলেন। মহাত্মা গৌতমও যেন এতকাল তাঁহাব চবণসংলগ্ন ছিলেন বলিয়াই আজ সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত তাঁহাব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হইলেন ও পুলকে বোমাঞ্চিত-কলেবরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—

"দেব! প্রসন্ন হউন এই, দারুন অনাবৃষ্টি নিবারণ করুণ—পৃথিবীতে মেঘ জল প্রদান করুণ"

বরুণ। "বৎস! অন্য বর প্রার্থনা কর। এই অনাবৃষ্টি যাঁহার আজ্ঞায় হইয়াছে, তাঁহাব আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার সাধ্য নয়।"

গৌতম। "দেব! আপনার দর্শন লাভ করিয়া—আপনার অনুগ্রহ লাভ

করিয়া আবার অন্য কোন্ বর প্রার্থনা করিব? আপনার দর্শনেই আমার দুঃখ দূর হইয়াছে;—কিন্তু এই অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট জীবকুলের সন্তাপ দূর করুন,—আমায় মেঘ-জল প্রদান করুন। দেখুন,—বৃক্ষ নিজে আশ্রয়শূন্য ও নিরন্তর সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়; কিন্তু অসংখ্য জীবকুলের আশ্রয়স্থল ও নিরন্তর ছায়া দান করিয়া উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করে। দেখুন, এই চন্দন বৃক্ষকে যতই ছেদন ও ঘর্ষণ করা যায়, ততই সৌগন্ধি বিতরণ করে। আপনাদের সমুদয় সৃষ্ট পদার্থই এইরূপ প্রেমময় আত্মোৎসর্গ সকলকেই শিক্ষা দিতেছে। আরও দেখুন,—ইক্ষুকে যতই পেষণ করা যায়, ততই সে স্বাদু সুমিষ্ট রস প্রদান করিয়া থাকে। হে দেব, আপনি আরও দেখুন এই যে সুবর্ণ তাহাও পরোপভোগের জন্য। যখনই সুবর্ণ পরোপভোগের জন্য কল্পিত ও প্রদত্ত হয়, তখনই সুবর্ণের সুবর্ণত্ব ও তাহার মূল্যের গুরুত্ব সৃজিত হয়। হে ভগবন্, নিজের দেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া পরের উপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আপনার ন্যায় মহত্ত্বের দর্শন যেন ব্যর্থ না হয়। দেব, আমাকে মেঘ-জল প্রদান করুন।"

সেই করুণাময় দেবতা গৌতমের এতাদৃশ মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে হস্তের দ্বারায় গর্ত্ত খনন করিতে বলিলেন। মহাত্মা গৌতম সহস্তে বালুকামধ্যে গর্ত্ত খনন করিলেন। সেই গর্ত্ত বরুণদেব জলে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন ও বলিলেন—"বৎস, আমার বরে এই জল অক্ষয় হইবে।" এই বলিয়া বরুণদেব চলিয়া গেলেন। ক্রমে সেই জল এক সরোবরে পরিণত হইল। ঋষিগণ সেই জলে উদক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। ক্রমে সেই সরোবর-তীরে বৃক্ষলতাসকল উৎপন্ন হইল এবং অন্য দেশ হইতে পশু পক্ষী সকল আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। ঋষিগণ ক্রমশঃ ভূমিতে সেই জল সেচন করিয়া শস্য উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকালমধ্যেই সেই তপোবন বৃক্ষ-লতাদিতে, পশু-পক্ষীর সুস্বরে ও ঋষি তপস্বিগণের বেদধ্বনিতে অতিশয় মনোরম হইয়া উঠিল। ঋষিকুমার, ঋষি-কুমারীগণ ও তদীয় শিষ্যসকল আনন্দে সেই তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গৌতম জীব-কুলকে সন্তাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে শত শত নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ঋষিগণ পরম আনন্দে পুত্র কলত্র লইয়া সেই তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সকল গ্রাম্যসুখ উপভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট সুখের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাভিমানের কলঙ্ক-

কালিমা তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মধুর দাম্পত্য-প্রেমে বিভোর হইয়া ঋষিগণ তাহাঁদের পত্নীগণের বদন-রূপ দর্পণে, স্ব স্ব প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন--দেখিতে দেখিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মম্ভরিতার আপাত-মধুর সুখরসে ডুবিয়া গেলেন।

একদিন ঋষি-পত্নীগণই মহাত্মা গৌতমের সেই, তপোলব্ধ সরোবর হইতে জল আনিতে গিয়াছেন, এমন সময় গৌতমের শিষ্যগণও গৌতমের জন্য জল আনিতে গিয়াছেন। ঋষি-পত্নীগণ সেই শিষ্য-বালক সকলকে জল লইতে নিবারণ করিয়া তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌতম-শিষ্যগণ ঋষি-পত্নীগণের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুপত্নীর নিকট সমুদয় নিবেদন করিল। অহল্যা, এস্থলে স্বয়ং জল আনয়ন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া শিষ্য-বালক গণকে নিবারণ করিলেন ও স্বামীর আহ্নিক-ক্রিয়ার জন্য জল আনয়ন করিতে গমন করিলেন। ঋষিপত্নীগণ অহল্যাকে দেখিয়া ঈর্ষ্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং অহল্যাকে আহ্বান করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, আমরা শিষ্যগণকে নিবারণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি তাই গর্ব্বিতা অহল্যা মনে করিয়াছে যে 'আমাকে ত' আর নিবারণ করিতে পারিবে না—দেখি আমি নিজে যাই।' যাহা হউক, মহামায়ার মোহগর্ত্তে পতিতা সেই রমণীগণ সরলা অহল্যাকে অযথা বহুপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সাধ্বী অহল্যা, স্বামি-সেবার জন্য জল পাইয়াছেন, সুতরাং অত তিরস্কার শুনিয়াও প্রসন্না আছেন, ঋষিপত্নীগণের সহিত অন্য কথার বা কলহের প্রয়োজন ছিল না, তিনি কোনও কথার কোন উত্তর করিলেন না। সেই দেবী প্রতিমা, সদাই প্রসন্ন-হৃদয়া অহল্যা যেন হাসিতে হাসিতেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

অহল্যার এতাদৃশ হাসি হাসি অথচ গম্ভীর ভাব দেখিয়া ঋষিপত্নীগণ আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। এক জন অন্য জনকে কহিলেন, "দেখ এই অহল্যা অতিশয় দাম্ভিকা, আমরা যে এত দুর্বাক্য বলিলাম তাহার একটা উত্তর পর্য্যন্তও করিল না।" কেহ কেহ বলিলেন, "অহল্যা আমাদিগকে নিশ্চয় শৃগাল কুকুর মনে করিয়া আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না,—আমাদিগকে সমকক্ষ মনে করিলে নিশ্চয় একটা রূঢ় কথাও কহিত!" আবার কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "অভাগ্যি" গালাগালি?—ঠাকুরপ্রতিমার" মত আমাদিগের দিকে চেয়ে হাস্তে হাস্তে কেমন আবার 'পাটি পাটি' ক'রে গেল—এত দর্প—এত গরব!" এই প্রকার বিচার করিতে করিতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, এই

গর্ব্বিতা অহল্যার দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সকলেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ঋষিপত্নীগণ স্ব স্ব স্বামীর নিকট অহল্যার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করিতে আবম্ভ করিলেন, কিন্তু ঋষিগণ সরল-হৃদয়, অহল্যাব ও মহাত্মা গৌতমেব বিরুদ্ধে পত্নীগণের অভিযোগ গ্রাহ্য কবিলেন না। বরং তাঁহাদের পত্নীগণকে মহাত্মা গৌতমের অসাধারণ দয়ার কর্ম্ম সকল বর্ণন কবিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া সেই দারুণ অনাবৃষ্টিকালে বরুণদেবের তপস্যা করিলেন, কেমন করিয়া জল আনয়ন করিয়া এই তপোবনবাসী জীব জন্তু, ঋষি তপস্বী, বৃক্ষ লতা ইত্যাদিকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, তাহা বলিলেন। আবও বলিলেন, মহাত্মা গৌতম তাঁহাদের অন্নদাতা, জীবনদাতা ও পবিত্রাণকর্ত্তা। কিন্তু সেই দাম্পত্যসুখেব মত্ততায় পত্নীদিগেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেমন মনেব সরলভাবটুকু নষ্ট হইয়া গেল; আর সেই পূর্ব্বকৃতজ্ঞতার মূল ভিত্তিটীও যেন অলক্ষ্যেব দৃষ্টিতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল। ঋষি পত্নীগণ বিফলমনোরথ হইয়া আবও ঈর্ষ্যাপববশ হইয়া উঠিলেন। সরলা নিরপরাধিনী অহল্যার উপর অহরহঃ ঈর্ষ্যা কবিতে লাগিলেন, এবং সেই দিন হইতে প্রত্যহই স্ব স্ব স্বামীর নিকট অবকাশ পাইলেই অহল্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আরম্ভ কবিলেন—কেমন করিয়া দুর্বাক্য বলিল—কেমন করিয়া গর্ব্বিত ভাবে অগ্রে জল লইয়া গেল—কেমন ভাবে তাহাদিগকে তিরস্কার কবিল;—এই লইয়া নিত্য অভিমান, নিত্য কলহ, নিত্য বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে পত্নীগণেরই বাক্যপারিপাট্যের ও অভিমান গৌরবের জয় করিল। ঋষিগণ অবশেষে সকলে মিলিয়া মহাত্মা গৌতমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের পত্নীগণের বর্ণনা অনুসারে তদীয় পত্নী অহল্যার দুর্ব্ব্যবহারেব কথা নিবেদন করিলেন। মহাত্মা গৌতম তাঁহাদের কথায় তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিবাক্য বা প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। তাহাতে ঋষিগণ ও সকলে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন ও পরামর্শ কবিতে লাগিলেন, এবং সকলেই একমত হইয়া, মহাত্মা গৌতমকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, তাঁহার দণ্ড বিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থির কবিলেন যে, 'যাহাতে গৌতমকে আমরা তিরস্কার করিতে করিতে এই তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি' তাহার উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য; কেন না ব্রাহ্মণকে হত্যা করা বা অন্য কোন প্রকার গুরুতব দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। সকলেই গণপতি বিঘ্নরাজের পূজাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট

হইতে এই প্রকার বর লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহাই সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই স্ত্রী-পরায়ণ ঋষিগণ আজ মহামায়ার মোহ-গর্ত্তে নিপতিত হইয়া দুর্নীতিকে নীতি, অধর্ম্মকে ধর্ম্ম, ও ঘোরতর পাপাচরণকে পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে সকলে মিলিয়া সেই দুষ্কর্ম্মে প্রাণপণে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

ঋষিগণের পূজায় বিঘ্নরাজ গণপতি তুষ্ট হইলেন। বরদমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, বর গ্রহণ কর।" ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "হে দেব, হে বিঘ্নরাজ, যদি আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক দর্শন দিয়াছেন, তবে আমাদিগকে এই বর দিন যাহাতে আমরা গৌতমকে তিরস্কার করিতে করিতে এই তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি।" তাঁহাদের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া, সেই করুণাময় দেবতা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আহা, মহাত্মা গৌতম জীবন দিয়া তোমাদের উপকার ভিন্ন অপকার করেন না। তাঁহার প্রসাদে তোমাদের এই সুখ-ভোগ, সেই উপকারী ব্যক্তির উপর এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না। সাধু ও নিরপরাধী গৌতমকে অযথা পীড়ন করিও না।" ঋষিগণ বলিলেন, "হে দেব, হে দয়াময়, যদি আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকে, আমাদিগকে এই বরই প্রদান করুণ; অন্য বরে প্রয়োজন নাই" গণপতি বলিলেন "অহো, অসাধু কখন সাধু হয় না সাধু কখন অসাধু হয় না। তোমরা অতি অসাধু ও বৃথা অভিমানী, স্ত্রীবুদ্ধিবশতঃ তোমাদের স্বভাব অতিশয় দুষ্ট হইয়াছে। লোকে যে তপস্যা ও দেব-আরাধনা মুক্তি বা লোক-হিতের জন্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আজ তোমাদের সেই তপস্যার ফলকে স্ব স্ব বন্ধনের জন্যও পরপীড়নের জন্য প্রয়োগ করিতেছ। অহো পরোপকারী পরম-দয়ালু সাধু মহাত্মা গৌতম তোমাদের কি অনিষ্ট করিয়াছেন? যাহা হউক, তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কিন্তু ইহার ফল পরে জানিতে পারিবে।" মূঢ়বুদ্ধি ঋষিগণের তবুও চৈতন্য হইল না। দৈবের বশবর্ত্তী সেই মুগ্ধ ঋষিগণ বরলাভ করিয়া আনন্দে বাটী গিয়া স্ব স্ব পত্নীগণের নিকট পৌরুষের আড়ম্বর করিতে লাগিলেন। ভবিষ্যতের জন্য এতটুকু আশঙ্কা ও হৃদয়ে স্থান পাইল না।

এ জগৎ মায়া দ্বারায় পরিকল্পিত। কিন্তু যেমন সুকবির মনঃকল্পিত রচনা, স্থানে স্থানে অলঙ্কারের দ্বারায় ও কল্পনার নিত্য-নূতন তরঙ্গে, স্থানে স্থানে অধিকতর সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে,—যেমন চিত্রকরের চিত্রে বর্ণ,

প্রয়োজন অনুসারে কোথাও ঘনীভূত, কোথাও বা মন্দীভূত হইয়া, সেই চিত্রকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, যথার্থ ও জীবন্তের ন্যায় করিয়া প্রতিফলিত করে, তেমনই এ জগতে শ্রীভগবানের মায়া কোথাও বা মনুষ্যগণের হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া কোথাও বা মন্দীভূত হইয়া অনুগ্রহ ও নিগ্রহের নিত্যনূতন তরঙ্গের অবতারণ করিয়া এই বিশ্বকে শিক্ষা-প্রদ ও মুক্তি-প্রদ করিয়া রাখিয়াছে। সেই চতুরালীর চতুরতায় এই চির-দুখের জগৎ অভিনব সুন্দর ও আনন্দময়। আজ মহাত্মা গৌতমের তপোবনও শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব মায়ায় হাস্যময়ী। সকলেরই মন সেই সম্পর্কে আসিয়াই যেন তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়িতেছে। সুনীল, শ্যামল, বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র অতিশয় মনোরম শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুণ্য মুহূর্ত্তে সেই তপোবনকেই যেন পবিত্র করিবার জন্য শ্রীভগবান বৃদ্ধ গো-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সেই নব-ঘন-নিন্দিত-শ্যামল শস্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পরম দয়ালু গৌতমের দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। গূঢ় উদ্দেশ্য-সম্পন্ন শ্রীভবানের মায়ায় গৌতম মুগ্ধ হইলেন। শীর্ণ দেহ, কম্পিত কলেবর, বৃদ্ধ গো তাঁহার ক্ষেত্রের সুন্দর সুন্দর শ সকল ভক্ষণ করিয়া নষ্ট করিতেছে দেখিয়া আজ বুঝি গৌতমেরও অন্তর্নিহিত সুপ্তবৃত্তি সকল উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। গৌতম একমুষ্টি তৃণ লইয়া সেই গোকে ভয়প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু সেই গোরূপী ভগবান্ সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে ছলনা করিবার জন্য আরও অধিক আগ্রহসহকারে সেই শস্য সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, গৌতমও সেই তৃণগুচ্ছ সঞ্চালিত করিয়া প্রহারোদ্যত হইলেন, আর যেমন সেই তৃণমুষ্টি গাভীর গাত্রস্পর্শ করিল অমনি সেই গো সেইখানেই পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। মহাত্মা গৌতম অবাক্—শেষ "হায়, এ কি করিলাম" এই বলিয়া নিতান্ত ব্যথিত অন্তঃকরণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। "হায়, হায়, এ কি করিলাম!—গো-হত্যা করিলাম!" "হায় ভগবান! এ কি হইল!" এই বলিয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। অহল্যা আসিয়া দেখিলেন তাঁহারা গো-হত্যার মহাপাপে নিমগ্ন হইয়াছেন। "হায় ভগবান এ কি করিলে? কেন অকস্মাৎ গো-হত্যা ঘটিল? এক্ষণে আমরা কি করি! কোথায় যাব!" এই বলিয়া অহল্যা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই ক্রূরকর্ম্মা ঋষিগণও তদীয় পত্নীগণ জানিতে পারিয়া ও উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, মহাত্মা গৌতমকে তিরস্কার করিতে করিতে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

১ম। ওহে গৌতম, তুমি এ কি কাজ করিলে ?—ব্রাহ্মণ হইয়া গো-হত্যা করিলে ?

২। অহো, এই বৃদ্ধ গো তোমার কি করিয়াছিল ?—চণ্ডালেও এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করে না।

ঋষি-পত্নীগণ। এই যে অহল্যা—এই যে গৌতম—জীবন্ত গরুটাকে এমন মার্‌লে, যে ম'রে গেল!—ছি ছি! তুমি না তপস্যা করিয়াছিলে ?—তোমার তপস্যায় ধিক্! তুমি না ব্রাহ্মণ হইয়া ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া থাক্ ?—তোমার ত্রিসন্ধ্যায় ধিক্! গায়ত্রী জপে ধিক্! তোমার ত্রিকালীন হোমে ধিক্! তোমার বৈদিক ও পৈতৃক কর্ম্মে ধিক। তোমার জ্ঞানে ধিক্, গুণে ধিক্, বিদ্যার ধিক্, বয়সে ধিক্ আর কত বলিব—তোমার শত শত ধিক্!

অহল্যা। যথার্থ কথা—আমাদের জীবনে ধিক্—তাহা না হইলে অকস্মাৎ গো-হত্যা ঘটিবে কেন ?—হায়, ভগবান কি কবি ?—কোথায় যাই ?

৩য়। অহে, দেখ এই গো-ঘাতক গৌতমেব আর মুখ দর্শন করিতে নাই।

গৌতম। হায় ভগবান, আজ হইতে পতিত হইলাম—ত্রিসন্ধ্যায় বঞ্চিত হইলাম—হে দেবগণ, হে দিক্‌পালগণ আজ হইতে নিত্য-কর্ম্মের অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইলাম!—ত্রিকালীন হোমে বঞ্চিত হইলাম! অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে পিতৃগণ তোমাদের কুলাঙ্গার সন্তান আজ হইতে পৈতৃক কর্ম্ম হইতে চ্যুত হইল; এই পতিত পাতকীর অপবাধ মার্জ্জনা কর! মা—গায়ত্রি—,

৪র্থ। "আরে—রেখে দে তোর গায়ত্রী—গায়ত্রী—তুই গো-ঘাতক, তুই যতক্ষণ আমাদের সম্মুখে থাকিবি, ততক্ষণ কি পিতৃপুরুষগণ, কি দেবগণ, কেহই আমাদের দেওয়া একগণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন না।"

গৌতম। হে ঋষিগণ—

সকলে। বেরো—বেরো—'দূর হ!'—গো-ঘাতক!—দুরাত্মা!

গৌতম। সত্য সত্যই আমি গো-ঘাতক!—আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না। চল অহল্যা—

সকলে "মার্ এই গো-ঘাতককে মার্" এই বলিয়া সেই দুঃখ-সন্তপ্ত বিকল-চিত্ত পরম দয়ালু তপোনিধিকে লোষ্ট্রপ্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

গৌতম। তোমাদের সামান্য লোষ্ট্রপ্রহারে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না—বৃথা পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত হও। এস অহল্যা; আমরা গো-ঘাতক!—

আমরা আর ঋষি নই—ব্রাহ্মণ নই,—শৃগাল কুকুরের ন্যায় অধম হইয়াছি। চল যাই,—কিন্তু কোথায় যাই ?”

সকলে। কোথায় যাই !—এক ক্রোশ দূরে, যেখানে লোকালয় নাই।

গৌতম। তথাস্তু, ঋষিগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক ; আমি চলিলাম।

অহল্যা। আমাদের এই তপোবন ছাড়িয়া কোথায় যাইব ?

গৌতম। অহল্যা, ভুলে যাও—চিত্ত স্থির কর—মন দৃঢ় কর। কে তুমি ? ভাবিয়া দেখ,—কে আমি ? এই ঋষিগণই বা কে ?—ভগবান্! শুন অহল্যা, এ তপোবন তোমারও নয় আমারও নয় ; যাহারা এই তপোবনের উপযুক্ত, এই তপোবন চিরকাল তাহাদেরই থাকিবে। গো-হত্যা করিয়াছি, এখন চল, শৃগাল কুকুর ও হিংস্রজন্তুর সহিত একত্র বাস করি। এই দেব-মানব-পরিপূর্ণ বিশ্বে, এই বেদ-বিদ্যাপরিপূর্ণ জীবনে, এখন এইমাত্র আমাদের অধিকার। এস অহল্যা, আমার এই অধিকার লইয়াই পূর্ব্বের ন্যায় সন্তুষ্ট থাকি। আর এই তপোবন শ্রীভগবানের অপার করুণার চিহ্নস্বরূপ—ইহা তোমারও নয়, আমারও নয়,—ইহা কাহারও নয়।

* * * * *

সাধ্বী অহল্যা এক বৃক্ষ-তলে বসিয়া আছেন, নির্জ্জনে, সেই বনভূমির মধ্যে অতি দীনভাবে যেন কাহার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া শূন্যপানে চাহিয়া আছেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে সেই বিজন বনে মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিয়া চমকিত হইলেন,—চাহিয়া দেখিলেন, মহাত্মা গৌতমের শিষ্য সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছেন।

অহল্যা। বৎস্য, তোমার মঙ্গল হউক—তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? বল বৎস্য, মহাত্মা গৌতম এখনও কেন আসিতেছেন না ?

শিষ্য। মাতঃ! আমাদের উপাধ্যায় কোথায় গমন করিয়াছেন ?

অহল্যা। তপোবনে—ঋষিদের নিকটে।

শিষ্য। কেন, মাতঃ! আবার তপোবনে কেন ? তাহারা কত লাঞ্ছনা, কত ভর্ৎসনা ও কত অপমান করিল ;—আবার তাহাদের কাছে কোন্ প্রাণে গমন করিলেন ? এত সহ্য করিবার কি প্রয়োজন মা ?

অহল্যা। তাঁহারা বিধি ও অনুমতি দিবেন, তবে ত আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইব।

শিষ্য। মাতঃ! যাঁহার তপস্যায় আজ তপোবন তপোবন বলিয়া বিখ্যাত—

সেই নিদারুণ অনাবৃষ্টি সময়ে যাঁহার তপস্যায় বরুণদেব সশরীরে মর্ত্তালোকে আগমন করিলেন, সেই পর-হিতব্রতধারী মহাত্মাকে কে উপদেশ দিবে? যাহারা কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া, আপনাদিগকে লোষ্ট্রপ্রহারে লাঞ্ছনা করিল—যাহারা স্ত্রী-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদাই গ্রাম্যসুখের বশবর্ত্তী—যাহাদের বেদ-পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ শুকপক্ষীর মুখে কৃষ্ণগাথার ন্যায় কেবলমাত্র জিহ্বার পরিচালনা মাত্র—তাহারা আমাদের ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়কে কি উপদেশ দিবে? মা, আপনারা কেন এরূপ প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়াছেন? প্রাণায়াম-পর হইয়া তপস্যায় আমাদের মহাত্মা উপাধ্যায় কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহাদেব, সকলকেই তুষ্ট করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট শুদ্ধিকামনা করিলে তাঁহারা আপনাদিগকে শুদ্ধ করিবেন। কেন মা সেই নীচ ঋষিগণের নিকট পুনঃ পুনঃ অপমানিত, তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন।

অহল্যা। বাছারে আজ একপক্ষকাল যাবৎ শূদ্রের ন্যায় সকল কর্ম্মের অধিকারভ্রষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিতেছি। ব্রাহ্মণের পতিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ, আর সেই নির্দ্দয় ঋষিগণ পরম দয়ালু গৌতমকে, দেহশুদ্ধির কোন উপদেশ দিতেছেন না। দেখিলে, উপহাস করিয়া চলিয়া যান, কত গঞ্জনা দেন—তবুও প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেন না। হায়! মহাত্মা গৌতম আজি শূদ্রের ন্যায় তাঁহাদের পদ সেবা করিতেছেন; তবুও দয়া হয় না।” বলিতে নিতান্ত দুঃখে সাধ্বী অহল্যার নয়নকোন হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শিষ্যবালক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, সর্ব্ব-শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মুহুর্ম্মুহু বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। “হায়! হায়! কি দুর্ভাগ্য—ভগবানের একি বিড়ম্বনা! পণ্ডিত হইয়া মূর্খের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে—তপস্বী হইয়া চণ্ডালের নিকট দীক্ষা ইচ্ছা করে সাগর হইয়া শুষ্ক কূপের নিকট বারি ভিক্ষা করে। আহা, আমাদের উপাধ্যায় জ্ঞানে বলুন পাণ্ডিত্যে বলুন, তপস্যার বলুন, কিসে ন্যূন, যে সেই পশুধর্ম্মাবলম্বী কপট তপস্বীদিগের নিকট উপদেশ ভিক্ষা করেন!”

অহল্যা। না, বৎস, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ ভিন্ন হয় না। দশজন বা অন্ততঃ তিন জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া যাহা উপদেশ দিবেন তাহাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি।

শিষ্য। পণ্ডিত হইয়া পাষণ্ডগণের নিকট উপদেশ লইতে যাওয়ায় ভাল হয় না।

অহল্যা। না বৎস, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের এই নিষ্ঠুরতা আমাদের ভাগ্যদোষে।

শিষ্য। যাহারা এত নিষ্ঠুর তাহাদের বেদ অধ্যয়নে ধিক্!

অহল্যা। না—বৎস, আমাদের সহ্য করিতে বড় যাতনা হয়; কিন্তু দণ্ডদাতাগণের আচরণ এইরূপ নিষ্ঠুরই হইয়া থাকে। ভগবানের এই কঠোরমূর্ত্তি, মনুষ্যগণকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্যই প্রকাশিত হয়।

শিষ্য। মা। আপনি এ প্রকার অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য কেন বলিতেছেন? কোথায় শ্রীভগবানের প্রকাশ,- আর কোথায় নীচাশয় ব্রাহ্মণগণের নিষ্ঠুর অত্যাচার!—কোথায় স্বর্গ—আর কোথায় নরক!।

অহল্যা। না বৎস, আমি ঠিকই বলিতেছি - আমরা এখন শূদ্রবৎ পতিত, উহারাই আমাদের দেবতা—উহারাই আমাদের পরিত্রাতা।

শিষ্য। তাহাই যদি হয়, তবে আমাদের উপাধ্যায় উপলক্ষ্য মাত্র, আর গো, গোহত্যা, ও গোহত্যাকারী সকলই যখন সেই নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ তবে প্রায়শ্চিত্ত কেন?—তাহার বিধি কেন?—উপদেশ ও অনুমতি কেন?

অহল্যা। যখন দশজনে আমাদের পাপ ঘোষণা করিতেছে—আমাদের কর্ম্মে যখন অপরের মন কলুষিত হইয়াছে, তখন তাহাদের চিত্তশুদ্ধি কেমন করিয়া হইবে? আর ব্রহ্ম বোধে—

শিষ্য। তাহাদের চিত্তের পরিতোষ যদি না হয়—মূর্খদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্য আমাকে কায়িক যাতনা কেন ভোগ করিতে হইবে?

অহল্যা। আর ব্রহ্ম বোধে 'ত' এই হত্যা করা হয় না; তখন 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান ছিল; সুতরাং একথা এখানে বলা ঠিক হয় না। আর যদি ব্রহ্মবোধেই অবস্থান করিতে পারা যায়, তবে দুঃখই বা কি কষ্টই বা কি?—মান অপমান কি? কেন এই দেহাত্ম-বুদ্ধি লইয়া, অধিকারের জন্য এত লালায়িত হইব? কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি পাপী কি পুণ্যাত্মা, সকলেই সমান, ভগবান্ সকলকেই সেইরূপ পরম পদ প্রদান করিবেন; কেহ মুক্ত হইবে আর কেহ কল্পকল্পান্ত পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত ও পতিত হইয়া থাকিবে ইহা ভগবানের নিয়ম নয়। সুতরাং আমাদের কর্ম্মে যদি লোকের মনে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পায়, তাহা করা উচিত নয়। বরং তাহাদের সেই মনের কালি ও আমাদের কলঙ্ক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই পরিষ্কার করা উচিত। আরও দেখ, যদিও সকল

ক্ষেত্রেই সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ, ও তাঁহাতে পাপ স্পর্শ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও এই স্থূল দেহে, যে অবৈধ কর্ম্ম বাসনাবশে মনুষ্য করিয়া থাকে, মরণান্তে সেই অপবিত্রতা হইতে এক যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হয়—তাহা দ্বারা জীবের যাতনা ভোগ হয়—সে যাতনা, জীবৎপ্রায়শ্চিত্তের যাতনা অপেক্ষা শতগুণ অধিক্। মৃত্যুর পর সে রূপ যাতনা ভোগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা অপেক্ষা, জীবিত অবস্থাতেই প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। তাহাতে শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে ও সকলেরই মনে ধর্ম্মে আস্থা ও উৎসাহবৃদ্ধি পায়, এবং মৃত্যুর পর আর দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না।

শিষ্য। কেন, জপ ও প্রাণায়াম দ্বারাও ত' লোকে শুদ্ধিলাভ করে?

অহল্যা। সে যে গূঢ় পাপ।

শিষ্য। আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। কিন্তু তাহারা মন্ত্রণা করিতেছে যে, এবার বিধি চাহিতে আসিলে, এমন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি দিবে, যে আর জীবিত অবস্থায় লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

অহল্যা! কেন বাছা, আমরা তাহাদের কি করিয়াছি? আর যদি মরিতেই হয়, তাতেই বা কি? পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা বরং মৃত্যুর দ্বারায় প্রায়শ্চিত্ত করাও মঙ্গল।

তাঁহাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই মহাত্মা গৌতম ফিরিয়া আসিলেন। শিষ্য ও অহল্যা উভয়েই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অহল্যা জল লইয়া পদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন ও মহাত্মা গৌতমকে ধীরে ব্যজন করিতে করিতে প্রায়শ্চিত্তের কথা উত্থাপন করিলেন।

মহাত্মা গৌতমের চিত্ত তখন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; অহল্যা ও শিষ্যকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন—ব্রাহ্মণগণ সকলে একবাক্যে অনুমতি ও প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিলেন। আমাকে একাদশবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া শত কলসে স্নান ও কোটী শিব পূজা করিতে হইবে, বা গঙ্গা আনয়ন করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা পাপমুক্ত হইতে পারিব। আহা ব্রাহ্মণগণ আজ অতিশয় সদয় ব্যবহার করিলেন! তাঁহাদের এতাদৃশ অনুমতিতে আজ আমার মনে অতিশয় আনন্দ বোধ হইতেছে। বল অহল্যা, তুমি নিরুত্তর কেন এত বিমর্ষ কেন?"

শিষ্য। কেন বিমর্ষ? হায় সরলচিত্ত সাধুগণ আসন্ন বিপদকে যে মঙ্গল বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন—তাহা কেবল বিধির বিড়ম্বনা মাত্র। মাতঃ, সেই

ব্রহ্মগিরির সানুদেশ সিংহব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। অহো কপট ঋষিগণ তোমাদের মনে এই ছিল। হে দুরাত্মগণ, তোমরা আজ এই দয়ার অধীর মহাত্মাকে ও এই দেবীপ্রতিমা সাধ্বী অহল্যাকে আজ স্বহস্তে বধ করিতে না পারিয়া, প্রকারান্তরে বন্যজন্তুর মুখে তুলিয়া দিলে!! আর এই কুসুম-কোমলাঙ্গী জননী অহল্যা সেই কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি, উত্তপ্ত প্রস্তরময় পথ ও বন্যজন্তুপরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল কেমন করিয়া অতিক্রম করিবেন ?”

দেখিতে দেখিতে মহাত্মা গৌতমের শিষ্য, প্রশিষ্য সকলে দলে দলে তাঁহাদের অনুগমন করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই এক মহান্ হাহাকার শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কি অহল্যা, কি শিষ্যগণ সকলেরই নয়ন হইতে দর্ দর্ করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। মহাত্মা গৌতম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই করুণ দৃশ্য পানে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিতে লাগিলেন “হে বৎসগণ, তোমরা এই আনন্দের সংবাদে এতদৃশ শোক করিতেছ কেন? আমরা কখনও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ নহি, একমাত্র ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এখনই প্রবল বায়ু আসিয়া, এই সকল বৃক্ষ ভগ্ন ও উৎপাটন করিয়া আমাদিগে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। অকস্মাৎ উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, আমাদিগকে ও বনস্থল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে। আচম্বিতে ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে, এই পৃথিবী এখনই বিদীর্ণ হইতে পাবে অথবা পাতালে প্রবেশ করিতে পারে। এই সকল দৈব-দুর্ঘটনা দৈবাধীন, যাহা দৈবাধীন তাহার জন্য অসংখ্য কেন? আমাদের মৃত্যুও সেইরূপ দৈবাধীন, এই দেখ বৎসগণ, কত সিংহ ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন এখানে দেখা যাইতেছে, এখনও যে অহল্যা ও আমি জীবিত আছি, এখনও যে আমাদিগকে বন্যজন্তুতে ভক্ষণ করে নাই তাহা কেবল ভগবানের অনুগ্রহ মাত্র। যাবৎ লোকের পরমায়ু থাকে তাবৎ ভগবান্ স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কেহই বিনাশ করিতে পারে না।” তখন মহাত্মা গৌতম সাদরে অহল্যাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন “অয়ি, কোমলাঙ্গি অহল্যে তুমি এত বিষণ্ণ কেন ?—তোমার কি আমার অনুগমন করিতে ভীত হইতেছে ?”

অহল্যা অতি ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, “দেহ গমন করিলে ছায়া অনুগমন করিয়া থাকে, তাহাতে ছায়ার কি কষ্ট উপলব্ধি হয় ? হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনাতে অচলা ভক্তি রাখিয়া, এই অধম স্ত্রীজাতি এ দেহের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারে।”

শিষ্যগণ, গৌতম ও অহল্যাকে সেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া অকারণ শোক পরিত্যাগ করিলেন ও সকলেই তাঁহাদের অনুগমনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহাত্মা গৌতম প্রফুল্লহৃদয়ে সকলকেই অনুগমানব জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া, স্বয়ং শ্রেণীর অগ্রভাগে গমন করিলেন; তৎপশ্চাৎ সাধ্বী অহল্যা, তৎপশ্চাৎ শিষ্য প্রশিষ্য সকলে গমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের কৃপায় একাদশ বাব ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে সুসম্পন্ন হইল। তখন সেই মহাত্মা গোতমের দেহ হইতে এক পবিত্র ভাব স্বতঃই স্ফুরিত হইতে লাগিল। যেমন কুসুমের সৌরভ, কুসুম হইতে বায়ুবক্ষে প্রবাহিত হইয়া চতুর্দ্দিকের দুর্গন্ধ বিনষ্ট করে, তেমনই সেই কৃতপ্রায়শ্চিত্ত গৌতমের পবিত্র শরীব হইতে, এক পাপ-বিনাশন-শক্তি, যেন তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া জগতের পাপ,—প্রতি পতিত জীবের পাপ, বিধৌত করিবার জন্য চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল। যেমন স্রোতস্বিনীর জল বর্ষাগমে কূল প্লাবিত করিয়া উভয় পার্শ্বের ক্ষেত্র সকল সেই জলে প্লাবিত করে, তেমনই সেই মহাত্মার পুণ্য-পবিত্রতা তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহে ও হৃদয়ে, স্থান না পাইয়া আপামর সকলের হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সাধ্বী অহল্যা ও তাঁহার সুশীল শিষ্য সকল দেখিলেন —বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী,—কি গিরি, কি প্রস্তর সকলই এক ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে কেমন একটী আহা-মরি ভাব—কেমন একটী মধুর ভাব সর্ব্বদাই হৃদয়কে অতুল আনন্দে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ব্যাধ, পক্ষী দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে তাহার সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট। এই অদ্ভুত পবিত্রতায় সেই বনস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা গৌতম শত কলসে স্নান করিলেন। তখন দিক্ সকল অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বায়ু ও সূর্য্যদেব অতি স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন! সেই বনস্থলীর শব্দও, সেই সৌন্দর্য্যের অনুকূল হইয়া সুমিষ্ট ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনের ন্যায় অতি মধুর ভাবে প্রতিহৃদয় প্লাবিত করিল। মহাত্মা গৌতম সেই খানে আসন-বন্ধন পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মহাত্মা গৌতম "শিবম্ অদ্বৈতম্" ভাবের সাধনায় বিশ্ব প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পবিত্রতা লহরে লহরে খেলিয়া যাইতেছে—প্রতি পাপী ও পাষণ্ডের মনেকেও, ক্ষণ কালের জন্য আত্মবিস্মৃতির স্রোতে ফেলিয়া, যেন কোন্

অজানাদেশে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাতে আবার অন্তদিকে,—হৃদয় মধ্যে এক অভেদ জ্ঞান। আসনে উপবেশন, পূজা, তৎপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনায়, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, ধ্যান ধারণায়, স্তব স্তুতিতে এক অভেদ জ্ঞান—"শিবম্ অদ্বৈতম্।" মুহুর্ম্মুহু প্রণিপাত-নিরত হৃদয় হইতে এক মহান্ সঙ্গীত গীত হইতেছে—"ওঁ নমঃ শিবায়", সেই সঙ্গীতে আমি তন্ময়,—তুমি তন্ময়, তাই জগৎ তন্ময়। এই কি সেই সঙ্গীত?—যখন প্রলয়ের জল তালে তালে নাচিতেছিল। পথহারা ব্রহ্মা "কে আমি?" "কোথাইতে আসিনু" এই এই প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইলে. এক মহান্ সঙ্গীত শুনিলেন! একি সেই সঙ্গীত?—যে সঙ্গীতে সৃষ্টি হয়—যে সঙ্গীতে প্রলয় হয়—যে মহান্ সঙ্গীতের উপর এই বিশ্ব নিত্য প্রতিষ্ঠিত,—একি সেই সঙ্গীত? তাহা জানি না; কিন্তু কি ক্ষিতি, কি অপ্, কি তেজ, কি বায়ু, কি আকাশ, সব সেই একই সঙ্গীতে এক সমস্বরে মিশিয়া যাইতেছে। নাসিকার আঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদ, চক্ষুর দৃষ্টি, ত্বকের স্পর্শানুভূতি ও কর্ণের শ্রবণ,—সবই সেই এক অনুভূতিতে, এক মহান্ সঙ্গীতের আনন্দরসে, মিশিয়া যাইতেছে। আর স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তের গতি যেন এক আনন্দময় স্রোতে পড়িয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে। আর তত্রস্থ কাননবাসী সকলে শুনিল যেন—ভ্রমণশীল ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দে সেই সঙ্গীত,—"ওঁ নমঃ শিবায়"। মধুমত্ত মক্ষিকার ঝঙ্কারে সেই গীত—"ওঁ নমঃ শিবায়"। বায়ু যেন কর্ণকুহরে অতি মধুর ভাবে গাহিয়া যাইতেছে—"ওঁ নমঃ শিবায়"। আর সেই পরম যোগীর হৃদয়ের নিভৃতনিলয়ে, মহান্ সঙ্গীত,—"ওঁ নমঃ শিবায়"। সে সঙ্গীত কে শুনিল?—সে সঙ্গীতে কাহার প্রাণ মাতিল? গৌতমের প্রাণ সেই মহান্ সঙ্গীতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গেল, তাহা কে জানে।

সেই মহান্ সঙ্গীত অতি মধুর স্বরে গীত হইয়া দেবদেব মহাদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইল। সেই ভক্তাধীন দেবতা সেই সঙ্গীত শুনিলেন—সেই করুণার আধার পরমপুরুষের প্রাণ সেই সঙ্গীতে বিচলিত হইল। দেবাদিদেব মহাদেব, দেবী পার্ব্বতীর সহিত, বৃষভ-বাহন আরোহণ করিয়া স্থূল দৃশ্য শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মহাত্মা গৌতমের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কি সুন্দর রূপ!—একদিকে কোটী চন্দ্রসম-প্রভ, রজত গিরি-সন্নিভ, বর-বপু, যেন সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নির্লিপ্ত ও আনন্দময়

অনুভূতি, শুভ্র-জ্যোতি রূপে, চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত করিতেছে; আর অন্যদিকে বিদ্যুন্মালার ন্যায় সুবর্ণ-বর্ণ-প্রভ চম্পক-কুসুমোপম মনোরম তনু, এই বিশ্বকে, স্নিগ্ধ জ্যোতিতে গুণ-রাগ-রঞ্জিত ও সেই আনন্দময় প্রকাশশীল করিয়া তুলিতেছেন; একদিকে ফণি-ফণাবিরাজিত রুক্ষ জটা-জাল যেন বিষয়-দোষ-দূষিত-ব্যক্ত বিশ্বকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর অন্য দিকে মণিমালা-বিভূষিত চিকুর-চাঁচর-কেশ যেন চঞ্চল ও উন্মত্ত বিশ্বকে বিষয়সম্পর্কে সম্পর্কিত করিয়া যম-নিয়মাদির বশীভূত করিয়া আনন্দতৎপর করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে ভাবে ঢুলু ঢুলু ঢুলু বিলোল-নয়ন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে বিশ্বকে লক্ষ্যহীন ও উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিতেছেন; আবার অন্যদিকে প্রেম-মাখা লজ্জাবনত আঁখি-যুগল হইতে দয়া, মায়া, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি কোমল ভাবরাশি প্রস্রবণের ন্যায় বিশ্ব প্লাবিত করিয়া দিতেছে। মহাত্মা গৌতম নির্ব্বাক্—নিস্তব্ধ! মহাত্মা গৌতমের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পুলকে প্রতিরোমকূপ কণ্টকিত হইয়া উঠিল—সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একান্ত অন্তরে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিলেন—আনন্দে সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন রুদ্ধ হইয়া গেল,—অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল-নয়ন দুটী কেবল মাত্র উন্মুক্ত রহিল। আর দর্ দর্ ধারে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তখন দয়ার অবতার দেবাদিদেব মহাদেব মধুর স্বরে বলিলেন, "বৎস, বর গ্রহণ কর।" গৌতম তেমনই একাগ্র-হৃদয়ে সেই মনোরম মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অতি দীন ভাবে বলিলেন "দেব, আমায় পবিত্র করুন।" সেই প্রেমের দেবতা মধুর হাসি হাসিয়া অতিশয় স্নেহভরে উত্তর করিলেন, "বৎস, তপোধন, তুমি চিরকালই নিষ্পাপ—তোমাকে দর্শন করিলে পাপীর পাপ দূরে যায়।" গৌতম পুনরায় বলিলেন, "আমাকে গো-হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত করুন।"

দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমি ত' গো-হত্যা কর নাই। ভগবান্ ছলনার জন্য গো-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীপরায়ণ ঋষিগণ বিঘ্নরাজ গণেশের আরাধনা করিয়া এই প্রকার বর লাভ করিয়া তোমায় এতদূর নির্য্যাতন করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলে লোকে নিষ্পাপ হইবে, কিন্তু সেই দুষ্ট ঋষিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধ হইতে পারিবে না।"

মহাত্মা গৌতমের হৃদয় বিস্ময়ে ও আনন্দে দ্রবীভূত হইল। একান্ত অন্তরে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, 'হে দেব! সেই ঋষিগণই ধন্য; কেন না তাঁহাদের কৃপাতেই আজ আমি আপনার প্রসাদ লাভ

করিয়া কৃতার্থ হইলাম, সেই ঋষিগণের প্রতি সদয় হউন।" তখন মহাত্মা গৌতম-হৃদয়ে যেন অপার-জীব করুণা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, "হে দেব! যখন জগতে আমার পাপ প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাহা ক্ষালন করা উচিত, আমায় গঙ্গা প্রদান করুন।" মহাত্মা গৌতমের এই প্রার্থনায় যেন এজগতের সমুদয় বদ্ধ ও পতিত জীবের কাতরোক্তি একসুরে বাজিয়া উঠিল।

মহাত্মা গৌতমের এতাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া সেই করুণাময় দেবতার সস্মিত বদন আনন্দে মেঘমুক্ত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব, এই পৃথিবীর যাহা সার,—সমুদয় স্বর্গের যাহা শ্রেষ্ঠাংশ,—মহেশ্বরের বিবাহ কালে—আহা, চৈতন্য-জননী যখন যখন নির্গুণ ঈশ্বরের সহিত সংমিলিত হইয়া লীলা-তরঙ্গ বিস্তার করিলেন, তখন সে গঙ্গা-বারি মহেশ্বরের নিকট হইতে ব্রহ্মা লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই অবশিষ্ট গঙ্গাবারি হস্তে লইয়া মহাত্মা গৌতমকে প্রদান করিলেন। তখন সেই সকলের তত্ত্বার্থ-রূপিণী গঙ্গাদেবী সৌম্যা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আকাশ মণ্ডল মনোরম জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া বিরাজমানা হইলেন। মহাত্মা গৌতম দেখিলেন "সুরূপ সুন্দর তনু মাল্য-গন্ধ-বিভূষিত, সুপ্রসন্ন সুবদনে সুন্দর নয়ন যুগল করুণার উৎসে, বিশ্বমাতাইয়া দিতেছে, কোটী-চন্দ্র-সমপ্রভা জ্যোতির্ম্ময়ী-তনু হইতে বিচালিত সুধা ধারায় ধরাতল অভিষিক্ত হইতেছে; মস্তকে শ্বেত ছত্র,—শ্বেত চামর উভয় পার্শ্বে আন্দোলিত; সুরাসুর ঋষিমণ্ডল ও ত্রৈলোক্যবাসী সকলে অবিশ্রান্ত প্রণিপাত করিয়া কৃতার্থ হইতেছে —ত্রিনয়না চতুর্ভুজার রত্নালঙ্কার ভূষিতা, বরাভয় মূর্ত্তি বিরাজমানা। কলি-কলুষ বিনাশ করিবার জন্য মহাদেবের আজ্ঞায়, সেই করুণাময়ী দেবী নদীরূপ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মগিরি হইতে অবতীর্ণ হইলেন, ও সেই ঋষিকে পবিত্র করিলেন, আর যাবৎ কলিযুগ থাকিবে তাবৎ পাপিগণের পাপ মোচনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সেই পুণ্য প্রবাহিনী গোদাবরী যেন শম্ভু-আরধনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতেই ধরাতল প্লাবিত করিলেন। তখন প্রেমাধীন দেবতা গঙ্গার কাতরোক্তিতে তাঁহার শম্ভু-বিরহ-সন্তাপ নিবারণ করিবার জন্য, সেই গোদাবরী-কোলে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'ত্র্যম্বকেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজমানা হইলেন। অপার দেব-করুণার স্থূল প্রকাশে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া সিদ্ধগণ, দেবগণ, ঋষিগণ সকলেই সেইখানে সমবেত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন সেই

তীর্থ, স্বর্গ অপেক্ষাও মনোরম হইয়া উঠিল ;—কেন না স্বর্গবাসী ও মর্ত্ত্যবাসী এমন কি পাপী ও পতিত জীব পর্য্যন্ত আজ একত্র হইয়া একই আনন্দে ও একই স্তব-স্তুতিতে যোগদান করিলেন।

মহাত্মা গৌতমের শিষ্যগণ ও অহল্যা, সকলে আসিয়া মহাত্মা গৌতমের চরণ বন্দনা করিলেন। গৌতম সকলকেই সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "তোমাদের শ্রম ও পরিচর্য্যা সার্থক হইল। সেই তপোবনবাসী ঋষিগণই ধন্য। তাঁহাদের পুণ্যেই আজ জগৎ পবিত্র হইল।"

অহল্যা। "যখন ঋষি ঋষি-পত্নীগণ তিরস্কার করিলেন ও লোষ্ট্র প্রহার করিয়া অপমান করিলেন, কেন তখন কাঁদিয়াছিলাম?—কেন তখন তাঁহাদের উপর অত দুঃখ করিয়াছিলাম? কে জানিত তাহার মধ্যে ভগবানের এত দয়া, এত করুণা লুক্কায়িত ছিল!

শিষ্যগণ কহিলেন। "আহা, ভগবান্ তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে? সেই স্ত্রীপরায়ণ ঋষিগণের আচরণে জগতের এতদূর মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা কে জানিত! আজ বুঝিলাম কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। সকলে জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই ভগবৎ-মহিমা প্রচার করিবার জন্যই কর্ম্ম-নিরত রহিয়াছে।"

সকলে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সেই তপোবন-বাসী ঋষি সকল পত্নীগণের সহিত স্নান করিবার জন্য আগমন করিলেন। তাঁহারা আসিয়া যেমন সেই পবিত্র গঙ্গাবারি স্পর্শ করিলেন, হরি! হরি! অমনি গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। আর সেই ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের সর্ব্বাঙ্গ ও হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কেন ঋষিগণ?—কি জন্য এত বিহ্বল হইয়া পড়িলে?—কোথায় তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি?—কোথায় তোমাদের আত্মাভিমান? কি যেন এক মহান্ দর্পণ তাঁহাদের সম্মুখে ;—আর সেই দর্পণে, তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতে লাগিল!—স্ত্রীগণের কপটতা, ঋষিগণের স্ত্রৈণতা, সরল-চিত্ত গৌতমের উপর অত্যাচার—ভোগ-সুখের মমতা—তাঁহাদের বৃথা গর্ব্ব ও আত্মাভিমান। সব এ ককালে তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল ; শত কর্ম্মের অনুশোচনা যেন শত সহস্র বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতে লাগিল। আর সেই সদাশয় ঋষি গৌতম, সম্মুখে দণ্ডায়মান—তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাদেবীর স্তুতি করিতেছেন। এ দৃশ্য তাঁহাদের পক্ষে আরও ভয়ানক! আজ যদি গৌতম ঋষিদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিতেন, আজ যদি

তিনি তাঁহাদিগকে লোষ্ট্র-প্রহার করিতেন, তবে তাঁহাদের এই চিত্ত-ক্লেশের বোধ হয় কিছু লাঘব হইত। কিন্তু সেই অপকৃত, অবমানিত, তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত গৌতমের এই সদয় ব্যবহারে তাঁহারা যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দর্শন করিতে লাগিলেন—যেন নরকের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিয়া মুহুর্মুহু ত্রাসিত হইতে লাগিলেন। কেন মা গঙ্গে পতিতজীবের প্রতি তোমার এত নিগ্রহ ! !—না না—ইহাই জগতের নিয়ম ;—যে অগ্নিতে সুবর্ণ সুন্দর হয়, সেই অগ্নিতে কাষ্ঠ অঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন দৈববাণী হইল "উহারা কৃতঘ্ন, বৃথা তাপস-বেশধারী, অভিমানী ও অসমীক্ষকারী, আমি উহাদের মুখ-দর্শন করিব না।" মহাত্মা গৌতম ভক্তিগদগদ স্বরে ও স্তুতি-পূর্ণ-বাক্যে উত্তর করিলেন, "মাতঃ। প্রসন্ন হউন ; স্বয়ং মহাদেব আপনাকে, সকলকেই উদ্ধার করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন ; আপনার তাঁহার বাক্য মিথ্যা করা উচিত হয় না।" এদিকে সর্ব্বতত্ত্বার্থরূপিণী ও তপঃ সিদ্ধির ফলস্বরূপিণী গঙ্গা এ প্রকারে বিমুখ হইলে ব্রাহ্মণগণ যেন হতশ্রী ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া গেলেন—সাহস, উৎসাহ, উদ্যম, ও তৃপ্তি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। এই স্থূল দেহেই যম-যাতনা ভোগ হইতে লাগিল। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "হে গৌতম, উহারা তোমার প্রতি যে আচরণ করিয়াছে, তজ্জন্য একশত একবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিলে, তবে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।" তখন মহাত্মা গৌতম তাঁহাদিকে সেই প্রকার উপদেশ দিলেন। তখন সকলেই বলিতে লাগিলেন "ধন্য মহাত্মা গৌতম ! তুমিই ধন্য। পতিত ও নারকী জীবের যে গঙ্গা-স্পর্শে অধিকার, আজ আমরা জপ, হোম ও ত্রিসন্ধ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও সেই গঙ্গা-স্পর্শের অধিকারী হইতে পারিলাম না। হায় ইহা আমাদেরই দুষ্কর্ম্মের ফল !" তখন ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে পত্নীগণের হস্ত ধারণ করিলেন। সেই ঋষিপত্নীগণ তখন অধোবদনে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর অহল্যার প্রতি মিথ্যা-দোষারোপে তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে এক নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত করিয়াছে। অবশেষে অতিশয় ব্যাকুল চিত্তে তাঁহারা ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তখন সেই ঋষি ও ঋষিপত্নীগণের চিত্ত লজ্জায়, দুঃখে ও ভয়ে বিকল হইয়া উঠিল। এক শত এক বার ব্রহ্ম-গিরি প্রদক্ষিণ করিয়া আবার যে ফিরিয়া আসিবেন—আবার যে এই গোদাবরীর পূর্ণ-সলিল স্পর্শে পবিত্র হইবেন, সে আশা কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না। তবে, আপামর-চণ্ডাল ও মনুষ্যগণ যে

অধিকারে অধিকারী—যে গঙ্গা-বারি স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতেছে,—আজ তাঁহারা সেই অধমদিগের অধিকার হইতে চ্যুত হইলেন,—তা'ই ভাবিয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই কোমলাঙ্গী রমণী-গণের সহিত গমন করিতে করিতে, তাঁহাদিগকে অশেষ-বিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিতে করিতে, সেই রমণীগণের চরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। স্বামিগণের অনুবর্ত্তিনী হইয়া প্রতি পদ-বিক্ষেপে,—প্রতি শোণিতাক্ত পদে, দেহাত্ম-বুদ্ধিকে পদ-দলিত করিতে লাগিলেন। কখন প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে মৃতবৎ, কখন বা অনাহারে ও তৃষ্ণায় মুমূর্ষুর ন্যায় হইয়া পড়িলেন। যতই সেই সকল বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্যে পতিত হইতে লাগিলেন, ততই শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আবার রজনীতে সিংহ ব্যাঘ্রের গভীর গর্জ্জন! জীবনের আশা ও আত্ম-রক্ষার উৎসাহ তাঁহাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করিল। দৈব দুর্ঘটনার এই সকল করাল মূর্ত্তি দেখিয়া ও অনাহারে, অনিদ্রায় তাঁহাদের জীবন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিল। উদ্যম, উৎসাহ ও সহিষ্ণুতা মুমূর্ষুর জীবনী-শক্তির ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তখন নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, ভগবানকে স্মরণ করিয়া নানা প্রকার স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। অতীত জীবনের ঘটনা সকল স্মরণ করিয়া বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা গৌতম গঙ্গাদেবীর আদেশে কুশাবর্ত্ত নামে এক তীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই তীর্থ অতিশয় মনোরম হইল। সেই স্থানে গৌতম ও শিষ্যগণ কিয়দ্দিন বাস করিলেন। একদিন অহল্যা ও গৌতম গোদাবরী তটে স্নান ও শিবপূজাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সেই নদীতটে অবস্থান করিতেছেন; এমন সময় অহল্যা, মহাত্মা গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, এই গোদাবরী সলিলে বহুলোক স্নান ও শিব আরাধনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছে, কিন্তু সেই তপোবন-বাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীদিগকে অদ্যাপি ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম না। আহা, একশত একবার গিরি প্রদক্ষিণ করিয়া আর কি তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন? আর কি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব? কেন গঙ্গাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধি লঘু করিলেন না?"

গৌতম। "দেবতারা আমাদের অপেক্ষাও দয়ালু। কাহার কেমন করিয়া৹

হিত-সাধন করিতে হয় তাহা তাঁহারাই জানেন। আমাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না।"

অহল্যা। "আহা, তাঁহাদের কি অপরাধ?—বিঘ্নরাজ গণেশ যদি বর-দান না করিতেন—ভগবান যদি সেরূপ ছলনা না করিতেন, তবে এই দুর্ঘটনা কেন ঘটিবে। যদি তাঁহাদের একজন পথ-ক্লেশে প্রাণত্যাগ করেন, তবে আমাদের চিরকালের জন্য দুঃখ থাকিয়া যাইবে। লঘুপাপে গুরু দণ্ড তোমার বিধান করা উচিত হয় না। গঙ্গাদেবী এই গুরুদণ্ড বিধান করিয়া তোমাকেই পরীক্ষা করিয়াছেন।"

গৌতম। "না অহল্যা। ব্রাহ্মণের পাপ কখন লঘু হয় না। ব্রাহ্মণ ভগবানের হৃদয়—ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণের উপরই জগৎ প্রতিপালন ও পতিতের পাপ মোচনের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। যেমন ধনীর ধর্ম্ম ধন বিতরণ করা, যেমন প্রবলের ধর্ম্ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করা—স্বামীর ধর্ম্ম স্ত্রীকে প্রতিপালন করা, তেমনই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হৃদয়ে হৃদয়ে ধর্ম্মবুদ্ধি ও ভগবৎ-ভাবকে উত্তমরূপে পরিস্ফুট করান। একদিকে দেবগণ ও অন্যদিকে আচণ্ডাল বিশ্ববাসী, মধ্যে ব্রাহ্মণগণ দেব ও বিশ্ববাসীর সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া দণ্ডায়মান। সুতরাং তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর, পাপও গুরুতর এবং দণ্ডও গুরুতর। তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, ভোগের দ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে; এবং তজ্জন্য কিছুকাল অতিবাহিত হইবে। কালপূর্ণ না হইলে বাঞ্ছিত বস্তুলাভ হয় না। প্রিয়ে! বৃথা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত হয় না।"

অহল্যা। "এজগতে ভগবানের নিয়ম ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। যে ব্রাহ্মণগণকেই এই মহামঙ্গলের মূল কারণ করিলেন, আবার তাঁহাদেরই এই গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত!

গৌতম। শুন অহল্যা,—

মাহাত্মা গৌতম দেখিলন সেই তপোবনবাসী ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ সকলে স্নান করিয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিতেছেন। মাহাত্মা গৌতম তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন "হে ঋষিগণ! অয়ি ঋষিপত্নীগণ! এই হতভাগ্য গৌতমই আপনাদের এই ক্লেশের কারণ। অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

তখন সেই ঋষিগণ আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না; আনন্দে ও একান্ত কৃতজ্ঞতায় দ্রবীভূত হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে

মহাত্মন্! তোমার ন্যায় মহৎ ভিন্ন এরূপ বাক্য আমাদের ন্যায় অধমের প্রতি আর কেহ কখনও বলেন না। স্বর্গাভিলাষী দেবগণও দ্বেষ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভবদীয় চরিত্রে দ্বেষ বা রাগের লেশ মাত্র নাই। হে মহাত্মন্, আপনার চরিত্র স্বর্গস্থ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র। আপনাকে ধন্য! আপনার সহিষ্ণুতাকে ধন্য! আমরা যে আপনার সহিত শক্রতা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাদের ও আমাদেব পত্নীগণের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এই ক্ষমা ভিক্ষা এখন নিষ্প্রয়োজন। কারণ অগ্রেই আপনি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছেন। আবার, এই অধম ব্রাহ্মণগণকে পাপ মুক্ত করিবার জন্য---শক্রগণের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আপনার সমস্ত তপস্যার ফলকে যে প্রয়োগ করিলেন—তাহাতেই এই তপঃসিদ্ধিরূপিণী পতিত-পাবনী গোদাবরী-গঙ্গা—প্রবাহিত হইল; আর আচণ্ডালনর লোক নিষ্পাপ হইয়া আপনার স্তুতি গান করিল! আর, যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর বিদ্যমান থাকিবেন, তাবৎ এই ত্র্যম্বকেশ্বর লিঙ্গ গোদাবরী-কোলে বিরাজমান থাকিবেন, তাবৎ এই অধম ব্রাহ্মণগণের ত্রুকৃতি ঘোষণা করিবে। ইহাই আমাদের সারা জীবনের তপস্যার ফল—ইহাই আমাদের এখন একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। হে-গৌতম, হে অহল্যা, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

তখন ঋষিপত্নীগণ বলিলেন, "হে অহল্যা, তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি—কত উপহাস করিয়াছি, কত শক্রতা করিয়াছি—তুমি তাহার উপর আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছ—কিন্তু এখন আমরা তাহাতে সুখী নই—তুমি একবার আমাদের তিরস্কার কর—আমাদের গাত্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর—ঐ দেখ অহল্যা। এই ব্রহ্মগিরির প্রস্তরাঘাতে—আমাদের চরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় তাহাতেও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।"

অহল্যা। "হে ভগিনীগণ! আমি তোমাদের জন্য ঐ বৃক্ষতলে কতদিন আসিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিয়া গিয়াছি। মনে হইত তোমরা এই পথশ্রমে আর জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে না—আর দেখা হইবে না—কেন তোমাদের উপর দুঃখ করিয়াছিলাম—কেন তখন লোষ্ট্র প্রহারে ব্যথিত হইয়াছিলাম, কে জানিত যে সেই তিরস্কারের মধ্যে জগতের এত খানি মঙ্গল লুকান ছিল। তাই সেই তিরস্কার, সেই-লোষ্ট্র প্রহার—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাস—ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ আজ এত সুখের বলিয়া মনে হইতেছে। ভগ্নীগণ! আজ আমরা অকপট হৃদয়ে ও ভক্তি ভাবে এই পুণ্যপ্রবাহিনীকে ও ত্র্যম্বকে-

শ্বরকে প্রণাম করি। আর আমাদের হৃদয়ে যেন চিরকাল এই জ্ঞান থাকে যে এই গোদাবরীর আবির্ভাব ও মহেশ্বরের লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠান তোমাদের পুণ্যের জন্য নয়, মহাত্মা গৌতমের তপস্যার জন্যও নয়, ইহা কেবল শ্রীভগবানের পতিতোদ্ধারিণী শক্তির লীলা ও মহিমা বিস্তারের জন্য —ইহা ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু পতিত-পাবন ভগবানের অনন্ত-জীব-করুণার অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্তম্ভ।

'দিশেহারা'

প্রার্থনা।

যদি কভু মোহের সে রঞ্জিত বিচিত্র
—রূপে, হতভাগা মন ভুলিয়া পবিত্র—
—সে প্রেম-মধুর দৃষ্টি, ধায় অন্য পানে
হে প্রভু বিশ্বের নাথ! ক্ষমিও অধীনে।
সংসার-'সাহারা' মাঝে যদি বারিভ্রমে
মায়া-মরীচিকা হেরি সতৃষ্ণ নয়নে
—যদি ধাই, অসংযত চপল মনের
অবিবেক কর ক্ষমা এ দীনহীনের।
তবু জেনো, মহারাজ! তোমারেই খুঁজি
বিপথে হারাই পথ, দুরাশায় মজি;
তোমারি লাগিয়া ফিরি, না পাই সন্ধান;
অজ্ঞান-তমসা আছে আবরিয়া প্রাণ।
তা'ই নাথ! ক্ষমা কর, ধরি পদ দুটী
কত মিথ্যা মোহ মায়া অপরাধ-ত্রুটি।

শ্রীলীলাদেবী।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] ভাদ্র ও আশ্বিন; ১৩২২। [৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।

এস—১।

এসগো এস আজি ফুলরাজি নতশির
তোমার আগমনে শুভক্ষণে সব-স্থির,
ত্রিদিব আলো ক'রে তব তরে শশধর
সমীর বহে ধীরে থরে থরে সুখকর।
তোমার তরে এযে ফুললাজে পথ-ঘাট
নাচিছে ধানভরা দিয়ে সাড়া ক্ষেতমাঠ।
কলসী কাঁথে লয়ে নারী ধেয়ে আগুলিতে
ঢোলক কাঁশীরবে শিশু সবে একচিতে।
বসন নব পরি হাত ধরি হাসে বিশু
তোমার তরে এযে এসে সেজে নাচে শিশু।
আজিকে জাগরিত মুখরিত সব স্থান
শুনিছে একচিতে হরষিতে তব গান
এসগো এস, তারা দুঃখ-হরা ভাঙ্গাঘরে
লভিবে নবপ্রাণ সব জন তব বরে॥

শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস—ই।

"হৃদয় দেবতা আসিল কি মোর
শঙ্খ বাজে কি তাই ?
"আরতির দীপ থাকিয়া থাকিয়া
জ্বলিয়া উঠে কি তাই ?
ধূপের গন্ধে দিগ্‌দিগন্ত
ভরিয়া উঠেছে আজ
আম্র-মুকুল গন্ধে আকুল
কুহরে বিহগরাজ ॥
চৌদিকে আজি ফুটে উঠে ফুল
কাহার পাইয়া সাড়া,
গগনে অগণ্য দীপালির মত
চমকে চন্দ্র-তারা ?
সকল হৃদয়ে বসন্ত উদিল
মলয় বহিছে ধীরে,
এতদিন পরে প্রবাস হইতে
সখা কি আসিল ফিরে ?
যদি এসে থাকে, বন্ধু আমার,
মাধুরী নয়নে মাখা
গোপন আবাসে ডেকে নিয়ে তা'রে
(সেথা)—প্রাণে প্রাণে হ'ক দেখা ॥

লুটায়ে পড়্‌রে হৃদয় আমার
লুটাও চরণতলে
সখা যে এসেছে লইতে আমায়
আপন বক্ষে তুলে ॥
ফেলে দেবে আজি, দূরে ফেলে দেরে
সকল চিন্তা কর্ম্ম
কি করুণ সুরে বেজে উঠে বাঁশী
ছিঁড়িয়া সকল মর্ম্ম ॥
অশ্রুধৌত হৃদয়ে তাঁহারে
বসাও আদর করে
কতদিনকার কত যে বেদনা
সব যাক্ দূরে সরে।
মধু করে উঠুক্ অনল অনিল
মধু ক্ষরে যেন সলিলে
ফুলে ফুলে মধু ভরিয়া উঠুক্
গন্ধে ব্যাকুল মুকুলে।
(সব) হৃদয়ে হৃদয়ে মধু বরষণ
হউক অজস্র ধারে
মাতৃস্তন্যে সুখে ও দৈন্যে
ঝরুক অমৃত অঝরে ॥

ধনী ও নির্ধন।

(১)

তোমার সকলি আছে।

আছে ধন জন, মান, নাম,
ভক্তি, মুক্তি, শক্তি, আরাম,
রূপ-মহিমা, জ্ঞান-গরিমা
প্রভু হে! সকলি আছে।

(২)

তোমার সকল আছে।

দশ দিশে হাসি, আঁধারে আলোক,
বিশ্বে শান্তি, দৃশ্যে পুলক,
পলকে সৃষ্টি, সকলে দৃষ্টি,
আছে ত' সকল আছে।

(৩)

তোমার সকল আছে।

বিনীত দয়িত, শক্ত সেবক,
ভৃত্য বিনত, ভক্ত সাধক,
বলিতে, "কাঙাল তরিতে দয়াল,"
প্রভুহে! সকলে আছে॥

(১)

আমার কিছুই নাই।

নাহিক অর্থ, নাহিক জ্ঞান,
রূপ, গুণ নাহি, কুল, শীল, মান,
নাহিক শক্তি, নাহিক ভক্তি,
নাই গো! কিছুই নাই।

(২)

আমার কিছুই ত' নাই।

মরমে সরম, জগতে জয়,
জীবনে তৃপ্তি, অন্তরে নয়,
সাধনে সিদ্ধি, কর্ম্মে ঋদ্ধি,
নাই ত, কিছুই নাই।

(৩)

আমার কেহই নাই।

সহৃদয় সখা, সহায় দোসর,
বিপদে সম্পদ, স্নেহের দোসর,
দুঃখী বলিতে, দুঃখ করিতে,
আমার কেহ যে নাই!!

'প্রসাদ'

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাগবতের ভগবান্।—১

আমরা দেখিয়াছি যে 'ভাগবত শাস্ত্র' নামক অধিকারে উপনীত হইলে জীব শ্রীভগবানকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারে। সেইজন্য ভাগবত শাস্ত্র এমন কৌশলে উপদেশ দিয়াছেন, যে শান্ত হৃদয়ে তদ্দ্বারা ভগবানেরই স্বরূপ-স্ফুরণ আরম্ভ হইবে। আর এখন জীব "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া ধর্ম্মের

স্বরূপ জানিতে চাহে না ; সে বুঝিয়াছে যে বিশ্ব একটী অবয়ব মাত্র,—উহা একেরই অভিব্যক্তি, একেরই খেলা। 'ধর্ম্ম' শব্দে শাস্ত্র ভগবানের মহান্ অবয়বী ভাবের ইঙ্গিত করেন। পাঠক বুঝিয়া দেখুন হিন্দু-অভিধান-অভিমানী আমাদের এই স্তরের শিক্ষালাভ হইয়াছে কি না? বলুন সামান্য চটক পক্ষীর মৃত্যু হইতে সূর্য্যমণ্ডলের প্রলয় পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই একের অভিব্যক্তি দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? আহারের সময় কি বুঝিতে পারেন যে উহা একেরই জন্য? সন্তান উৎপাদনকালে কি বুঝিতে পারেন যে "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্প"? যেমন আপনার শরীরের প্রত্যেক কার্য্য ভিতরের অবয়বী ভাবের প্রাণে দ্বারা সাধিত হয়, যেমন প্রত্যেক অঙ্গের যাহা কিছু করা হয় বা সাধিত হয় সকলই একমাত্র আপনার "আমি"র ইঙ্গিত করে, তদ্রূপ প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারেও সেই একের অভিব্যক্তি হয়। যেভাবে প্রত্যেক ব্যাপারেও সেই একেরই বিলাস বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে আর জগতে কোনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভাবটীও অসংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধবিহীন বলিয়া অনুভূত না হয় সেই ধারণশীল ও বহুর খেলায় একের প্রকাশশীল ভাবকে ধর্ম্ম বলে। পক্ষান্তরে এই ভাবটী স্ফুরিত করিবার জন্য, বিপরীত ক্রমে হিন্দুর জীবনকে ভগবানময় করিবার জন্য, নিষেক হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে ভগবানকে আনিবার নিমিত্ত যে শাস্ত্রের প্রয়াস তাহাকে 'ধর্ম্মশাস্ত্র' বলে। নিষেকের পূর্ব্বে গর্ভাধান অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি একবার পড়ুন, দেখিবেন কেবল ভোগের জন্যই প্রযুক্ত অসংযত কামভোগ হিন্দুর গ্রহণীয় নহে। সংসারের জীবস্রোত রক্ষার জন্য, আপনাতে প্রজাপতির অধিষ্ঠান সাধনপূর্ব্বক, ভগবতপ্রসাদে সন্তানোৎপাদনের নামই গর্ভাধান। এই প্রকারে অনুষ্ঠানসমূহ সুসম্পাদিত হইলে জীব বুঝিতে পারে যে তাহার সমস্ত চেষ্টা, অভিব্যক্তি, ক্রিয়া, সকলই ভগবৎভাবে তাঁহার প্রকাশ-ভাবের মহিমা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োগ করাই হিন্দুর ধর্ম্ম। আর লোভের বশে থাইলে চলিবে না—তমসাচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইলে চলিবে না। আহারের সময় আপনাকে বৈশ্বানররূপে কল্পনা করা চাই ও সেই বৈশ্বানরে সর্ব্বের জন্য আহুতি দেওয়া চাই। যিনি বিশ্ব ও নর (World and the Indviidual) রূপে প্রকটিত হয়েন, তিনিই বৈশ্বানর। সুতরাং এমন করিয়া আহার করিতে হইবে যাহাতে বিশ্বের এতটুকুও মঙ্গল সাধিত হয়। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিলেন—"তে পচন্তোঽঘং পাপাঃ যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" অর্থাৎ যাহারা কেবল নিজের জন্য অন্ন পচন করে, সেই পাপাত্মাগণ কেবল ও পাপময় অন্নই

ভক্ষণ করিয়া থাকে। আর মোহবশে ঘুমাইলে চলিবে না,—যদি সমস্ত শক্তি-গুলিকে আপনার ভিতরে আমির সহিত মিশাইয়া দিয়া, তোমায় জগতের দ্রষ্টা স্বরূপ হইয়া ঘুমাইতে পার, তবেই বলিব তুমি আর্য্যের ন্যায় ঘুমাইতে শিখিয়াছ। ইহাই 'শয়নে পদ্মনাভ' শব্দে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পরে যোগশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব সিদ্ধ করিতে হইবে। আজকাল তোমরা সকলেই যোগী। কিন্তু যোগের মূল ভাষাটি কি জান? আমির ভিতর যে 'দ্রষ্টা আমি' আছে,—যে ফুটিলে একমাত্র পুত্রবিয়োগ ও তোমার রাজ্যাভিষেক কেবল স্বপ্ন-দ্রষ্ট খেলার মত মনে হয়, সেই আমিকে আত্মা বলে। আর বাহিরে সুখশান্তি ও অস্তিত্বের কণা খুঁজিলে চলিবে না। যিনি আমির বাহিরে স্থিত কোনও বস্তু বা শক্তির উপর সুখ ও অস্তিত্বের আশা ন্যস্ত করেন, তিনি এখনও যোগী হইবার উপযোগী হয়েন নাই। বাহ্যদৃষ্টিও অসন্তুষ্ট হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মের সাহায্যে বাহিরের খেলা সমূহকে সেই অবয়বীরই ভাবমাত্র বলিয়া বুঝা গেল; খেলার ভিতর সার্ব্বজনীন শৃঙ্খলা ও একত্বের আভাস পাওয়া গেল। কাযেই ব্যস্ত ও চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই। যোগের সাহায্যে বুঝিতে পারা গেল যে, সেই অবয়বী কেবল অবয়বের খেলা লইয়াই থাকেন না, তিনি আমার আমি-স্বরূপ,—তিনি আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব—তিনি আমার নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্ব। অথচ আমার আমিটী সসীম, তিনি যে অসীম; আমার আমিটী আনন্দময় বটে, বিকারার্থে, আর তিনি যে প্রকৃত ও ঘন আনন্দের সনাতন উৎস। তখন প্রাণের ভিতর এক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে; এমন কি স্থিতপ্রজ্ঞ আমির এই শান্ত পরিপূর্ণ ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে না জানি কতই মধুর 'কতই শান্ত', তখনই জীব ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারী হয়।

তবে ভাগবতের ভগবান্ কে? জলদগম্ভীর স্বরে ভাগবত বলিলেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ১।২।১১

গীতামুখে ভগবান্ বলিলেন—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৩।১৭।

বঙ্গের নদিয়া নগর হইতে মহাপ্রভু বলিলেন—"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্র-নন্দন।" সুতরাং সকলের উক্তি এই যে "চিদানন্দঘন অদ্বয়" এক সত্তা

আছে ও তাহাকেই ভগবান্ বলে। তাহাত' হইবার কথাও বটে। জ্ঞানই একমাত্র নিত্যসিদ্ধ, জ্ঞানই (consciousness) সর্ব্ববস্তুর সর্ব্বভাবের পরিসমাপ্তি। কিন্তু ইহাতেও কিছু বেশী বুঝা গেল না! দেখা যাউক শ্রীজীব গোস্বামীপাদ এ বিষয়ে কি বলেন। তিনি বলিলেন, 'ভগবান্ জ্ঞান'-স্বরূপ বা চিদেকরূপ; উহা অদ্বয় কেননা স্বতঃসিদ্ধ এবং তদ্রূপ বা তাহার বিপরীত আর কোনও তত্ত্ব নাই। এই একতত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে লক্ষিত করা হয়। যাহারা 'পারমেষ্ঠ্যাদি' অধিক ও অধিকতর আনন্দময় পদ সকল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, সেই পরমহংসগণের সাধনে ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যভাব হইলে, ভগবানের শক্তির অংশ ও তাহার বৈচিত্র্য প্রভৃতির অভিমুখে যখন দৃষ্টি না থাকে, তখন সর্ব্বশক্তির আশ্রয়রূপ ভগবানের যে বিশেষ ভাব আছে সেই ভাব গ্রহণ না করিলে—সুধু একত্ব অংশে চিত্ত স্থির হইলে, তাঁহাকে 'ব্রহ্ম'রূপে বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ চৈতন্যের সমস্ত ভাবের উপর যাঁহাদের চিত্ত পরিনিষ্ঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয়ে আর বিশেষের পিপাসা নাই, তাঁহারা দেখিতে পান যে তাঁহাদের আত্মাকে ওতপ্রোত করিয়া একঘন একরস সত্তা আছে। "জ্ঞানং চিদেকরূপং, অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশ-অতাদৃশ তত্ত্বান্তর অভাবাৎ। * * * তদেকমেবাখণ্ডাস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃৎপারমেষ্ঠ্যাদিকাদিকানন্দসমুদ্দয়ানাম্ পরমহংসানাং সাধনবশাৎ তত্তাদাত্ম্যমাপন্নে সতি তদীয় স্বরূপশক্তি-বৈচিত্র্য গ্রহণাসমর্থে চেতসি * * * ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।" আর যাঁহারা ব্রহ্মানন্দপরায়ণ ভাগবতপরমহংসগণ, সেই সামান্য ভাবের অভ্যন্তরে শক্তির মাত্রা সংরক্ষণ করত ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বাহিরে ও ভিতরে প্রকাশিত, অথচ স্বশক্তির সহিত অভেদভাবে স্থিত, বিশেষভাবে চিত্ত স্থির করেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে তিনি জীবের আমি-স্বরূপ হইলেও পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বলিয়া আমি হইতে বিশিষ্ট, এইভাবে তাঁহাকে ভগবান্-শব্দে লক্ষিত করা হয়। "তাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবত পরমহংসানাং তথানুভবৈকসাধক তম তদীয় স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তিভাবিতেষন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্বিবিক্ততাদৃশশক্তিশক্তিমত্ত্বভেদেন প্রতিপাদ্যমানং ভগবানিতি শব্দ্যতে ইতি।" শক্তিবর্গ লক্ষণের ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের অতিরিক্ত, কেবল, জ্ঞানরূপ ভাবকে ব্রহ্ম কহে, আর অন্তর্যামী মায়াশক্তিবিশিষ্ট চিৎশক্তি ভাবকে পরমাত্মা কহে, আর পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভাবকে ভগবান্ বলে। "তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি

শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ-সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি।" (ভাগবত-ভাষ্য)।

ভাগবত অন্যত্র এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বাক্যসমূহের অর্থোপলব্ধির সাহায্য হইতে পারে। একাদশ স্কন্ধে, উদ্ধবের প্রতি উপদেশ সময়ে, শ্রীভগবান্ কহিলেন :—

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞক্ষেত্রচোদনাম্॥ ১৫
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনোময্যাদধদ্‌যোগী মদ্ধর্ম্মা বশিতামিয়াৎ॥ ১৬
নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥ ১৭ [ভাগ ১১।১৫]

চিত্ত ত্রিগুণাত্মিকা 'সর্ব্ব'ভাব-প্রবণা মায়ার অধীশ্বররূপ বিষ্ণুভাবে স্থির করিলে সাধক জীবভাব ও জীবের উপাধি সকলের প্রেরণাশক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি করিবার অধিকার লাভ করিতে পারেন না। তুরীয় নারায়ণ-রূপ ভগবৎ শব্দদ্বারা ইঙ্গিত পরম ভাবে চিত্তস্থির করিলে যোগী বশীতা-সিদ্ধি লাভ করেন, এবং মায়ার সহিত সম্বন্ধহীন নির্গুণ ব্রহ্মভাবে চিত্ত ধারণা করিলে সাধকের পরমানন্দ ও কামাবসায়ীতা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদিগের গ্রাম্য ভাবের ভিতর দিয়া তত্ত্বটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। সকল জীবই আপনাকে 'আমি' বলে, কিন্তু সকলেই একতত্ত্বকে 'আমি'শব্দে লক্ষিত করে না। 'আমি অমুক' ইত্যাকার ভাবেই, আমাদের 'আমি'জ্ঞান থাকে। 'আমি অমুক' একথায় আমরা কি বুঝি? শরীর প্রভৃতির অবয়বীভাব আপনাতে আরোপ করিয়া আমিটিকে দেখিতে যাই। ইহাই ধর্ম্মের স্তর। এই স্তরে থাকিলে বাহিরের সর্ব্বের সহিত ভিতরের 'আমি'র সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং এ অবস্থায় 'জীবের উন্নতি' শব্দে শক্তির বিকাশই বুঝায়। এই শক্তির সাহায্যে 'সর্ব্বের' সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; এবং যাঁহার যত অধিক শক্তি তাহাকে সাধারণ জীব তত উচ্চ বলিয়া বিবেচনা করে। সনাতন ধর্ম্ম এ ভাবের পোষকতা করেন না। সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ থাকে, থাকুক্, তাহাতে বড় আসে যায় না। তবে ঐ সম্বন্ধের ফলে কোন্ তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহা লইয়াই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার। 'আমি যোগী', 'আমি ইন্দ্র,' 'আমি ব্রহ্মা' ইত্যাকার বুদ্ধির উন্মেষ হইলে সেই জীবকে নিকৃষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'আমি ও জগৎ' এতদুভয়ের

ক্রীড়াসমূহের অভ্যন্তরে, জীব যদি এক মহত্তর জ্ঞানঘন কতকটা 'আমি'র মত অথচ 'আমি'র পরিপোষক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ "বড় আমির" সত্তানুভব করিতে সমর্থ হয়, তখনই ভগবানের আভাষ প্রাপ্ত হয়। এই আভাষের উন্মেষ করিবার নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রে অনুষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থা। দয়ার কার্য্য করিলে সাধারণ জীব আপনাকে দয়ালু ব'লয়া বুঝিতে পাবে। দয়াটী যে তাহার আমির-ধর্ম্ম ও সেই জন্য তাহার আমিটী যে সাধারণ জীব হইতে উচ্চে উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়াই সামান্য সাধকেরা ক্ষান্ত হয়। সে ক্ষুদ্র অহঙ্কারের বশে দয়ার ভিতরে সর্ব্বাত্মিকাভাবের বিকাশ দেখিতে না পাইয়া, দয়াটীকে ছিন্ন আমির সহিত যোগ-করিয়াই গর্ব্বিত হয়। 'আমি ভোগী,' 'আমি যোগী,' 'আমি দয়ালু' প্রভৃতি ভাবে ছোট আমিকে লইয়াই ব্যস্ত। সে ভগবানের আরাধনা করিতে পারে; তাহার সেই আরাধনা কেবল ক্ষুদ্র আমিটীকে ফুটাইবার জন্য, কিন্তু যে রসিক সে বুঝিতে পারে যে দয়া অর্থে—সকল জীবের সহিত তাহার আমির একত্ববাচক তত্ত্বকেই বুঝায়। রামের 'আমি' আমার মতনই, এইজন্যই আমি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রামকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে যাই, এবং অস্পষ্টরূপে বুঝিয়া ফেলি যে রামের 'আমি' ও আমার 'আমি' এবং বাহ্যবস্তু ও শক্তিনিচয়কে ব্যাপ্ত করত কি এক প্রকাণ্ড, সর্ব্বব্যাপী, কিয়ৎপরিমাণে 'আমির' মত, অথচ আমির প্রেরক কি এক তত্ত্ব আছে; তাঁহার খেলার বাহির ভিতর এক হইয়া কি জানি কেমন ঘন আনন্দময় হইয়া যায়। সেই ঘন আনন্দে ক্ষণকালের জন্যও ছোট 'আমি' সমূহ ডুবিয়া যায়। এই তত্ত্বকেই শাস্ত্রে "ভগবান্" শব্দে ইঙ্গিত করেন। এই তত্ত্বে অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজ নিহিত আছে বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চিরকাল বৃক্ষ হইতে আপেল পড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু নিউটনের হৃদয়ে কাহার খেলার বশে সেই এই সামান্য আপেল্ পতনে তিনি একটী বিশ্বজনীন শক্তির ইঙ্গিত পাইলেন? এরূপ তত্ত্ব না থাকিলে, বল কি করিয়া বাহিরের বস্তুনিচয় তোমার জ্ঞান আনন্দ ও শক্তি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে? সে বাহিরে আছে বলিয়াই, বাহিরের বস্তু ভিতরে আসিতে পারে। সে ভিতরে আছে বলিয়াই বাহিরের বস্তু ভিতরে মিশিয়া যাইতে পারে। সে আমার আমির অভিন্ন বলিয়াই, আমার রামরূপ জ্ঞানটীকে শান্ত শিবময় আমিরূপে লইয়া যাইতে পারে। তাহাকে বাদ দিলে, বস্তু আর আমি কখনই মিশিতে পারে না; আর সুখ বা আনন্দরূপ কখনই প্রকাশিত হয় না। যখন তিনি প্রসন্ন না হন বা প্রকৃষ্টরূপে তোমার হৃদয়ে না খেলেন, তখন সুখকর বস্তুর উপভোগ করিতে যাইয়াও

দেখিবে, যে তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। পদ্মের চাষার ন্যায় শিশুমানব বুঝিতে পারে না "যদুর বাছুরটী কূপে পতিত হওয়ায় দড়ি বাঁধিয়া টানাতে অনায়াসেই তাহা উপরে আনয়নকরা গেল; আর নারিকেল বৃক্ষ হইতে রামকে বদ্ধ-দড়ি টানিয়া নামাইতে যাইয়া সে পড়িয়া মরিয়া গেল? উভয়ইত দড়ির টান।" হে ইন্দ্রিয়লোলুপ, বল দেখি তোমার ভিতরে কাহার অধিষ্ঠান বশতঃ কতসুখ পাইয়াছিলে? আর আজ সে সেই ইন্দ্রিয়-আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিতে অবস্থিত আছেন বলিয়া, সমগ্র ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য উপাদানে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও তোমার সেই সুখ নাই!! বল কে ভিতর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর মিলন সাধিত হইতেছে? যে তত্ত্ব প্রভাবে ইহা সাধিত হয়, তাহাই ভগবান শব্দে লক্ষিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবানের এইরূপকে ঐশ্বর্য্যময় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ এই ভাবে তিনি ভিতর ও বাহিরের নিয়ন্তা. তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ভিতর ও বাহিরের মিলন সংসাধিত হয়।

ঐ ভাবেই মিলন সাধন করিলাম, ঈশ্বরজ্ঞানে ভগবানের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তিতে ডুবিতে যাইলাম, কিন্তু ডুবিতে ত পারিলাম না! বাহ্য ও অভ্যন্তরের মিলন হইল প্রত্যেক ভাবের মিলনের মধ্যদিয়াই তাহার ইঙ্গিত পাইলাম, কিন্তু তৃষ্ণা মিটিল না, প্রত্যেক তত্ত্বেই তাঁহার বিভূতি নির্দ্দেশ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম উহা 'বিভূতি' মাত্র!! দগ্ধবস্ত্রাবভাসের ন্যায় আভাসমাত্র লাভ হইল। আমার আমিত গেল না! বাহিরের খেলাও গেল না!! হিরণ্যকশিপু বধ হইল, রাবণ বধ হইল, কিন্তু আত্ম ও অনাত্মের খেলার নিবৃত্তি হইল না! একটা খট্‌কা লাগিল। স্থির ভাবে ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম যে যোগক্ষেম-বহনকারী ঈশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছি বটে কিন্তু তিনি ত বুদ্ধিগত হয়েন নাই! বুদ্ধির ধর্ম্ম খেলার অবসান বা শান্তি, আমি যে খেলাতেই রহিয়াছি, কৈ অবসান ত দেখি নাই! দৃষ্টি যে খেলার দিকেই রহিয়া গিয়াছে? অন্তর্য্যামী অমৃতরূপ ভগবানকে ত দেখিতে পাই নাই। বিপদে সম্পদে ত' তাঁহার সাড়া পাইয়াছি, কিন্তু বিপদ্-সম্পদ্-বিরহিত শান্ত ভাবেত তাঁহাকে দেখি নাই! যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির ক্রীড়াসমূহ নিয়মিত করেন, যিনি আছেন বলিয়া মাঝে মাঝে চঞ্চল, কর্ম্ম-ভাবপুষ্ট জীবনের হট্ট-কোলাহলের মধ্যে এক শান্ত, জনহীন, নিস্পন্দ, নীরবতার ন্যায় একটা কি জানি কি অনুভূত হয় সেই তত্ত্বকেই আত্মা বলে; সেই প্রকৃত 'আমি।' সেই আমিতে বস্তু ও জগৎ নাই। কারণ উহাতেই

সর্ব্বপ্রকার গতির অবসান হয়। তোমাদিগের ভাষায় খুব একটা হৈ, চৈ—কয়েকখানি মাত্র রুটীতে হাজার হাজার লোকের তুষ্টি, প্রভৃতি একটা অমানুষিক খেলা হইলেই যেন ভগবানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইল। আগে আমিও তাহাই বলিতাম। কিন্তু এখন দেখি সে ত তা' নয়! সে যে শান্ত। সে আর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া গরুড়াসনে ভিতর বাহিরে মিলাইয়াই ক্ষান্ত নহে. সে এখন শেষ-শয়নে যেন নিদ্রিতবৎ,—যেন সমস্ত জাগতিক খেলায় মূর্ত্তিমান্ অবসানরূপে অবস্থিত। একবার ভাব দেখি, সে কি প্রকার শান্ত!! তোমার জগতে মহান্ অসুরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার প্রভাবে মন বুদ্ধি সমস্ত বিক্ষিপ্ত, ও সময়ে সময়ে সেই অসুরকর্ত্তৃক কবলিত; প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভের শত চেষ্টায়ও জগতের শান্তি হইল না। তখন তোমার ব্রহ্মা প্রত্যাহারের সাহায্যে দেবতাদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেই মধুময় ক্ষীরোদ সিন্ধুতটে উপনীত, সকলেরই মনে চাঞ্চল্য—সকলেই ভাবিতেছে কোনও উপায়ে সেই পরমোপশান্ত দেবকে দুঃখের বার্ত্তা নিবেদন করিতেই হইবে, তাঁহাকে আনিতেই হইবে। সকলেই ভাবিতেছে সেই পরদেবতাও বোধহয় ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের গ্লানিতে মা জানি কতই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার সমীপগত হইয়া কি দেখিলেন?—সেই ভোগি-ভোগাসনাসীন, অবয়বী ভাবের অবয়বস্বরূপ, অনন্তদেবের সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ অঙ্কাসনে সেই কর্ত্তাটী দিব্য ঘুমায়ে আছেন। তোমাদের ব্রহ্মাটী মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন 'তাইত! তাইত—!!' বিশ্বের আলয়, আশ্রয় পরমপুরুষ সুষুপ্ত। সে কি কথা! তা'কে ত জাগাতেই পারা যাইতেছে না।" তার পর, যদি কোনও কৌশলে জাগাইতে পারিলে, তখন শান্তাকার ঠাকুরটী সস্মিত বদনে বলিলেন—"দেবগণ, তোমাদের বিপদের কথা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছি; তাহা প্রতিকারের বিধান হইতেছে।" এই বলিয়া মস্তকের এক গাছি কেশ উৎপাটন করিয়া দিলেন।

"ভাই সাধকগণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কোনও প্রকার সাধন ক্রিয়ায় কি এই শান্ত পুরুষটীকে দেখিতে পাইয়াছ? ক্রিয়া, জগদ্বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি লইয়া সাধনা করিলে ইঁহার সাক্ষাৎ বা সাড়া পাওয়া যায় না। ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে উপনিষৎ বলিলেন 'অন্তর্য্যামী অমৃতঃ'। ইহার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে হইলে তোমার শুদ্ধ আমিটীকেও ক্ষেত্রমাত্র বা গোপীরূপে চিনিতে পারা চাই;—বাহিরের সহিত, ক্রিয়ার

সহিত, ঐশ্বর্য্যের সহিত আর সম্বন্ধ রাখিলে চলিবে না। ঐ দেখ যোগমায়া, মহামায়া-সমাবৃত শান্ত-হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে তাঁহার নিত্য রাসলীলা অভিনীত হইতেছে। দেবতারাও এই খেলায় যোগদান করিতে অসমর্থ; তাঁহারা কেবল বাহির হইতে এই খেলার একটুকু আভাস মাত্র দেখিতে পান; বাহিরে থাকিয়া এক আধটু উঁকি ঝুঁকি মারেন। উহা ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের ক্ষেত্র নহে। প্রকৃত সমাধি ভাবে যেরূপ ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি প্রভৃতি আর খেলিতে পারে না, সেই প্রকার ব্রহ্মা ও তাঁহার অধস্তন দেবতাগণ এ খেলায় যোগদান করিতে পারেন না। কেবল আত্মারাম নিগ্রন্থ, অকৈতব শুদ্ধ আত্মা বা আমিতে সেই পরম-দেবের বিলাস হয়। ধর্ম্মের কষ্টি পাথরে এই খেলার পরিমাণ করিতে যাওয়া বাতুলের প্রয়াস। কর্ম্মপ্রবণ পাশ্চাত্য জাতীয়েরা যেমন হিন্দু যোগীর সমাধির কথা বুঝিতে পারে না, কর্ম্মের মানদণ্ড লইয়া যোগীর অবস্থা মাপিতে যাইয়া, তাঁহারা যেমন সমাধির অবস্থাকে বৃক্ষ প্রস্তরের জীবনের ন্যায় মনে করেন,—ধর্ম্ম ও কার্য্য-কারণ বোধের মোট লইয়া আত্মারামের অপ্রাকৃতলীলার পরিচয় করিতে যাওয়াও তদ্রূপ বিপজ্জনক। ভাই তোমার আপনার "স্থিতপ্রজ্ঞ" অবস্থা হইতে কি বুঝিতে পার না, যখন জগতের প্রজ্ঞাস্বরূপিণী মহামায়া প্রত্যাবৃত্তা হইয়া যোগমায়া কাত্যায়নীরূপে স্বপ্রসূত জীব-সমূহের ছিন্ন পুরুষ বুদ্ধির অপলাপ সাধনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কুমারীরূপে সেই আত্মারামের সহিত মিলাইয়া দেন, সেই "নৈব কিঞ্চিদপি-চিন্তয়েৎ" অবস্থা দ্বারা ইঙ্গিতীকৃত অবস্থায় যে স্থির শান্ত ঘন আনন্দৈকরস পরম'-আর প্রকাশ হয় তাহাই ত প্রকৃত 'স্ব'রূপে স্থিতপ্রজ্ঞ। এই অবস্থার আভাস পাইলে সত্য সত্যই আত্মারাম, নিগ্রন্থ মুনিগণও ব্যাকুল হইয়া উঠেন। যে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় আমিত্বে জগৎকে বিলীন করিয়াছ, সেই নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে কি এক বাঁশী বাজিয়া উঠিবে, যাহার আকুল নিঃস্বনে এত সাধের সাধনপুষ্ট আমিটীকে বিনামূলে বিকাইতে পথ পাইবে না। তখন দেখিবে যে সেখানেও এক নায়ক আছেন। সে তুমিও বটে অথচ তুমি ছাড়াও বটে, তাঁহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাই ম্যাডাম ব্ল্যাভেট্‌স্কি Voice of the Silence গ্রন্থে বলিয়াছেন—Out of the silence a Voice shall speak and knowing the Voice to be thyself thou shalt obey !"

শব্দের ক্ষেত্রে যাঁহাকে Silence বলা হইল, রূপের ক্ষেত্রে সেইত আমাদের

শ্যাম। ত্রিভঙ্গ, ত্রিগুণের খেলা,—ত্রয়ীবিদ্যার বিলাস, ত্রিপুটীর বিকাশ আর বাহিরে বহিল না, তাঁহারই রূপে মিশিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া গেল। আর জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি নাই। এই তিনের ভিতর দিয়া অনুস্যূত এক মহান্ অথচ শান্ত সত্তার আভাসে, ছিন্ন-বোধসমূহ ভাসিয়া গেল। ব্যক্ত জীবনের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুরূপ অবসান বা যমুনার গতি বিপরীত প্রবাহে প্রবাহিত হইল। ইহাই ভগবানের পরম-মধু অমৃত-ময় পরমাত্মা স্বরূপ।

আমরা দেখিলাম কি আশ্চর্য্য কৌশলে শ্রীভগবানের বাহিরে বা সর্ব্ব-রূপে অবস্থিত প্রভু, নিয়ন্তা, ও ঈশ্বররূপ মহাভাবের মধ্য দিয়া অবশেষে পরিশুদ্ধা বুদ্ধির সাহায্যে ভাগবতের ভগবান্—অন্তর্য্যামী অমৃত পুরুষোত্তমরূপে প্রকাশিত হইলেন। ভিতর ও বাহিরের দুইটী স্রোত মিলিয়া গেল, ও তাহার ফলে অহঙ্কার ও জগদ্ভাব দুইটীই দ্রব হইয়া গেল। বাহিরের নিয়ন্তারূপে তাহাকে 'যাবান' বলিয়া চিনা গেল, ভিতরে আত্মার আত্মারূপে 'যশ্চ' বলিয়া জানা গেল। কাজেই দেহ দেহী ও বিভিন্ন অর্থ প্রভৃতি ভাব পড়িয়া গেল। এইবার তাঁহার পরম-বিশেষ রূপ প্রকট হইবে। বুদ্ধি পর্য্যন্ত লইয়া ঈশ্বরের খেলা। তিনি বুদ্ধির প্রেরকরূপে বাহিরে ও ভিতরে প্রকাশিত হন। বুদ্ধির অবসানে—যখন—যখন বাহিরের প্রবণতা ও ভেদজ্ঞান একেবারে পড়িয়া যায়, যখন আত্মন্যাত্মনা তুষ্ট হওয়াতে বাহিরের প্রতি আনন্দ আর থাকে না—যখন আমির অভ্যন্তরে অধিকরণরূপে তাহার অল্প আভাস পাইয়া সাধক 'অধ্যাত্মনিত্য' হয় এবং 'চাওয়া পাওয়া' ভুলিয়া যায় বলিয়া বিনিবর্ত্তকাম হয়, তখন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আমির ভিতর দিয়া যে খেলার আরম্ভ হয় তাহারই নাম ভাগবতের রাসলীলা—'। ভিতরের ভাষায়—যখন জীব—'পরীক্ষ্য লোকান কর্ম্মচিতান- ———কর্ম্মচিত সুতরাং অহঙ্কারের রচিত লোকসকল হইতে বিতৃষ্ণ হইয়া কেবল আত্মা বা আমির ভাষায় তাঁহার অনুসন্ধানতৎপর হয়—যখন শ্রীমতির মত সে বলিয়া উঠে—

"ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে
কোথা আমার আছে—

যখন ধর্ম্মাদন্যত্র, অধর্ম্মাদন্যত্র—ধর্ম্ম হইতে ও অন্য ও অধর্ম্ম হইতেও অন্য এক স্থির 'আমির' আভাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার মর্ম্ম ব্যাকুল হইয়া

উঠে তখনই রাসলীলার আরম্ভ। আমরা ভুলিয়া যাই যে আমিটি প্রবৃত্তি-স্রোতের পরিসমাপ্তিমাত্র বিশিষ্ট বস্তু নহে। সে জাগিলে আর কুল থাকে না, জাতি থাকে না; কারণ কুল ও জাতি'ত অবয়বী ভাবের খেলা! আর শীর্ণ বা প্রবলতা থাকে না, কারণ যাহার জন্য বাহিরে ধাবমান হই মন্মথ-মদন তখন ভিতরে আসিয়া বসিয়াছে। বাহিরের বহু ঘন হইয়া সর্ব্বে মিশিয়াছে, সর্ব্ব ঘন হইয়া সর্ব্বাত্মিকা আনন্দময়ীর অঙ্গে মিশিয়াছে! আছে কেবল শুদ্ধ 'অহং' প্রত্যয়ের কারণ প্রত্যগাত্মার বিলাস মূর্ত্তি; গুরু নাই, তিনিও হজম হইয়া একমাত্র যোগমায়ারূপে অবস্থিত, আর আছে কেবল সেই আমি-কণার, কি বলিব,—প্রাণের ভিতর এক আকুল পিয়াসা—এক মহান আকর্ষণ! যোগমায়া সর্ব্বকে হ্লীংরূপে আহরণ করিয়া—হায়! হায়! তাই বুঝি কৃষ্ণরূপে মিশিয়া গেলেন?

সেই অপ্রাণ, অমন, ইন্দ্রিয়বিহীন বুদ্ধির অবসানের পরপারে স্থিত সেই আকুল আকর্ষণের আকুলপিয়াসার ক্ষেত্রে ভগবান শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে বিরাজিত।

তার পর, এইবার বৈষ্ণব ভ্রাতাগণ ক্ষমা করিবেন, যখন এই আমিতে আর সেই আমিতে রাস-বিহারের হিল্লোলে পূর্ব্বরাগ মিলন, বিরহ প্রভৃতি বিবিধ দশার মধ্যদিয়া দুই আমির ঘন ঐক্য বোধগত হইয়া যায়, তখন হঠাৎ আর জীব আমির আমিত্বটুকু রক্ষা করিতে পারে না। এত সাধের আমির বিশেষত্বটুকু, হঠাৎ সেই পরম বিশেষের আমিতে মিশিয়া যায়। তাই বুঝি ভগবানের সেই গুণাতীত ভাববশে তদ্‌গতপ্রাণা গোপিকাগণ আপনা আপনি আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কৃত লীলাবলীর অনুকরণ করিয়া ফেলে। আকুল পিপাসার বশে ব্রজগোপীগণ যখন কৃষ্ণলীলা-ভিনয় করিত, তখন তাহাদের ব্যক্ত আমি জ্ঞান কোথায় থাকিত? ব্যক্ত আমিকে নির্দ্দেশ করিবার শক্তিও তখন এক মহান্ আমির মধ্যে লীন হইয়া যায়। ছোট আমিটীকে রাখিয়া নাট্যকারের ন্যায় ভগবৎচরিত্রের অনুকরণ ইহা নহে। এ অবস্থায় বাহ্য জগতের জ্ঞান থাকে না, তাহা হইলে কি সামান্ত উপলখণ্ড ধারণ করিয়া গোবর্দ্ধনধারণ লীলায় অভিনয় করা যায়। ইহা সাধন-জন্য জ্ঞান নহে। এখানে কেবল 'আমি' ও 'আমির আমি' থাকে; আর কিছুই থাকে না। মনে কর তোমার এমন একটি অবস্থা আসিয়াছে যাহাতে তুমি যাহাই কেন না দেখ সকলই 'আমি' হইয়া যাইতেছে; ইহা রাসলীলার

অবস্থা নহে, তাহা হইতে অনেক নিম্নাবস্থা; কারণ ইহাতে 'সর্ব্ব' আমি হইতেছে; কিন্তু ফলের হিসাবে দেখিতে গেলে এ অবস্থায় যেমন জগৎ আমিতে মিশিয়া যায়,—যেমন স্পন্দন থাকিলেও আর দ্বিতীয় ভাব থাকে না, তদ্রূপ 'ভগবানের আমি' যখন ভক্তের আমিটীকে অনুগৃহীত করিয়া মিশাইয়া লয়েন, তখন স্পন্দন-বিলাস থাকিতে পারে, কিন্তু দ্বৈত আর থাকে না। তখন একবার 'এ আমি', একবার সেই 'পর আমি' ফুটিতে ফুটিতে এ আমিটি সেই পরের সহিত স্বীয় স্বরূপগত ঐক্য চিনিয়া ফেলে। ইহাই 'তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা' শব্দে গীতায় অভিহিত। ভাগবৎ এই জ্ঞান-ঘন, আনন্দ-ঘন, পরম অদ্বৈত তত্ত্বকে "ব্রহ্মাদ্বৈতমবশিষ্যতে" প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্ম বা অদ্বয় জ্ঞান-স্বরূপ ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন। ইহাই ভগবানের নির্গুণ রূপ বা স্বরূপ। ইহা শূন্য অন্ধকারবৎ অভাববাচক শব্দ মাত্র নহে, ইহাতে অস্তিত্বের অভাব নাই—ভরপুর অস্তিত্ব আছে। ইহা জ্ঞানের বিরোধী অজ্ঞান নহে—জ্ঞানের ঘনতম চিদেকরস-রূপ। ইহাতে আনন্দের আর চাওয়া পাওয়া নাই, ইহার সবটাই আনন্দ, এত আনন্দ যে তোমার সাধের আমিটি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়া গিয়াছে। দুইটা আমি রাখিয়া লীলার-বিলাসই যদি ভাগবতের সার উপদেশ হইত, তাহা হইলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাসলীলা বর্ণনার অন্তেও পরীক্ষিতকে এই উপদেশ দিবেন কেন?

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ১১।
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥ ১২। ভাগ। ৫। ১২

"অহংই ব্রহ্ম, অহংই পরমধাম ও পরমপদ, এইরূপ ধারণায় তোমার আত্মাকে নিষ্কল আত্মাতে যোজনা কর, দেখিবে যে লেলিহান বিষমুখ তক্ষক, তোমার শরীর ও বিশ্ব, সকলই, আত্মাতে মিশিয়া গিয়াছে, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে।" তাহাই আরো বিশদ ভাবে শুকদেব কহিলেন—

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নি-সংযোগো যাবদীয়তে।
তাবদ্ দীপস্য দীপত্বমেবং দেহ কৃতোভবঃ।
রজঃ সত্ত্বতমো বৃত্ত্যা জায়তেঽর্থ বিনশ্যতি॥ ৭।
ন তত্রাত্মা স্বয়ং জ্যোতির্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ।
আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপম স্ততঃ॥ ৮

এবমাত্মানমাত্মস্থমাত্মানেবামৃশ প্রভো।
বুদ্ধ্যানুমানগর্ভিণ্যা বাসুদেবানুচিন্তয়া ॥ ৯। ভাগ ১২। ৫।

স্নেহ বা মমতা তৈল স্বরূপ, তাহার অধিষ্ঠান বা জগৎ, তাহার বর্ত্তিকা বা অহংজ্ঞান, ইহাতে অগ্নিরূপ ভগবৎ সত্তার সংযোগ হইলে তাহা প্রদীপ বলিয়া অভিহিত হয়। জীব ভাব ও গুণত্রয়ের জন্মও নাশ পাইয়া থাকে। জ্যোতি স্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা জন্মেন না। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের পর দেহ ও আকাশের ন্যায় সর্ব্ব বা মায়া শক্তির আস্পদ বা আধার, কিন্তু স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার, অন্তহীন ও উপমা বিহীন। বুদ্ধির অনুমান বা অবসানরূপ গতির সাহায্যে এইরূপ বুদ্ধিকে আধার বা গর্ভরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে বাসুদেব রূপ ভগবৎ-ভাবের অনুচিন্তন বা বীর্য্য প্রদান করত তোমার আমি-টিকে সেই আমিতে নিত্য অবস্থিত বলিয়া বুঝিয়া দেখ। ভাগবৎ পুনরায় বলিলেন—

ন যত্র সৃজ্যং সৃজতোভয় পরং
শ্রেয়শ্চ জীব স্ত্রীভিরন্বিতস্তগম্।
তদেতদুৎসাধিত বাধ্যবাধকং
নিষিধ্য চোর্ম্মীন্ বিরমেত তন্মুনিঃ ॥
পরংপদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎ সিসৃক্ষিবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ ॥

"তাঁহাতে সৃজ্য কর্ম্ম, সৃজতা বা কারক ও উভয়ের পর বা সাধ্য শ্রেয় ফল নাই। জীব ও তাহার তিন ভাবে ব্যবস্থিত অহঙ্কার নাই। এই তিন ভাবের অহঙ্কারকে জীবের জাগ্রৎ স্বপ্নাদি তিনটি কেন্দ্র বলে; উহারা সৃজ্যাদি ভাবাত্মক। তাহাতে বাধ্য ও বাধক—কর্ম্ম ও ফল, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, ভাবগুলি—নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। মননশীল যোগিগণ তাহাতে চৈতন্যের উর্ম্মি অর্থাৎ অহঙ্কারাদি ভাব সকল ত্যাগ করিয়া বিরাম প্রাপ্ত হন্, বা বিশেষ ভাবে ক্রীড়া করেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক তত্ত্বগুলির সামান্যভাব ত্যাগ করিয়া, আত্মার বিশেষ ভাবে অবস্থিত হন। ইহাই পরম বৈষ্ণব পদ। 'তদ্বিষ্ণুঃ পরম পদং' শব্দে লক্ষিত হয়। নেতি নেতি ভাবে আত্মা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, সেই সকল উৎসর্গ করিয়া দৌরাত্ম্য বা যাহাতে,

আত্মার প্রকৃত ভাবের অপলাপ হয়, এই রূপ দেহাদিতে অহংভাব ত্যাগ করিয়া এবং ভগবানের প্রতি অনন্য-সৌহৃদ্য হইয়া হৃদয়-চৈতন্যের ভিতর প্রকাশিত সেই পরম পদের জন্য যাঁহাদের চিত্ত আকুল হইয়াছে, তাঁহারা এই পরম পদ জানিতে পারেন ও প্রাপ্ত হন। ইহাই ভাগবতের ভগবানে স্বরূপের শুদ্ধতম আভাস বা ইঙ্গিত। এই ভাব জানিবার জন্যই ভাগবতের উপদেশ। ইহা যে শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ, তাহা আগামী বারে বুঝিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

বিহ্বলতা

কখনো তোমারে জানিনি দেবতা।
বুঝি নাই তব প্রেম।
মজিয়া রয়েছি তোমায় ভুলিয়ে,
নিয়ে তুচ্ছ মুক্তা হেম॥
সমুজ্জ্বল প্রভা নেহারি কভুও,
হৃদয়ে লাগেনি প্রীতি।
পুণ্য প্রতিভা আলোক ছটায়,
দেখিনি স্বরূপ জ্যোতিঃ॥
পরম স্বরূপ পূর্ণ-ব্রহ্ম-রূপে,
হেরিতে তোমায় প্রভু!
জাগেনি পরাণে ব্যাকুলতা হায়।
ডাকিনি তোমারে কভু॥
তবু' মর্ম্মস্থলে অলক্ষ্যে উথলে,
পূত স্পন্দন তব।
হৃদয় সেতার উচ্ছ্বাসে ধীরে,
বেজে উঠে অভিনব।
কি যেন কেমন অচেনা সুতানে,
পরাণ কাড়িয়া লয়।

ঊর্দ্ধ-অধঃ হেরি সতৃষ্ণ নয়নে
　　তবু' হৃদি স্থির নয়॥
এই বিহ্বলতা ভাঙ্গিওনা, স্বামি!—
　　—তোমাতে আবেশে মজি।
ভাঙ্গিব আমার মোহের স্বপন,
　　নিশিদিন তোমা ভজি॥

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত

আমার ক্ষেপা

রসের ক্ষ্যাপার গতিক বুঝা ভার।
(সে) হাসলে কাঁদে　কাঁদলে হাসে
হাসি কান্না উলটো তার॥
অকর্ম্ম হায়, কর্ম্ম করে,　উলঙ্গ রয়, পোষাক পরে।
শূন্যে চরে থেকে ঘরে বক্তা, তবু মৌনাচার॥
সঙ্গে দারা, তবু যোগী　ভোগ করে না তবু ভোগী
(তার) ঘুমে চেতন চেতনে ঘুম দেহী তবু নিরাকার॥
বদ্ধ, তবু সদাই মুক্ত,　ভিন্ন, তবু সদা যুক্ত,
ব্যক্ত, সদা তবু গুপ্ত ভাবে তবু নির্ব্বিকার॥
জাত থাকিতে বারো জেতে,　ভূত, তবু না ভূতের ধেতে,
তা'র রেতে দিবা, দিবায় রাতি, আত্মহারা অহঙ্কার॥
গুণে তবু নয় সে তালে,　কালের কাল সে থেকে কালে,
(তার) লয়ে উদয়, উদয়ে লয় স্থিতি আছে নাই আধারে॥

—'দেবা'—

ভিখারী।

(একাঙ্ক নাটিকা)

১ম দৃশ্য রাজপথ,—ভিখারী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ।—নারায়ণ মোর সাথে একি অভিনয়,
আমার অদৃষ্ট সাথে একি পরিহাস
আজি তিন দিন ধরি পথে পথে, হায়!
প্রতি গৃহ দ্বারে দ্বারে করিনু ভ্রমণ
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে লয়ে,
'নারায়ণ, নারায়ণ,' রবে
মুষ্টি ভিক্ষা করিনু প্রার্থনা,
কহিলাম সকাতরে,
"উপবাসী, ক্ষুধাতুর বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ
আমি, দেহ মোরে মুষ্টি ভিক্ষাদান।
তবুওতো কেহ, হায়, চাহিল না ফিরি
আমার মুখের পানে! কেহবা সরোষে
দূর, দূর, দূর বলি দিল তাড়াইয়া।
নারয়ণ। নারায়ণ। একি পরিহাস।
না, না প্রভু; তুমিতো নিষ্ঠুর নহ কভু,—
তোমারি ভুবন মাঝে নিষ্ঠুরতা নাহি পায় স্থান!
মঙ্গলনিলয় তুমি, প্রভু, দয়াময়।
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি,
কি মহা-মঙ্গল ইচ্ছা হৃদয়ে বহিয়া
তুমি, প্রভু, এ বিশ্বেরে কর নিয়ন্ত্রিত।
অধম অজ্ঞান মোরা,
বুঝিতে শকতি কোথা তোমার কৌতুক?
দয়াময় নারায়ণ,
তোমারি করম তুমি কর সম্পাদন,

আমি তারে বুঝিবারে না করি কামনা।
দাও শক্তি, দাও বল,
তোমাপরে স্থাপিতে নির্ভর।
মোর প্রাণে এনে দেও অটল বিশ্বাস,
প্রভু, তুমি নারায়ণ
ইচ্ছা তব মঙ্গলনিলয়,
আর শুধু তব ইচ্ছা হইবে পূরণ ;
আমি শুধু গাব দিবা নিশি
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ নাম।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য নগর-প্রান্তে জীর্ণ কুটীর—ব্রাহ্মণের আগমন।

ব্রাহ্মণ।—

নারায়ণ। নারায়ণ।

(কুটীরাভ্যন্তর হইতে গৃহস্বামীর আগমন)

গৃহস্বামী—

নারায়ণ। নারায়ণ। কে বটে আপনি ?

ব্রাহ্মণ :—

ভিখারী-ব্রাহ্মণ আমি, মুষ্টিভিক্ষা আশে
আজি তিন দিন ধরি মহানগরীর
প্রতি-গৃহ দ্বারে দ্বারে করিনু ভ্রমণ,
কিন্তু কেহ কৃপাদান করি, মুষ্টিমেয়
তণ্ডুল-কণিকা মোরে করে নাই দান।
আজি তিন দিন ধরি অনাহারী আমি,
কৃপা করি মুষ্টি ভিক্ষা করহ প্রদান।

গৃহস্বামী :—

তিন দিন ধরি উপবাসী।
হে ব্রাহ্মণ, এস মোর গৃহে,

‡ ৺কবিগুণাকর, বিদ্যাপতি নবীন চন্দ্র দাস M. A. B. L. কাব্য রত্নাকর মহাশয়ের অমর স্মৃতিতে উৎসর্গিত।—গুণানুরক্ত লেখক

(স্বগতঃ) নিষ্ঠুরতা ব্যাপিছে ধরণী
সুবিশাল নগরীর প্রতিগৃহ আজি
বিলাসের রঙ্গভূমি ; দয়া-মায়া প্রীতি—
হেথা হতে বিসর্জ্জিত আজি ।
বুভুক্ষু ব্রাহ্মণ ।
নারায়ণ নাম গাহি ফিরি দ্বারে দ্বারে
মুষ্টিভিক্ষা পারেনি লভিতে ।
নারায়ণ ধ্বনি বিনিময়ে
লভেছে ভ্রূকুটী হাস্য উপেক্ষা কেবল ।
(প্রকাশ্যে) এস তুমি মম গৃহে ।
ক্ষুধাতুর তুমি, নররূপে নারায়ণ,
বুভুক্ষু ভিখারী রূপে, এস তুমি হে ব্রাহ্মণ ।
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করি দীনের ভবনে
নারায়ণ, ভিক্ষা পরে করিও গ্রহণ ।

ব্রাহ্মণ :—

নারায়ণ, ! নারায়ণ ।
জীব বৎস, চিরজীবী হও । কি সৌভাগ্য মম
তোমার কুটীরে আমি করিব বিশ্রাম ।
(গৃহ-অলিন্দায় উপবেশন)
এ বিশাল নগরীর সর্ব্ব পুণ্যে প্রেমে
এ জীর্ণকুটীর তব আছে প্রতিষ্ঠিত ।
কুটীর ! কুটীর এ নহে,
এযে মহাদেব তার প্রেমের মন্দির
তুমি তার পূজারী সেবক, তা' নহিলে
দরিদ্র ভিখারী প্রতি কেন এ যতন !

(গৃহস্বামীর প্রস্থান ও ভিক্ষাসমেত পুনরাগমন—)

গৃহস্বামী :—

হে ভিখারী, নারায়ণ, হে ব্রাহ্মণ !
লহ ভিক্ষা দীনহীন আমি, ততোধিক
দীনহীন ভাণ্ডার আমার ! (ভিক্ষাদান)

ব্রাহ্মণ :—　　　(ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া)

নারায়ণ! নারায়ণ! হৌক্ জয়ী বাসনা তোমার!

(গৃহস্বামীর প্রতি)

ধন্য তুমি দয়াময়, লহ আশীর্ব্বাদ,
প্রেমের পবিত্র পীঠ ভবন তোমার
হৌক্ চির জয়যুক্ত দেব-আশীর্ব্বাদে।　　(প্রস্থান)

———

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপথ,

ব্রাহ্মণ।—নারায়ণ। নারায়ণ।

মোর জীবনের আজি মহাশুভক্ষণে
ভ্রান্তি মোর গিয়াছে টুটিয়া,
বুঝেছি, প্রভু, ঐশ্বর্য্য যেথায়
সেথা নাহি তব স্থান,
সেথা শুধু অহঙ্কার,
দেবতার নামে বিকট তাণ্ডবলীলা,
আর পরিহাস,
সেথা নাহি দয়া মায়া, সেথা নাহি প্রেম,
তাই বুঝি এ বিশাল মহানগরীর
অনন্ত ঐশ্বর্য্য ছাড়ি,
নগরের এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দীন হীন
জীর্ণ শীর্ণ কুটীর মাঝারে
প্রীতি প্রেমে করেছ স্থাপন।
ইচ্ছা তব করহ পূরণ।　　(প্রস্থান)

———

চতুর্থ দৃশ্য ব্রাহ্মণের কুটীর—ব্রাহ্মণ,

ব্রাহ্মণ।—নারায়ণ। নারায়ণ।

দরিদ্রতা দিয়াছ আমারে,
তাই বুঝি, তব নাম হতেছে ধ্বনিত
মোর মুখে অহরহঃ
সম্পদ্ দাওনি প্রভু, তা'ই ভালো;

না চাহি সম্পদ্, যাহা
তোমারে ভুলায়ে দেয়,
হৃদয় হইতে দেয় মুছাইয়া
মানবের প্রতি মানবের প্রেম, ভালবাসা।
দরিদ্রতা তা'ই ভালো। মৃত্যু-শেষে যদি
তোমার চরণে নাহি লয় হয়ে যাই,
এ ভুবনে পুনর্বার হয় জনমিতে
নারায়ণ, নারায়ণ,
দিও তবে দরিদ্রের কুটীরে জনম ,—
যেথা নাহি সংসারের ব্যর্থ কোলাহল
নরত্বের, ভ্রাতৃত্বের আহুতি অনল
যেথা নাহি উঠে প্রজ্বলিয়া
বিলাসের ব্যসনের নাহিক কামনা,
যেথা উঠে নিতি নিতি ব্যোম বিকম্পিয়া
নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ নাম।
(নেপথ্যে অতিথিরূপী নারায়ণ।)
—নারায়ণ, নারায়ণ। (অতিথির প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ :—
নারায়ণ, নারায়ণ,
নারায়ণ নাম গাহি কে তুমি দেবতা ?

অতিথি :—
আজি কতযুগ হ'তে উপবাসী আমি,
বিশ্বের সবার দ্বারে মেগেছি আহার।
কিন্তু হায়, 'দূর দূর' করি সবে দেছে
তাড়াইয়া ; যদ্যপি কেহবা
কোন দিন কিছু মোরে করেছে প্রদান
করেছি গ্রহণ , কিন্তু তৃপ্তি কোথা তাহে ;
হে ব্রাহ্মণ, নারায়ণ-সেবক উত্তম,
দয়া করে কিছু যদি এনে দেহ মোরে,
বুভুক্ষারে তৃপ্ত করি তৃপ্ত হই তবে।

ব্রাহ্মণ :—　　(স্বগতঃ)

নারায়ণ, নারায়ণ, একি ইচ্ছা তব
হৌক্ পূর্ণ বাসনা তোমার।
দিনত্রয় উপবাসী বুভুক্ষা-কাতর
বটে আমি, প্রভু, কিন্তু হায় এ অতিথি—
শাস্ত্র যারে কহে নারায়ণ, কতদিন ধরি
কত দিন কেবা জানে, অনশন-ক্লিষ্ট
ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ যে বলিতেছে যুগ—
কতদিন পায় নাই করিতে আহাব
নারায়ণ, নাবায়ণ,
ভুবন ঘুবায়ে তাবে
অবশেষে আনিয়াছ আমাব দুয়াবে।
এ কি ইচ্ছা তব সুমঙ্গল,
কল্যাণ-নিলয়, নাবায়ণ ? আমি তব
ভিখারী সেবক, ভিক্ষালব্ধ অন্নদানে
এ অতিথি নাবায়ণে কবিব অর্চ্চনা।
(প্রকাশ্যে) এস এস হে অতিথি,
নাবায়ণ দয়া করে
তোমাবে এনেছে যদি আমাব দুয়ারে,
আজি তোমা কবিব অর্চ্চন।
সামান্য যা দ্রব্য আছে আমার ভাণ্ডাবে,
তা'ই দিয়ে কব তব উপবাস দূব !
হে অতিথি,
আর্য্য গৃহস্থেব তুমি দেব নারায়ণ,
তোমারে করিব পূজা সাধ্য কি আমাব।
এস এস গৃহ-অভ্যন্তরে।

(অতিথিকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের
কুটীরাভ্যন্তরে গমন।)

৫ম দৃশ্য কুটীরাভ্যন্তর—ব্রাহ্মণ ও অতিথি।

ব্রাহ্মণ—

(অতিথিকে খাদ্য প্রদানান্তর)

অযোগ্য এ পূজা উপচার
নারায়ণ, তবু তারে করহ গ্রহণ !

অতিথি —

(আহারান্তে)

তৃপ্তি, তৃপ্তি, হে ব্রাহ্মণ,
নারায়ণ-সেবি-শ্রেষ্ঠ। দেহ আলিঙ্গন,
আমি বৎস উপাস্য তোমার,
বুভুক্ষু অতিথি নহি, আমি নারায়ণ
নর অতিথির রূপে তোমার দুয়ারে।

(শ্রীনারায়ণ রূপ ধারণ)

হে ভক্ত। সাধক শ্রেষ্ঠ। দেহ আলিঙ্গন—
আমি বৎস প্রেমের ভিখারী,
প্রেমে পূত খাদ্য মাগি
সৃষ্টির আদিম হতে,
ভিখারী ক্ষুধার্ত্ত রূপে ঘুরিতেছি আমি
হেন রূপে, বিশ্ব মানবের দ্বারে।
কিন্তু হায়, কোথা প্রেম পরিপূর্ণ ?
কোথাও লভেছি খাদ্য, বিন্দুমাত্র করুণার সঙ্গে !
কোথা হতে এসেছি ফিরিয়া
অত্যাচার, অনাদর উপেক্ষা সহিয়া ,
বিন্দু তণ্ডুল-কণিকা টুকু প্রেমে সুপবিত্র
রাজারও ভাণ্ডার হতে বেশী আগ্রহের।
প্রেম-পূত অন্নরাশি, হে ভক্ত ব্রাহ্মণ !
যে মহতী তৃপ্তি মোরে প্রদানিলে আজ,
ত্রিভুবনও দান লয়ে বলি-রাজ হতে
লভিবারে পারি নাই তেমনি সন্তোষ !
ধন্য তুমি সাধক উত্তম !

আমি বিষ্ণু নারায়ণ.
তোমা আজি যাচিতেছি কোল।
তোর লাগি গোলোক দুয়ার
মুক্ত আজি, হে ব্রাহ্মণ।
ভিখারী, ভিখারী তুমি নহ,
করুণার তুমি মহারাজ,
পরাজিত আমি,
বন্দী আমি নারায়ণ তোর করুণায়!

ব্রাহ্মণ :—　　　　(সবিস্ময়ে)

নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি নারায়ণ!!
আপনি এসেছ প্রভু আমার আলয়ে,
একি লীলা তব, লীলাময়,
মোর সাথে এ কেমন ছলা?
বুভুক্ষু অতিথি রূপে, নররূপে
নারায়ণ, তুমি আজি আমার দুয়ারে
ইচ্ছা তব হউক পূরণ, নাথ নারায়ণ।
দয়া করে মোরে যদি দিয়াছ দর্শন,
তবে মোরে ওই তব চরণ যুগলে
উৎসর্গিত পুষ্প সম করহ গ্রহণ,
তোমার চরণে মোর দাও নাথ স্থান!

নারায়ণ :—

চরণে, চরণে কিহে? হে ব্রাহ্মণ!
বৈকুণ্ঠের হৈম-গৃহে স্বর্ণ-সিংহাসন
তোমারে হৃদয়ে বহি হইবে সার্থক!
নিজে নারায়ণ বন্দী যাহার নির্ভরে
সে কিরে পড়িয়া রবে চরণে আমার
পার্থিব কুসুম সম?

(আকাশের পানে নির্দ্দেশ করিয়া)

হের ওই জ্যোতিঃ ধারে দিক্ উজলিয়া,
জ্যোতির্ম্ময় হৈম-রথ আসিতেছে নামি

তোমারে বহিয়া নিতে বৈকুণ্ঠ ভুবনে,
হে ব্রাহ্মণ, বৈকুণ্ঠ-বিহারী
আপনি করিবে সেথা তোমারে বরণ!
(ভূতলে জ্যোতিঃ রথ স্থাপন. নারায়ণ ও ব্রাহ্মণকে লইয়া
আকাশ পথে রথে বিলীন)
(যবনিকা)
শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

বস্ত্রহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের বস্ত্রহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ শিহরিয়া উঠেন। যেরূপভাবে উহাকে প্রকাশ করিলে ঠিক হইত, সেই ভাবে প্রকাশিত না হওয়ায়, লোকে ইহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সভ্যলোকে এই ব্যাপারটাকে যে একটা খেউড় মাত্র মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরাও ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারি না, সুতরাং প্রতিপক্ষেরা যখন বলেন, "তোমাদের ধর্ম্মসংস্থাপন কর্ত্তারই যখন এই দশা তখন আর তোমাদের ধর্ম্ম ও নীতিবল যে কতটা শিথিল তাহাতো বুঝাই যাইতেছে"—একথার উপর বাস্তবিক কথা কহা যায় না। সুতরাং অনেক সময় লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াই থাকিতে হয়। তাহার ফলে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন! কৃতবিদ্য ভারতসন্তান অনেকেই আর তাঁহার দেশের শাস্ত্র ও মনীষীদিগের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধালু নহেন? অবশ্য এজন্য দোষী তাঁহাদিগকে করা যায় না!

এই থেকে একটা কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে উদয় হয়, কেন আমাদের দেশে শাস্ত্র গুরুমুখে শুনিবার ও বুঝিবার ব্যবস্থা ছিল। সদ্‌গুরু ব্যতীত অন্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন মহাপাপ বলিয়া গণ্য, একথা তাঁহারা কেন প্রচার করিয়াছিলেন, এবং কেন ব্রাহ্মণই শাস্ত্র পড়িবেন, শূদ্র পড়িবেন না, ইহার মূলে কি সত্য আছে তাহা বুঝিতেও আর বিলম্ব হয় না। অবশ্য আমরা আজকাল

একথা বড় আর মানিতে চাহি না। কাজে কাজেই নিজেদের বিকৃত মস্তিষ্ক লইয়া শাস্ত্রানুশীলনে রত হইয়া, শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ অবগত হইতে পারি না। তা'ই বেদপাঠ করিতে করিতে বেদের ভেকগীতে মোহিত হইয়া পিতামহদিগের সরলতা এবং সরল বরষার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ বালকের ন্যায় তাঁহাদের বালকোচিত সরল সঙ্গীত রচনার প্রয়াস দেখিয়া, উহা আদিম অসভ্য মানবের প্রথম হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। সায়ণ-ভাষ্য পড়িয়া বেদের প্রকৃত মর্ম্ম সায়াহ্নের অন্ধকারের মতই তাঁহাদের হৃদয় দেশকে আরও নিবিড় তমসাতেই আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। যুগে যুগে বেদবাণী ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া পূজিত ছিল, যে বেদোক্ত সাধনা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যশক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠিত, অধুনা কাল প্রভাবে তাহা আমাদের হৃদয় হইতে ক্রমশই অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের এবং পুরাণ সমূহের বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মহান্ চরিত্র যে কাব্য উপন্যাসের অলীক কথার সহিত তুলিত হইবে, তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কারণ কি? আমাদের এই একটা দোষ যে আমরা সমগ্র শাস্ত্রখানাকে সম্মুখে রাখিয়া বিচার করি না। শাস্ত্রের কোন একটি শ্লোক দেখিয়া বিচার করিতে গেলে ভ্রম সিদ্ধান্ত হইবার সম্ভাবনা, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। আমরা কোন স্থানে সামান্য অংশ টুকু শুনিয়া, শাস্ত্র সম্বন্ধে যে ধারণা করি, তাহা অনেক সময়েই বিকৃত সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। ইহার ফলে হৃদয়ে যে সংস্কার জন্মিয়া যায়, তাহা আর সহসা মুছিয়া ফেলাও যায় না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ খুব মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই সত্যটি আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিতে পারিবে না! শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ একথা এখন মনে নাই করিলাম। গোপীগণের বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স দশমবর্ষকে অতিক্রম করে নাই। কারণ তিনি ব্রজেই একাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। ভাগবতে তাহার প্রমাণ আছে।

"ততোনন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্বি বিভ্যতা।
একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চ্চিঃ সবলোঽবসৎ।"

এ বয়স সাধারণতঃ কামোদ্দীপনার সময়ই নয়, সুতরাং ব্রজ-যোষিৎদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার অবৈধপ্রণয় কল্পনা করা নিতান্তই অসঙ্গত, এবং যুবতীদের পক্ষেও একটি দশম বা একাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের প্রতি

কামভাবে আসক্ত হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার! বিশেষতঃ পল্লী-বাসীদের পক্ষে, যেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অকাল যৌন সম্বন্ধের অনুকূল স্থান নহে! সুতরাং গোপিকাদের বস্ত্রহরণ বালসুলভচপলতা বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। গোপিকারাও, যাঁহাদের বস্ত্রহৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই তখন অবিবাহিতা কুমারী, তাঁহারা কাত্যায়নী ব্রত সমাপন করিয়া দেবীর নিকট মনোমত স্বামী লাভের অভিলাষ জানাইতেছেন। এখনও কুমারীরা ব্রত করিয়া 'রামের মত স্বামী পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই' ইত্যাদি বর প্রার্থনা করে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমে ব্রজরাজনন্দনের একমাত্র পুত্র। তাঁ'র বলিষ্ঠ সুগঠিত সুন্দর শরীর, নয়নে অলৌকিক প্রতিভার বিকাশ, সমস্ত মুখ-মণ্ডল অপার্থিব জ্যোতির্বিমণ্ডিত, মাথার কেশগুলি পর্য্যন্ত শোভনশ্রী-সম্পন্ন অদ্ভুতকর্ম্মা, বুদ্ধিমান্ ও মিষ্টভাষী এমন রমণীয় বালককে কোন্ বালিকা আপনার চিরজীবনের সহচররূপে প্রার্থনা না করিবে? কাজে কাজেই তাহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছুই হয় নাই, সুন্দর জিনিষকে সকলেই আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে। এখনও সকলেই আমরা সুন্দরের পক্ষপাতী? শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার বুদ্ধি নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। গোপিকারা ব্রতধারিণী অথচ বিবস্ত্রা হইয়া জলে স্নান করিতেছে, ইহাতে দেবতার অবমাননা হয়। সুতরাং যে ব্রতের জন্য তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আছে। একটু অনভিজ্ঞতার জন্য দেব-অবহেলায় পাছে ব্রতের ফললাভ না হয়, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ করিয়া তাহাদিগকে একটু বিপন্না করিয়া শিক্ষা দান করিলেন; উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে তাহারা সতর্কতা অবলম্বন করিবে। ভাগবতে স্পষ্টই আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যূয়ং বিবস্ত্রা যদপোধৃতব্রতা,
ব্যগাহতৈতৎ তদুদেব হেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥"

'তোমরা ব্রত আচরণ করিতে করিতে বিবস্ত্রা হইয়া জলে স্নান করিয়াছ। ইহাতে নিশ্চয়ই দেবতাকে অবহেলা করা হইয়াছে। অতএব এই পাপ দূর করিবার নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলি ধারণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া বস্ত্রগ্রহণ কর'। বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করার পদ্ধতি কোন কোন দেশে প্রচলিত

আছে, এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এ প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায়! ইহা যে আপত্তিজনক আচরণ তাহা শ্রীকৃষ্ণের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। এ প্রথা যাহাতে তাঁহার দেশ হইতে উঠিয়া যায়, হয়ত সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল না কে বলিবে? নয় দশ বৎসরের শিশুর এতখানি দূরদর্শিতা হয়ত অনেকের নিকট কেমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে! কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত প্রতিভার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা সাধারণ মানুষে ধারণা করিতে পারে না বা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহা যাঁহাদের বুদ্ধির নিকট প্রকাশিত হয়, আমরা সেই সকল লোকোত্তর মনীষিবর্গকে মহাপুরুষ বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদিগকে আপ্তকাম ঋষি শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি! সম্রাট্ আকবর তো ১৪।১৫ বৎসরেরই বালক ছিলেন, কিন্তু সেই অবস্থাতেই ভারতবর্ষের রাজনীতির গভীর মর্ম্মস্থানকে উপলব্ধি করিতে তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয় নাই। অসাধারণ প্রতিভা থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে! অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই যে ভারতের তৎকালীন সামাজিক আচার ব্যবহার নীতিধর্ম্মের অবস্থা বুঝিয়া তাহার সংশোধনে সচেষ্ট হইবেন, ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে। এত সব গেল বাহিরের কথা। যাঁ'রা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম, মায়া-মনুষ্য বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের আর একটা কথা চিন্তা করিবার আছে। তিনি মায়া অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও দেহের মায়ায় আবদ্ধ নহেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে তাঁহার পরিপূর্ণ জ্ঞান, কোন দিন কোন খানে, বাধা-প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার নহে। এই মায়া-মনুষ্য বিগ্রহটিকে নারদাদি ঋষিগণ, উদ্ধবাদিভক্তগণ এবং ব্যাসাদি দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানিগণ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন! ভূভার-হরণের জন্য তিনিও না কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কাজে কাজেই ব্রজবাসীরা অনেকেই বিস্ময়ের সহিত এই অসাধারণ মানবকটির কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার শিশুকাল হইতেই অদ্ভুত কর্ম্ম সকল নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার অসাধারণত্বে ব্রজবাসী সকলেই প্রায় বিগত-সন্দেহ হইয়াছিল! অনেকে তাঁহাকে দেব মনুষ্য, কেহ কেহ ভাগ্যবান্ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন! শ্রীকৃষ্ণ যখন রাখাল বালকগণের সহিত নন্দগোপের ধেনু রক্ষার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখনও রাখাল বালকেরা তাঁহার অমানুষিক শক্তি দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল,—তাঁহার

অমায়িক ব্যবহার, বন্ধুবর্গের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়, এবং তাঁহার সুন্দর সরল মুখখানি। গোপ-বালিকারাও সরলতা প্রযুক্তই হ'ক বা তাহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে অন্তঃকরণের নির্ম্মলতার স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি intuition দ্বারাই হ'ক, তাহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিল। তিনিই যে জগতের একমাত্র আশ্রয় এবং জীবমাত্রেরই পরমগতি, তাহাদের হৃদয় তাহা কেমন টের পাইয়াছিল। তাই তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভাল-বাসিয়া প্রেমাকুল-চিত্তে আপনাদের জীবন মন শরীর সমস্তই তাঁহার পাদপদ্মে লুটাইয়া দিতে সমর্থা হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের ভগবদ্বুদ্ধি আদৌ ছিল না, জার-বুদ্ধিমাত্র ছিল, তাঁহারা ভ্রান্ত। আমি এইটুকু মাত্র তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধটি যেন ভাল করিয়া পড়িয়া দেখেন। কয়েকটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম!

ধন্যা অহো অমী আল্যা গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥

গোবিন্দের পদরেণু অতি পবিত্র, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও লক্ষ্মী দেবী পাপস্খালনের নিমিত্ত এই সকল মস্তকে ধারণ করেন, আইস আমরা এই সকল পুণ্যপ্রদ চরণরেণুতে স্নান করি। গোপীগণ বলিতেছেন ঃ—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্ব গুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান সাত্বতাংকুলে॥
বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি ধূর্য্যতে চরণমীয়ুষাং সংসৃস্মৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্তকামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্॥
ব্রজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং, নিজজনস্মর ধ্বংসনস্মিত।
ভজসাথভবৎ কিঙ্করীস্মনো, জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

'তুমি যশোদার নন্দন নহ, যাবতীয় প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী তুমি, ব্রহ্মার প্রার্থনীয় বিশ্বের পালনের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমরা তোমার ভক্ত, অতএব আমাদের প্রার্থনা পূরণ কর। হে যদুকুলধুরন্ধর! যাঁহারা সংসার ভয়ে তোমার চরণে শরণ ল'ন, তোমার করপদ্ম তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়া অভিলাষ পূরণ করে; ঐ করকমল আবার কমলার হস্তধারণ করিয়া থাকে, তুমি আমাদের মস্তকে ঐ করপদ্ম দান কর'। কেবলমাত্র জার-বুদ্ধিতে লোকের এতটা অনুরাগ হইতে পারে না; যদিই বা হয় তাহা সুচিরকাল

স্থায়ী হয় না। শরীর মাত্র সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে নির্ম্মল অনুরাগ আসিবে না ত! হৃদয় নির্ম্মল না হইলে জ্ঞানোদয় হয় না।

"জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"

'তত্ত্ব বিচার সহ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা তমের ক্ষয়প্রাপ্ত ও চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান আপনিই উদয় হয়।' অজ্ঞানীর অনুরাগ কামান্ধতা মাত্র! চিরদিন একটা মানুষের গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু রূপ তো চিরকাল থাকে না। সুতরাং রূপের মোহে যাহারা ভালবাসে, রূপ ফুরাইলেই তাহাদের ভালবাসা ফুরাইয়া যায়। কিন্তু এই দেহতটে যে রূপের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে, যাহারা সেই অরূপ-সমুদ্রের রূপ-তরঙ্গকে দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে আর সে রূপ কোন দিন ফুরায় না। সে অফুরন্ত নবীনতা সে অনন্ত যৌবন, সুতরাং অফুরন্ত উপভোগ তথায় বর্ত্তমান! মনঃপ্রাণ সেখানে কিছুতেই ক্লান্তি অনুভব করিতে চাহে না।

অনেকবার যে জিনিষটাকে আমরা পাই, বা ইচ্ছা মাত্রেই যে জিনিষটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিতে পারে, তাহার প্রতি আর আমাদের তেমন অনুরাগ থাকে না, কিন্তু যাঁহাকে আমরা পাইয়াও সবখানি পাই না, যাঁহাকে ধরিয়াও সবখানি ধরা যায় না— নাহং মন্যে সুবেদেতি, নান বেদেতি বেদ চ' যাঁহার শ্রীঅঙ্গের রূপ কালাদি কর্ত্তৃক বিধ্বংসিত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্য যাঁহার মধ্যে নিত্য নব নব ভাবে বিস্ফুরিত, মাধুর্য্যরসের সীমা নির্দ্ধারণ যাঁহার মধ্যে কেহ করিতে পারে না, সেই অ-ধর অ-রূপ চির-সুকুমার চির-যৌবন-সম্পন্ন অপূর্ব্ব রূপবান্ চিন্ময় পুরুষটিকে চিরকাল পাইয়াও আবার চিরকালই পাইতে ইচ্ছা করে! সরোবরে কমল ফুটিয়া আছে, বা বাগানে গোলাপ ফুলটি ফুটিয়া আছে দেখিলে জ্ঞানহীন বিচারহীন শিশুরও ঐ কুসুমের পানে লোভ না হইয়া যায় না। যাহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, কিংবা যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত বিষয়-বিজড়িত, তাহারা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য তেমন করিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, সম্মুখে ঐ যে ফুটন্ত ফুলের সৌন্দর্য্য ও সুরভি তাহার প্রাণের মধ্যেও কি এক অপূর্ব্ব মাধুরী ছড়াইয়া দেয়, যেন তাহাদের কোন সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দেয়, যেন তাহাদের প্রাণের কোন ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়িয়া যায়! যখন প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই এতটা আকর্ষণ অনুভব করা যায়, তখন যিনি এই বিশ্ব প্রকৃতির অধীশ্বর, সমস্ত সৌন্দর্য্য

মাধুর্য্যের নিত্য নব নির্ঝর, যাঁহাকে দেখিয়া পশু পক্ষীরও আনন্দলাভ হওয়া সম্ভব, সুতরাং মানবী গোপিকারা যে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে উন্মাদিনী হইয়াছিল ইহা তো নিতান্তই স্বাভাবিক! ভক্ত তো সেই জন্যই কাঁদিয়া বলেন।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর!"

তাঁহার নাম ও রূপ এই বিষয় বিশালী চিত্তকে এত প্রবলবেগে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করে. যে তখন "আমি কে" একথা যেন ভুলিয়া যাইতে হয়।

"সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ"।

ভক্তের তখন এইরূপ অবস্থা, এ সময়ে কি আর জাতি কুল মানের কথা মনে থাকে?

আর এক কথা, যিনি সর্ব্ব জীবের মধ্যে "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা," যিনি আমার মার মধ্যে মা, পিতার মধ্যে পিতা, স্বামীর মধ্যে পতি রূপে বিরাজিত, যিনি সর্ব্ব দেহের মধ্যেই সেই আসল মানুষটি, তাঁহাকে যদি কেহ ভালবাসে তবে তাহাতে তাহার নৈতিক আধ্যাত্মিক কোন দোষই ঘটে না। আমরা সকলেই তো তা'ই করিয়া থাকি। সকলেই ভগবানকে সুহৃদ্, পতি, প্রভু, ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাঁহাকে প্রত্যহ পূজা করেন, ও তাঁহার পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করেন। আর গোপবালাগণ মনঃপ্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াই একবারে জঘন্য কার্য্য করিয়া ফেলিল তবে কিরূপে? যাহা আমাদের বেলায় ঠিকই হয়, তাহা তাহাদের পক্ষেই বা উল্টা হইবে কেন? অতএব তাহারা পতিকে উপেক্ষা করিয়াও যে তাঁহাকে ভজনা করিয়াছিল, ইহাতে দোষের কিছুই হয় নাই, এবং পতির নিকটেও তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসিনী হইতে হয় নাই। বিবাহিত পতিকে লঙ্ঘন করিয়া উপপতির প্রতি প্রণয়ের ন্যায়, ইহা ব্যভিচার নহে! ইহা সকলকে ছাড়িয়া ধন, জন, গৃহ, মান, স্বজন, বান্ধব, পতি, পুত্র সমস্ত ছাড়িয়া—এক তাঁহাকে চাওয়া! এরূপ চাহিতে পারিলে তো হয়! তিনি যে পরমাত্মা—তিনি যে ভুবন-জন-মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ—তিনি যে সকলের মধ্যেই সব হইয়া বসিয়া আছেন। পতির মধ্যেও যে তিনি আসল পতি—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়ণেনেহ দেহভাক্॥

একথা ভুলিলে চলিবে কেন যে তিনিই সর্ব্ব যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর, তিনিই একমাত্র "সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"। গোপিকারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিত; তাহারা শুধুই রূপে মুগ্ধ হইয়া পরপুরুষ বোধে তাঁহাকে ভজনা করে নাই। গোপিকারা বলিয়াছেন—

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন
সম্মোহিতার্য্যা চরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্গো দ্বিবা দ্রুম মৃগা পুলকান্য বিভ্রন"॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবিগৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥

আর একটা কথা গোপিকাদের স্বপক্ষে বলিবার আছে। আপনাকে আপনি সকলেই ভাল বাসে। আপন আত্মার অধিক প্রিয় জগতে আর কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ 'পরমাত্মা'; তাঁহাকে মানুষ মনে করিয়া দেখিলে চলিবে না, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

তিনি যখন আত্মা তখন তো তিনি সর্ব্ব জীবেরই অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং গোপিকারা যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণানুগতা হইবে, ইহা তো অত্যন্তই স্বাভাবিক! ইহাতে বরং তাঁহাদের বরণীয় চরিত্রকে আরও বরেণ্য করিয়াই তুলিয়াছে!

বস্ত্রহরণের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব রহস্য আছে। এইবার বস্ত্রহরণের সেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব!

পশু-প্রকৃতি জঘন্য ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ যাহারা, তাহাদেরই স্ত্রীর উলঙ্গবেশ

অনাবৃত গাত্র দেখিলে আনন্দ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যিনি লোক-শিক্ষক জগদ্গুরু, পূর্ণাবতার, আপ্ত-কাম তাঁহার আবার ইহাতে কি আনন্দ হইবে? তিনিই যে 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ' তিনিই যে প্রত্যেক রূপের সদৃশরূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং তাহার বহির্দ্দেশেও বিদ্যমান আছেন"—যিনি সকলের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, তাঁহার আবার এ কৌতুকের আবশ্যক কি? কিন্তু ভাগবতের এই শ্লোকটি পড়িলে মনে হয়, বুঝিবা গোপবালাদের উলঙ্গ বেশে তাঁহার কিছু তৃপ্তি হইয়া থাকিবে।

"ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ" ॥

ভগবান্ কহিলেন "হে সুহাসিনীগণ! যদি তোমরা আমার দাসী, আমার আজ্ঞা তো প্রতিপালন করিবে। তাহা হইলে আমি আজ্ঞা করিতেছি, এই স্থানে উঠিয়া আসিয়া আপন আপন বস্ত্রগ্রহণ কর"! শ্রদ্ধার চক্ষে এ কথাগুলি না দেখিয়া যদি বাহিরের দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে যেন কেমন কেমন ঠ্যাকে। দেহাত্ম-বুদ্ধি বদ্ধজীব আমরা, আমাদের দেহের কথাই মনে পড়ে। ভুলিয়া যাই যে শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্, সকল জনগণের হৃদয়বল্লভ পরমাত্মা। আমরা যেমন আপনাদের কাছে লজ্জিত হই না, সব দেহেই যে তিনি তাঁহারই বা কেন ইহাতে সঙ্কোচ আসিবে? ইহাতে যে তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল, তাহা সত্য। কিন্তু সে আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, তাহাতে ইন্দ্রিয়জনিত আনন্দের গন্ধও নাই। সেই জন্যই বস্ত্রহরণের গভীর সত্যটির আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা করিব! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা এ রাজ্যের কথা নহে, উহা পরম পুরুষের নিত্য চিন্ময় লীলা; স্থূলভাবে ইহাকে দেখিলে স্থূলশরীর ও তাহার ভোগের কথাই মনে হইবে। তাই এ লীলার কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ্য নহে। কেন না উহা সকলের বুদ্ধিগম্য নহে। গুরু-কৃপা ও সাধনবলে যাঁহার দোষ-দৃষ্টি অপগত হইয়াছে, স্থূলদেহাদিতে যাঁহারা অভিমান শূন্য, যাঁহাদের হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট-প্রায় হইয়াছে তাঁহাদেরই এ লীলা শ্রবণের অধিকার আছে! অধিকার তত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলারসাস্বাদনে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা অমৃতের সাক্ষাৎ পাইবেন না; পরন্তু বিষ-ভক্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া আপনার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট করিবেন!

আমাদের মন রজস্তমোগুণে বাসনা-বিক্ষোভিত এবং নিদ্রালস্যের বশবর্ত্তী হইয়া হইয়া আপনাকে আপনি বুঝিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে

প্রধাবিত হইতেছে। সংসার-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া কেবল স্ত্রী পুত্র পরিজন ও অর্থ সম্পদের চিন্তায় সে ব্যাকুল। জন্ম মৃত্যুর জরাব্যাধির প্রচণ্ড দাহনে নিরন্তর সন্তপ্ত! তবুও সংসারের মায়া কাটাইয়া, যিনি এই বিচিত্র সংসার-লীলার প্রবর্ত্তক ও অধিনেতা তাঁহার চরণাশ্রয় করিতেছে না; এমনই মোহ!! পদে পদে ব্যর্থমনোরথ হইয়া রোদন করিতেছে, তথাপি বিষয়াসক্তির হ্রাস হইতেছে না। এমনই নিদারুণ বিষয়তৃষ্ণা। সাধারণতঃ সকল মানুষেরই এই অবস্থা! এই মানুষই আবার যখন অচিন্তানীয় ভাগ্যফলে তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সন্তাপ ভোগ করিয়া তাহার অগ্নিময়ী জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরে, তখন এই সমস্ত বিষয়াদির অতীত একটি অবিষয় অবস্থার পানে তাহার প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহে। নিরন্তর দুঃখ-দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একটু শান্তিময় স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে তাহার স্বাভাবিকই আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। অবসাদময়ী মৃত্যুর দারুণ দুঃখময়ী অবস্থা স্মরণ করিয়া, অমৃত লাভের জন্য ব্যাকুলতা স্বতঃই জীবের প্রাণ পরিস্ফুট হইতে থাকে। তখনই সে কাঁদিয়া বলে "সর্ব্বদুঃখ-মোচনকারী সর্ব্বানন্দ-নিলয় কোথা তুমি ভগবান্ আমাকে পরিত্রাণ কর"। ব্যাকুলভাবে এইরূপ ডাকিতে ডাকিতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধাদি-সম্পত্তি লাভ করে। তারপর ভগবৎ প্রেরণায় সাধু মহাজনের সাক্ষাৎকার লাভ করে। তখন তাঁহার উপদেশে মনের ভ্রম বিদূরিত হয়, নিত্যবস্তু লাভের জন্য প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে এবং সাধুপদিষ্ট পন্থায় ভগবদ্দর্শনের দ্বারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মায়াপাশ কাটাইবার সম্বল সংগ্রহ করিতে থাকে! কিন্তু যে সংসারকে সে এতদিন ভজনা করিয়া আসিয়াছে তাহার মায়াগণ্ডী ও আকর্ষণ অতিক্রম করা প্রথম প্রথম তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না! কারণ পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়গুলির চিন্তা মন একেবারে ছাড়িতে পারে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ বিক্ষেপ আনয়ন করিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলে!

কিন্তু পুনঃ পুনঃ স্মরণ কীর্ত্তন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও তৎপাদাভিবাদন করিতে করিতে চিত্ত সরস ও সবল হইয়া উঠে! এইরূপে মনে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। তখন জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রেমের সঞ্চার হইতে থাকে, এবং মায়া-যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে ভক্ত সাধক যখন ভগবানের কাছাকাছি হন ও নিতান্ত অন্তরতর রূপে তাঁহাকে বুঝিতে পারেন, তখন এক অজানা দেশ হইতে আনন্দের সুশীতল বায়ু বহিতে থাকে, কে যেন সেই আনন্দ-রসসিন্ধুকে বুঝিবার জন্য চিত্তকে

উন্মুখ করিয়া দেয়। এইরূপে সাধকের চিত্ত, সীমাকে ছাড়িয়া অসীমের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে, তখন ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া কাণ্ডারী হন। তখন চৈত্য-গুরুর আবির্ভাবে ভক্ত সাধকের হৃদয় নির্ম্মল শুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠে। কোথাও তখন অপূর্ণতা থাকে না, সকলের মধ্যেই তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়, সমস্ত অভাব অভিযোগ, হৃদয়ের ধুকধুকানি মিটিয়া যায়! বিশুদ্ধ আনন্দ ও জ্ঞান তখন ভক্ত সাধকের চিত্তকে বেষ্টন করিয়া থাকে, এবং তাঁহাকে পরমানন্দ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী করে।

গোপিকারা সেই ব্রহ্মান্বেষমানা ভক্ত-সাধিকা! বহু জন্মের সুকৃতি-কালে তাহারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে চৈত্য-গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুজন্ম ধরিয়া এই কামনা (পরমাত্মসঙ্গলাভ) তাহাদের চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতেছিল। এইবার তাহাদের সাধনা সিদ্ধিলাভের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। অবশ্যই তাহাদের মন তাহা হইলে, পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। তবে কি এতদিনে তাহাদের *মায়ার বন্ধন সব খসিয়া পড়িল? মনের কোন দিক্, কোন ক্ষুদ্র কোণে* একটু অভিমান আবর্জ্জনা অহং-বুদ্ধিত' আর লাগিয়া নাই? লাগিয়া আছে; সেইটুকু ঘুচাইবার জন্যই ভগবানের এই অদ্ভুত লীলা। সত্যব্রত ও শুদ্ধসত্ত্ব না হইতে পারিলে কেহ তাঁহাকে পাইতে পারে না। কারণ তিনি যে সত্য-স্বরূপ, সত্য ও তপস্যাদ্বারাই তিনি লভ্য। আমার মধ্যে এতটুকুও অসত্য থাকিতে তিনি ধরা দিবেন না। হে সত্যস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার, আমার প্রাণের মধ্যে তুমিত তোমার সত্য-মূর্ত্তিটিকে প্রকাশ কর। হে পরম সত্য, তুমি কৃপা না করিলে কে এই অসত্য হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? "অসতো মা সদ্গময়"। তমসো মা জ্যোতির্গময়।

গোপীদিগের গুরু পরম-সখা শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন! অনন্তকাল হইতে তিনি চিদ্ বিমুখ জীবকে তাঁহার পানে আহ্বান করিতেছেন; জীব তাহা শুনিয়াও শুনে না! নিজের অহং অভিমানে মত্ত হইয়া তাহার বাঞ্ছিতের পানে বিমুখ হইয়া সে বসিয়া আছে! কিন্তু যে একবার মন দিয়া সেই বাঁশী শুনিল তখন, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যায়, আর তার সংসার মুখ হইবার উপায় নাই। এই বাঁশীর সুরে মনঃ প্রাণ ভরিয়া উঠে, চিত্ত হইতে বিষয় বাসনা খসিয়া পড়ে, সেই অপূর্ব্ব বংশীবাদকের নিকটস্থ হইবার জন্য,—তাঁহার সুচারু চরণে ধন মান জীবন যৌবন সমস্তই লুটাইয়া দিবার জন্য,—এক প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়!

যাহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, সেই তাঁর বংশীধ্বনি শুনিতে পায়। যোগীরা আপনাদের হৃদয় গুহার মধ্যে এক মধুর ধ্বনি শুনিতে পান ; তাহাকে প্রণবধ্বনি বলে। সে ধ্বনি যখন শ্রুত হয় তখন চিত্তের বহির্মুখবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া থাকে। অব্যক্ত হইতে সে ধ্বনির উত্থান এবং অব্যক্তে যেমন লয় হইতে থাকে, তেমনি মনও সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ করে। প্রণবের এমনই মধুর নিক্কণ যে শুনিলেই অন্য কিছু আর ভাল লাগে না, সেই মধুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় হইয়া যায়। এই বংশীরব সর্ব্বদাই শুনিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাঁশী তো সকল সময়ে শুনা যায় না। সুতরাং যে সময় বাঁশী শুনা না যাইবে, সে সময় আবার চিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন হইতে থাকে। ভক্ত সাধক সমস্ত সংস্কার হইতে আপনার চিত্তকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান, এবং তজ্জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত হ'ন। কিন্তু তথাপি সংস্কার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। ভগবান্ যখন দেখেন সাধ্য সাধনা করিয়াও ভক্ত আর পারিয়া উঠিতেছে না, তখন সংস্কারের সেই আবরণ টুকু তিনি স্বয়ং আসিয়া হরণ করেন। এতই তাঁর দয়া। একবার যে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়াছে, আর তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি থাকিতে পারেন না! এই জন্যই ভগবানকে লোকে পতিতপাবন বলে।

গোপিকাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। অন্য কোন আচরণ না থাকিলেও, বহু দিনের সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করা ত' সহজ নহে। বহুদিনের সেই সংস্কার-গুলিকে দেখিতে না পাইলে আপনাকে যেন নিরাশ্রয় ব'লিয়া মনে হয়। আবার সেগুলিকে পাইতে ইচ্ছা করে, মায়াকে ছাড়িতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। এখনও তাহাদের সমস্ত সংস্কার তো উন্মূলিত হয় নাই, পরমাত্মার সঙ্গ-লাভের যোগ্যতা হয় নাই। এখনও আপনাকে ভুলিতে পারে নাই! আপনা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ আর তবে কবে হইবে? এখনও শরীর বন্ধন, লজ্জা ভয় উদ্বেগ অভিমান তো নিরস্ত হয় নাই। এখনও যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে চাহিতে পারে নাই, আবরণ মুক্ত হইয়া নিরাবরণ হইতে পারে নাই। তখন সেই জগদ্গুরু প্রেমময়ী একবার জীবের একান্ত প্রিয় বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন— "ওগো সখী, ওগো আপনাকে ভুলিয়া আমার কাছে এস দেখি।" 'প্রভু! আপনাকে কিছুতেই তো ভুলিতে পারিতেছি না, কি করিয়া সব ছাড়িয়া মনকে উলঙ্গ করিয়া তোমার কাছে যাইব? সংসার-হ্রদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া ক্লেশ পাইব, তবু আপনাকে ভুলিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করি, এ শক্তিতো এখনও হয় নাই। তবে কি হইবে নাথ! তবে জন্ম জীবন সবই যে ব্যর্থ

হইল! জীবের এইরূপ আকুলতা দেখিলে ভগবানই তাহার উপায় করিয়াছেন।

মনের অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায়! ভগবানকে না পাইলেও নয়, অথচ সংসারের প্রতি সবখানি টান একবারে যাইতেছে না! এ সময় সাধকের প্রাণান্তকর যাতনা হইতে থাকে! গোপিকারা ও কাতরকণ্ঠে তাই বলিয়াছিল "হে শ্যামসুন্দর আমরা তোমার দাসী, আমাদিগের শীতে কষ্ট হইতেছে, বস্ত্রগুলি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।" অর্থাৎ ভগবানও থাক, আবরণও থাক এই জীবের ইচ্ছা! কিন্তু ভগবান্ ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন "তোমরা আমাকে চাও, না আপনাকে চাও? যদি আমাকে চাওতো আমার আজ্ঞা পালন কর। এস, একবার নিরভিমান হয়ে আমার নিকটে এস, একবার সব ভুলিয়' চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে বিস্মৃতির জলে ভাসাইয়া সংস্কার-শূন্য নিরাবরণ হইয়া আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াও। তোমায় চিরদিন যে আমাকে কামনা করিতেছ, তাহা হইলে তোমাদের চিরবাঞ্ছিত চিরসঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা আজ পরিপূর্ণ হইবে।"

অন্য কাহারও নিকট নহে, তাঁহার নিকট হইতে যখন এই আহ্বান জীবের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসিয়া পৌঁছায়, তখন সে অভিসার-মুখী প্রবৃত্তিকে কেহ আর নিবৃত্ত করিতে পারে না। প্রাকৃত মানব মদন-শরে আহত হইয়া যেমন উন্মত্তের ন্যায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়, আজ ইহারাও তদ্রূপ মদনমোহনের মদনশরাহত। আজ কি আর তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়া সংসারকে ভজনা করিতে পারে? তাই কৃষ্ণ-কামিনী প্রেমময়ী গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা হইয়া, সব ফেলিয়া, সর্ব্বশূন্য হইয়া সর্ব্বপূর্ণকে লাভ করিবার জন্য, তাঁহার চরণতলে ছুটিয়া আসিল। তাহারা উলঙ্গ হইয়া তাঁহার কাছে ব্রীড়াবনতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তবু যে সংস্কার মনের কোন এক নিভৃত কোণে বুঝি একটু লাগিয়া রহিল। তাই প্রেমময় সাহাস্যে বলিলেন "ওটুকু সংস্কারও ছাড়িতে হইবে, কোনও আশ্রয়কে সেই ধরিতে পাইবে না, অনন্যচিত্ত, হইলে তবে আমাতে পরিপূর্ণ আশ্রয় লাভ করিবে।" তখন মুগ্ধা গোপীরা তাঁহার মধুরবাণীতে মোহিত হইয়া একবার সেই নবনীরদনবীনকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া সহসা সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া, নিঃসঙ্গ হইয়া, দুই হাত তুলিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিল! তখন করুণাময় ভগবান্ প্রেমভরে গোপিকাদের আদর করিয়া বলিলেন "হে সাধ্বী সকল, আমি জানিতে পারিয়াছি যে আমার অর্চ্চনা করাই তোমাদের সঙ্কল্প; উহা আমার অনুমোদিত! অতএব

উহা সফল হওয়া উচিত হইতেছে। যাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাহাদিগের আর বাসনাজনিত ফল ভোগ করিতে হয় না। ভর্জ্জিত বা পক্কবীজের প্রায়ই অঙ্কুর উদ্গত হয় না! হে অবলাগণ। তোমরা ব্রজে গমন কর; সিদ্ধ হইয়াছ।"

> তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
> ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্প মাহদামোদরোঽবলাঃ॥
> সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
> ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥
> ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
> ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধান্যপ্রায়ো বীজায়নেষ্যতে॥
> যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধাময়েমাবংস্থথক্ষপাঃ।
> যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥"

কিন্তু একটা গোলের কথা আছে?

ভাগবতে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেইপ্রকারে অবনত হইতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সদয় হইয়া বস্ত্রদান করিলেন?

তবে তো মায়া-বসন আবার তাহাদিগকে পরিতে হইল। এত সাধ্য-সাধনার পর এত কষ্ট বহিয়া কি শেষে এই ফল ফলিল?

না সে ফল ফলে নাই। "ত্যাগাচ্ছান্তি নিবন্তরম্"—গোপিকায়া ত্যাগ ফল শান্তি, তাহা পাইয়াছিল! তাহারা মায়া ফি'রয়া পাইল বটে, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণার্পিত হওয়ায় বিশুদ্ধা বিদ্যা হইয়া গেল, যাহা বন্ধনের কারণ ছিল তাহা আনন্দ অমৃতরসে পূর্ণ হইয়া গেল? ভগবৎ পদে অর্পিত কর্ম্মের ন্যায় তাহা মুক্তির সৌভাগ্যলাভ করিল। ভক্ত তখন বন্ধনকে আর ভয় করে না, সে তখন মায়াকে ভগবৎপ্রসাদরূপে গ্রহণ করে? এই মায়া অভিমান ভগবানে নিবেদিত হইলে তাহাই লইয়া ভক্তরা প্রাকৃত লোকের মত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন? কিন্তু তৈলম্রক্ষিত গাত্রের ন্যায় তাহাতে মায়া-জল আর লাগিতে পারে না "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ"। সুতরাং নির্ভয়ে, তাঁহারা সংসারে তাঁহার ভৃত্যের বেশে বিচরণ করেন, এবং ভবিষ্যৎ পথ-যাত্রীদের জন্য কালের পাষাণগাত্রে আপনাদের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যান; এই লীলাই বাহিরের সহিত অন্তরের সসীমের সহিত অসীমের, অধিভূতের সহিত অধ্যাত্মের, জীবের সহিত শিবের, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বিলাস। অন্তর বাহির এক করিয়া, সর্ব্ব

জীবকে শিবজ্ঞান করিয়া সমস্ত আত্মার মধ্যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে, সেই "সর্ব্বকে" পরমাত্মরূপে সাক্ষাৎ করিয়া সাধক পরমা তৃপ্তিকে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হন। যতদিন এই মিলন না হয়, ততদিন অভিমান-আবরণে আমরা আচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে ভাল থাকি, নিজেকে অনাবৃত নিঃসঙ্গ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে সঙ্কোচ অনুভব করি। ততদিনই অপূরণীয় কামনা পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করে, ততদিন সমস্ত এ বিশ্ব-রহস্য আমার নিকট অস্পষ্ট অজ্ঞাত ও অনুপলব্ধ থাকে, ততদিন মান, অভিমান, সহস্র ভেদ-সাগরে উত্তাল-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে। যখন জীব সংসারে সুখশান্তি না পাইয়া কামনানলে দগ্ধ হইয়া রোদন করিতে থাকে, যখন সে এক পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই তৃপ্তিকর শান্তিদায়ক বলিয়া মনে করিবে না, তখন সে সব ফেলিয়া আপনাকে ভুলিয়া কেবল তাঁহার প্রেমের ভিখারী হয়—তখন সে পরিপূর্ণ নির্ভরতার সহিত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া করযোড়ে আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে নিবেদন করে।

"একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়?
আপন বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।"

"প্রভু দেখ যেন আমাকে চরণে ঠেল না, দাসী বলে মনে রেখ।" ভক্তের মনের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখনই সে মায়াবরণ ভেদ করিবার উপযুক্ত হয়! পরমাত্মার সহিত রাসরস-সম্ভোগের তখনই যোগ্যতা লাভ হয়! যতক্ষণ আমি তাঁহাকে আপনা হইতে পর মনে করিব, ততক্ষণ তাঁহার নিকট সঙ্কোচতো থাকিবেই। যেমনি তাঁহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন মনে করিব, তেমনি তাঁর সহিত নিরন্তর যোগ অনুভব করিতে পারিব। আর তাঁহাকে পর বোধ হইবে না, পরমাত্মীয় বোধ হইবে। তখন ভিতর বাহির সমান, অভিমান তিরোহিত; আত্মাপরমাত্মায় তখন একাকার—ইহাই মহাতীর্থ সাগরসঙ্গম।

এস আমরা সেই পরমাত্মৈকনিষ্ঠা, প্রণতচিত্তা, কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকাদের প্রণাম করি, এবং তাঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মুক্তি পথে অগ্রসর হই!!

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

নীরব সাধক।

অসীম তোমার মন্দির দুয়ারে
নীরব সাধক আমি,—
নাই কিছু মোর দিতে হে তোমারে
পূজা-উপহার, স্বামি।
অসংখ্য তোমার ভকত সকল
কবে কত আয়োজন
তোমারে পূজিতে তুষিতে তোমারে
করিছে জীবন পণ।
সাধের বীণায় কেহবা তুলিছে
তোমার মহিমা গীতি
আজীবন কেহ জগতে ঢালিছে
তোমার করুণা প্রীতি।
কত সাধুজন সকলি দিতেছে
ধরার কল্যাণ তরে ;—
হিয়ার শোণিত সঁপিতেছে বীর
পূজার অর্ঘ্য ভরে।
আমিই শুধুগো একাকী দাঁড়ায়ে
লাজ অবনত শিরে
কিছু নাই দিতে—তাই প্রাণ মোর
ভরিছে নয়ন-নীরে।
ভগ্ন বীণার ছিন্ন তারে মোর
নাহি উঠে তব গান
কখনও তোমার সাধনা সাধিতে
জাগিয়া উঠেনি প্রাণ।
নীরস নিষ্ঠুর পরাণে আমার
দেখি নাই বিশ্বপ্রীতি
তোমার মহান্ আদেশ ঠেলিয়া
সেধেছি স্বার্থের নীতি।

সাধিতেছি তাই নীরবে অন্তরে
দাঁড়ায়ে মন্দির-তলে
দয়া করে আসি করহে গ্রহণ
আমায় নয়ন জলে।

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

চূড়ালার উপাখ্যান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একদিন চূড়ালা স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার উপাস্য কুলদেবতা আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গপ্রভায় গৃহটি আলোকিত, দেহ-সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। চূড়ালা প্রণাম করিল। ইষ্টদেবতা ধীরে ধীরে কহিলেন—

"সতি! তোমার কামনা আজ ফলবতী, সাধনা আজ মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার সম্মুখে আসিয়াছে। আমার আশীর্ব্বাদে, তোমার সংকল্প মুহূর্ত্তের মধ্যে ফল দিবে; তোমার বাসনা সম্পূর্ণ নির্ব্বধি, অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ, কার্য্য নির্ব্বিঘ্ন হইবে। তুমি পতির নিকটে এক্ষণে যাইতে পার; তুমি যাইলে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সফল হইবে। তোমার সাহায্য ব্যতীত, তাঁহার বাসনা নিবৃত্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। ঐ দেখ, মন্দরতটেতে তরুকোটরে তোমার স্বামী মহারাজ শিখিধ্বজ পদ্মাসনে তপস্যা-রত। তাঁহার চিত্ত পরমানন্দে লীন। নিস্তরঙ্গ মহাসাগরের মত শিখিধ্বজ আজ অক্ষুব্ধ, নির্ব্বাত দেশস্থ প্রদীপের মত আজ নিশ্চল। কিন্তু প্রারব্ধ ভোগের এখনও বাকী আছে। তাই চূড়ালা, বৎসকে আমার ঐ ভোগের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যথা সময়ে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।"

মেঘ কাটিয়া গেল; চূড়ালা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল মধ্য আকাশে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত। জ্যোৎস্না-সলিলে মুহূর্ত্তেই আকাশপথ পৃথিবীতল প্লাবিত হইয়া উঠিল। চূড়ালার ইচ্ছা হইল সে একবার সুনীল আকাশ-পথে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া, মেঘের উপর পাড়ি দিয়া, একবার বিচরণ করে। সংকল্পমাত্র চূড়ালা দেখিল সে আকাশপথে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে নীলাঞ্চলাবৃত গাত্র। সিতাভিসারিকার

দল পাঁকে পাঁকে শূন্যের উপর নীলপথ বাঁধা ফুটাইয়া দিয়া কান্তাভিসারে যাইতেছে। চূড়ালার সর্ব্বাঙ্গ জ্যোৎস্না পড়িয়া শুভ্রতর হইয়া উঠিতেছিল, স্বর্ণালঙ্কারগুলি বিদ্যুৎপ্রভায় ঝলমল করিয়া দীপ্তি পাইতেছিল, কৌমবাস বাতাসের মৃদুমন্দ চলনে শূন্যপথে ব্যজনের কার্য্য করিতেছিল। চূড়ালা ক্রমেই যেন উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তাহার পদতলে পৃথিবী একখানি মানচিত্র মত দেখাইতেছিল। ইন্দ্রজাল স্পর্শে চূড়ালার কি যেন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল।

রঙ্গমঞ্চে নিমিষের মধ্যে দৃশ্যপট অন্তর্হিত হইয়া গেল। নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য-পথের সেই স্থানে অবতারণা দেখা দিল। ধৈর্য্যশীল সহৃদয় পাঠক একে একে তাহার পরিচয় পাইবেন। ধীর মন্থর গতি দেখিয়া হতাশ্বাস হইবেন না, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

প্রেম-মণি।

প্রেম কল্পতরু খুঁজিতে খুঁজিতে ছুটিনু মরুর পথে,
গরল ভখিনু, প্রেম মধু আর মিলিল না কোন মতে।
নিজ নাভিবাসে আকুল পিয়াশে মৃগ সে ছুটিয়া মরে—
সতত যা পাশে যায় তারই আশে দূর সুদূরেতে সরে!
মরমে বিরাজ তুমি প্রেমমণি, নাহি চাহি সে হৃদয়,
মুগ্ধ মৃগসম ঘুরিয়া মরিনু জীবন-কানন ময়!
কাঁদিলাম কত হাহাকার করি—কোথায় বাঞ্ছিত ধন?
বিফলে যায়রে জীবন জনম, বিফল সকল শ্রম!
আজি দেখিলাম তোমার জগতে ব্যর্থ কিছুই নহে
পরাজয় প্রভো, পশ্চাতে থাকিয়া বিজয়-গৌরব বহে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

শ্রীভ্রান্তশর্ম্মার পত্র।

(১ম পত্র)

সবিনয় নিবেদনমেতৎ পরে সমাচার এই যে আমি শ্রীকমলাভ্রান্ত শর্ম্মা, ৺কমলাকান্তের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার নামটা কিছু আপনার কেমন কেমন লাগিবে। তা' লাগুক্, কি করিব; অর্থশূন্য নাম গ্রহণ ও টাকার তোড়ার বদলে ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ সমান। বিশেষতঃ পিতামাতা আমার অতি শৈশবে, যখন আমার দাঁত হয় নাই, আমি কথা বলিতে পারি না, চলিতে পারি না, কেবল শুয়ে শুয়ে হাত পা নাড়াচাড়া করি,—তখন যে নাম করিয়াছিলেন, সেই পরাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া এখন আমি লোক-সমাজে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি না। এখন আমি চলিতে পারি, বলিতে পারি, শক্তদন্তপাঁতিতে কচি পাঁটার হাড় চিবাইয়া ভাঙ্গিতে পারি। সুন্দর দাঁড়ি গোঁফ আমার এই সুন্দর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বদনকমলে এখন শোভা পাইতেছে, এ অবস্থায়, যখন সে কালের সকলই বদলিয়া গিয়া'ছে, সেই অবস্থার সেই পুরাতন 'খোকা' নামটী কোলে করিয়া কেন বেড়াইব? ঐ নামটা আমার পক্ষে নিরর্থক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ নামটা মনে পড়িলে আমাকে আবার খোকা বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এত বড় হইয়া খোকা হইতে আমি নারাজ। তা'ই উহা আমি ত্যাগ করিয়া নূতন নাম লইয়াছি। বিশেষতঃ দেশের বড় বড় কৃতিমান্ ব্যক্তিগণ সেকেলে নাম রাখাটা ঘৃণা করেন।—যেমন দেখুন এই একটু ইংরাজি-ধরণে, সেকালের 'কৃষ্ণজীবন বিশ্বাস' মহাশয় কেমন সুন্দর 'কে জে বিশ্‌ব্যাশ্‌' হইয়াছেন, বশ নূতন হইলেও অনেকটা পুরাতনের গন্ধ আছে। আমি কিন্তু সেই গন্ধটুকুও রাখিতে চাই না। কিন্তু একটা গোপন, অতি গোপন, কথা হচ্ছে এই যে, নামই বদলাই আর চেহারাই বদলাই, কিন্তু আমি সেই খোকাই যে এই কমলাভ্রান্ত শর্ম্মা (আজকালকার হাল ফ্যাসানে) বাবু হইয়াছি। এই দারুণ অন্ধবিশ্বাসটা কোন রূপেই ছাড়াইতে পারিতেছি না, ও পাপ সর্ব্বদাই আমায় পেঁছনে গেলেই আছে। আপনি "থিয়সফিকেল সোসাইটীর" সভ্য; আপনার 'পন্থা'ও আগে থিয়সফিক্যাল সভার কাগজ ছিল। সেও এখন নাম না বদলাইয়াও তিন বৎসর যাবৎ 'ভেল বদলাইয়া বসিয়াছেন দেখিয়া আমার একটু একটু আশা হচ্ছে, আপনার নিকট স অর্থ সহযোগে বি, বিশেষ রূপে (নম্র) নী প্রাপণে অর্থাৎ বিশেষরূপে আনুগত্য সহযোগে (নি+বিদ, নিয়+অনট) নিকৃষ্ট বেদন, অর্থাৎ যে বেদন আমাকে

কোনও রূপেই ছাড়িতেছে না, এই যে আমি সেই খোকাও আমি, আর এই পঁচিশ বৎসরের যুবকও আমি, সেই এক আমিই আছি, ইহা, আমার এই ভে'লটা 'পল্টার' মত করিয়া বদলাইয়া দিন। আমার সেই পুরাণ নাম নেওয়া দরকার হইলে তাহাতে নারাজ নই। তবে কিনা জানেন ঐ নামটা থেকেই সেই 'খোকা খোকা' ভাবটা জেগে উঠে, এই যা দোষ।

আমার সঙ্গে কমলার সঙ্গে চিরকালের বিবাদ। যেমন চাঁদ সদাগর আর পদ্মাবতী ছিল। কমলা বড় চঞ্চলা, চপলা! আমি ওটা আদৌ ভাল বাসিনা। তিনিও আমার কাছে এসে কোন দিন উদয় হন নাই, তাই আমা কর্ত্তৃক কমলা ভ্রান্ত বলিয়া না হইলেও কমলা কর্ত্তৃক আমি ভ্রান্ত, যে ভাবেই সমাস করুন অর্থটা বেশ নিষ্পন্ন হয়, আমারও এইটা বেশ সার্থক নাম হয়। দেখুন অনর্থক নাম রাখা ভাল নয়। ওগুলি মিথ্যা কথা। আর অর্থশূন্য কথাটা কথাই নয়, বাবা মায়ের অর্থাৎ হরগৌরীর মিলনের ন্যায় বাগার্থ মিলিত। বাবা মহাশয় হচ্ছেন বাক্ ও মা হচ্ছেন অর্থ; অর্থ শূন্য হ'লে বাবা মায়ের মিলনটা ভাঙ্গিয়া দিলে বিষম অনর্থ ঘটিবে যে।

এই সংসারে কত নির্দ্ধন পুত্রের 'ধনপতি' নাম,
কত 'অমর' যে মরিল তাও দেখিলাম।
কত যে 'লক্ষ্মী' কুড়ায় ঘুঁড়া।
কত কাণা কন্যার নাম 'আসমান তারা'॥

ইহা ভিন্ন ও কত নিরেট বোকা 'জ্ঞানেন্দ্র', কত পর্ণকুটীরবাসী 'রাজেন্দ্র', কত উন্মাদ 'চিন্তাহরণ', কত 'অলব্ধ বেদান্ত খগেন্দ্রনাথ' দেখিলাম তার সীমা নাই। তবে দুই একটী সার্থক নামও দেখিয়াছি যেমন 'প্রমদাচরণ', 'বামাচরণ'; বেশ নাম গুলি। তাঁদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে একি তাঁদের পিতামাতার দেওয়া নাম, না স্বকৃত? কিন্তু 'ভুজঙ্গধরের' নামটার একটু সন্দেহ রহিল; সমাসটা ও ব্যাসবাক্যটা ঠিক হচ্ছে না। ভুজঙ্গধর অর্থে যদি মহাদেব হন, তবে নামটার সহিত কাযের মিল পাই না, কারণ উঁহার গদ্যপদ্য লেখাগুলি পড়িয়া 'বংশীধর' নাম হওয়া উচিৎ ছিল মনে লয়। যা হ'ক, কথাটা এই আমার 'আমি' বদলান চাই। আপনি যদি পারেন তবে আপনাকে গুরু স্বীকার ক'রে অনন্য-শরণ হইতে রাজি আছি। দেখুন এই 'আমি'-বদলানর জন্য আমি বাবা সদানন্দের সেবা আরম্ভ করিয়াছি। প্রথমতঃ মায়ের সেবা করিয়াছিলাম, অর্থাৎ 'জলপথে' চলিতাম; মায়ের কৃপা যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ আমিটা বদলাইত বটে,

কিন্তু অত পয়সা যোগাড় করিতে পারিলাম না। বাবা আশুতোষ,—অর্ণ ও সময় উভয় দিক্ দিয়া আশুতোষ,—আমার পরম দয়াল আশুতোষ তৎক্ষণাৎ দয়া করেন; দুইটী পয়সা হইলেই পুরা এক ছিলীম হয়। বেশ দম চড়াইয়া বসিলে 'আমি' একেবারে ছাড়ে না বটে, কিন্তু নানারূপের খেলা করে। কভু পশু হয়ে বনে বনে ঘুরি, কভু আকাশ হয়ে অনেক জীব বৃক্ষ পর্ব্বত নদী কোলে করিয়া বসি, কথনও বা ক্ষুদ্র পরমাণু হয়ে তুর তুর ক'রে নেচে বেড়াই। রাজা, বাদসা হওয়াত সহজ কথা, ওতে ত' আমি যেমন তেমনই থাকে। বাবা মহাদেবের কল্যাণে মাঝে মাঝে আমি 'তুমি' হয়ে যায়। আমার গাল চুলকাইতে পুষীমেনীর পিঠ চুলকাইয়া বসি;—পুষী বেটী নচ্ছার, এক আঁচড়ে আমার 'আমি' আমাকে ফিরাইয়া দেয়। বলব কি বেটী পিরীত জানে না। কিন্তু আমি যখন 'পুষী' হইয়া বসি, তখন বেটী বড় জব্দ থাকে, সে আমার পাশে ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন আমি আমার 'আমি' বদলাইতে যাইয়া ভারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। আমার ফটোতে আমাকে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, আমি ওরূপ কৃষ্ণবর্ণ নই। আমি বেশ মসি-বিনিন্দিত রূপবান, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অমাবস্যা-নিশিতে গা' ঢাকা দিয়া দেখেছি সহজে আমাকে কেহ ঠাহর করিতে পারে না। আমার মুরুব্বি,—হরেণবাবুর দেওয়ান মহাশয় আমাকে রোদে দাঁড় করায়ে আমার গায়ের ঘামে মসির অভাবটা সেরে নিয়েছেন; নিজের কাযে যে দোকানে যাই না, সেটা বলাই বাহুল্য। আপনারা আলোতে লুকাতে পারেন না, আমি কিন্তু আঁধারে বেশ ডুবে মিশে যেতে পারি। মায়ের এটাও বেশ দয়া; তাই মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমিও এখনও মায়ের গর্ভেই আছি। একদিন বাবা ভোলানাথের সেবায়, যখন দম্ পুরামাত্রায় চড়াইয়া গ্যাঁট্ হয়ে বসে আছি,—সমস্ত দুনিয়াময় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পাতাল, নদীনালা, পাহাড়, পর্ব্বত, সব ঘুরে ঘুরে একাকার হয়ে গেল; কিন্তু আমি ঠিক আমিই আছি। তখন দেখলাম জগতের আলো নিবে গেল, আমার রংটাই জগতের স্থায়ী রং,—আর আমার শরীরটাই সংসার দেহ। আর আমি এই সংসার দেহের একটী লোমকূপের গায়ে একটা কিম্ভূত-কি-জীব। হঠাৎ সেই লোমকূপটা একটা মহা সমুদ্র বলে বোধ হল, আর আমি ঐ সমুদ্রের মধ্যে ভাসছি। অনবরত ভাসছিই; কতকাল যাবৎ যে ভাসছি, তার সীমা নাই, সংখ্যাও নাই; আমি কেবল ভাসছিই। যাই মনে হল 'কেবল কি ভাসছিই দেখিত উপরে আকাশ আছে কি না?' ওমা

দেখি আকাশ নাই, জল নাই, অথবা সবই আকাশ, অথবা সবই 'জল বা জলাকাশ,—কেমন বলতে পারব না, তবু কেবল ভাসছিই ; এ কেমন ভাসা! আমার উপরেও যা', নীচেও তা', চারিদিকেও তা'। সে জল বটে, কিন্তু এই পৃথিবীর কোনও জলের সঙ্গে মিলে না ; সে আকাশ বটে কিন্তু এ আকাশের সঙ্গে মিল নাই। আমি আছি। যাই বোধ হওয়া 'আমি', অমনি দেখি সবই 'আমি'। দূর ও আমি নিকট ও আমি। যাই যাহা দূর বোধ হচ্ছে, ঐ বোধ হচ্ছে এই আমি। যাই যাহা কাছ বোধ হচ্ছে, ঐ বোধ হচ্ছে আমি একটুখানি, একবারে কিছুই না হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমিটা ঠিক আমি আছি। বাবার কৃপায় যাহার ভাগ্যে থাকিলে যে বুঝে সে বুঝে। সবটা আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না। আমার চেহারাটা তখন কি ছিল, তা' ঠিক বলতে পারব না; কারণ কোনও আয়না কিংবা পরিস্কার জল, কি কিছুই ছিল না, যে চেহারাটা ঠিক করে দেখি। তবে আমি ঠিক আমিই ছিলাম। যখন থাকবার মধ্যে আমি একাই সব, তখন ভেবে নিন্ আমার চেহারাই সব,সবই আমার চেহারা ; পশু,মানুষ, দৈত্য দেবতা, কোন চেহারাতে বন্ধ হওয়াটা আমি পছন্দ করি নাই। ও'ত ছোট হওয়া। মনে করে নিন্, দেখতে, শুনতে, কল্পনা করতে, বুদ্ধিতে যাহা একটা আসে সেটা বা কিছুই না অবাঙ্মনসগম্য একটা কিছু। যা'ক, এইরূপে কত শত সহস্র কোটী কোটী বৎসর চলিয়া গেল। যখনই বোধ হচ্ছে অনেক সময়, তখনই বড় অনেক বোধ হয়। আর যখন বোধ হ'ল, না এইত ক্ষণমাত্র, তখন কিছুই নাই। অতীত আর ভবিষ্যৎ নাই। সবটাই একটা বর্ত্তমান, যাকে ইংরাজি শিক্ষিত কর্ত্তারা ঐ কি Eternal Now বলে থাকেন। সেই একটা অকাল কুষ্মাণ্ড তা' যা'ক। শর্ম্মা ও সবার কোনও ধার ধারে না ; আমি আছিত আমিই। বস্। যাই বোধ হল আমি একা, অমনি দেখি সবই আমি ; আমি একাই আমি। যাই বোধ হল 'ঐ কে', বলে যাই তাকাইলাম, ওমা দেখি একটী খুব ছোট খোকা। ওঃ কত ছোট। ওমা এই যে সে কত বড়! সেই খোকাটী আমায় টুক্ করে রসগোল্লার মত গিলে ফেল্লে। । আমি খোকার পেটের ভিতরে এলাম। না, এও দেখি সেই ; আগে যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনই ভাসছি। ডুবে ডুবে ভাসছিই। খোকা যে আমাকে খেয়ে ফেল্লে তাওত ঠিক ; তবুও ঠিক তেমনই আছি। হতে হতে দেখি না একটা মস্ত বট পাতা ; সেটাও ঠিক আছে,—ভেসে কি ডুবে বলার সাধ্য নাই,—এর গোড়াও নাই মাথাও নাই। তবু পাতাটা আছে। আমি ঐ পাতার এক জায়গায় একটা 'আমি' হয়ে আছি। ঐ পাতায়

রসও ছাল খাচ্ছি, বেশ আছি খুব নেচে কুঁদে বেড়াই ; ভারি মজা। হঠাৎ একটা পাখীই বোধ হয় আমাকে খেয়ে ফেল্লে। আমি মরিলাম না ! পাখীর পেটেই না কোথায়—তা'ত বলতে পারি না,—গেলেম। আমি সেই ভাস্‌ছিই। জলে না আকাশে, জানি না। ভাস্‌ছিই। এখন কতবার কত কি হই, আর আমাকে খেয়ে ফেলে ; বেশ্ আমি মরি না। ও আমাকে মারবেই, আমিও মরব নাই। বস্, চলুক। এবার আমি সেই আমিই আছি আমি দেখলাম আমি একটা প্রকাণ্ড অণ্ড—আপনারা যাকে ডিম বলেন তাই, অর্থাৎ—'বাওয়া ডিম্ব' হয়ে আছি—; তার কেনো মাতাও নাই, পিতাও নাই বলেই বাওয়াডিম্ব। কিন্তু ডিম বলে আমাকে হাঁস, মুরগী, ঘোড়া বা হাতীর ডিম বা রসগোল্লার মত গোলাকার কিছু মনে করবেন্ না। এ'—একটা অখণ্ড মণ্ডলাকার ডিম্ব।

ফট্‌করে আমি ফেটে দুখানা হয়ে গেলাম। তা' কিন্তু ঠিক আমি ফাটা নয়,—ডিম ফাটা—। দুখানা হয়েও, আমি ঠিক আমিই আছি। মহাশয় গো, যাই একবার ফ'ট ধরা ত' আর যাবে কোথা ? ফর্. র-র-র—কেবল ফাটছে—ত' ফাটছেই। জর্ম্মণ যুদ্ধে কামান ফোটার মত ফর্-র্-র্, মিনিটে তিন লাখ। আমির এই ফাটা ব্যাপার, জর্ম্মণসংগ্রাম থেকে অনেক বড় কিনা। এত ফুটা ফুটিতেও, কিন্তু তোমাদের জর্ম্মণ কর্ত্তাদের মত খুন খারাপি নাই ; আছে কেবল আনন্দ তামাসা আর মজা, দেদার মজা। প্রথম যাই ফাটা, অমনি ফোটা। প্রথম'ত দুই, তারপর দুই থেকেই দশ, দশ থেকে শত সহস্র নিযুত কোটী অসংখ্য (volley) ভলি কে ভলি গোলা (গোলকার) বেড়িয়ে যাচ্ছে'ত যাচ্ছেই। আমি কিন্তু ঠিক আমিই আছি। এত যে বেরুচ্ছে, কিন্তু আমির গণ্ডি ছেড়ে কেউ যেতে পাচ্ছেন না ; সবগুলিই আমি ; আর সবগুলি নিয়েও আমি,—একটা আমি। এই যে দুই, দশ, শত, সহস্র, এ কিন্তু আপনাদের এক, দুই, তিন, চারের মত নহে। এটা আমাদের গোরব গণেশের ঘড়িগণার মত।

রাত বারটার সময় গোবরা মাণিক, চুরচুরে হয়ে ঘড়ি গণছেন, 'টং-এক'-টং এক-'টং-এক' সবই এক—একে একে দুই নাই। তেমন সবই আমি। একও আমি, সবও আমি, অনেকও আমি, সকলই আমি, আমি কেবল আমিই আমি। সে এক বিরাট্ আমি। অনেকগুলি জায়গা নিয়ে যে আপনাদের একটা— বিরাট্ মস্ত—এ তা নয়। আপনারা সূর্য্য-চন্দ্রের গতি দিয়ে যে কাল গণনা করেন সেরূপ—সূর্য্যের অনেক ঘুরপাক খাওয়া কালের অনেকগুলি ঘুরণি নিয়ে যে একটা মস্ত কিছু—তাও নয়। তবে একটা বিরাট্ আমি, তা'তে আপনাদের

ঐ স্থান, ঐ কাল, নিঃশেষে ডুবে যায়—কিছু থাকে না। তা'তে দুই বলেও কিছু নাই,—একও যে আছে তা নয়; আপনাদের কাছে কথায় বলছি বলে 'এক' 'দুই' প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার না করলে চলছে না। কোন এক মুনি ঠাকুরের কাছে কে একজন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিল। মুনিঠাকুব তার সঙ্গে আলাপ যা' করেছিলেন তা' বেশ, তার পব যাই সে জিজ্ঞাসা করলে 'ব্রহ্ম কেমন'? মুনি-ঠাকুর অমনি চুপ। মুনিঠাকুরের উত্তরটি বেশ হল; মানে কথায় তো বলা যায় না। আমার আমির কথাও কথায় বলা যায় না, ঠিক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মত; তবে কি না—আমার অনেক দায়!! দায়ে পড়ে বলতে হয়। 'সাধে কি আর বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।' আপনারা এত 'তত্ব-সভা' 'মত্বসভা' করছেন তার মধ্যে আমার এই "সিদ্ধিপ্রাপ্তিব" তত্বটা না থাকলে সবই যে বৃথা হয়। তাই আপনাদের প্রতি দয়াব দায়ে পড়ে বলতে হচ্চে। যাক মহাশয়, বলব কি এত ছুটে ফুটে, ভেঙ্গেচুরেও, আমি আমিই আছি।

সেই আমির মধ্যে কত কি যে উঠছে, পড়ছে, ভাঙ্গছে, চুর্‌ছে; কিছুতেই সে আমি ভাঙ্গছে না। কত চতুরানন—কত শতানন, সহস্রানন,—ছোট ছোট, বুদ্‌বুদের মত উঠছে, পড়ছে, ডুবছে, ভাসছে, হাস্‌ছে, খেলছে; কিন্তু আমিটি ঠিক আমিই আছে। বাহ্‌বা! ঐ সব ক্ষুদে বুদবুদ্‌গুলি কি না তাদের এক একটা আমি গড়িয়ে সেই ক্ষুদে আমিটুকু দিয়ে এই বিরাট্ আমির মাপ করতে যাচ্ছে! পূর্ব্ববঙ্গের হেঁয়ালির কথায় আছে:—

এট্টুখানি পোলাগুন্ দুধে ভাতে খায়
বড় বড় গাছের লগে যুদ্ধ* করতে যায়।

বাহ্‌বা কি মজা!! ওরে কেবল উঠছে, ফুটছে, ভাস্‌ছে, ভাঙ্গছে;—যারা নাই বল্লেই হয়, তারা কি না, যা' আছে তারই মাপ করতে ছুটছে!!! বাহবা কি বাহবা!!!

কেবল তাই নয় আরো মজা; আরো মজা কি শুন্‌বেন—ঐ যে আমি ভেঙ্গে দুখানা হলেম, সেই একখানা আমি বেশ একটী মজাদার সুন্দরী স্ত্রী—আপনাদের গৃহিনীর মত তার সবই আছে,—কাজ্‌লা চোখের ঠার, হাব, ভাব, ভঙ্গী সব। কিন্তু যদি চেহারাটার কথা বলেন তবেই মুস্কিল;—সে কেমন, তা' বলতে পারব না। সে আমার আমির মতই বটে—তবে সেও আমি, আমিও আমি—এক—ভেদ নাই। মোটের উপর একটা কথা সর্ব্বদার জন্য খেয়াল রাখিবেন, যে এসব

* একজন পূর্ব্বদেশীয় বন্ধু বলিলেন এই হেয়ালির উত্তর "কুঠার"। পংসং

বলার কথা নয়; বাবা সদানন্দের দয়ায় যে বুঝে সে বুঝে। বৈষ্ণব কবির ভাষায়:—

কহিবার কথা নয়। তথাপি বাউলে কয়,—

বাউল মানে বাতুল। অথবা যে এ কথা বলে, সে পাগল। লোকে কারো মুখে এমন ধারা কথা শুনলে, তা'কে পাগল না ভেবে থাকৃতে পারে না। কারণ এক যায়গায় 'হাঁ' ও 'না'র মিলন,—সংসাবে পাওয়া যায় না কিনা?

যাক যা' বলছিলাম—আমি ও আমার প্রকৃতি (তাঁকে শক্তি বলেন, পত্নী বলের—অর্দ্ধাঙ্গিনী বলেন, আপনাদেব কথায় গৃহিণী বলেন—) উভয়ে এক—অভেদ—এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ-স্বরূপ। অর্থাৎ, আপনাদের ভাষায় ভেদ, আমার আমির ভাষায় অভেদ। সেই ঠাকুরাণীটি—'ঠাকুরাণীই' বল্‌ছি, আপনাদের বুঝবার জন্য; তিনি ঠাকুব কি ঠাকুরাণী, তা তিনিও জানেন না, আমিও জানি না, কেহই জানে না;—তবে ভেদের ভাষায়—ঠাকুরাণী, দেবী, প্রভৃতি কথাগুলি বেশ মনোবম বলেই 'ঠাকুরাণী।' তিনি যেন ঠিক আমার ইচ্ছাটুকু,—খাস ইচ্ছা! আমার ইচ্ছাই যেন তিনি হয়ে আছেন। আমার সেই ইচ্ছা বা ইচ্ছাময়ী আমি এই ভাঙ্গাগড়া খেলা আরম্ভ করলেন। ফট্ ফট্ করে ভাঙ্গছেন, আবার খুট্ খুট্ ক'বে গড়ছেন। মোটে কিন্তু ভাঙ্গাগড়া দুটা নয়, ভাঙ্গাও যা' গড়াও তাই। আমার বা আমিব ইচ্ছা আর আমি বেশ আছি; সেই ইচ্ছা আমি বললেন 'দেখ,' আমি-আমি দেখছি। তিনি সাগরের অনন্ত তরঙ্গ, লহরী, উর্ম্মি হয়ে তোফা গুড়ুম গুম, সন্ সন্, কল্ কল্, কুল, কুল, গান গাচ্ছেন—আব কত নাচ নাচ্‌ছেন—কত বঙ্গ। কত ভঙ্গ!! সেই তাঁহার অর্থাৎ ইচ্ছা-আমির রকমটা যে কেমন, তা বলা যায় না। তবু লাজের মাথা খেয়ে বলতে হয়, নইলে আপনাদের এ মহা-তত্ত্বটা বুঝান যায় না—তাই আমার এত ক্লেশ। যদি কেহ আমায় এই দরগায় এসে, কিছু প্রণামি দিয়ে, আশুতোষের সেবা গ্রহণ করেন, তবে সিদ্ধি যে তাহাব করতলগত হবে, তাতে সন্দেহ একেবারেই নাই। থাক ইচ্ছা-আমি আর আমি-আমি ত' এক আমিই। খেলার খাতিরে ইচ্ছা-আমি যেন নানা রকমের ডায়মন্‌কাটা একখানা আয়না হয়ে আছেন, ও নানা রঙ্গে-ভঙ্গে হাস্‌ছেন, নাচছেন, কত কি করছেন, আমি-আমি তাঁর ডায়মনকাটাগুলির ভিতর দিয়া, ও তাঁব গোটাটার ভিতর দিয়া আমি-আমিকে দেখছি, হাস্‌ছি; আহা কত লীলা! কত বিলাস!! কত আনন্দ!!!

এই মজাদার খেলা খেল্‌তে খেল্‌তে দেখতে পেলেম, একটা মস্ত জগৎ হয়েছে। কত সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র, কত পাহাড় পর্ব্বত, কত নদী, হ্রদ, বন, জঙ্গল, কত কি সীমা নাই। আমি তাদের মধ্যে খুব বড় একটা কিছু। সেই চেহারাটা আমার মনে নাই, তবে আমি ঠিক আমিই। আমি একটা প্রকাণ্ড আমি। আমার মত কতজন আমার সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ করছে। কত কি বলব? আমি রাজার রাজা মহারাজা। যাই হক, আমি আমিই আমি। আমি একটা মস্ত খুব বড় শক্তিমান্ কিছু। ওমা কথা নাই বার্ত্তা নাই। দুই দল মস্ত সিপাহি আমাকে মারতে এল। সেই দুই দল দুই দিক্ থেকে আমার দল শুদ্ধ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। ক্রমে আমাকে এখন চেপে এনেছে যে, আমি মরি আর কি? ফুস্ করে কেমন একটা শব্দ হল। ওমা দেখি কি আমি আমারই গায়ে একটা ক্ষুদ্র ব্রণ হয়ে ছিলাম, আমিই সেই ব্রণটাকে চুলকাইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

মহাশয় আমাব নিজের দেহের ব্রণ হয়েও যখন আমি মরিয়াও মবিতে পারিলাম না; বাবার কৃপায় কতবার মরিয়াও মরিতে পারিলাম না। এই আমার আমিকে মারেন্ না বদলাইতে পারিবেন কি? আজ এই পর্য্যন্ত, আপনার পত্র পাইলে পরে যাহা হয় জানাইব। মোট কথা আমাব সদানন্দের সেবারও ত্রুটি হইয়া উঠিতেছে। দাদার 'নসিবাবু' ছিল, 'প্রসন্ন' ছিল, আর কালাচাঁদ ছিল। আমার যদিও হরেণবাবু আছেন, কিন্তু তিনি আজকাল বড় বে-আদবি আরম্ভ করিয়াছেন; কথায় কথায় চোখ রাঙ্গাণ। বলেন কি ধরাইয়া দিব। বাবা, তোমার ধরাধরির ধার ভ্রান্তশর্ম্মা ধাবেন না। যাক আপনি পন্থা-নায়ক,—আপনারা পন্থার বহুনায়ক, বিশেষ ত্রিমূর্ত্তি যখন, তখন কেহ না কেহ নিশ্চয়ই ভোলানাথ আছেনই। কাবণ কালাচাঁদ, ভোলানাথ না থাকলে ত, ত্রিমূর্ত্তির কিছুই হয় না; এই চৌমুখো বয়াটে ছেলেটাকে বাদ্ দিন, ওটা কোন কাজেরই নয়। ওর ত সম্পদেব মধ্যে একটু কমুণ্ডলুর জল; বড় বেশী দরে বিক্রী হয়, আর অল্পেতেও কিছু হয় না। ভোলানাথের ঝুলি খাস্ত হইলে, না হয় কালাচাঁদই কিছু দয়া করিবেন। তবে কি না তাঁর সঙ্গে প্রসন্ন গোয়ালিনীকে হটান বড় দায় হইবে। বেশী নয় রোজ দুই পয়সা হিসাবে ত্রিশ দিনের রসদ ত্রিশ খানা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকেট রেজেষ্টরী করিয়া পাঠাইলে কম ডাক-খরচাতেই চলিবে। আমার প্রাপ্তি সংবাদের জন্যও যেন আপনিই খরচটা দিয়ে দিবেন। ইতি—

শ্রীকমলাভ্রান্ত শর্ম্মা।

ঠিকানা—নিশ্চিন্তপুর।

একা।

সবাই গেছে ফেলে আমায়
সবাই গেছে ঠেলে'
আপন ভেবে যাদের তরে
বেঁধেছিলাম হৃদয়-ডোরে,—
সবাই গেল অচিন্ দেশে
খানিক হেসে খেলে॥

মেঘ করেছে চারি পাশে
আঁধার এলো ছেয়ে
সম্মুখেতে সিন্ধুবারি ঝঞ্ঝাবাতে গর্জ্জে ভারি
ঘোর তুফানে নাইক তরী।
নাই কি কোন 'নেয়ে'?
(আমায়) আঁধার এলো ছেয়ে।

আশার আলো নিভে গেছে
প্রাণের গেছে বল,
কেমন করে যাব পারে
অজানা এ অন্ধকারে
কে আছ গো আপন জনা
কারে শুধাই বল্।

কেটে গেছে বৃথায় জীবন
আকাশ-কুসুম গড়ি;
সম্বল যা ছিল ওরে
নিয়েছে সব ছয়টা চোরে
কেমন করে যাব পারে
দিয়ে খেয়ার কড়ি।

আপন যারা তারাও গেছে
পরও নাহি আর ;—
পারের বেলা সবাই ফেলে,
কোন্ দেশে সব গেছে চলে,
সাম্‌নে গর্জ্জে মহান্ সাগর
মরণ অন্ধকার।

'নরেশ'

প্রার্থনা।

সব হতে মোরে বঞ্চিত করে
তোমার চরণে রেখো গো।
সব আশা প্রভু! ভেঙ্গে যাক্ মোর
শুধু তব আশা যেন রহে গো।
মম) সব অহঙ্কার লুটায়ে দিয়ে
তোমার চরণ ধূলিতে
অজ্ঞান মোহ হইতে আমারে
তুলে লহ তব জ্যোতিতে।
অন্ধ-নয়নে দেখাও তোমার
শ্রীমুখ-চন্দ্রমা খানি ;
(মম, বধির শ্রবণে শুনাও তোমার
আশার তৃষিত বাণী।
(আমি) পাগলের মত ছুটে চলে যাই
তোমার চরণ হতে গো
জোর করে তারে রাখ তুমি ধরে
দিয়ো না ছুটিয়া যেতে গো।
শোক রোগ হতে দুষ্কৃতি হইতে
আবরিয়া মোরে রেখেছ,

মোর গ্লানি তব চরণ জ্যোতিতে
ধুইয়া মুছিয়া ফেলেছ।
সার্থক আজি জীবন আমার
তোমার পুণ্য প্রেমে গো
তুমি যে আমার কত আপনার
জানি তা' যে,—আমি জানি গো।

সানুবাদ বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

পঞ্চমাধিকরণ মারচয়তি—

তদৈক্ষতেতি বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্মবোধ্যতে।
জ্ঞানক্রিয়া শক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণং॥
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যে প্রধানস্য বিরোধিনী॥ ৫॥

অনুবাদ—ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়ে—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি তত্তেজোঽসৃজত"। "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল, সেই সৎ 'আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব' এইরূপ দেখিয়াছিলেন; এরূপ দেখিয়া সেই সৎ-ব্রহ্ম তেজের সৃষ্টি করিলেন।" এই বাক্য এই অধিকরণের বিষয়। এই বাক্যে জগৎ কারণত্বের প্রতিপাদক 'সৎ' শব্দ প্রধান-পর, কি ব্রহ্মপর, এই সন্দেহ। এই স্থলে প্রধান-কারণ-বাদি সাংখ্যগণ বলেন সৎশব্দ-বাচ্য জগৎ-কারণ প্রধান ব্রহ্ম নহে। কারণ প্রধান সত্ত্বগুণ যুক্ত, অতএব তাহার জ্ঞানশক্তি আছে, আর পরিণাম বিশিষ্ট অতএব ক্রিয়া শক্তিও আছে; ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ব্বিশেষ কূটস্থ তাহার জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব সৎশব্দবাচ্য জগৎকারণ প্রধান, ব্রহ্ম নহে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব উক্ত থাকায় চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ। সৎশব্দ বাচ্য, অচেতন প্রধান নহে; কারণ অচেতনের ঈক্ষিতৃত্ব হইতে পারে না। জ্ঞান ক্রিয়া

শক্তি, ব্রহ্মে মায়া দ্বারা সম্ভব হইতে পারে। অপিচ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি", জগৎ-কারণ দেবতা জীবে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ চেতন জীবের সহিত অভেদ দেখাইয়াছেন। এবং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে গুরু শ্বেতকেতুর সহিত জগৎ-কারণ তাদাত্ম্যের উপদেশ করিয়াছেন। এই বাক্য অচেতন প্রধান জগৎ-কারণ হইলে অসঙ্গত হয়; কারণ অচেতনের সহিত চেতনের তাদাত্ম্য কখনই হইতে পারে না। অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ, 'সৎ'শব্দ-প্রতিপাদ্য ইহা সিদ্ধান্ত। ৫॥

ভাবার্থ—"তদৈক্ষত" এই বাক্য প্রধান-পর, অথবা ব্রহ্মপর? জ্ঞান ব্যক্তি ও ক্রিয়াশক্তি প্রধানেরই সম্ভব, অতএব প্রধানই তচ্ছব্দবাচ্য জগৎ কারণ এই পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ঈক্ষণ চেতনেরই হইতে পারে অচেতনের ঈক্ষণ অসম্ভব। অতএব চেতন ব্রহ্ম জগৎ কারণ, ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি মায়াকল্পিত। আত্মশব্দ এবং আত্ম-তাদাত্ম্য বিষয়ে শ্রুতি যে বলিয়াছেন তাহাও চেতন ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, প্রধানে সঙ্গত হয় না। ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠাধিকরণ মেকদেশিমতে নহে—

সংসারী ব্রহ্মবানন্দময়ঃ সংসার্য্যয়ং ভবেৎ।
বিকারার্থময়ট্ শব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ॥
অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যো ব্রহ্মানন্দময়োভবেৎ।
প্রাচুর্য্যার্থো ময়ট্ শব্দঃ প্রিয়াদ্যাঃ স্যুরুপাধিগাঃ॥ ৬॥

অনুবাদ—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ দেহপ্রাণ মন বুদ্ধি ও আনন্দরূপ পঞ্চকোষ ক্রমে বলিয়াছেন। এই স্থলে সন্দেহ এই সর্ব্বান্তর আনন্দময়, সংসারী অথবা পরমাত্মা। 'আনন্দময়' শব্দবাচ্য সংসারী, কারণ 'আনন্দস্য বিকারঃ আনন্দময়ঃ' এই ব্যুৎপত্তি সংসারী জীবেই সম্ভব, অবিদিত ব্রহ্মেতে সম্ভব নহে। এবং "তস্য প্রিয়মেবশিরঃ" ইত্যাদি অবয়ব কল্পনাও সংসারীরই সম্ভব। নিরংশ পরমাত্মায় অবয়ব কল্পনা কখনও হইতে পারে না, অতএব আনন্দময় শব্দে সংসারীকেই বলা হইয়াছে; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। আনন্দময় পরমাত্মা সংসারী নহে, কারণ পুনঃ পুনঃ আনন্দময় বলিয়া ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, পুনঃপুনঃ একবিষয়ের কথন তাৎপর্য্যের নির্ণায়ক হয়। বেদান্তের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেতে, ইহাও বলিয়াছি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," এই উপক্রমে যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বলা হইয়াছে তাহা সংসারীর

সম্ভব হয় না, অতএব আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে। বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয় ব্রহ্মে যুক্ত হয় না;—তাহাও বলিতে পার না। কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সকল হইতে প্রচুর, এই জন্য প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্ প্রত্যয় তাঁহাতে হইতে পারে। এবং প্রিয়াদি অবয়ব কল্পনা উপাধিকৃত, নিরংশ ব্রহ্মেরও হইতে পারে। অতএব পরমাত্মাই আনন্দময় ইহা সিদ্ধান্ত॥ ৬॥

ভাবার্থ—তৈত্তিরিয়োপনিষদে 'আনন্দময়' শব্দে জীব, কি পরমাত্মা? 'আনন্দস্য বিকারঃ' এই অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হওয়ায় এবং প্রিয়াদি অবয়ব উক্ত থাকায় আনন্দময় শব্দে জীবকে বলা হইয়াছে এই সন্দেহ। "আনন্দময়মাত্মানমুপ-সংক্রামতি" ইত্যাদি শ্রুতি পুনঃপুনঃ আনন্দময় শব্দে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মের উপ ক্রমেই আনন্দময় শব্দ বলা হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয় প্রাচুর্য্যার্থে হইয়াছে, বিকারার্থে নহে। প্রিয়াদি অবয়ব ও পরমাত্মাব উপাধিকৃত হইতে পারে; অতএব আনন্দময় পরমাত্মা। জীব নহে॥ ৬॥

স্বমতানুসারেণ ষষ্ঠাধিকরণং—

অঙ্গাঙ্গং স্বপ্রধানং বা ব্রহ্মপুচ্ছমিতিশ্রুতং।
স্যাদানন্দময়স্যাঙ্গং পুচ্ছেঽঙ্গত্ব প্রসিদ্ধিতঃ॥
লাঙ্গুলাসম্ভবাদত্র পুচ্ছেনাধার লক্ষণা। *
আনন্দময় জীবোঽস্মিন্নাশ্রিতোঽতঃ প্রধানতা॥ ৬॥

"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কি আনন্দময়ের অঙ্গ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অথবা স্বপ্রধানরূপে, ইহা সংশয়। 'পুচ্ছ' শব্দ অবয়ব বাচক ইহা ব্যবহাব-প্রসিদ্ধ থাকায়, ব্রহ্ম শব্দ আনন্দ-ময়ের অবয়ব রূপেই এই বাক্যে বলা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

---

* "লক্ষণাবাক্য সম্বন্ধত্বাৎ পয্যানুপপত্তিত." বাক্যের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণা, বাক্যার্থ দ্বারা তাৎপর্য্যের বোধ না হইলে কিংবা অন্বয়ের বোধ না হইলে, সেই স্থলে লক্ষণা হয়, যথা "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ঘোষ শব্দে গোপপল্লী বুঝায়, গঙ্গা শব্দের শক্তি জলপ্রবাহে। জলপ্রবাহে গোপপল্লী এইরূপ অর্থ শব্দার্থ দ্বারা হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলে জলপ্রবাহে গোপপল্লী অসম্ভব বলিয়া অন্বয়ও হয় না এবং তাৎপর্য্যও কিছু থাকে না; অতএব গঙ্গা পদের তীর লক্ষণা। সেইরূপ পুচ্ছ শব্দের শক্তি লাঙ্গুলে; কিন্তু লাঙ্গুলার্থ এই স্থলে হইলে আনন্দময়ের সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না এবং তাৎপয্যও সিদ্ধ হয় না, অতএব পুচ্ছ শব্দের আধারে লক্ষণা। অর্থাৎ আনন্দময়াধারে ব্রহ্ম।

পুচ্ছশব্দ অবয়ব-বাচক নহে কিন্তু লাঙ্গুলের (লেজের) বাচক ; আনন্দময়ের কখনও লাঙ্গুলসম্ভব হইতে পারে না, কারণ লাঙ্গুল গবাদি পশুরই থাকে। অতএব পুচ্ছ শব্দের মুখ্যার্থ আনন্দময়ে অসম্ভব হওয়ায়, পুচ্ছশব্দের আধারে লক্ষণ। অর্থাৎ আনন্দময় জীবের অধিকরণ ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্মে কল্পিত, অতএব তাহার অধিকরণ ব্রহ্ম হইতে পারে। আনন্দময় শব্দে পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বলিতে পার না ; কারণ প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইলেও অল্প দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, এই জন্য আনন্দময় শব্দে জীব বলিতে হইবে। অতএব "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতি জীবাধার ব্রহ্মের স্বপ্রধানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা সিদ্ধান্ত।৬।

ভাবার্থ—"ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতি স্বপ্রধান ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিংবা অন্যের (আনন্দময়ের) অঙ্গরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন ? এই সন্দেহ হওয়ায় আনন্দময়ের অঙ্গরূপেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ পুচ্ছ শব্দ অঙ্গেই প্রসিদ্ধ,—এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—পুচ্ছশব্দ অঙ্গে প্রসিদ্ধ নহে কিন্তু লাঙ্গুলে (লেজ) প্রসিদ্ধ। আনন্দময়ের লাঙ্গুল সম্ভব নাই, অতএব পুচ্ছ শব্দের আধারে লক্ষণ। আনন্দময় জীব এই ব্রহ্মেতে আশ্রিত, অতএব স্বপ্রধানরূপে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছে। ৬।

সপ্তমাধিকরণং—

হিরণ্ময়ো দেবতাত্মা কিম্বাসৌ পরমেশ্বরঃ।
মর্য্যাদাধার রূপোক্তের্দেবতাত্মৈব নেশ্বরঃ॥
সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্ব দুরিতবাহিত্যাচ্চেশ্বরো মতঃ।
মর্য্যাদাদ্যা উপাস্ত্যর্থমীশেঽপি স্যুরুপাধিগাঃ॥ ৭।

অনুবাদ—

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে উদ্গীথ উপাসনা প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" এই যে আদিত্যের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখা যাইতেছে—(ইহাকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিবে)। এই শ্রুতি এই অধিকরণের বিষয়। এই স্থলে হিরণ্ময় শব্দে দেবতা অথবা ঈশ্বর, ইহা সংশয়। হিরণ্ময়ের মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা আধার এবং রূপাদি বলা হইয়াছে, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাধার নীরূপ। পরমেশ্বরের সীমা আধার ও রূপাদি অসম্ভব। অতএব হিরণ্ময় শব্দে দেবতা বাচ্য, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"সৈবঋক্ তৎসাম, তদুক্থং, তদ্‌যজুঃ তদ্‌ব্রহ্ম," সেই হিরণ্ময় ঋক্, সাম, উক্থ, অর্থাৎ স্তোত্রাত্মক সাম, যজুঃ এক ব্রহ্ম, এই শ্রুতি তদ্ শব্দ বাচ্য হিরণ্ময়ের

সর্ব্বাত্মকত্ব দেখাইয়াছেন। ইহা পরমেশ্বরেই হইতে পারে, কিন্তু দেবতায় হইতে পারে না; এবং "সএষঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" 'সেই হিরণ্ময় সর্ব্ব পাপরহিত' এই বাক্যোক্ত সর্ব্ব-পাপ-রাহিত্যও পরমেশ্বরেই সম্ভব। যদি বল 'দেবতাদিগেরও কর্ম্মে অধিকার না থাকায়, পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই', তাহা বলিতে পার না—কারণ তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার না থাকিলেও অসুরাদি-জনিত দুঃখ দেখা যায়। তাহাদ্বারা জন্মান্তরীয় পাপ আছে বুঝিতে হইবে, কারণ পাপ না থাকিলে দুঃখ হইতে পারে না। অতএব হিরণ্ময় শব্দে পরমেশ্বর। মর্য্যাদা আধাররূপাদি তাঁহার উপাধিকৃত হইতে পারে, অতএব কোনও অসামঞ্জস্য নাই;— ইহা সিদ্ধান্ত। ৭।

ভাবার্থ—হিরণ্ময় শব্দে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর এই সন্দেহ। মর্য্যাদা সীমা আধার ও রূপাদি বলা হইয়াছে, ইহা পরমেশ্বরের সম্ভব হয় না, অতএব হিরণ্ময় শব্দে—দেবতা, ঈশ্বর নহে। এই পূর্ব্বপক্ষে,—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—হিরণ্ময় সর্ব্বাত্মক এবং সর্ব্বপাপমুক্ত ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। দেবতা—সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্ব পাপমুক্ত হইতে পারে না, অতএব হিরণ্ময় শব্দে পরমেশ্বর। মর্য্যাদা রূপাদি উপাধিকৃত উপাসনার জন্য বলা হইয়াছে। কারণ সর্ব্বব্যাপক নীরূপের উপাসনা হইতে পারে না।৭।

অষ্টমাধিকরণং—

আকাশ ইতি হোবাচেত্যত্র খংব্রহ্মবাত্রখং।
শব্দস্তত্র রুঢত্বাদ্‌বাক্যাদেঃ সর্জ্জনাদপি॥
আকাশ জগদুৎপত্তি-হেতুত্বাৎ শ্রৌতরূঢিতঃ।
এবকারাদিনাচাত্র ব্রহ্মৈবাকাশশব্দিতং॥ ৮॥

অনুবাদ—

পূর্ব্বাধিকরণোক্ত 'হিরণ্ময়" বাক্যের পর শালাবত্য নামক মহর্ষি 'সর্ব্বজগদাধার কি' ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর প্রবাহন রাজা এই বাক্য দ্বারা দিতেছেন—"আকাশ ইতিহোবাচ সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব-সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদি "আকাশই সর্ব্বজগদাধার এই সকল বায়ু জল তেজ প্রভৃতি আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে," এই বাক্যে আকাশ শব্দার্থ কি ভূতাকাশ (ব্যবহার্য্য আকাশ) অথবা ব্রহ্ম এই সন্দেহ। আকাশ শব্দ ভূতাকাশেই রূঢ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ; এবং সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ ভূতাকাশের হইতে পারে, আকাশ হইতে বায়ু—বায়ু হইতে অগ্নি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা শ্রুতিই 'আকাশাদ্‌বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ,' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন। অতএব আকাশ শব্দার্থ ভূতাকাশ;—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"সর্ব্বানিহবৈ" এই বাক্যে 'সর্ব্ব'শব্দ দ্বারা ভূতাকাশ সহিত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং লয়-হেতুত্ব বলা হইয়াছে। ভূতাকাশ কখনও নিজের উৎপত্তি ও লয়ের হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আকাশে আকাশ শব্দের প্রসিদ্ধি থাকিলেও, শ্রৌত-প্রয়োগে ব্রহ্মকে অনেক স্থানে আকাশ বলা হইয়াছে। এবং "আকাশাদেব" এই 'এব' শব্দদ্বারা কারণান্তরের নিষেধ করা হইয়াছে। লৌকিক আকাশ এই বাক্যের প্রতিপাদ্য হইলে, কারণান্তরের নিষেধ কখনও হইতে পারে না। যেহেতু ঘটাদি কার্য্যেতে মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপক্ষে কারণান্তরের নিষেধ সঙ্গত হয়, ব্রহ্মসৎরূপ, অতএব সকল বস্তুর সহিত তাহার অভেদ। ব্রহ্ম কারণ বলিলে, আর কোন কারণ বলিবার আবশ্যক নাই ; অতএব ব্রহ্মই আকাশ শব্দবাচ্য ; ইহা সিদ্ধান্ত। ৮।

ভাবার্থ—

"আকাশ ইতিহোবাচ" এই বাক্যে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অথবা লৌকিক আকাশ, এই সন্দেহ। আকাশ শব্দ লৌকিক আকাশে প্রসিদ্ধ এবং "আকাশাদ্ বায়ুঃ" এই বাক্যে আকাশ হইতে বায়ুআদির সৃষ্টি বলা হইয়াছে ; অতএব লৌকিক আকাশই 'আকাশ' শব্দের প্রতিপাদ্য এই পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "সর্ব্বানি হবা" এই বাক্যে 'সর্ব্ব'শব্দদ্বারা আকাশের সহিত জগৎ-উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে। তাহা লৌকিক আকাশের হইতে পারে না। আকাশ শব্দের প্রসিদ্ধি লৌকিক আকাশে থাকিলেও শ্রুতি অনেক স্থলেই আকাশ শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতাঃ" আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, অর্থাৎ আকাশ হইতেই নাম ও রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং "আকাশাদেব" এই 'এব' শব্দদ্বারা কারণান্তরের নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা ব্রহ্ম পক্ষেই সঙ্গত হয়, লৌকিক আকাশ পক্ষে হয় না। অতএব ব্রহ্মই আকাশ শব্দ প্রতিপাদ্য। ৮।

নবমাধিকরণং—

মুখস্থো বায়ুরীশো বা প্রাণঃ প্রস্তাবদেবতা।
বায়ুর্ভবেত্তত্র সুপ্তৌ ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ ॥
সঙ্কোচোঽক্ষপরত্বে স্যাৎ সর্ব্বভূতলয়শ্রুতেঃ।
আকাশশব্দবৎ প্রাণশব্দস্তেনেশবাচকঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—

আকাশ বাক্যের পর "প্রাণ ইতিহোবাচ সর্ব্বানিহবা ইমানিভূতানি প্রাণ-

মেবাভিসম্বিশন্তি" এই বাক্য বলা হইয়াছে। এই স্থলে প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য মুখস্থিত বায়ু অথবা ব্রহ্ম ? এই সংশয়। ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয়গণ মুখস্থিত প্রাণবায়ুতে লয় হয়। অতএব প্রাণশব্দের প্রতিপাদ্য মুখস্থিত প্রাণবায়ু;—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"সর্ব্বানিহবা" এই বাক্যে 'সর্ব্ব' শব্দদ্বারা সকল ভূতেরই প্রাণে লয় হয় বলা হইয়াছে মাত্র, ইন্দ্রিয় লয় বলিলে তাহার সঙ্কোচ করা হয়। কোনরূপে অর্থের প্রতীতি না হইলে, শব্দার্থের সঙ্কোচ হইয়া থাকে। এইস্থলে 'প্রাণ'শব্দ ব্রহ্ম পর বলিলে আর সঙ্কোচ করিতে হয় না। অতএব সঙ্কোচ না করিয়াও অর্থের উপপত্তি হয়। এই স্থলেও আকাশ শব্দের ন্যায় 'প্রাণ' শব্দ ব্রহ্মেতে শ্রোতরূঢ় অর্থাৎ শ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে, এবং "প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" এই 'এব' শব্দ দ্বারা কারণান্তর নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব আকাশ শব্দের মত প্রস্তাব-দেবতা প্রাণশব্দের অর্থও ব্রহ্ম বলিতে হইবে; ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—প্রস্তাব দেবতা প্রাণশব্দের অর্থ কি মুখস্থিত বায়ু অথবা ঈশ্বর (ব্রহ্ম) এই সংশয়. সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণের লয় হয় মুখস্থিত বায়ুতে। অতএব মুখস্থিত বায়ু প্রাণ শব্দের অর্থ এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সর্ব্বভূতলয় প্রাণে ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন অতএব তাহার ইন্দ্রিয়-পরত্ব মাত্র অর্থ করিলে সঙ্কোচ করা হয়। এবং আকাশ শব্দ যে সকল কারণে ব্রহ্মপর বলা হইয়াছে সেই সকল কারণ এইস্থলেও আছে এইজন্য এই বাক্যে প্রাণশব্দের অর্থ ঈশ্বর (ব্রহ্ম)।

দশমাধিকরণং—

কার্য্যং জ্যোতিরুতব্রহ্ম জ্যোতির্দীপ্যত ইত্যদঃ।
ব্রহ্মণোঽসন্নিধেঃ কার্য্যং তেজোলিঙ্গবলাদপি ॥
চতুষ্পাৎপ্রকৃতং ব্রহ্ম যচ্ছব্দেনানুবর্ত্ততে।
জ্যোতিঃস্যাদ্‌ভাসকং ব্রহ্মলিঙ্গস্ত্ পাধিযোগতঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—

ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—"অথযদতঃপরোদিবো-জ্যোতির্দীপ্যতে" "এই দ্যুলোকের পর যেই জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যাইতেছে" এই বাক্য বিষয়। এই বাক্যে জ্যোতিঃশব্দদ্বারা কার্য্যজ্যোতিঃ অথবা নিত্য জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ইহা সংশয়। এই বাক্যে কোথাও ব্রহ্ম বলা হয় নাই, অতএব 'জ্যোতি'শব্দ ব্রহ্মপর বলা যায় না। কিন্তু "ইদং বাবতদ্‌যদিদম-

মস্মিন্নতঃ পুরুষেজ্যোতিঃ" ইহাও সেই জ্যোতিঃ যাহা পুরুষের অন্তরে (জঠরাগ্নিরূপে আছে) এই শ্রুতি পূর্ব্ববাক্যের অন্তর্গত, সেই জন্য জ্যোতিঃশব্দ কার্য্যজ্যোতিঃ বাচক; কারণ জঠরাগ্নি কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

এই বাক্যে ব্রহ্ম না বলিলেও, ইহার পূর্ব্বে গায়ত্রীখণ্ডে "পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ এই পরমপুরুষের তেজঃ অপ্‌ অন্ন প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকল একপদ (চতুর্থাংশের একাংশ) এইবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; সেই ব্রহ্মেরেই এই স্থলে "যদতঃপরো" এই যদ্‌ শব্দদ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বাবভাসক অতএব প্রকাশবাচক জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মেও উপপন্ন হইতে পারে। ব্রহ্মে জঠরাগ্নির কল্পনা ঔপাধিক, এইজন্য অসঙ্গত নহে। অতএব জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবাচক ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—

"জ্যোতির্দীপ্যতে" এইবাক্যে জ্যোতিঃশব্দ অন্যতেজোবাচক, অথবা ব্রহ্মবাচক ইহা সংশয়, এই বাক্যে ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হয় নাই, বরং অন্য জঠরাগ্নির প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অতএব অন্য তেজই জ্যোতিঃশব্দ প্রতিপাদ্য,—এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—পূর্ব্বে গায়ত্রীখণ্ডে চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এই স্থলে ও "যদ্‌" শব্দদ্বারা সেই ব্রহ্মের অনুবৃত্তি হইয়াছে, এবং জ্যোতিঃ শব্দও সর্ব্বপ্রকাশক ব্রহ্মে যুক্ত হয়, উপাধিবশাৎ জঠরাগ্নির সহিত অভেদও হইতে পারে, অতএব জ্যোতিঃ শব্দবাচ্য ব্রহ্ম।

একাদশাধিকরণং—

প্রাণোঽস্মীত্যত্রবায়িন্দ্রজীব ব্রহ্মসু সংশয়ঃ।
চতুর্ণাংলিঙ্গমদ্ভাবাৎ পূর্ব্বপক্ষস্তুনির্ণয়ঃ॥
ব্রহ্মণোঽনেকলিঙ্গানি তানি সিদ্ধান্যনথা।
অন্যেষামন্যথাসিদ্ধে র্ব্যাৎপাস্যং ব্রহ্মনেতরৎ॥ ১১॥

ইতি বৈয়াসিকন্যায়মালায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥

অনুবাদ—

ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছেন—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতম্‌ ইত্যুপাস্ব" আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, সেই আমাকে আয়ু এবং অমৃত (মরণ ধর্ম্ম রহিত, নিত্য) রূপে উপাসনা কর। এই বাক্যে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে প্রাণ বায়ুর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, অথবা জীবের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, কিংবা ইন্দ্রের

উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, এই চারিপ্রকার সংশয় (চাতুষ্কোটিক সন্দেহ)। এই চাতুষ্কোটিক সংশয়েরই হেতু আছে। "ইদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি" শরীরের উত্থাপক প্রাণ বায়ু অতএব এই বাক্যদ্বারা প্রাণবায়ু বুঝা যায়, "অস্মি" এই অহংকারবাদ, অর্থাৎ আমাকে (ইন্দ্রকে) উপাসনা কর। ইহা এই বাক্যদ্বারা বুঝায়, "বক্তারং বিদ্যাৎ" এইবাক্য দ্বারা জীবের উপাসনা বুঝায়, "আনন্দা-হপরোহমৃতঃ" এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা বুঝায়। ইহার কোন হেতু দুর্ব্বল এবং কোন হেতু প্রবল, তাহা বুঝা যায় না, অতএব এই স্থলে কাহার উপাসনা বলা হইয়াছেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ—

প্রতর্দ্দন বলিয়াছে "ত্বমেবমেবৃণীষ্ব যং ত্বং মনুষ্যায়হিততমং মন্যসে" তুমি তাহা আমাকে বল যাহা মানুষের পরমহিতকর বলিয়া মনে কর। পরমহিত আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা হইতে পারে না। "যোমাং বিজানীয়াৎ নাস্য কেন চ ন কর্ম্মণা লোকোমীয়তে, ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন" যে আমাকে জানে তাহার মাতৃবধ পিতৃবধ প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারাও পাপসংস্পর্শ হয় না। ইহাও ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রশংসা, আত্মজ্ঞানীরই মহাপাতকের স্পর্শ হয় না, কিন্তু প্রাণ, ইন্দ্র, জীব, বিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও তাহার পাপ স্পর্শ হইবে। কারণ যে ব্রহ্মজ্ঞানী তাহার ভেদ জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন কিছুই তাহার পক্ষে থাকে না, অতএব পাপ পুণ্য কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহার ভেদজ্ঞান আছে তাহার পাপপুণ্য সকলই আছে, অতএব প্রাণাদির উপাসনা বলিলে এই সকল হেতু উপপন্ন হয় না। প্রাণাদি বিষয়ক যে সকল হেতু তাহা ব্রহ্মপক্ষেও যুক্ত হয়, কারণ প্রাণাদি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ব্রহ্মবোধক হেতুর আধিক্য নিবন্ধন এবং অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার প্রাবল্য। অতএব ব্রহ্মই এই বাক্যে উপাস্য, প্রাণ ইন্দ্র বা জীব নহে, ইহা সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

ভাবার্থ—

"প্রাণোহস্মিপ্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদিবাক্যে প্রাণবায়ু জীব, ইন্দ্র, অথবা ব্রহ্ম উপাস্য, ইহা সংশয়, (ইহাকে চাতুষ্কোটিক সংশয় বলে) সকল পক্ষেই হেতু আছে অতএব কোন্ পক্ষ প্রবল কোন্ দুর্ব্বল তাহা অনিশ্চিত। এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—মানুষের পরমহিতকর ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কিছু হইতে পারেনা, এবং পাপের অসংস্পর্শও ব্রহ্মজ্ঞানীর ভিন্ন অন্যের হইতে পারেনা। কিন্তু ব্রহ্মপক্ষে বহু হেতু বলা হইয়াছে এবং তাহা অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রাণাদি

প্রতিপাদক হেতু ব্রহ্ম পক্ষেও সংলগ্ন হয় অতএব এই বাক্যে ব্রহ্মই উপাস্য। ১।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ভাষা অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী।

মহিম্ন-স্তব। *

আর্য্য জাতির দেবারাধনার স্তব কবচ একটী অঙ্গ, পূজারাধনকালে কিম্বা উপাসনার সময় অভীষ্ট দেবতার পূজার অনন্তর জপ ও স্তবের প্রথা শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখিত আছে, সম্প্রতি ঋষিমহর্ষি প্রভৃতির প্রণীত বহু সহস্র দেবতার স্তব ও কবচ পাওয়া যায়। এই ভিন্ন অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতৃ-গণ গ্রন্থের আরম্ভ এবং অবসানে স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার স্তব পূর্ব্বক শ্লোক লিখিয়া থাকেন; ইহা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম স্তবনীয় দেবের স্বাভাবিক গুণ বর্ণনা, দ্বিতীয় দেবতার আরোপিত গুণ বর্ণন। এতাদৃশ স্তব কবচ দ্বারা সাধকের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি, ও অভীষ্ট দেবের বিশেষ তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক স্বীয়-মনের অভিলাষ, পূর্ণ করা। মানসিক স্তব ও বাচনিক স্তব— এই উভয়বিধ স্তব দ্বারা সাধকের হৃদয়ে দেব-ভাবের বিকাশ হইয়া শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার সংঘটিত হয়। স্তব ও কবচ নানাবিধ ছন্দে নিবদ্ধ; সুমধুর সংস্কৃত স্বরে উচ্চারিত হইলে পাঠক এবং শ্রোতৃবর্গের মানসিক কালিমা, চাঞ্চল্য, অবসাদ, প্রভৃতি যুগপৎ বিদূরিত করিয়া ঐশ-ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়।

স্তবসমূহের মধ্যে শ্রীশিবের আরাধনায় মহিম্ন স্তব অতি প্রসিদ্ধ। 'মহিমন্' এই শব্দমাহাত্ম্য অর্থে ঋগ্ ও যজুর্ব্বেদের সূক্তে একাধিক বার উক্ত আছে। অতএব মহিমন্ শব্দ যে খুব প্রাচীন তাহা কোন সংশয় নাই। সাধারণতঃ শিবপূজার সময় সম্পূর্ণ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে না পারিলে অন্ততঃ প্রথমে তিনটী স্তব অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলে প্রায় সব ব্রাহ্মণই শিব-পূজান্তে এই স্তব বিশেষ

---

* 'সরস্বতী' প্রেস।

ভাবে পাঠ করেন। তদ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবদ্ বিষয়ে একাগ্রতা অভীষ্ট এক, পরম শান্তি লাভ করেন। দক্ষিণাপথে ও মহারাষ্ট্র দেশে মহিম্ন স্তব সহযোগে, শত রুদ্র বা রুদ্রাধ্যায়, শিবপূজার সময় পাঠ করেন। আমাদের অনেক পণ্ডিতের ধারণা আছে যে "রুদ্রাধ্যায়" (শত রুদ্রী) কেবল যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গেই পাঠ করিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ট্র দেশে (আমাদের) শ্রীদেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর ন্যায় রোগে, বিপদে, ত্রিবিধ উৎপাতে (দিব্য, আন্তরীক্ষ, ভৌম) গ্রহ দোষে, শান্তি স্বস্ত্যয়নে "রুদ্রাধ্যায়" পাঠ করা হয়। এই বিষয়ে রুদ্রাধ্যায়ের ভাষ্য ভূমিকায় শাস্ত্রীয় নানা প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমৎসায়ন, মহীধর, ভট্টভাস্করাচার্য্য তাঁহার মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়াছেন। প্রতীচ্য-দেশীয় কোন কোনও পণ্ডিত শিবকে অসুরের উপাস্য দেবতা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রী, বেদান্ত দর্শনের শৈবভাষ্য, শিবার্কমণি দীপিকা, শিবতত্ত্ববিবেক, শিব-রহস্য, কৈবল্যোপনিষৎ, সূত ও ঈশান সংহিতার ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের গূঢ় আশয় না জানাই হেতু। যাহারা চিন্ময়ী পরমা শক্তি জগদম্বার মাহাত্ম্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বম্বের মুদ্রিত সাতটী টীকাসহ দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী, দুর্গোপাসনা কল্পদ্রুম, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত "প্রপঞ্চ সার," লক্ষ্মণাচার্য্যের সারদা তিলক, তন্ত্ররাজ, দেবী-ভাগবত পাঠ করা উচিৎ মনে করি। দেবআরাধনায় সিদ্ধ ও ফলার্থী আর্য্য ভক্তগণের ধারণা,—"মহিম্ন-স্তব" দ্বারা শ্রীশঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত পূজা আরাধনা সময়ে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত স্তব পাঠ করা হয়। ইহা অতি প্রাচীন সংস্কৃতে সন্নিবদ্ধ ও রচিত হইয়াছে, এমন কি পৌরাণিক সংস্কৃত ভাষা হইতেও প্রাচীন সংস্কৃতে লিখিত, এবং "শার্দ্দুল বিক্রীড়িত" ছন্দঃধারা গ্রথিত। ইহা যেমন ভাবগম্ভির, তদ্রূপ বিবিধ তত্ত্বপূর্ণ, ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য গাঁথা। ইহা যে কেবল শৈবগণের পাঠ্য তাহা নয়, ভক্তি-সুধার্ণব ভাগবতের ন্যায় বৈষ্ণবগণের ও পাঠ্য। স্তবের সপ্তম শ্লোকে সকল সম্প্রদায়, সকল দার্শনিক, এবং সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ও তাহার একমাত্র প্রতিপাদ্য যে জগদীশ শ্রীভগবান্ তাহা অতি বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

এই তত্ত্ব ফরিদপুর জেলার বৈদিক শ্রেণীতে লব্ধজন্মা, নানা শাস্ত্র বিশারদ বঙ্গের প্রধান বেদান্তী শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়, শিব ও বিষ্ণুপক্ষে স্বীয় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যায় সুব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিই সকল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় "প্রস্থান ভেদ" বলিয়া লিখিয়া

গিয়াছেন। শ্রীমৎ সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাখ্যায় শিব ও বিষ্ণু প্রতি শ্লোকে যেন বর্ণিত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা যায়। অতএব তদীয় ব্যাখ্যা উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার সামগ্রী। তিনি ব্যাখ্যারম্ভে বলিয়াছেন যে "তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল আচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহাদেরই উক্তি সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র"।

অনেকে বলিয়া থাকেন—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যেমন সকল গীতার সারাংশ স্বরূপ একটী শ্লোক আছে, তদ্রূপ মহিম্নস্তবেরও সারাংশ এই শ্লোকটী। গীতার সারাংশ শ্লোক "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমঃ" ইত্যাদি; মহিম্নস্তবের সারাংস "ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ" এই শ্লোকটী, ইহার ব্যাখ্যার নাম সকল শাস্ত্র সারাংস "প্রস্থান" ভেদ স্তবের * ব্যাখ্যাতৃ সরস্বতী মহোদয়কে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারতের লোকে তদ্দেশীয় মুনি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি প্রস্থান ভেদের ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত অচিরে বাহির করিব। একটী স্তবের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সরস্বতী মহোদয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

"কোন এক গন্ধর্ব্বরাজ, জনৈক নরপতির প্রমোদ-কেলি-কাননের মনোহর কুসুমাবলী প্রতি রাত্রে প্রহরী সত্ত্বেও অলক্ষিত ভাবে অপহরণ করিত। রাজা বিশেষ অনুসন্ধানে ও দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে শিব-নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিলেন। পর রাত্রিতে যে সময় গন্ধর্ব্বরাজ ফুল অপহরণ করিতে আসেন, সে সময় শিব-নির্ম্মাল্য-পাদস্পর্শে খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়াতে, প্রতিহারী দ্বারা চোররূপে আবদ্ধ হইয়া কারাগৃহে নীত হন। সে সময় গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় শিব-নির্ম্মাল্য-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে খেচরত্ব হারাইয়া যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়া কারামুক্তি ও অপরাধ পরিমার্জ্জনার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন। ইহাই পুষ্প-দন্ত-গন্ধর্ব্বরাজের মহিম্নস্তব। এই স্তব সমাপ্ত হওয়ার পর পুনর্ব্বার তাঁহার খেচরত্ব লাভ হয়, এবং তিনি অলক্ষিত ভাবে আকাশপথে চলিয়া যান"।

ইহার পনের খানি টীকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, মহিম্ন স্তব শ্রীওঙ্কারনাথ শিবের মন্দিরের নিকট অমরেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরে ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছে। দক্ষিণাপথের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণপার্শ্বে উক্ত অমরেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির বর্ত্তমান। ইহার সমীপে উত্তর দিকে অপর তীরে ওঙ্কার-

*'পন্থা'—১৩২০—২১ দ্রষ্টব্য।

নাথের মন্দির। সম্প্রতি সেই দেশীয় কেহ কেহ এই মন্দিরকে "মমলেশ্বর-নাথের মন্দির"ও বলিয়া থাকে। এই স্থান মালব দেশের মধ্যে পরিগণিত। মহারাজ ইন্দোরাধিপতি হোলকারের ষ্টেট্ রেলওয়ের মোরটক্কা নামক একটী ষ্টেশন আছে। এই মোরটক্কা ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে নর্ম্মদা পূত সলিলপার্শ্বদেশে এই পবিত্র স্থান বিগুমান। এইখানে নর্ম্মদা নদীর উপর এক বিশাল সেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে, অমরেশ্বর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ অতিশয় রমণীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তথা হইতে নৌকারোহণে পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্য অবলোকন পূর্ব্বক, যাত্রীগণ ওঙ্কারনাথ দর্শনে যাইয়া থাকেন। উক্ত সুরম্য মন্দিরের মধ্যস্থানে সভামণ্ডপের মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। এই স্থান অনেক সময় অন্ধকারে আবৃত থাকে।

প্রাতে যে সময় সূর্য্যোদয় হয়, সে সময়ে ভিতের কোন কোন স্থান আলোকিত হয়। এই সূর্য্যালোকে বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, যেন ভিতের মধ্যে কিছু লেখা আছে, ইহাতে মহিম্ন স্তব (১) অমরেশ্বরের অষ্টক (২) হলায়ুধ প্রণীত মহাদেবের অষ্টক (৩) ও নর্ম্মদাষ্টক (৪) খোদিত আছে। উক্ত স্তব সমূহের নীচে সম্বৎ ১১২০ শকাব্দ অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয়, মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে স্থপতির দ্বারা উল্লিখিত শ্লোক সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীদের যাহাতে প্রবেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়,এবং পাঠ করিতে পারে, এইভাবে খোদান হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী সভামণ্ডপ, স্বনামধন্যা মহারাণী স্বর্গীয়া অহল্যাবাঈর আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মণ্ডপ নির্ম্মাণের পর হইতেই ঐ প্রকোষ্ঠে কিছু অন্ধকার হইয়াছে। যদিও মন্দিরের ভিত্তিতে কোনও রাজা, মহারাজার সময়ের উল্লেখ নাই থাকুক, তথাপি অনুমান করা যায় যে, উক্ত লিপি রাজা উদয়াদিত্যের সময়ে খোদিত হইয়াছিল। উদয়াদিত্য পরমার বংশে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি ভোজ নৃপতির পরে ধারা নগরীর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই স্তব ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল।

কথা সরিত-সাগরে লিখিত আছে ;—"পুষ্পদন্ত" নামক গন্ধর্ব্ব শিবের অনুচর ছিল, এই অনুচর গোপনে শিব-পার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন, সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন বররুচী নামে কৌশাম্বী (বর্ত্তমান আরানগরী) নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পরই আকাশবাণী হয়। "এই বালক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যালাভ করিবে।" ইহাঁর প্রণীত মহিম্ন স্তব কিনা বলিতে

পারি না। মন্দিরে খোদিত স্তব, প্রচলিত স্তবের শ্লোকাবলীর মধ্যে কতিপয় শ্লোকের পাঠের অনৈক্য দেখা যায়। তাহাতে কেবল একত্রিশটী শ্লোক আছে, স্তবের মাহাত্ম্য-সূচক নয়টী শ্লোক খোদিত হয় নাই। তাহাতে অনুমিত হয় যে, পরিশেষ ঐ নয়টী শ্লোক স্তবের মাহাত্ম্য পরিচায়করূপে পণ্ডিতগণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। সরস্বতী মহোদয় উক্ত একত্রিশটী শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শেষ নয়টীর কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।

মাহাত্ম্য-পরিচায়ক শ্লোকের মধ্যেও কোন কোন পুস্তকে সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। কোথাও পাঁচটী, কোথাও সাতটী, কোথায় বা নয়টী। মন্দিরের খোদিত শ্লোকাবলীর শেষে স্তব-রচয়িতা পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বের নাম উৎকীর্ণ হয় নাই। যে যে শ্লোকে শিলা-লিপির পাঠের সঙ্গে প্রচলিত শ্লোকের পাঠের ভেদ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

১। প্রচলিত পাঠ যথা—	শ্লোক সংখ্যা যথা—	২। শিলালিপির পাঠ, যথা—
"গিরিশ যৎস্বয়ং তস্থে"	১০ = ৩ = ৪	"গিরিশয় স্বয়ং তস্থে"
"নকস্যা পুনরত্যো"	১৩ = ৪	"নকস্যা উন্নত্যো"
"দোস্থাং যাত্যনিভৃত"	১৬ = ৩	"দোস্থাং যাত্য নভৃত"
"নখলু পর তন্ত্রাঃ,	১৮ = ৪	"নখলু কল তন্ত্রা"
দৃঢ়-পরিকরঃ,	২০ = ৪	"কৃত পরিকরঃ"
ক্রতু ভ্রংশঃ,	২১ = ৩	ক্রতুঃ ভ্রেষঃ"
ধৃত ধনুষঃ,	২৩ = ১	"ভৃত ধনুষঃ"
নৃক রোটী,	২৪ = ২	"নৃক রোড়ী"
শ্রুতি রপি,	২৭ = ১	শ্রুতি রপি,
বর্ষিষ্ঠায়,	২৯ = ৩	"বর্হিষ্ঠায়,

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্তদর্শনতীর্থ।

নমস্কার।

জলে,
কিবা স্থলে,
বায়ু ব্যোমে,
সূর্য্য-সোমে,
কার—
রূপ-রাশি
ঢালে
সুধা-রাশি,
তুলে
প্রেম-গীতি,
নিতি নিতি?
রবি,
তাঁরি আঁখি,
তাঁর ছবি,
প্রেম-মাখি
দেখি—
বিরাজে
নানা সাজে
বিশ্ব মাঝে;—
ধীর-হিল্লোলে,
নদী-কল্লোলে,
ক্ষুদ্র পল্লবে,
পুষ্পে,
শ্যাম শষ্পে,
লতা-সঙ্গমে
বন-জঙ্গমে,
তুলে
নব গীতি
ঢালে
সুধা-প্রীতি
নিতি নিতি।
মায়েতে—তাঁরি' স্নেহ,
জায়াতে—
তাঁরি মোহ,
জীবেতে—
ভালবাসা,
মনেতে—
সুখ-আশা.
সে যে আঁখিতে
সে যে প্রাণেতে
নারি দেখিতে;—
থাকে
সাথে সাথে,
ডাকিতে
শত ইঙ্গিতে
প্রেম-সঙ্কেতে
দিয়ে—
রূপ-তৃষা,
সুখ-আশা,
ভালবাসা।
মুদি' নয়নে
নমি' চরণে
রাম শরণে—
চির-জীবনে।

ফুলে
  বিল্ব-দলে
পাপ-হারী
  দুর্ব্বা-তণ্ডুলে
ধরি'
    বাহিরে
স্মরি
  অন্তরে—
দেব, ব্রাহ্মণ
বিশ্ব-নয়ন
দীপ্ত তপন।
ওই জ্যোতিঃ
ব্রহ্ম-দ্যুতি,
  শিবে
  কিবা জীবে
বিরাজে
বিষ্ণুতেজে;
ওই বিধাতা
বিশ্ব-সবিতা
পর-দেবতা।
এস
  মরমে
প্রতি করমে;
হে নাথ
  তুমি অর্ক
  ধর অর্ঘ্য।
  তুমি ভানু
প্রতিবিম্বে
  আমি অণু;
  তুমি সিন্ধু
জল-বিম্বে
  আমি বিন্দু;
  দাও মিশায়ে
পাপ বিনাশি,
  তবু চরণে
  চির-শরণে।
বিভো,—
  ধর অর্ঘ্য
  দাও তাপ
তুমি সূর্য্য
  হর পাপ;
প্রভো,
থাকি তোমাতে
তুমি আমাতে
কিবা ধেয়ানে
কিবা চেয়ানে
চির-মিলনে।

'শান্তি'।

পূজার গান।

সোণার থালে শোণিত ঢেলে
এসেছি মা, বলি হ'তে।
বর-অভয়ে— দুহাত দিয়ে
কেটে তোল মা পেটের পুতে॥

হৃদয় ফেটে রুধির ছুটে
ভয় করে মা তোরে দিতে।
কামের ঝুটো মনের এঁঠো
নিবি কি মা, দুহাত পেতে?

হীরা, মুক্তো, মাণিক যত
সাগর-জলে ডুবে গেল।
বুকের জ্বালা— হাড়ের মালা
পরিয়ে দি'মা যদি বল॥

(২)

সোণার থালে শোণিত ঢেলে
এসেছি-মা, বলি হ'তে।
শোণিত বেয়ে' পড়্‌লে ভূঁয়ে
অসুর শত উঠে তা'তে॥

নাচ্‌চে তারা, শোন্ মা, তারা,
বুকের রক্ত শুষে খেতে।
সইতে নারি জুলুম্ ভাবি
প্রাণ কাঁদে মা, দিনে রেতে।

তুইও যে মা— নাচিস্ শ্যামা
বুকের মাঝে থেকে থেকে।
পায়ের ঘায়ে ভাঙ্গিস্‌নি মা
নাচিস্‌নি মা ছেলের বুকে॥

(৩)

সোণার থালে শোণিত ঢেলে
পান কর মা—মুণ্ড কেটে—
নাও মা বলি, যাই মা চলি'
জগৎ ভুলে তোমার পেটে—

দেয় না ধরা পলায় তারা
বলির পশু রিপু ছটা।
আমার "আমি"—দাঁড়িয়ে "বলি"
কেটে দাও মা মুণ্ড যেটা॥

'দিশেহারা'

সাধক সর্ব্বানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভুবনেশ্বরী।

পূর্ণানন্দ পরিপ্লুত
সর্ব্বানন্দ পুলকিত
আনন্দ আবেশে রসে যে রাস লীলায়
সৈন্ধব পুতলি যথা,
তারি মাঝে গলে তথা,
দেহ কাম মন বুদ্ধি তাহাতে মিলায়।
সে রস-তরঙ্গ ভঙ্গে,
দেখে সর্ব্বানন্দ রঙ্গে
সর্ব্বাভূত, প্রেমপূত নয়ন খুলিয়া
সেই আদি কাম মাঝে,
ভুবন ঈশ্বরী সাজে,
কি খেলা খেলিছে মাতা ভুবন ভরিয়া
সর্ব্ব— গলিত হিরণময়
লোহিত কিরণ চয়,
লজ্জা বিজড়িত কিবা অরুণ আভায়,—
রঞ্জিত লোহিত রঙ্গে

অনুরাগ রাস অঙ্গে,
'লজ্জা'বীজেরই যে লোহিত প্রভায়,--
মহামায়া মায়া রঙ্গে
আধার শ্রী অঙ্গ-রঙ্গে
সেই 'পর' প্রাণধনে লুকায়ে গোপনে
হৃদয়ের গুপ্তপুরে
যতনে রেখেছ পরে
হিরণ্ময় পেটিকার চারু আবরণে।
মরি কিবা মনোহর
রক্ত শতদল পর,
লোহিত-বরণী শিবে রক্তবাস পরা,
বরাভয় দুই করে
দু'য়ে পাশাঙ্কুশ ধরে,
রক্ত শতদলে কিবা রাজিছে অপরা॥
স্পর্শি তাঁর পদপ্রান্ত
অনন্তে ভাতিছে সান্ত
ঊর্দ্ধ অধ স্তরে স্তরে অসংখ্য ভুবন
অম্বিকা তাহার মাঝে
বসিয়া ঈশ্বরী সাজে
সকল স্তরেতে সবে ক'রে আলিঙ্গন।
কত ব্যোম চরাচর
ভাঙ্গি গড়ি নিরন্তর
তাহার চৌদিকে ঘিরে করে কত খেলা,
কত বিধি বিষ্ণু হর
কিবা রূপ মনোহর
পরায় মাতার কণ্ঠে পঙ্কজের মালা।
বিশ্ব ভ্রূণ মাঝে বসি
সর্ব্বরূপা ভুবনেশী
'অজাত জাতক' ধরি শ্রীঅঙ্ক-আধারে ;—
গর্ভোদক সুধানীরে

দোলাইয়া ধীরে ধীরে
বুলায়ে কল্যাণ-কর তুলিতেছে গড়ে।
লয়ে কোটী জড় অণু,
জুড়ে গড়ে জীব তনু,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারে সাজায়ে যতনে
কামের কোমল 'শেযে'
রসিকা রঙ্গিণী সেজে
পর সঙ্গে রঙ্গে রাজে প্রেম আলিঙ্গনে।

নবীন ভুবন কত
পেয়ে জীব শত শত
অভিনব ভাব, বোধ, কল্পনা মালায়
নব নব কত বিশ্বে,
কত অভিনব দৃশ্যে,
খেলে কি আশ্চর্য্য খেলা অদ্ভুত লীলায়।

স-কল ভুবন জুড়ি
গড়ি কি অদ্ভুত পুরী
পরমা জননীরূপে বসে আছ সেজে,—
নাথের 'স্ব' স্বত্ব লয়ে,
নিজ 'অন্তঃ'সত্ত্বা হয়ে
ধরিয়া তাঁহার সত্তা জরায়ুপঙ্কজে।

সকল বিলাসে ভোগে,
নিজ তনু-অণুযোগে
আপন 'সর্ব্বস্ব' দিয়া সোবছ তাহারে;
বিশ্বরূপা বিশ্ব মাঝে,
ভুবন-ঈশ্বরী সাজে,
আপনারে ছড়াইয়া দিয়া বিশ্বাধারে!।

নব নব নবরসে
ভুবন চতুর্দ্দশে
অমিয়া-সাগর-সুধা-মলিন-সিঞ্চিত,

জীব অণুকণা যত
অনুরাগ-সুরসিত
সুধার মদন তব অধর চুম্বিত—
ধর্ম্ম-অর্থ আর কামে,
ত্রিবর্গ পুটিত ধামে,
ভিন্ন ক্ষুদ্র 'আমি'রূপ কোটী জীবকুলে,
যা'র ভাগ্যে যাহা ধরে
তা' দিয়া যতন করে,
পোষিছ বসায়ে তারে স্নেহময় কোলে।
প্রতিজীব মাঝে মাগো
প্রবৃত্তিস্বরূপে জাগ,
কামনা, মানস, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারে,
ভুবনের কণা অণু
লয়ে গড় জীবতনু,
জীবেতে বিশ্বেতে 'সম অনুপাত' ক'রে।
জগতে—'চৈতন্য' সাজে,
'কাম'রূপে—জীব মাঝে,
সুখে, ধর্ম্মে, অর্থে, কামে ছড়াইয়া নিজে,
হ'য়ে 'তৃপ্তি'রূপে ঘন,
করি 'সর্ব্ব' আহরণ,
মহতে, অণুতে সর্ব্বে সাজি হ্রীং বীজে!
মায়াতে চতুরদশ
ভুবন করিছ বশ,
আনন্দ-সিঞ্চনে তব—সুধার আধার,
সর্ব্বত্র ছড়ান তাই,
তোমারি মাধুরি পাই,
পুটিত মমত্ব রসে পীযুষ তোমার।
আনন্দ করিয়া ঘন,
'সব' করি আহরণ,
বাহিরে ঢাকিয়া দিয়া মায়ার বসন,

হইয়া অন্তর মুখী,
'লাজ' সর্ব্ব অঙ্গে মাখি
নাথের নিভৃত কুঞ্জে ত্যজ আবরণ ॥
জড়িয়ে ধরিয়ে সবে,
গড়িতেছ অনুভবে,
হরতনু বরবপু জবায়ু কমলে ;
বিশ্ব হৃদি-পদ্মাসনে
লজ্জাবতী লজ্জাননে,
লজ্জাবীজরূপ মাতা ধরিয়া কৌশলে।
অপরা সাজেতে পরা
নাথেরে জঠরে ধরা !
সে লজ্জা রাখিতে ঠাঁই আছে বা কোথায় ?
তাহে ঐ লজ্জা বীজে
স্বরূপ ঢেকেছ নিজে,
তোর লাজে জগদম্বে লাজ মরে যায় ॥
শর্ব্ব-অংশে সর্ব্বময়ি
আপন জঠরে অই
গড়িছ কি মনোহর ক্ষিতি মূর্ত্তিখানি
আবার সে ক্ষিতি অণু
লয়ে গড়ি সর্ব্ব তনু
জড়ে দেখাইছ হরে, হরে জড়ে আনি।
সমুদ্রমেখলা ধরা
শ্যামল কাঁচুলি পরা
ধরাধর পয়োধরা নভঃ কিরীটিনী
(এযে) মূর্ত্তিমান্ ব্যোমকেশ,
নীলকণ্ঠ সে মহেশ,—
তারি রূপ জ্যোতি লয়ে দ্যোতিত মেদিনী।
রসিত বাসনা রসে,
সলীন সলিল-রসে
মাধুর্য্য রসেতে ভরা এ ভব সংসার

এবে ভব মূর্ত্তি তাঁর
সকল সারের সার,—
প্লাবিনী পাবনী সুধা, বিশ্বের আধার।
যে রসে রসিতা মতি,
ভানু-সুতা রসবতী,
প্রেম বৃন্দাবনে করে রাস অভিসার
সে রস ধরিয়া কায়া
জল রূপে যোগমায়া,—
তাহারি প্রকট তনু বিশ্ব জলাধর।
তুমি বিশ্ব, তিনি নর,
তুমি পরা, তিনি পর
রুদ্র রূপে ভদ্রে বিশ্ব করিয়া দহন
ইন্দ্রিয় বাসনাচয়,
করি তাহে ভস্মময়,
নাথ অঙ্গে কর সেই বিভূতি লেপন।
তাঁ'রে দেখাইছ বিশ্ব
সুধু মুষ্টিমেয় ভস্ম
পরশি শ্রী-অঙ্গ তাঁর করে ঝলমল,
বিশ্বে দেখাইছ রঙ্গে
সে যে লিপ্ত তাঁরি অঙ্গে,
তাঁহারি বিভূতি সেত'—সে তাঁর 'সকল'।
খর, মৃদু সুতীঘনে
পরশেতে সমীরণে,
উগ্র রূপে বায়ু মূর্ত্তি করাও দর্শন
বায়ুর বায়ুত্ব ধরি
তা'দিয়া তুলিছ গড়ি,
শিবের সে উগ্রমূর্ত্তি মরি কি মোহন!
মাতৃপ্রায় মাতরিশ্ব
শ্রীঅঙ্কে লইয়া বিশ্ব,
ঊর্দ্ধ পর অভিমুখে কর যে গমন।

উড়াইয়া রজ ধূলি,
প্রেমময় কোলে তুলি,
অরূপ রূপের কূলে করয়ে গ্রহণ।
'উৎ-গ্রহ' স্বভাব তার
তাই উগ্র নমে তা'র
উদ্ধব সে উগ্র কহে বার্ত্তা দ্বারকার,
সেই উগ্রসেন কুলে,
সুবুদ্ধি-দৈবকী কোলে,
বাসুদেবে পেয়ে ধন্য কংস-কারাগার॥
বিশ্বাকাশে হৃদাকাশে,
তাঁহারি মূরতি হাসে
আকাশে শব্দেতে সেই ভীম রূপে রাজে।
সেই আত্মারাম বলী
ভীম সঙ্কর্ষণ হলী,
সেইত রাজিত বিশ্বে সর্ব্ব অণুমাঝে!
রোহিণীনন্দন যেই
নিত্যানন্দ রূপ সেই
সেই ভীমরূপে নভঃ অনন্ত গগন।
সেই ভোগ, তা'রি অঙ্কে,
শায়িত সুষুপ্তি রঙ্গে
যত্র জীব তত্র শিব অঙ্কে জনার্দ্দন।
তাঁহারি পঞ্চক্তি বাণী
সকল জ্যোতির খনি,
বারুণী সমুদ্র মাঝে আনন্দ আগার,
ভোগাসনে তারি কোলে,
রমা যাঁর পদ তলে,
সুপ্ত সে পুরুষ, হীন-বিকল্প-বিকার!
আকাশ বিকাশ তা'রি
এই হর, ওই হরি,
সেই ভীম,—সর্ব্ব ভয় যাহে পায় ভয়,

ভীষণ সে ভীষণের
গতি সেই ভুবনের
শিব রূপে সে আকাশ ব্যাপ্ত বিশ্বময়।
বিশ্ব যে বিভূতি তাঁ'রি
সে-ই সর্ব্ব অধিকারী,
তাঁহারে দেখাতে, সর্ব্ব তুমি সর্ব্বমাঝে
সে-ই তরঙ্গিত মনে
সঙ্কল্প বিকল্প সনে
যজমান মূর্ত্তি ধরি পশুপতি রাজে।
জ্ঞান-মূর্ত্তি নিরমল,
ঘন, শুদ্ধ, অচঞ্চল,
শান্ত ব্রহ্মানন্দ গুরু যজমান বেশে,
আসিয়া কালিন্দী কূলে,
ভ্রান্ত জীব পশুকুলে,
গোকুলে চালায়ে লয় রাখালের বেশে।
মানসে 'মনন' যেই
'বিশাখা' দূতী যে সেই,
'শাখা চন্দ্র' ন্যায়ে দূতী গুরুকে দেখায়,
গোচারণ ছলে এ যে,
পরদেব এই ব্রজে,
সঙ্কেতে তোমারে নিতে বাঁশরী বাজায়।
শুনি সে বাঁশীর স্বর
বিশ্বের সকল স্তর,
আকুল আনন্দে তাঁ'র অভিমুখে ধায়,
দেখাইছ ভুবনেশী
নিজে সাজি পৌর্ণমাসী,
যজমান রূপে পশুপতি শোভা পায়।
ঢল ঢল সমুজ্জল,
জ্ঞান কলা নিরমল
সুধার আধার সোম মূর্ত্তি সুধাময়,

মহাদেব মনোহর
তাঁহারি যে কলেবর
তিনি হ'য়ে সোমরূপে সর্ব্ব জ্ঞানালয়।
সেই সোমরস পানে
আনন্দ উধাও প্রাণে
গোপীরূপে শুদ্ধ জীব ধায় অভিসারে,
সোমে যার রস সুধা
পিয়ে মিটে সর্ব্ব ক্ষুধা,
সূর্য্যরূপে সেই পর নিকুঞ্জ আগারে।
আদি কাম-রূপ হর,
সর্ব্বাতীত পরাৎপর
ঈশান মুরতি শিব সূর্য্য রূপে রাজে,
লয়ে কোটী সূর্য্য অণু
গড়িছ তাঁহারি তনু
ভুবন ঈশ্বরী বসি ব্রহ্ম ভ্রূণ-মাঝে।
কোথা সৃষ্টি। কোথা নাশ।
সবই তব পরকাশ,
সর্ব্বময়ি। সকলি ত' তোমার বিলাস,
'ভাঙ্গা গড়া' কোথা কার?
একি লীলা চমৎকার
তুমিই যে সবে সব তোমারি প্রকাশ!!
'আমি' রব তুলি বিশ্বে,
সর্ব্বত্র সকল দৃশ্যে,
লইয়া নাথেরে কিবা খেলিছ সর্ব্বাণি,
উছলিত কত রঙ্গে,
অসংখ্য অযুত ভঙ্গে,
'তারে দেখাইছ লীলা রঙ্গালয়ে আনি।
আমি কোথা ক্ষুদ্রবিন্দু,
তুই যে মা মহাসিন্ধু—
সিন্ধু তুমি, বিন্দু তুমি, তুমিই সকল।

আমার এ 'আমি' রব,
তোরি লীলা কলরব,
আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব্ব তুমিই কেবল ;
তবে কেন মাগো আর,
লয়ে ক্ষুদ্র অহঙ্কার,
ভাল মন্দ নানা দ্বন্দ্বে সাজাইয়া ডালা
ছিন্ন বোধে হয়ে ভিন্ন
আপনারে ক'রে ক্ষিণ্ন
সহি কত সংসারের শোক দুঃখ জ্বালা !
সত্য যদি হয় ভব
তা'ও ত তোমারি সব
তোমারই সকল, তুমি যা'কর তা'হয়,
আমার যা' ভালমন্দ
সুখ দুঃখ ক্লেশদ্বন্দ্ব,
তোমার সকল মা'গো মো'হে হক লয় ;
'আমি না' 'আমি না' আর
'তুমি তুমি' মন্ত্র সার,
আমি-তুমি, তুমি-তুমি তুমিই সকল
সংসার ভবের হাটে—
তোমার লীলার নাটে—
সর্ব্বত্র সর্ব্বত তুমি , তুমিই কেবল ॥

শ্রীচিন্তা—

ত্বমেক ভবানি !

১

পিতা মাতা বন্ধু সখা যত কেহ রয়,
সময় বিরূপ হলে কেহ কারো নয় ;
মাতৃস্নেহ ডোরে যারে না পারে বাঁধিতে,
সুহৃদ বান্ধবে যারে না চাহে আঁখিতে,

এ হেন পতিতে জনে পরম আদরে
যতনে লহগো তুলি তব অঙ্কোপরে
প্রণমি অভয়পদে ওমা নারায়ণি!
অগতির গতি মাগো—ত্বমেকা ভবানি!

২

সংসার-সমুদ্র মাঝে যত বিঘ্ন বয়,
তোমারি প্রসাদে মাগো! সব হয় ক্ষয়;—
কত ছলে কত রূপে, উদ্ধার কাহারে,
কেমনে বলিব মাগো। কে বুঝে তোমারে?
তুমি কৃপাময়ি! তব করুণার ধার,
জুড়াতে ত্রিতাপ জ্বালা ঝরে অনিবার!
সবার জননী তুমি, সবার পালিনী,
দীন হীনে দয়াবতী—ত্বমেকা ভবানি!

৩

বিপদে পড়িয়া কেহ লইলে শরণ,
তুমি আসি কর তার ভয় নিবারণ!
তাইতো 'অভয়া' নাম হয়েছে তোমার,
না ডাকি তোমারে শুধু করি হাহাকার!
যমদ্বারে মহাঘোরে বৈতরণীতীরে,
তোমা বিনা আর কেবা উদ্ধারে পাপীরে?
তুমি শক্তিরূপা মাগো। শান্তিবিধায়িনি,
অনাথে আশ্রয়দাত্রী—ত্বমেকা ভবানি!

৪

ভব ভয়ে ভীত হয়ে যে তোমায় ডাকে,
তুমিই পরম পথ দেখাও তাহাকে;
পার কর ত্বরা তারে এই ভব-নদী,
পায় সে পরমপদ না রহে দুর্গতি,
আমিও যে মহাপাপী দুস্কৃত অধম,
যাচি মা করুণা তব—হয়োনা নির্ম্মম,
পার কর ওমা শ্যামা! দুর্গে নিস্তারিণি,
দুর্গতি-হারিণি ভবে—ত্বমেকা ভবানি!

৫

বিচিত্র এই বিশ্ব মাগো ! তোমারি প্রসূত,
রবি সোম গ্রহ তারা আদেশে চালিত !
অণু হতে অণু তুমি পরমা প্রকৃতি,
গুরু হতে গরীয়সী তুমি বিশ্বমূর্ত্তি !
অনন্ত অজ্ঞেয় তোমা কে পাবে চিনিতে,
না চিনালে আপনায় ওমা অচিন্তিতে ?
দয়া কর দাসে ওমা ! আনন্দদায়িনি !
সিদ্ধিমুক্তি ভক্তিদাত্রী—ত্বমেকা ভবানি !

৬

অগতির গতি তুমি পরম কারণ,
না পায় তোমার তত্ত্ব মোহমুগ্ধ মন।
সংসার অনলে মাগো ! পুড়িয়া পুড়িয়া,
ভক্তি প্রীতি সব হায় ! গিয়াছে জ্বলিয়া ;
মিথ্যা আশা মায়া মোহ ঘিরি চারিধার,
উদ্‌ভ্রান্ত বাসনা বলে 'আমার আমার',
দূর কর মিথ্যা চিন্তা ওমা চিন্তামণি !
বাসনা-বিকার-হরা—ত্বমেকা ভবানি !

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রস্ফুটিতমল্লিকামধুর শারদীয়া রজনীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে ব্রজ-যুবতীগণের সহিত মিলিত হইয়া যে লীলার আচরণ করিয়াছিলেন, আত্মারাম হইয়াও তিনি স্বেচ্ছায় আত্মায় অবস্থিত গোপীকাগণের সহিত যুগপৎ রমণক্রীড়া দ্বারা কামগন্ধহীন প্রেমলীলার অভিনয়ে অপরিজ্ঞাত প্রায় অভিনব যে প্রেমভক্তি-মার্গের ইঙ্গিত করিলেন, সেই মিলনচিত্র শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে স্মরণ করিতে করিতে কত সাধক হৃদ্গত কাম বিসর্জ্জন দিয়া, ধন জন মান ও প্রতিষ্ঠা চরণতলে ঠেলিয়া

হৃদয়মধ্যে কি এক দিব্যভাবের আভাষ পাইয়াছে সত্য, এই প্রেমের নদী বহিয়া বহিয়া কত কত সাধককুলকে সেই স্রোতে ভাসাইয়া স্রোতের পরমনিবৃত্তি স্থান অচলপ্রতিষ্ঠ মহাসাগরে লইয়া গিয়াছে সত্য,—কিন্তু প্রেমাবতার শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যেদিন এই প্রেমনদীতে মহাবন্যার সঞ্চার করিলেন, আবেগময়ী উত্তাল তরঙ্গময় সে জোয়ারে ব্যবহার-রস মত্ত নবদ্বীপ ভাসিয়া গেল, শান্তিপুরও ডুবিবার উপক্রম আর সেই প্রেমিক-চূড়ামণি স্বয়ং কলসে কলসে সে প্রেম যাচিয়া যাচিয়া আসমুদ্র হিমাচল বিতরণ করিলেন। সে নদীতে সাঁতার দিতে দিতে স্রোতে গা' ভাসাইয়া কতজন সেই প্রেমরসের মিলনস্থান প্রাণবঁধুর চরণতলে নীত হইল, এমন কি যাঁহারা ইহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল, তাহারা ব্রজ-সেবার অধিকার পাইল;—সংসারতাপ আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন, স্বীয় অভিন্নাপ্রকৃতির সহিত পুরুষোত্তম ভগবানের মিলন, এ ক্রীড়া বালকের দর্পণস্থ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়ার ন্যায়, * ত্বংরূপী জীবের সহিত 'তৎ'রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

এ মিলনের অন্তস্থলে কেবল অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিতা। হিমাদ্রি-বক্ষবিদারী বেগবতী এই প্রেমনদী স্বভাবতঃই সাগরাভিসারিণী,—ঐরাবত ইহার গতিতে বাধা দিতে গিয়া ভাসিয়া যায়। চিত্তের এই গতি স্বাভাবিক,—ক্রিয়া-বহুল সাধনামূলক অহঙ্কার-প্রণোদিত কর্ম্মদ্বারা এই গতি সিদ্ধ হয় না—চিত্তের গতি "আমি" রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হইলে পর, সিন্ধুর আহ্বান-মুগ্ধ স্রোতস্বিনীবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোগতি জন্মায়—তখন এই মনোগতি শ্রীভগবানের গুণ শুনিবামাত্র আপনাপনি সেই সর্ব্বগুহাশয় ভগবানে সমাপ্ত হইতে চায়। (†) তখন 'সে যে কে' তাই ভুল হইয়া যায়—সে প্রেমে নামরূপের দিকে দৃষ্টি থাকে না—দৃষ্টি থাকে কেবল শ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপে,—

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥

এমনই আত্মভোলা জগৎ-ভোলা ভাবে—আসল ভক্তির টানে গোপীগণ

(*) রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥ ভাগ ১০।৩৩।১৬

(†) মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ভাগ ৩।২৯।১১

শ্রীভগবানের অচিন্ত শক্তি যোগমায়া কাত্যায়নীদেবীর প্রসাদে এই স্বাভাবিক গতিতে আপনাকে ভাসাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গোপীরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক আবিষ্টতার যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আপ্তকামা হইয়াও প্রেম-স্বভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজনা করিয়াছেন * সেই নিঃস্বার্থ আত্মহারা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিত্যাগ রূপ ভিত্তিতে মহাপ্রভু রাগানুগা বা গোপী-অনুগা ভজন স্থাপন করিয়াছেন।

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতাই রাগাত্মিকা ভক্তি, তাহার অনুগত ভক্তির নাম রাগানুগা।

রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

এই রাগানুগা ভজনই ভাগবতোক্ত "প্রোজ্‌ঝিতকৈতব ধর্ম্ম"। 'সর্ব্ব'ত্যাগের জলন্তদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, আমাদের গৌরহরি প্রেমের পাগল সাজিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন—শচীদেবীর অকৃত্রিম স্নেহবন্ধন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে অসমর্থ হইল, সৌন্দর্য্যময়ী কণকপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, বৈধীভক্তির ক্ষুদ্রগণ্ডী তাঁহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইল না। তখন ভাবিবার অবকাশ নাই, চিন্তার অবসর নাই; প্রাণবঁধুর মধুর আহ্বান মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে, তখন কোন বাধা, কোন বিপত্তি, কোন প্রতিবন্ধক, তাঁহার সে গতিরোধ করিতে পারিল না। এ যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি—এ গতি সেই রসসিন্ধুর দিকে চলিতেছে।

তিনি তখন অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ কত বুঝাইলেন, কত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু তিনি যেন শ্রীমতীর ন্যায় বলেন—

"সখাহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীবন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।"

"সেই নব-নীল-নীরদকান্তি আমার নয়ন-পুতলি * হৃদয়ের মধ্যে সেই আমার প্রাণ চিরসুন্দরের নির্ম্মলরূপে আমার মন ডুবিয়া গিয়াছে, সংসারের কথা আর আমায় বলিও না। ভাই! সব শুনিয়াছি আমার অন্তরস্থিত এই প্রাণবঁধু

---

* নয়ন পুতলি করি লয়্যাছি মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে হরি প্রাণ।

নাকি শ্রীক্ষেত্রে প্রকটরূপে চিন্ময়মূর্ত্তিতে সাগরতটে বসিয়া আছেন, সেই রূপ-সমুদ্রে একবার অবগাহন করিগে। ছি ছি—তোমরা আমায় জাতি কুলের কথা বুঝাইতেছ;—আমার আমার আর যে কিছুই নাই—

পিরীতি আগুন জ্বালি   সকল পোড়ায়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান।"

তখন ত সর্ব্বের মোহ নাই—সর্ব্বধন হইয়া "আমিতে" মিশিয়া গিয়াছে—কুলের বন্ধন তখন লুপ্ত, সাধন ভজনাদি শীলতা লুপ্ত,—ক্ষুদ্র আমির মাপকাটি বা অভিমান তখন ভাসিয়া যায়। এ আকর্ষণে যে পড়িবে তাহার জাতি যাইবে, কুল যাইবে সব যাইবে;—তাহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে, মহাপ্রভুর ন্যায় তাহাকে বলিতে হইবে—

কালশশী বাজালে বাঁশী,   ছিনু গৃহবাসী করলে উদাসী
এখন কুল ত্যেজে হে অকূলে ভাসি।
হৃদয়বিহারী! কোথায় হরি!   পিপাসু প্রাণ তোমায় চায়॥"

তা'ই মহাপ্রভু বলিলেন—

'তোমরা আমাকে কুলের দোহাই দিও না—

স্রোত বিথার জলে   এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।

মূঢ়লোক না বুঝিয়া আমাকে কত কি বলিতেছে, বলুক্ আমার তা শুনিয়া আবশ্যক কি—

না জানিয়া মূঢ়লোকে   কি জানি কি বলে মোকে
না করি এ শ্রবণ-গোচরে।
"মধু বিনে   থান নাহি ভায়॥"

মহা প্রভুর উপদিষ্ট রাগানুগা ভজন পরাভাবে সিদ্ধ হওয়ার পর সেই সিদ্ধ দেহে অখিল রসামৃত মূর্ত্তির সহিত মিলন।

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।

চিন্তার দ্বারা নিজের সেই স্বরূপ বা সিদ্ধ দেহ ভাবনা করিয়া নিরন্তর অন্তর্ম্মনা হইয়া সতত ব্রজে কৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। অন্তর্ম্মুখী মনই এই সেবার অধিকারী। এভজন চিত্তের স্বভাবিক বা সহজ ভাব হইলেও বহির্ম্মুখী চিত্তে ইহার সাধনা হয় না। স্ত্রীলোকের ন্যায় বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া বিশিষ্ট

মান অভিমান এবং অহংকার আবর্জ্জনার মধ্যে অবস্থান করিয়া,কেবল মুখে "তুমি হৃদয় স্বামী" বলিলে শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না।

ভাই! যদি গোপীভাবের সাধনা করিতে চাও, তবে আপনার স্বরূপটী বুঝিয়া লও। স্বরূপ বুঝিলে বা যে 'আমির সহিত ভগবানের মিলন হইতে পারে, তাহাকে চিনিলে,—তবে তখন সেই'আমি' শ্রীভগবানের রাসাভিসার করিতে সমর্থ হইবে। তবে এক সুবিধা এই যে সেই নন্দ নন্দন ঐ স্বরূপ বুঝাইবার জন্ম অনন্ত জন্মে অনন্ত যোনির ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শুদ্ধ বাহ্য অনুভূতিতে আমার উদ্ভিদজন্ম, অনুভূতির ভিতর সুখ বোধে আমার পশুজন্ম। এইরূপে মনুষ্যজন্ম, দেবজন্ম যোনি হইতে যোনি ভ্রমণ;—গতির কিন্তু নিবৃত্তি নাই। এই রূপে যখন ভ্রমণ করিতে করিতে গুরুকৃপাতে জীব সেই পরম একত্বের আভাস পায়, তখন তাহার লক্ষ্য বা গতি স্থির হয় সে বুঝিতে পারে যে জীব ভগবানের শক্তি—এই আমি বা জীব শ্রীভগবানের প্রকাশধর্ম্মী বা তটস্থ ভাব তখন আর জীব ভ্রান্তি থাকে না। অগ্নির রূপাংশের দৃষ্টি করিলে দাবানলের অগ্নি এবং ক্ষুদ্র কাষ্ঠস্থিত অগ্নিতে ভেদ থাকে না—অগ্নির বৃদ্ধি বা ক্ষুদ্রত্বের ভ্রান্তি হইতে পারে কিন্তু অগ্নির স্বরূপজ্ঞানে সে ভ্রান্তি থাকে না। এই স্বরূপাংশে যেই দৃষ্টি পড়িবে অমনি দেখিবে,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

জীবের এই স্বরূপ ভাবকে না বুঝিয়া, অনধিকারী ব্যক্তিরা জোর করিয়া ঐ সাধনা করিতে গিয়া, মহাপ্রভু কর্তৃক নিষিদ্ধ ইন্দ্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য-মূলক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে এসংসারে প্রকৃতি-প্রসূত জীবমাত্রই নারী—পুরুষ কেবল শ্রীভগবান। সেই পুরুষ প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। জীব-ভাবে এ সাধনা চলে না। যতক্ষণ জীব প্রকৃতির ক্ষেত্রে ত্রিগুণের মধ্যে হাবুডুবু খায়, ততক্ষণ কাম, ততক্ষণ বহির্ম্মুখী ভাব তাহাকে ঘিরিয়া রাখিবে, ততক্ষণ আত্মসুখ।

গোপীদিগের কাম কাম নহে, প্রেম। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নামইত কাম, এযে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি। কামের তাৎপর্য্য আত্মসুখসম্ভোগ, প্রেম কেবল কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য মূলক। কাম যেন অন্ধকার, প্রেম যেন নির্ম্মল সূর্য্য স্বরূপ, গোপীরা

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

"বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামা, তাহারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক "গৃহীত-মানসা" তাহারা অন্যাভিলাসিতা শূন্যা। তাহারা আপনহারা, জগৎভোলা, ভেদশূন্য দ্বৈতশূন্য, তাহাদের কায় মন বাক্য কেবল কৃষ্ণ লইয়া। সকল ব্যবহার, সকল আচরণ, সকল সেবা কৃষ্ণ-সুখনিমিত্ত। গোপীরা জগতে ত্যাগের আদর্শ; জগতের গুরু।

একবার এস দেখি এই পথে যাইতে পারি কিনা। আপনাকে একবারে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি সর্ব্বত্যাগ করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই গোপীবল্লভের চরণে ছাড়িয়া দিতে পারি কিনা,—যাহা কিছু নিজস্ব বলিয়া মনে করি, তিনি ডাকিবা মাত্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেই রাসমণ্ডলের নায়কসমীপে গমন করিতে পারি কিনা?

ভাই সব। গোপীগণ ঐশ্বর্য্য চাহে না, কিন্তু ব্যক্ত জগতে যাহা কিছু আছে সবই যে তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সবই যে তাঁহার বিভূতি,—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত"।

প্রকাশ মাত্রই ঐশ্বর্য্য সাপেক্ষ; ব্যক্ত জগতের মোহ একেবারে অপসৃত না হইলে কেহ বলিতে পারে না 'আমি ঐশ্বর্য্য চাহি না'। আমরা সংসারে পূরা-দস্তুর কারবার করিয়া, প্রিয়তমার সুন্দর মুখখানি বেশ করিয়া অঙ্কিত করিয়া, শিশুর চাঁদবদনে ঘর্ম্ম দর্শনে ব্যস্ত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে অকৈতব গোপী-প্রেমের সাধনা করিতে চাই, তা কি হয়! রাসাভিসারিণী গোপিকাগণের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যেই সেই বনমালী—

নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদুবেণুং—(জয়দেব।)

অমনি যে যে অবস্থায় ছিল তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঘোর-সত্ত্ব-নিষেবিতা গহন বনে প্রবেশ করিল। কেহ বা গাভী দোহন করিতেছিল, কেহ বা পরিবেশন করিতেছিল, কেহ বা শিশুগণকে দুগ্ধ পান করাইতেছিল, গৃহকর্ম্ম তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণমিলনে বাধা দিতে পারিল না। কাহারও নিষেধ, কাহারও অনুযোগ, কাহারও ভৎর্সনা, হৃদয়ে প্রবেশ করিল না; কারণ তখন তাহাদের আত্মা বুদ্ধি মন শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত। তখন কিসের লজ্জা, কিসের সংসার, কিসের দুঃখ, কিসের ভয়?

গোপীদিগের এ মিলন স্বতন্ত্র। কারণ তখন ভগবান্ অবতাররূপে ভক্তানুগ্রহের জন্য বৃন্দাবনধামে অবতীর্ণ। তাঁহার অনাবৃত ব্রহ্মত্বের ভজনায় বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে হয় না। কামে হউক, ক্রোধে হউক, ভয়ে হউক, স্নেহে হউক, সৌহৃদ্যে হউক, যে কোন রূপে তাহাতে মনোনিবেশ করিলেই তিনি সেই সেই বুদ্ধির ভিতর দিয়া

আপনার স্বরূপ দেখাইয়া দেন। এখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময় নয়; মহাভাগ্যবান্ ব্যতীত সকলের নিকট সে অধোক্ষজ প্রকাশিত হয়েন না। তাই মহাপ্রভু জগতের জীবকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে "ভাই সব! শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা নিত্যলীলা। এই লীলা নিজ হৃদয়ে প্রকট লীলা, তোমার অন্তরতম তত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত (related), লীলার বীজ তোমার তত্ত্বগত, এ লীলা সর্ব্ব কালের এবং সর্ব্বজনের জন্য। যখনই তুমি স্বীয় তত্ত্বগুলিকে সেই ভগবানের সহিত মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে, তখনই সেই অপ্রাকৃত লীলা-রস তোমার হৃদয়ে স্বতঃ প্রবাহিত হইবে,—তখনই অপ্রকট লীলা তোমার নিকট প্রকট হইবে।"

প্রকট বৃন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দন "বামদৃশাং মনোহরং" যে কলগানে গোপীগনকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এখনও হৃদিবৃন্দাবনে তাহার সেই বংশী ধ্বনি অবিরত ধ্বনিত হইতেছে, সে গান মধুবাদপি মধুর অবিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ সেই স্বরূপ ভাবটী না দেখিয়া, প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বিত জীবাভাস দর্শনে "আমি এই" এইরূপ অভিমানে ভেদাত্মক আপনাকে দেখিতে চাই,—ততক্ষণ সে আকর্ষণমন্ত্র আমার নিকট ভেদাত্মক, পরিচ্ছিন্নও বিশিষ্ট সুখ স্বরূপের অনুসন্ধান-শক্তি রূপে খেলিতে থাকে। তখন বাহিরে বস্তু লইয়াই সুখ, বাহিরের বস্তুতেই দৃষ্টি ইহাও সেই প্রেম-ময়ের টান। এটান বহির্ম্মুখী; এই বহির্ম্মুখী টানই কাম। যতক্ষণ কাম ততক্ষণ আশানিবাশা বিশিষ্ট, ততক্ষণ ছুটাছুটী, ততক্ষণ সুখ দুঃখ, যতক্ষণ জীবভাবে থাকে ততক্ষণ কাম বহির্ম্মুখী ভাবে খেলে। অন্তর্ম্মুখী কামই প্রেম, তখন সেই কামই কাম-পতির চরণতলে উপস্থাপিত করে।

এই সাধনার মূলমন্ত্র সর্ব্বভাববিসর্জ্জন। সংসার হইতে মনের বাঁধন ছেদন, পুত্র মিত্র ঘর কন্যা চিত্ত হইতে উৎপাটন। মনকে সেই পাদ-পদ্মে ত্যাগ, বুদ্ধিকে যে সেই চরণে উৎসর্গ, সংকল্প বা আকাঙ্ক্ষা যে সেই চরণে বলিদান। থাকিবে কেন? আমি যতক্ষণ আমার জন্য ততক্ষণই ত আকাঙ্ক্ষাও আমার জন্য "আমির" এ সাধনার অধিকার নাই। কল্পনার তুলিতে আপনাকে কেবল গোপীরূপে চিন্তা করিলে হইবে না, গোপীদিগের ত্যাগ-তুলিকায় আপনার স্বরূপ ফুটাইতে হইবে। অনেকে ভাবেন যে "আমিটী" লইয়া সাধনা করিতে করিতে, বুঝি কি জানি কেমন করিয়া ভগবান্ প্রকটিত হইবেন, কিন্তু একবার যদি "শুদ্ধ আমিকে" ভগবানের প্রকৃতি বা প্রকাশশক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব যে কি পশু কি মনুষ্য কি দেবতা সকলেই এক "আমিটী" ও তাহা সর্ব্বদা একরূপ

তাহার কোন উন্নতি অবনতি নাই, "আমাদের উন্নতি" বলিয়া যে ভ্রান্তি আছে সেটা "আমির" নহে,—সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ লইয়া।

'আমি'র আবার সাধনা কি, সেত সর্ব্বদাই কৃষ্ণদাস। ভ্রান্তিজ্ঞানেই সংসার; বহির্ম্মুখ হওয়াতেই ত এই মায়ার মধ্যে হাবুডুবু। অঞ্চলে রত্ন বাঁধিয়া ভ্রান্তি বশে যেমন বহু স্থলে অনুসন্ধান করা যায়, তদ্রূপ তাঁহার সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও এই গতায়াত, এই হাসি-কান্না, এই সুখ দুঃখ, এই হর্ষ বিষাদ কেবল সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ লইয়া। এই সর্ব্বত্যাগেই গোপীরা আমাদেব গুরু, জগদ্‌গুরু; এই সর্ব্বত্যাগেই মহাপ্রভু আমাদেরও জগদ্‌গুরু। দেখিলাম গোপিকাগণ উন্মাদিনী বেশে গৃহ ছাড়িয়া সংসার ছাড়িয়া বনে প্রবেশ করিলেন—দেখিলাম মহাপ্রভু প্রেমের জন্য গৃহ ছাড়িয়া পথে বসিলেন। তবে কি রাগানুরাগ ভজন গৃহে বসিয়া হইবে না? তবে কি সেই প্রাণবঁধুয়ার অমৃত-সমান মিলন-সুখ কেবল সংসারের বাহিরে? তবে কি মাঠে মাঠে. পথে ঘাটে গিরি গহনে সে প্রেম লুক্কায়িত?

না! সকলের পক্ষে সমান নয়। অনেকের বনে গিয়াও ঘর-কন্না; আর অনেকের ঘরে বসিয়াও বন।

"নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং"

গোপীগণের সকলেত রাসমণ্ডলে গমন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই বলিয়া কি অলব্ধ রাস গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে বঞ্চিত হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই উদ্ধব দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন।

যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজথাস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসা কল্যাণ্যো মা পুর্ম্মবীর্য্য চিন্তয়া॥ ১০।৪৭

এই চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা ভগবানের সহিত মিলন—ব্রজে থাকিয়াই হইয়াছিল; কারণ তাহারা ত বনে গমন করেন নাই। সর্ব্বাত্মা ভগবানের সহিত গোপীদিগের কখনই বিয়োগ সম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতি যে সর্ব্বদাই পুরুষসঙ্গত, তদ্রূপ জীব প্রকৃতিও ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। কেবল ভ্রান্তি বশেই ভগবান্ হইতে দূরে মনে করি। তাই নিকট হইবার জন্য মানসিক চিন্তা। তাই ভগবান্ বলিলেন—

ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তিযৎ
অনুস্মরন্তো মাং নিত্য অচিরান্মামুপৈষ্যথ॥ ১০।৪৭

মনের এই অশেষ-বৃত্তি পরিত্যাগ বড় কঠিন। অনন্তের দিকে অনন্ত টান। এই বাহিরের টানগুলি ব্যক্ত জগতের টান। এই ব্যক্তের টান হইতে মুক্ত

হইয়া যাই তাঁহাকে অনুস্মরণ করিতে পারা যায়, অমনি ভগবান আসিয়া বলেন —"এইত আমি এই খানেই আছি, তুমি এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পাও নাই। বড় হাসির কথা—"বহু" অনুসন্ধান করেছ, মৃগ যেমন আপনার নাভির সুগন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায়, তেমনি তুমি আমাকে অনেকদিন খুঁজেছ * উদ্ভিদ জন্ম, পশু জন্ম, মনুষ্য জন্ম, কত জন্মে অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছ। এই দেখ আমি তোমার হৃদয়েই আছি—তোমার "আমির" মধ্যেই যে আমি আছি।" সেই দেখা হওয়ার পরও একটু খানি অভিমান এসে, মধ্যে মধ্যে সেই অনুসন্ধানে বস্তুকে যেন অন্তর্হিত করে ফেলে। তখন আর দুঃখের সীমা থাকে না, সে বিরহ অসহনীয়। তার পর কাঁদিতে কাঁদিতে সে অভিমান টুকুও যখন দূরে যায়, তখন তিনি আবার দেখা দেন। সে মিলনে কেবল আনন্দ; সে মিলন নিত্য মিলন, তখন আর আকর্ষণ নাই টান নাই, আছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।

গোপীভাবের ইহাই সাধনা—সে সাধনার দেবতা শ্রীনন্দনন্দন—শক্তি হ্লাদিনী,—বীজ কাম। এই মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে, সর্ব্বত্যাগ না করিলে, শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তুমি দেখিতে পাইবে না—দেখিবে তিনি অসি-মুণ্ড-বরাভয়-ধারিণী মূর্ত্তিতে লেলিহ্য-রসনা বিস্তার করিয়া এলোকেশী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তোমার ভেদ বিশেষের স্পৃহাতেই তাঁহাকে এরূপ দেখায়।

যে মূর্ত্তি নব নটবর বেশে বাঁশী হাতে করিয়া বৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জে শ্রীরাধার মানসকুঞ্জে অবস্থিত, আবার সেই মূর্ত্তিই "প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে" রূপে আমার সম্মুখে একই ক্ষেত্রে প্রকটিত। ফলতঃ একই বিগ্রহ অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন দিলেন।

আধুনিক বৈষ্ণবভ্রাতাগণ! এই ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়া ভীত হইবার কারণ নাই,—বিশেষের বিনাশ-সাধিনী বলিয়াই, ঐ রূপ ভয়ঙ্করী। কিন্তু চৈতন্যময়ীর এতৎ ব্যতীত আর একটী ভাব আছে, তখন আর সর্ব্বভাবের কিছুই থাকে না, তখন সে মূর্ত্তি "পরব্রহ্ম রূপেণ সিদ্ধা," তখন তিনি আনন্দামৃত মূর্ত্তির স্বরূপে ঘন হইয়া নিজ মায়া-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনীরূপ তিন

(১) সবকি ঘটমে হরি রহতাহৈ দেখ্‌তা নহি হৈ কোই
আপনা নাভিকি সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত ঢুঁডত বিয়াকুল হোই। (তুলসী দাস)

ভাবে ও এই অভাবের অনন্ত বিলাস মূর্ত্তি বা সঙ্গিনীগণের সেই অদ্বয় রূপে বিহার করেন। তাহার সেই ধাম—

ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

তাহাদের সে প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিয়াছ—সেই তুমি ত আবার সর্ব্বায়ুধসজ্জিতা মূর্ত্তিতে বঙ্গের ঘরে ঘরে আগমন করিয়াছ, এইবার আমাদের প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষে চাও, যাহাতে সর্ব্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অহংকার অতিক্রম করিয়া, কৈতবশূন্য-চিত্ত চিদানন্দঘন কিশোর-শেখর শ্রীনন্দনন্দনে প্রযুক্ত করিতে পারি। ওঁ নমো শ্রীগুরুদেবায়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

আমার কথা।

'বহ্বাশ্চর্য্যা বসুন্ধরা'—আর তাহা হইতে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল মানব-মনের গতি। সংসার প্রতিনিয়তই মানবকে কত কুহকজালে বেষ্টন করিতেছে; কত মায়া মমতার ফাঁদ পাতিয়া স্বর্গের চাঁদকে হাতে ধরিয়া আনিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া মোহের মলিন অন্ধকারে ফেলিয়া দিশাহারা করিতেছে, সুখের আশায় ছাই দিয়া চোখের জলে তাহার বুক ভাসাইতেছে। তবুও মানব দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না!! সত্য সত্যই মায়া 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী'—আর মানুষ মায়ার দাস। তাহার একটুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই; আপনার রচিত মায়াজাল হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিতে মানুষের একটুও সামর্থ্য নাই, একটুও সাহস নাই। এইরূপে কাপুরুষের চূড়ামণি হইয়াও যে মানুষ আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে এত তৎপর, মূর্খাধম হইয়াও প্রাজ্ঞ ও বিদ্বান বলিয়া খ্যাতির অর্জ্জনে এত সস্পৃহ, মিথ্যামুগ্ধ হইয়াও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্যের মহিমা প্রচারের বিজ্ঞাপনে এত রত তাহাই কি তাহার জ্ঞানকৃত বঞ্চনার, আত্মপ্রতারণার পরা-কাষ্ঠার প্রকৃত পরিচায়ক নহে?

বঞ্চনা বঞ্চনার সৃষ্টি করে, এবং সেই সৃষ্টিতে আত্মবিনোদন করে! যখন নিজের কথা মনে করি, দলিত চরণে, গলিত শক্তিতে, চঞ্চল গতিতে ঘূর্ণ্যমান হইতে হইতে জীবনের যে পথটুকু অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহার দিকে

একবার একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির দৃষ্টিতে তাকাই, তখন কি এক বিপুল শূন্যতা, কি এক তুচ্ছ অসারতার তীব্র মূর্চ্ছনা, কি এক মোহময়ী অবজ্ঞার স্পষ্ট অট্ট-হাসি আমাকে ঘেরিয়া ফেলে। তখনই তাই আবার মায়াজাল বুনিতে থাকি, আশার আবাহন দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি। ফুৎকারে অমস্ত দাবানল নিবাইতে পৌরুষের অবতারণা করি! শৈশবে চৈতন্যের আবির্ভাবে, ভাবের 'তরল আল্‌তা' দ্বারা যে মানসী প্রতিমার চরণ দুখানি রঞ্জিত করিয়া আসিয়া-ছিলাম, কৈশোরের বুকভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যাহার প্রসাধন সাধনে এত তন্ময়ভাবে নিবিষ্ট ছিলাম, আজ যৌবনের ভরা-গাঙের খর গতিতে তাহাকে ধরিতে গিয়া উপলব্ধি করিতেছি, আমি তাহা হইতে কতদূরে পড়িয়া গিয়াছি। এ ব্যবধান ক্রমে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইবে; আমার মানসী প্রতিমা, আমার জীবনদেবতা আমাকেই উপহাস করিবে!! আর আমি,—মায়ার জীব আমি,—তখনও আপনাকে ভুলাইতে থাকিব, আপনাকে ফাঁকি দিয়া কৃতার্থ মনে করিব, আকাশকুসুম রচনার শ্রান্তিময়ী কল্পনায় আপনার অসম্ভব শান্তি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাম হইব! হায়! হায়! কি বিচিত্র গতি! কি দুর্দ্দম বাসনা! দুঃখের প্রবলতম তাড়নে তাড়িত হইয়া, ভ্রান্তির গভীরতম পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া মানব মনে করে, সুখের কোমল করস্পর্শ, বিবেকের স্নিগ্ধ তট তাহার কত নিকটে। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা তাহার এই কপোলকল্পিত সুখভিত্তির মূল শিথিল ও ভগ্নপ্রায় করিতেছে। তথাপি মানব অন্ধ! সত্যের তীব্রতরুণ কিরণচ্ছটা যে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহার বুকভরা আশার কুহেলিকা-ময়ী কুজ্‌ঝটিকাকে অপসারিত করিবে—এই ভয়ে চকিত মানব, সত্যের তত্ত্ব গুহায় নিহিত বলিয়া আত্ম-প্রতারণায় নির্লজ্জভাবে নির্লিপ্ত!

কিন্তু প্রতারণারও শেষ নাই! মায়ী মহেশ্বর অনন্ত, তাঁহার মায়াও অনন্ত-রূপা অশেষশক্তিশালিনী! তাই যখন ক্ষতে অসহ্য ক্ষার বর্ষণের মত বেদনাক্ষত-হৃদয়ে শত ক্ষোভ, আক্ষেপ ও অবমাননার দুঃসহভার বর্ষিত হয়, তখনও অলীক সতর্কতা, অপূর্ব্ব চাতুরীর আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রবোধে নিরত হই,—বৃথা জ্ঞানে গর্ব্বিত হইয়া স্ফীতবক্ষে প্রচার করি, সংসারের আধিব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার ঔষধ পাইয়াছি, গরল হইতে অমৃত সেঁচিয়াছি! এইরূপ মূর্খ হইয়া মূর্খতার অনুসন্ধানে ও অনুসরণে ব্যস্ত রহিয়াছি। অসন্তোষ, আকাঙ্ক্ষা, বিবাদ বিসম্বাদ, সংশয় ও অশান্তিকে আপনার করিয়া, আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রেম ভুলিতে বসিয়াছি। সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সংসারের কপট পাশায়,

খেলিতে লাগিয়াছি, দেখি পারি কি হারি!! 'আমার আমার' করিয়া অহর্নিশি ডাক ছাড়িতেছি, ক্ষুদ্রতাকে ও দুর্ব্বলতাকে পুটীভূত করিয়া মনকে আশ্বাস দিতেছি. "এই উচ্চতার পথ, এই আমার গন্তব্য, এই আমার শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ!" হায়! ক্ষুদ্রতা দিয়া যে বিশালতার প্রতিষ্ঠা হয় না, দুর্ব্বলতার বিনিময়ে যে শক্তি লাভ ঘটে না, এ কথা জানিয়াও জানি না, তাই প্রতিমুহূর্ত্তে নির্ব্বাচিত পথের গতি পরিবর্ত্তিত করিতেছি, সরল পথে কুটিলতার প্যাঁচ মিলাইতেছি! শুধু তাহাই নহে, যখনই মনে দিব্য জ্যোতির স্ফূর্ত্তি হয়, যখনই কৃতকর্ম্মের, অনুসৃত পথের ভ্রমসঙ্কুলতার ও সঙ্কীর্ণতার কথা সহসা জাগিয়া উঠে, তখনই চিরাভ্যস্ত বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে ভাবকে মন হইতে অপসারিত করি। বলিতে থাকি, এই পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক আচরিত কর্ম্ম, এই সজ্জনসেবিত পন্থা! পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম গ্রহণ করিবার যোগ্যতাও যে হারাইয়া মোহের অঞ্জন পরিয়া সকলই যে কজ্জলময় দেখিতেছি, সজ্জনের পথ চোখে পড়িবে কেন, তা' মনেই হয় না! এই মোহময়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ বলিয়াছেন—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
অন্ধেনেব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

হায়! বিপর্য্যস্ত, বিপ্রলব্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট জীব! তোমার জ্ঞানোদয় সুদূর পরাহত, তোমার উন্নতিপথ কণ্টকসঙ্কুল, অমঙ্গলময়। তোমার স্রষ্টার কৃপাকণার ভিখারী হইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা নাই, তুমি তাঁহার সুবিচারের বিষয় সন্দেহ করিয়া বস কোন্ বলে? তুমি 'আমার আমার' করিয়া কাঁদিয়া মর, অথচ প্রকৃত আমিত্বটাকে লোপ পাওয়াইতে এত তৎপর! যাদের জন্য তোমারে, তোমার ধর্ম্মকে, তোমার দেবতারে ভুলিতে বসিয়াছ, তারা ত' চাহে না তোমারে। তারে আসে, তা'রা চ'লে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে।

বিপদের অন্তরালে, ক্ষোভ ও অবসাদের ইন্দ্রজালে অথবা পূর্ব্ব সুকৃতের বলে, যদি বা তোমার মানস নয়নে সেই আর্ত্তিহারী দেবতার করুণমূর্ত্তি আপনা হইতে উপস্থিত হয়, সত্যের পথ সুখভাবে তোমার নিকটে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখনও তুমি কি আপনার ঊর্ণনাভ চক্র হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে প্রয়াসী হও? ধিক্! আবিলতা তখনও তোমায় ত্যাগ করে না, কপটতা ও

আড়ম্বরের উপর তোমার দেবতার মন্দির গাঁথিতে চাও, আর বিজ্ঞাপনের কুহকে সারাংসার পুরুষকেও প্রলোভিত করিবার কুৎসিত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে কর।

কপট চাতুরী চিতে জন মন ভুলাইতে
লইয়ে তোহার নামখানি।
দাঁড়াইয়ে সত্যপথে অসত্য মজিয়ে তাতে,
পরিণামে কি হবে না জানি॥
(পদকল্পতরু ৪।১৩৫৪)

এমন অনুতাপ মনে কখনও স্থান পাইয়াছে কি? আপনার ভুল বুঝিয়া আপনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছ কি? যদি না হইয়া থাক, প্রতারণার শেষ হয় নাই। তুমি তাঁহার চরণপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত না হইবে কেন?

শ্রুতি উদাত্তস্বরে ঘোষিতেছেন,—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়॥

স্মৃতি বলিতেছেন, আত্মান্ধজীব। তুমি কার, কে তোমার; ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? 'আমার' 'আমার' করিয়া সারাজীবন খোয়াইলে, জানিও,

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
ভবানন্তানি যাতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, স্বয়ম্প্রভ বেদব্যাস, ভগবান্ বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর, মনীষী ঈশা, সকলেই একবাক্যে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকে জীবনের প্রকৃষ্ট সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানুষ হইয়া মানুষকে চিনিতে শিখ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, মানুষ হইতে শিখ—তবেইত জগতের মোহজাল হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে শিখিবে, তবেইত নিষ্কৃতি পাইবে। অন্যথা নহে। আর্ত্তিহারীর প্রেম অমৃত-তৃষিত জীব। তোমাকে অমর করিয়া তুলিবে, সংসারের বিপ্রলম্ভ হইতে তোমার মুক্তি মিলিবে।

সোই গোবর্দ্ধন, সোই বৃন্দাবন,
সো নব রসময় কুঞ্জে।
সো যমুনা জল — কেলি কুতূহল,
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে।
(বলরাম দাস)

কই, আমি সে নিত্য ধনের স্বাদ একদিনও অনুভব করিলাম না? তাহার ঐশীপ্রভা, তাহার উদারস্ফূর্ত্তি, আমার হৃত-কলা হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তির আবির্ভাব ত করিল না। তবে কি সারাজীবনই বিপ্রলব্ধ রহিব? তবে কি চোখ হইতে এ মোহের ঠুলি খুলিবে না,—বিপ্রলব্ধ দীন অধমের পাষাণ হৃদয়-দ্রুত কাতর-করুণ বিলাপ কি করুণাময়ের চরণে পৌঁছিবে না? জীবনে এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন অহঙ্কার ভুলিয়া, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া, মন খুলিয়া ভক্ত সনাতনের সহিত বলিতে পারিব—

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব !
 ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক
 দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥

এমন ঘটনা কি ঘটিবে না যাহার জন্য বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া ভগবচ্চরণোদ্দেশে লুঠাইয়া, আপন কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিব,—কহিব,

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া
 কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
হেরিনু সহসা নয়ন মেলিয়ে,
 এনেছে তোমারি দুয়ারে।

'বিপ্রলব্ধ'

উদ্বোধন।

(ব্রাহ্মণের প্রতি)

হে ব্রাহ্মণ, আর কত মোহনিদ্রাঘোরে
'অস্মিতা অবিদ্যা' শয্যা আলিঙ্গন ক'রে,
অতীত মহিমা-স্মৃতি-স্বপ্ন বুকে লয়ে
সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ থাকিবে শুইয়ে?
অতীত গৌরবস্বপ্ন করিয়া স্মরণ
অতৃপ্ত পিয়াস কিহে হইবে মোচন?

ছাড়ি মোহনিদ্রালস্য স্বপ্ন মদিরার
নয়ন মেলিয়া দেখ, ব্রাহ্মণ কুমার !
কোথা ছিলে, কোথা এলে, যেতেছ কোথায়,
কিবা ছিলে কি হইলে, কি হতেছ হায় !
উঠ, জাগি' উঠ জ্ঞান-নেত্র প্রসারিয়া—
জাগ্রত নয়নে তব দেখহ চাহিয়া
অতীত মহিমা তব করিয়া স্মরণ
বর্ত্তমান রূপ তব কর নিরীক্ষণ—

(১)

মনে কি পড়েছে যবে সৃষ্টির ঊষায়,
ফুটে ছিল তব হৃদে পূর্ণ মহিমায়,
জগত-পাবনী বাণী প্রণব রাগিণী
অক্ষর পরম-ব্রহ্ম-যোনি সনাতনী ?
মনে পড়ে যেই দিন ত্রয়ীর ভাষায়
গেয়েছিলে তোমার সে পূর্ণ মহিমায়,—
"ভগবান্ নিত্য সত্য, সর্ব্ব মিথ্যা আর"
ঘোষিয়া এ মহাসত্য বিশ্বে দ্বারে দ্বার ?
ভেঙ্গে দিলে জগতের মোহের স্বপনে,—
'হস্ত আমলক' প্রায় সত্য নিরঞ্জনে
দেখিলে দেখালে সেই পূর্ণ পরাপর,—
নিত্য সত্য সনাতন অব্যয় অক্ষর ?
সামান্য সৈন্ধব খণ্ড মিশাইয়া জলে,
প্রচারিলে নিত্য সত্য আশ্চর্য্য কৌশলে ,
সলিলে সৈন্ধব সম সর্ব্ব-জীবচয়
পরব্রহ্ম মাঝে সদা লীন হয়ে রয়।
শুনিয়া তোমারি মুখে এ সত্য মহান্
নির্ভয় হইল যত মানব-সন্তান।
তুমিই অভয়বাণী করিলে ঘোষণ
'যত কিছু দৃশ্যাদৃশ্য সবি নারায়ণ !'
'সোঽহং' মন্ত্রের তানে দেখাইলে জীবে
শাশ্বত স্বরূপ তা'র পরিপূর্ণ শিবে।

উদ্ভাষিত জ্ঞাননেত্রে তুমি মহাশয়,
দেখি ঘন একত্বের রস মধুময়,
হৃষ্টমনে, শান্তচিতে জগত বৈভব
ভ্রাতৃগণ তরে যবে তেয়াগিলে সব—
সমস্ত বিভব, ধন, রাজ্য, ব্যবসায়
ঘোষিলে যে মুক্তকণ্ঠে অমর ভাষায়—
'সন্ন্যাস পরম ধর্ম্ম' প্রশান্ত উদার
'পর'তরে 'সর্ব্ব'ত্যাগ আনন্দ আগার।
যে বৈরাগ্যে নাহি কোনো স্মৃতি বেদনার,
নাহি ক্লিষ্ট ক্ষুণ্ণজ্ঞান অতৃপ্ত তৃষ্ণার,—
পবিপূর্ণ অন্ত বাহ্য;—তাই অকাতরে
ত্রিবর্গ ত্যজিলে নিজ ভ্রাতৃগণ তরে।
আত্মজ্ঞানে যোগশক্তি করিয়া অর্জ্জন
পরিলে গৈরিক তাহা করিয়া বর্জ্জন।
বাসনা-বিলাস-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া
ত্যাগ-ধর্ম্ম-মূল শান্তি হৃদয়ে ধরিয়া
হাসিমুখে বিলাইলে ভোগ সমুদয়,—
আশ্বাসিত হ'ল তব শিশু ভ্রাতৃচয়।
সেই আত্মজ্ঞান ভুলি কি লাভ আশায়,
অমৃতের পুত্র! এবে ধাইছ কোথায়?—
আপনি মজিলে কিন্তু আহা মরি জলে,
জগতের চিত্রপট হ'তে নিলে তুলে—
সন্ন্যাস অভয় বাণী—বৈরাগ্যের ভাষা।
তাই দেখ জীব-হৃদে দুরন্ত লালসা
জাগিয়া উঠেছে, কিবা ভীম রূপ ধ'রে
লালসার বহ্নিশিখা নভ স্পর্শ করে।
ক্ষুদ্র কাম-বাসনায় মজি ভোগ তরে
নিয়ত সবাই লিপ্ত জীবন সমরে।
আপন আত্মজে হের করিয়া বিনাশ,
পিতামাতা তার ভোগ্য করিতেছে গ্রাস!

ওই দেখ জীবকুল আকুল তৃষ্ণায়
ত্রিবর্গের ফলগুলি সবে সব চায়।
এ উহার গ্রাস কাড়ি লইতে তৎপর
ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ ন-পূর্ব্ব ন-পর!
সেই তুমি সেই আজ দেখ চক্ষু মেলি
কিবা ছিলে, কি হইলে, কোথা যাও চলি'।

(২)

ত্যাগ ধর্ম্ম ত্যজি, মজি মোহ কুয়াসায়,—
ভোগ, কীর্ত্তি, যশ, অর্থ, মানের আশায়
বুভুক্ষা-পীড়িত, শীর্ণ দাঁড়ায়েছ এসে
ধনীর দুয়ারে দীন ভিক্ষুকের বেশে।
ঐ দেখ, বিপ্র, তব সৃক্কণি বহিয়া
লালসার লালাধারা পড়িছে ঝরিয়া।
কখনও উচ্ছিষ্টকণা, কখনও প্রহার
মিলিতেছে তাই আজ অদৃষ্টে তোমার!!
পল্লীগ্রামে যথা ভোজ উৎসব দিবসে
সুদূর নিক্ষিপ্ত ভুক্ত অবশেষ আশে
পরের উচ্ছিষ্ট ভোজী সারমেয় দল,
দাঁড়াইয়া দীননেত্রে বাসনা-বিকল।
দেখি যত পল্লীবাসী বালক সকল
দণ্ড লোষ্ট্রাঘাতে সবে করয়ে বিহ্বল।
সে উচ্ছিষ্ঠ পত্রলিপ্ত অন্নকণা আশে
প্রহারে জর্জ্জর তবু ঘুরে তার পাশে।
পশি' কিন্তু নিজ দলে দুর্ব্বল অপরে
তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে পুন ছিন্নভিন্ন করে।
তেমতি ব্রাহ্মণ দেখি বৈশ্যের সম্পদ,
ক্ষত্রিয় প্রতাপ আর উচ্চ-রাজপদ
নাম, যশ, অর্থ,—ছার চাকুরীর আশে
অবিরত ঘুরিতেছ তাহাদের পাশে।

বেদ, শাস্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি দলিয়া চরণে
মুষ্টিভিক্ষা আশে ধাও ধনীর সদনে;
মূর্খতার অভিনব কবি শাস্ত্র ছলে,
ডুবিয়া গভীর মোহ অস্মিতার জলে।
সুতীব্র লালসা-সুরা পানে ভ্রান্তচিত্ত
ইতস্ততঃ ভ্রমিতেছ হইয়া মোহিত।
　কি যে শ্রেয়ঃ, কি যে হেয়, হয়ে বিস্মরণ
মোহেতে হতেছ নিত্য দুঃখেতে মগন;
অপমান দীনতার ভীষণ জ্বালায়
তোমার এ মোহনিদ্রা টুটে নাকি হায়!
মিথ্যা গর্ব্ব বাক্যে করি নিজেরে ছলন
এ দারুণ দৈন্যে মুগ্ধ রবে কতক্ষণ।
　তাই ভাই উঠ জাগি, দ্বিজেন্দ্রকুমার!
একবার ফিরে চাহ গৃহে আপনার
পূর্ব্ব পুরুষের কথা করিয়া স্মরণ
তাহাদের পথে ফিরে করহ গমন।
　　কায়ক্লেশে কয় পদ হলে অগ্রসর
দেখিবে তোমারি কত বিভূতি বিস্তর;—
মহাবল নরপতি বৈশ্য ধনিগণ
নতশিরে করে তব চরণ সেবন;
সমস্ত বিভব তা'র উৎসর্গের তরে
লোটাইছে ভূমিতলে তব পদে ধরে;
ত্যাগীর আদর্শ, তুমি সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণ
পরমার্থ সুধারসে স্নিগ্ধ প্রাণ মন;—
অকাতরে বিতরিয়া শান্তি সুধারস,
দীন, ধনী সর্ব্ব জনে করিতেছে বশ।
দেখিবে তুমিই শাস্তা পাতা সবাকার
রাজা প্রজা, ধনী, দীন, আশ্রয় সবার।
নররূপে নারায়ণ ভূদেব ব্রাহ্মণ,
সকলে আশ্রয় চাহে তোমার চরণ।

তুমি গুরু, সর্ব্ব জীবে করাবে দর্শন
সর্ব্বত্র রাজিত সেই এক নারায়ণ।

শ্রীরমাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রকৃত পূজা।

(পুরাণ অবলম্বনে)

সে অতি পুরাকালের কথা। কালের স্রোতে কত যুগ অতীত হইয়াছে তথাপি সেই অতীতের কাহিনী আজিকার ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হয় কেন? তাহার উত্তরে, যিনিই যাহা বলুন, আমি বলি—যাহা সত্য, তাহা কালের দ্বারা কবলিত হয় না। কাল কেবল তাহার বহিরাবরণই স্পর্শ করিতে পারে; অন্তস্থ সত্যকে স্পর্শ বা আবিল কবিতে সক্ষম নহে। আজ সেই অবন্তীনগর নাই, সেই সুধর্ম্মা ব্রাহ্মণ নাই, তাহার পত্নী সুদেহা নাই। আছে একটী কাহিনী, একটী উপাখ্যান। এই উপাখ্যান হইতে সত্য সংগ্রহের ভার পাঠকের হস্তে সমর্পিত হইল। লেখক সেই পৌরাণিক ইতিবৃত্তকে একটু একালের ভাষায় প্রকাশ করিলেন মাত্র। ছাঁচ সে কালেরই রহিল। লেখকের ভরসা এই যে সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক হংসের ন্যায় জলীয় ভাগ বর্জ্জন করত সত্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতেই রমণ করিবেন।

প্রাচীনকালে অবন্তীনগরে সুধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সুদেহা। ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ, আচার পদ্ধতি, ব্রত নিয়ম, হোম-পূজা, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি সকল ব্যাপারেই তাঁহার সুধর্ম্মা নামের সার্থকতা সম্পাদন কবিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী সুদেহাও সর্ব্ব-প্রযত্নে পতির মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতেন, গৃহধর্ম্ম পালনে সুদেহা তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তিনী হইলেও পত্নীর আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। তথাপি আর্য্য-রমনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে স্বামি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কি গৃহকর্ম্মে কি দেবার্চ্চনে, কি ব্রত, নিয়ম ও সংযমাদি ব্যাপারে নিরন্তর পতির অনুপন্থী হইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন।

সংসারের প্রথম সোপান,—যৌবনের প্রথম বিকাশ,—উষার নবীন আলোক-ভূষিত স্নিগ্ধ প্রভাতের ন্যায় বড়ই মধুর, বড়ই প্রীতিপ্রদ, কিন্তু সেই উষার স্নিগ্ধ

মাধুর্য্য যতই মধ্যাহ্নের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সংসারের তাপও ততই প্রখর হইয়া উঠে ও সেই আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত জীবনে নানাপ্রকার অভিসন্ধি ও তন্নিবন্ধন তাপের সঞ্চার হইয়া, সেই প্রভাতী আনন্দের অনেক অন্তরায় উপস্থিত হয়।

একের মনে মন মিলাইয়া, নিজের ইচ্ছা, নিজের বাসনা, নিজের সুখ-সাধের আশা, নিজের আদর্শ ও আনন্দের ধারণা, এক কথায় বলিতে গেলে নিজের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে সংন্যস্ত করিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যদি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, তাহাতে যে কি আনন্দ রসিক প্রেমিক ব্যতীত আর কেহই তাহা জানে না। সেই প্রেমভাজনকে কর্ণধাব করিয়া ক্ষুদ্র এই জীবন-তরণী যদি তাঁহার প্রেমের স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া, একান্তহৃদয়ে ভাসিয়া যাওয়া যায়, তাহাতে যে আনন্দ,—ভক্তহৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের স্ফুরণ ব্যতিরেকে সেই আনন্দের উপমাস্থল জগতে আব নাই। এই অনুরাগ ও এই প্রেমই, কালে, পূর্ব্বরাগ ও রাসমিলনে পরিসমাপ্ত হয়।

পতিপরায়ণা সুদেহা তাঁহার পতি-দেবতাকেই তদীয় স্ত্রীজনসুলভ বাসনা-নিচয়ের একমাত্র কর্ণধার করিয়া সুখসাগরে ভাসিয়া চলিয়াছিল। অচিন্ত্য-লীলাকুশল বিধাতাব আশ্চর্য্য কৌশলে জাবনের মধ্যাহ্নগগনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, সেই নির্ম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। সুদেহা সেই নিত্যধর্ম্মপরায়ণ সংযত পতিদেবতার মানসও হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হইয়া অনুগমনে অসমর্থা হইলেন। স্বামি-সেবাব্রতের ফল, পুত্র-কামনায় সুদেহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তাই অপুত্রবতী সুদেহা একদা বিনয়-মধুর-বচনে স্বামী'কে কহিলেন—'নাথ জীবনের বহুপথ অতিক্রম করিয়া যৌবনের সীমান্তে আগমন করিলাম, অদ্যাপি আমাদের কোনও সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিল না। পুত্রহীনা রমণীর জীবন নিষ্ফল বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত হেয়। বিশেষতঃ পুত্রই পিতামাতা ও পিতৃপুরুষদিগকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধাব করে ও বংশের মঙ্গল বিধান করে। পুত্রের কামনায়ই নিষ্ঠাবান্ আর্য্যগণ দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন; সংসারী হইয়াও পুত্রলাভেচ্ছায় আপনাকে একান্ত উদাসীন দেখিতেছি।' সুধর্ম্মা কহিলেন—'আমাদের যদি পুত্র না হয় তাহাতেই বা কি? সুদেহা, চিরকালই তুমি আমার প্রিয়বাদিনী; আজ কামনার বশবর্ত্তিনী হইয়া অপ্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন? আত্মাই আত্মাকে উদ্ধার করে, আত্মাই আত্মার বন্ধু ও পরিত্রাতা। পুত্রই বল, আর

বান্ধবই বল, সকলেই স্বার্থ অন্বেষণ করে। স্বার্থপর জগতের মুখাপেক্ষী হইয়া সামান্য সুখের অনুসন্ধানে তৎপর হইলে, সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ করিবে। আর শুন সুদেহা! পুত্র হওয়া বা না হওয়া দৈবাধীন; যাহা দৈবের অধীন তাহার জন্য কামনার বশীভূত হওয়া উচিত নয়। দৈববশতঃ সুখ বা দুঃখ যাহাই আসুক না কেন, তৎসমুদয় ভগবানের মঙ্গলময় দান স্বরূপে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম! পক্ষান্তরে আকাঙ্ক্ষা বা যাচ্ঞা ত' ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে!'

সুদেহা কিছুই বলিতে পারিলেন না, কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মন'ত তাহা মানিল না! তা' মানিবেই বা কেন? সুদেহা ত আর 'রামা,' 'শ্যামা' মেয়েমানুষ নয়! ইনি যে সুধর্ম্মার পত্নী সুদেহা! এই যে ধর্ম্মের অনুরূপ ভাবের চিরন্তন তত্ত্ব। তিনি আছেন বলিয়াই অবয়বীভাব সম্পন্ন হয়. তিনিই উর্দ্ধতন সত্ত্বাকে মূর্ত্তিমান ও প্রকট করিয়া দেন। তিনি সুদেহা যদি এক কথায়ই সুধর্ম্মার অনুমত হইয়া পড়েন, তবে আর কাহার প্রযত্নে সুধর্ম্মের বিস্তৃতি হইবে?

সমগ্র শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণ এই কৌশলেই সত্যকে আখ্যায়িকার অন্তরালে সন্নিবিষ্ট করিয়া বেদ ও ইতিহাসের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। পাঠক যদি এই কথাটি স্মরণ রা'খেন যে আখ্যায়িকায় নায়ক নায়িকাগণের চরিত্রের মূল ভাবটুকু অবলম্বন করিয়াই এক একটী উপাখ্যানে চিরন্তন সত্যের একটী একটী ভাব বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা হইলেই পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব ও পুরাণত্ব উভয়েরই সাম্যতা সাধন হয়। যাউক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আড়ম্বরে মাথা ঘামাইয়া দরকার বড় নাই। "কৃষ্ণ কেমন?" "যার মন যেমন" তিনি তাহাই লইবেন। এই প্রকার আলাপের পরে স্থূলকথা, সুদেহার মানসিক বিষণ্ণতা বা পুত্রকামনার কথা কখনও সুধর্ম্মার মনে উদয় হয় নাই; ধর্ম্মানুগতজীবন সুধর্ম্মার ধর্ম্মাচরণেই উত্তরোত্তর উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৈশাখের বেলা অবসানপ্রায়, সুদেহা যথাবিহিত কেশবিন্যাসাদি সমাপন করিয়া কলসী ও পরিধেয় বস্ত্রাদি লইয়া অনতিদূরবর্ত্তী নিকটস্থ সরোবরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময়ে প্রতিবেশিনী জনৈকা রমণী ডাকিল, 'সই দিদি, গা ধু'তে যাবে না গো?' অনেক প্রতিবাশিনীই উহাকে সুদেহা দিদির পরিবর্ত্তে 'সই দিদি' বলিয়া ডাকিত, কেহ বা 'বামন দিদি'ও বলিত।

"হাঁ বোন আমিও বেরুচ্ছি।" এই বলিয়া সুদেহা প্রতিবেশিনীর অনুসরণ করিলেন। তাঁহার অসামান্য রূপ, চলনগাম্ভীর্য্য, সামান্য অথচ মনোহর বেশ-বিন্যাস-পারিপাট্য দর্শনে অনেকে তাঁহার নানাপ্রকার সমালোচনা করিতে

লাগিল। কেহ তাঁহার রূপের, কেহ তাঁহার দেহের, কেহবা তাঁহার স্বামি-সৌভাগ্যের গুণানুবাদ করিল। কথা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বা গোষ্ঠী গৌরব লইয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিল, কোনও রমণী বলিল 'যাই বল মা, রূপ গুণ পতি-সোহাগ থাকিলেও কোলে না থাকিলে রমণীর আবার শোভা কি ?'

মনিষ্যি কুলে দিবে ঠাকুর, মনে দিও সুখ।
সুবুদ্ধি সোয়ামী দিও, কোলে দিও পুত।

মেয়ে মানুষের ভাই! আর ঐশ্বর্য্য কি ? শাক ভাত খেয়ে, মোটা মোটা পরে যদি সুবুদ্ধি সোয়ামী আর কোলে সোনার চাঁদ ছেলে নিয়ে, বিনা ঝগড়া কোন্দলে দিন কাটে, তার চাইতে আর কি চাই।

কথা গুলি সুদেহার প্রাণে বড়ই বাজিল ; লজ্জা অভিমানে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল যথারীতি সাংসারিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক, রাত্রে পতির পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে অপরাহ্ণের ঘটনাবলি স্বামীর নিকট নিবেদন করিয়া কহিলেন 'যাহার পুত্র নাই, তাহার কেহই নাই। আজ প্রতিবাসিনীগণ আমাকে বন্ধ্যা বলিয়া তিরস্কার করিল। প্রভাতে অপুত্র স্ত্রী বা পুরুষের মুখ-দর্শন লোকে অযাত্রা বলিয়া মনে করে। হায়! আমরা মরিয়া গেলে আমাদের বংশ লোপ হইবে, আমার ও আপনার পিতৃকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, রাজা আমাদিগের ধন অংশ করিয়া লইবেন। দেবতাকে প্রসন্ন করত যাহাতে আমাদের পুত্র সন্তান হয়, এমন কোনও ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন।'

সুধর্ম্মা পত্নীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয্য ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বড়ই সন্তপ্ত হইলেন। পরে দৈব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সুদেহার গর্ব্ভে তাঁহার কোনও অপত্য সম্ভাবনা নাই। তখন সুদেহাকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'প্রিয়ে, আমি দৈবানুশীলন করিয়া দেখিলাম তোমার পুত্র সন্তান নাই—আমি কি করিব ? তুমি সন্তান কামনা পরিত্যাগ কর।'

সুদেহা রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, পত্নীকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'প্রিয়ে, ভগবানে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর, যাহার ভবিতব্যতা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে নাই। আমাদের মৃত্যুর পরে বংশের কি হইবে, ধন কি হইবে এ মমতা ত্যাগ কর।'

রোদনপরায়ণা সুদেহা ক্ষণকালের জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিত্ত কিছুতেই স্থির হইল না। প্রতিবাসিগণের দুর্ব্বাক্য অঙ্কুশাহত

মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার মনকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার এই যাতনা বিদূরিত করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুদেহা তাঁহার পতির উপদেশানুসারে ভগবানে চিত্ত সংন্যস্ত করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। দেহ হইতে দেহান্তর উৎপাদনপূর্ব্বক জীব-স্রোতের সংরক্ষণেই যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; গোত্র, বংশ, প্রবরাদির ভিতর দিয়াই যে তাহার খেলা? তাই সুদেহা স্বামীর সহধর্ম্মিত্বে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বিপথগামী হইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। স্থূল বিরহে প্রেমিকের মন যেরূপে দেহাদি হইতে নির্ভিন্ন হইয়া প্রেমময়ের মানসমূর্ত্তি হৃদয়পটে স্থাপনা করত অর্চ্চনা করে, যোগীর চিত্ত যে প্রকার ইন্দ্রিয়াদিতে রসাস্বাদ না পাইয়া আপনাকে পরম পুরুষে পর্য্যবসিত করিতে প্রযত্নপরায়ণ হয়, তদ্রূপ সুদেহাও আপনা দ্বারা স্বামীর বংশ রক্ষার সম্ভাবনা না দেখিয়া আপনাকে অপর স্ত্রীমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত করত পতির দারান্তর পরিগ্রহই এই সমস্যার একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। সুদেহার অগ্রজের নাম সুবুদ্ধি। পতির দারান্তরগ্রহণে কৃতসংকল্পা সুদেহা নিজ ভ্রাতাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার কন্যা ঘুশ্মার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র স্থির করিয়াছেন তিনি অচিরে তাহাকে পাঠাইয়া দিন। সুদেহার সহোদর সুবুদ্ধি অতিশয় স্বধর্ম্মপরায়ণ, বিষয়কর্ম্মে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহার চিত্ত নিরন্তরই ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল, কাযেই বিষয়বুদ্ধি বা বাহ্যবৃত্তির উন্মেষ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও প্রযত্ন তাঁহার একেবারেই হয় না, সুতরাং সংসারে থাকিয়াও তিনি একটী জড়ভরতের ন্যায় অসার ও উদ্যমহীন।

ঘুশ্মা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। সুদেহা তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন। ঘুশ্মার বিবাহযোগ্য বয়স হইলেও সুযোগ্য পাত্রের অভাবে বিবাহ হইয়া উঠিতেছে না, তদুপরি সুবুদ্ধির বৈষয়িক অবস্থাও বড় ভাল নহে। তাহাতে সুবুদ্ধিরও বিশেষ যত্ন চেষ্টা নাই; তাই সুদেহার সংবাদে ঘুশ্মার জনক জননী হাতে আকাশ পাইলেন। সুবুদ্ধি নিজেই দুহিতাকে লইয়া আনন্দে ভগ্নীগৃহে আগমন করিলেন। সুধর্ম্মা ও সুদেহা উভয়েই অতিশয় প্রীতির সহিত অভ্যাগত কুটুম্বের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে সন্তানবতী না হইলে রমণীগণ পাকা গৃহিণী হইতে পারে না। কথাটা কিন্তু ষোল আনা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রমণী

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] কার্ত্তিক; ১৩২২। [৭ম সংখ্যা।

পথিক।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
বাহিরের ঝঞ্ঝাবাতে বাহিরায় প্রাণ;
কাতরে তোমারে তাই ডাকি বার বার,
একটুকু স্থান আজি মোরে কর দান।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
ঘন গরজনে মোর কাণ ফেটে যায়,
ঢাল বিন্দু করুণার শিরে অভাগার,
নতুবা তোমার দ্বারে জীবন ফুরায়।

কে আছ বসিয়া ঘরে খোল গো দুয়ার,
আমি যে এ পথে আর পারি না চলিতে
চেয়ে দেখ চারিদিকে ঘোর অন্ধকার
আসিয়াছে আজি যেন অবনী গ্রাসিতে।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িছে মাথায়,
আকাশে বিদ্যুৎ-রাশি তাহাতে আবার,
থাকি থাকি প্রাণে মোর চমকিয়া যায়।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
বিষম দুর্দ্দিনে বড় পেয়েছি যে ভয়,
জোয়ারে ভরেছে খাল, কে করিবে পার ?
তোমার মন্দিরে মোরে দেহ গো আশ্রয়।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
কণ্টকে আবদ্ধ পথ চলে না চরণ,
শ্রান্ত, পথভ্রান্ত আমি, আজিকে আমার
কাতর প্রার্থনা শুনি রাখ এ জীবন।

কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গো দুয়ার,
ডাকিতে ডাকিতে কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে যায়,
দয়া করে দ্বারখানি খোল একবার,
নিরাশ করিও না গো হতাশ ভিক্ষায়।

তোমার হৃদয় যদি কঠিন পাষাণ
তুলে লও আশাটুকু, ভেঙ্গে দেও প্রাণ।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত, এম, এ, বি, এল,

কাঞ্চী পুরী।

(দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন)

(১)

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

হিন্দুর মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর মধ্যে কাঞ্চী অন্যতম। শাস্ত্র-বিধানানুসারে ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযত করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই সপ্তপুরী দর্শন করিলে মনুষ্য মোক্ষলাভ করে। কাঞ্চী অতি প্রাচীন এবং ত্রিভুবনকমনীয় নগরী

বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে, ইহাতে অনুমান হয় কাঞ্চী একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল।

নদীষু গঙ্গা, জলজেষু পদ্মং
ধান্যেষু শালি, দ্বিপদেষু বিপ্রঃ
চতুষ্পদে গোশ্চ যথা মৃগেন্দ্রঃ
পুষ্পেষু যাতি নগরেষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভা শ্রমীণাং গৃহস্থঃ॥　　"বামনপুরাণ"

কাশী-খণ্ডে, শিব শর্ম্মার তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে, লিখিত আছে—

"জগাম নগরীং কাঞ্চীং কান্তাং ত্রিভুবনাদপি।
দৃষ্ট্বা কাঞ্চীং কান্তিমতীং কান্তিমদ্ভির্নিষেবিতাম্।
কান্তিমান্ অভবৎ সোঽপি না কান্তি স্তত্র কস্যচিৎ॥

কাঞ্চী একদিন দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ছিল। এই কান্তিমতী ত্রিভুবনকমনীয় নগরীশ্রেষ্ঠ কাঞ্চী নগরীর পূর্ব্ব গৌরব এখন বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত। কাঞ্চী এক্ষণে একটী সাধারণ নগরী মাত্র; বর্ত্তমানে ইহার লোকসংখ্যা ৪২,৮০০ মাত্র। পূর্ব্বকালে কাঞ্চী একটী বিস্তীর্ণ জনপদে বিভক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কুমারিকা খণ্ডে লিখিত আছে,—

গ্রামাণাং নবলক্ষঞ্চ কাঞ্চী পুরে প্রকীর্ত্তিতম্॥

সপ্তম শতাব্দীতেও চীন পরিব্রাজক 'হোয়েন সাং' দ্রাবিড়ের রাজধানী এই কাঞ্চী নগরী ৪০ লি বিস্তৃত দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল প্রাচীন সাহিত্যে এবং প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতিতে কাঞ্চীর পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কাঞ্চী পুরী দুই ভাগে বিভক্ত—শিব-কাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী।

বিষ্ণুকাঞ্চ্যাং হরিঃ সাক্ষাৎ শিবকাঞ্চ্যাং শিবঃ স্বয়ম্।
অভেদাদুভয়োর্ভক্ত্যা মুক্তিকরতলে স্থিতা।
বিভেদজননাৎ পুংসাং জায়তে কুৎসিতা গতিঃ॥
স্কন্দপুরাণ বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যম্।

বিষ্ণু-কাঞ্চী ক্ষেত্রে স্বয়ং হরি এবং শিব-কাঞ্চীতে শিব বিরাজ করেন; অভেদবুদ্ধিতে ভক্তিপূর্ব্বক এই উভয় দেবের দর্শনে মুক্তি করতলস্থ হয়; কিন্তু

মেখলদ্বয়ের বিচ্ছেদ দর্শনে মানবের কুৎসিৎ গতি হইয়া থাকে। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)। যেখানে শিব, সে খানেই শক্তি ; কারণ শক্তি শিব ভিন্ন থাকিতে পারেন না, শিবও শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারেন না। আনন্দরূপ হর এবং আনন্দরূপিণী গৌরীর অভিন্নাভাব সম্বন্ধ ; তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাই, নিত্য মিলন। অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্ উভয়েই এক।

ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
অভিন্নাভাব সম্বন্ধ স্তয়োরানন্দরূপয়োঃ॥

তাই শিব-ক্ষেত্র কাঞ্চীপুরীতে কামাখ্যা দেবী বিরাজমানা। কাঞ্চী দেশে দেবীর কঙ্কাল পতিত হয়। তাই কাঞ্চী একটী মহা পীঠ এবং সিদ্ধ ক্ষেত্র।

কাঞ্চী দেশে চ কঙ্কালে ভৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা বেদগর্ভাখ্যা॥

তন্ত্র চূড়ামণি।

বৃহন্নীল-তন্ত্রে কাঞ্চীর সুবর্ণবিনির্ম্মিত কনককাঞ্চী দেবীতর উল্লেখ আছে।

কাঞ্চ্যাং কনক কাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।

৫ম পটল॥

তোড়ল তন্ত্রের মতে কাঞ্চী তীর্থ বিশ্বরূপ মহাদেবের কটী-দেশ স্বরূপ।

নাভি মূলে মহেশানি অযোধ্যা পুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চী পীঠং কটীদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥

৭ম উল্লাস।

মহালিঙ্গ তন্ত্রে মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন,—

কাঞ্চী নগরমধ্যে তু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বরঃ॥

কাঞ্চী কেবল হিন্দু তীর্থ নহে, ইহা প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ও জৈনগণেরও তীর্থ ছিল। হোয়েন সাং বলেন কাঞ্চীপুরা ধর্ম্মপাস বোধিসত্ত্বের জন্মভূমি। তাঁহার ভ্রমণ কাল ৭ম শতাব্দীতে। এখানে কয়েক শত সংঘারাম এবং ১০ সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন এবং তৎকালে এখানে ৮০ টী হিন্দু দেবমন্দির এবং কয়েকটী জৈন মন্দির ছিল। কাঞ্চীর তন্তুবায়পল্লীর অনতিদূরে বেগবতী নদীর অপর পারে একটী প্রাচীন জৈন মন্দির এমনও বিদ্যমান আছে। পুরা-বেত্তারা অনুমান করেন ইহা ৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর চোল-রাজগণের ও বিজয় নগর রাজগণের শিলালিপি সমূহ এই

মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন আছে। এই সকল শিলা লিপি পাঠে এই প্রাচীন জৈন মন্দিরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) শিবকাঞ্চী—পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণ।

কাঞ্চ্যামেকাম্রমূলস্থঃ কামাখ্যা কামশাসনঃ।
তপশ্চর্য্যাতিসংশ্লিষ্টো বলয়ে নাঙ্কিতোঽভবম্॥

স্কন্দ পুরাণ মহেশ্বর খণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্যম্।

কাঞ্চীপুরীতে কামাখ্যার সহিত কামশাসন মহাদেব একাম্র-মূলে অবস্থিত আছেন। এবং তপশ্চারিণী কামাখ্যা দেবীর সহিত অভিসংশ্লিষ্ট 'দেব কাম-শাসন' এই স্থানে দেবী কর্ত্তৃক বলয় দ্বারা অঙ্কিত। কাঞ্চীতে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির মধ্যে অনাদি ক্ষিতিলিঙ্গ বিরাজমান। ক্ষিতিলিঙ্গ দেবী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

একদা পার্ব্বতী দেবী প্রীতি বশতঃ জগদ্‌গুরু শঙ্করের পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া পদ্মগর্ভ কর দ্বারা তাঁহার নয়নত্রয় আবৃত করিলেন। দেবী পার্ব্বতী "ইহা এক রম্য কৌতুক" এইরূপ মনে করিয়াই এই লীলা করিয়াছিলেন।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তেন ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। কঠ ২।২—১৫

সূর্য্য চন্দ্রাগ্নি জ্যোতিঃ পদার্থ মহেশ্বরের প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহেশ্বরের দীপ্তিতে দীপ্তিমান। সুতরাং চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিরূপ মহেশ্বরের লোচনত্রয় আচ্ছাদিত হইলে সমস্ত জগৎ তমসাবৃত হইল. জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, গ্রহ নক্ষত্রাদি বিনষ্ট হইল, দেবগণ স্ফূর্ত্তিহীন হইলেন, বেদের প্রতিভা বিলুপ্ত হইল, কোন জীবেরই অস্তিত্ব থাকিল না। সমস্তই যেন কেবল একমাত্র অব্যক্তে অবস্থিত হইল (নাপি জীবাঃ সমভবন্ন ব্যক্তং কেবলং স্থিতম্।) মহেশ্বরের নিমিষার্দ্ধ কালে জগতের কোটী বৎসর অতীত হইল। অকালে এই ভুবনক্ষয়কর দেবীর অন্যায় কার্য্য দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহাকে মহাদেব তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন।

তস্মাল্লোকানুরূপং তে প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
ষড়্‌বিধো গদিতো ধর্ম্মঃ শ্রুতিস্মৃতিবিচারতঃ।
স্বামিনা নানুপাল্যেত যদি ত্যাজ্যোঽনুজীবিভিঃ॥
পৃথ্বী চ সকলা ভূয়াত্তপসা সফলা তব।

ত্বৎ পাদপদ্মসংস্পর্শাত্ত্বত্তপোদর্শনাদপি।
নিরস্তন্তি স্ম সান্নিধ্যাদ্দুষ্ট জাতমুপদ্রবম্॥
কর্ম্মভূমে স্তমাধিক্যহেতবে পুণ্যমাচর।
ত্বত্তপশ্চরণং লোকে বীক্ষ্য সর্ব্বোঽপি সন্ততম্॥
ধর্ম্মে দৃঢ়তরাং বুদ্ধিং নিবধ্নীয়ান্ন সংশয়ঃ।
কৃতার্থয়িষ্যতি মহীং দয়া তে ধর্ম্মপালনৈঃ॥

মহাদেব বলিলেন হে পরমেশ্বরি! অতএব সাধারণ লোকের ন্যায় (লোক-শিক্ষার্থ) তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শ্রুতি স্মৃতি বিচারপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তাদি ষড়্‌বিধ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। প্রভু যদি এই সকল ধর্ম্ম পালন না করেন, তবে অনুজীবী নরগণ অবশ্যই তাহা পরিত্যাগ করিবে। তুমি তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার তপস্যায় পৃথিবী প্রভৃত ফলবতী হইবেন এবং তোমার পাদস্পর্শে ও তপস্যা দর্শনে পৃথিবীর দুষ্ট উপদ্রব সকল তিরোহিত হইয়া যাইবে। অতএব কর্ম্মভূমির গৌরব বৃদ্ধির জন্য, তুমি তপশ্চরণ কর। আরও দেখ লোক সকল তোমার তপস্যা দর্শন করিয়া নিঃসংশয়ে ধর্ম্মে দৃঢ়মতি হইবে, তোমার ধর্ম্ম পালনে পৃথিবী কৃতার্থ হইবেন। মহাদেব দেবীকে কাঞ্চীপুরীতে তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—

(শিবপ্রোক্ত কাঞ্চী মাহাত্ম্য)।

অস্তি কাঞ্চী পুরী খ্যাতা সর্ব্বভূতিসমন্বিতা।
যা দিবং দেব সম্পূর্ণাং প্রত্যাক্ষয়তি ভূতলে॥
যত্র তপ্তং তপঃ কিঞ্চিদনন্তফলমুচ্যতে।
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে বাসং বাঞ্ছন্তি সন্ততম্॥
তত্র কম্পেতি বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী।
যত্র স্থিতানাং মর্ত্ত্যানাং কম্পতে পাপকোটয়ঃ॥
তত্র চূতদ্রুমশ্চৈকো রাজতে নিত্যপল্লবঃ।
সম্পূর্ণশীতলচ্ছায়ঃ প্রসূনফলপল্লবৈঃ॥
তত্র জপ্তং হুতং দত্তমনন্তফলদং ভবেৎ।
গণাশ্চ বিবিধাকারা ডাকিন্যো যোগিনীগণাঃ।
পরিতস্তাং নিষেবন্তাং বিষ্ণুমুখ্যাস্তথা পরাঃ॥

হে দেবি! সর্ব্ববিভূতি-বিভূষিতা কাঞ্চী নাম্নী এক পুরী আছে। ঐ পুরী ভূতলে সর্ব্ব দেবতাপূর্ণ স্বর্গের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়। তথায় অতি অল্প মাত্র

তপস্যা করিলেও অনন্তফলপ্রাপ্তি ঘটে। দেব ও মুনিগণ তথায় সর্ব্বদা বাস করিতে অভিলাষ করেন। তথায় মহাপাতকনাশিনী বিখ্যাত কম্পানাম্নী একটী নদী আছে। ঐ নদীর তীরে অবস্থান করিলে মানবগণের কোটী কোটী পাপ বিনাশ হয়। তথায় নিত্য পল্লবশালী এক আম্র বৃক্ষ আছে। উক্ত আম্র বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় যাহা কিছু জপ হোম ও দান করা যায়, তাহা অনন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। দেবতাগণ, ডাকিনী, যোগিনী এবং বিষ্ণু প্রমুখ দেবগণ উক্ত চূততরুর সন্নিহিত স্থান সকল নিত্য সেবা করিয়া থাকেন।

শিবাজ্ঞায় গৌরী কাঞ্চী তীর্থে আগমন করিয়া জটাবল্কলধারিণী ও ভস্মবিভূষিতা তাপসী বেশ ধারণ করত কম্পা-সিকতা দ্বারা পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কম্পা তটে যথাবিধি পূজা ও তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল তপস্যায় অতিবাহিত হইলে মহাদেব গৌরীর ভক্তি ও ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করার জন্য কম্পার বেগশালী প্রবাহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তাঁহার সখীগণ কম্পা নদীর প্রবাহ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে অবলোকনে নিয়মাসীনা অম্বিকাকে কহিলেন, দেবি! বেগবতী কম্পার প্রবাহ সকলদিকই পরিপ্লাবিত করিবে, অতএব পূজা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করুন।' সখীর বাক্যে ধ্যানাবস্থিতা দেবী ভগবতী নয়ন উন্মীলন করিয়া বর্দ্ধমান কম্পাপ্রবাহে সৈকতলিঙ্গ লয়প্রাপ্ত এবং তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন হইবে এই আশঙ্কায় চিন্তিতা হইলেন। কিন্তু বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকাম, ভগবচ্চিত্তসমর্পিত হইয়া তাঁহার ভজনা করিলে, সংসারের কোন বিঘ্নই ভক্তের অনিষ্ট করিতে পারে না। ভক্তির দৃঢ়তা পরীক্ষা জন্য মায়াবিরচিত চিত তপস্যায় বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয় বটে কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভক্তের সকল বিঘ্নই তিরোহিত হয়। দেবী সখীগণকে কহিলেন—'তোমরা সত্বর এস্থান হইতে চলিয়া যাও, আমি হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া অনাকুল ভাবে অবস্থান করিব।' এইরূপ বলিয়া অম্বিকা শিবলিঙ্গকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন এবং বেগশালী প্রবাহবেষ্টনে বেষ্টিতা হইয়াও সেই লিঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না।

জলপ্রবাহে যখন তাঁহার স্তনাগ্রভাগ নিমগ্ন হইল, তখনও তিনি ধ্যাননিবিষ্ট হৃদয়াশ্বালিঙ্গিত সদাশিবকে স্মরণ, বন্দন ও প্রণাম করিতে লাগিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন :—

বিমুঞ্চ বালিকে লিঙ্গং প্রবাহোঽয়ং গতোমহান্ ॥
ত্বয়ার্চ্চিতমিদং লিঙ্গং সৈকতং স্থিরবৈভবম্।

ভবিষ্যতি মহাভাগে বরদং সুরপূজিতম্ ॥
তপশ্চর্য্যাং তবালোক্য চরিতং ধর্ম্ম পালনম্ ।
লিঙ্গং চৈতন্নমস্কৃত্য কৃতার্থাঃ সন্তু মানবাঃ ॥

"হে বালিকে! মহাপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, তুমি লিঙ্গত্যাগ কর। তুমি এই শিববৈভব সৈকত লিঙ্গের পূজা করিয়াছ অতএব হে মহাভাগে! এই সুরপূজিত পার্থিব শিবলিঙ্গ বরদ হইলেন, অর্থাৎ ইহাঁর নিকট যিনি যাহা প্রার্থনা করিয়া উপাসনা করিবেন তাঁহার তাহাই সফল হইবে। তোমার তপশ্চর্য্যা ও ধর্ম্মপালন দর্শন ও শ্রবণ এবং এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়া মানবগণ কৃতার্থ হইবেন।"

অনৈষিতৈজসং রূপমহং স্থাবর লিঙ্গতাম্ ॥

'এখানে আমি আমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ ত্যাগ করিয়া স্থাবর লিঙ্গে পরিণত হইয়াছি, তুমি গৌতমাশ্রম অরুণাচল তীর্থে গমন করিয়া তপস্যা কর। তথায় আমি তেজোরূপে তোমার সহিত মিলিত হইব।' শিবকাঞ্চীর একাম্রনাথ ক্ষিতিলিঙ্গই মহাদেবী-প্রতিষ্ঠিত স্থাবর লিঙ্গ।

অম্বিকা কাঞ্চী হইতে গমনকালে তপস্যার্থ সমাগত দেব ঋষিগণকে বর প্রদান করিলেন।

তিষ্ঠতাত্রৈব বৈ দেবা মুনয়শ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নিয়মাংশ্চাধিতিষ্ঠন্তঃ কম্পা রোধসি পাবনে ॥
সর্ব্বপাপক্ষয়করং সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ।
পূজ্যতাং সৈকতং লিঙ্গং কুচকঙ্কণলাঞ্ছনম্ ।
অহঞ্চ নিষ্কলং রূপমাস্থায়ৈতদ্দিবানিশম্ ।
আরাধয়ামি মন্ত্রেণ মহেশ্বরং বরপ্রদম্ ॥
মত্তপশ্চরণালোকে মদ্ধর্ম্মপরিপালনাৎ ।
মল্লিঙ্গদর্শনাচ্চৈব সিধ্যন্তুষ্টবিভূতয়ঃ ॥
সর্ব্বকামপ্রদানেন কামাক্ষীমিতি কামতঃ।
মাং প্রণমাত্র মদ্ভক্তা লভন্তাং বাঞ্ছিতং বরং ॥

হে দৃঢ়ব্রত দেব ও মুনিগণ! নিয়মাধিষ্ঠিত হইয়া আপনারা পবিত্র কম্পাতীরে বাস করুন এবং আপনারা সর্ব্ব পাপক্ষয়কর সর্ব্ব সৌভাগ্যবর্দ্ধন মদীয় কুচকঙ্কণলাঞ্ছিত এই সৈকত লিঙ্গ পূজা করুন। আমিও নিষ্কল রূপে অবস্থিত হইয়া দিবানিশি এখানে বরদ মহাদেবের আরাধনা করিব। আমার তপস্যা

প্রভাবে ও ধর্ম্ম পালন বশতঃ এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজন করিলে মনুষ্য অভিলষিত ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি লাভ করিবে। আমি সর্ব্ব কামনা প্রদান করি, আমার ভক্তগণ আমাকে কামদায়িনী কামাক্ষী জানিয়া কামনাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে অভিলাষিত বর লাভ করিবেন।

(বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত স্কন্দ-পুরাণ মহেশ্বর খণ্ড অরুণা-চল মাহাত্ম্য হইতে সংগৃহিত।)

(৩) পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস।

দাক্ষিণাত্যের বারাণসী কাঞ্চী অতি প্রাচীন মহাতীর্থ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র স্থল। পুরা কালে ইহা হিন্দু রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানেও (কাশীর ন্যায়) মৃত্যু হইলে সদ্‌গতি লাভ হয় এই বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ বৃদ্ধবয়সে এখানে তীর্থবাস করিয়া থাকেন। কাশীর ন্যায় ইহা দাক্ষিণাত্যের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র। এখানে বহু প্রসিদ্ধ সাধক পণ্ডিত ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও এস্থলে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। সুতরাং দাক্ষিনাত্যের প্রত্নতত্ত্বের অনেক সামগ্রী কাঞ্চীতে পাওয়া যায়। মন্দিরে মন্দিরে প্রাচীন শিলালিপি, গৃহে গৃহে ভূমিদানসূচক তাম্র লেখ এবং প্রাচীন পুস্তকাদি আবিষ্কৃত হইয়া নিত্যই কত বিস্ময়বিজড়িত লুপ্ত কাহিনী আবিস্কৃত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগে কত বিজয়ী হিন্দু নরপতি দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া প্রথমেই মহাতীর্থ কাঞ্চী ধামে সমাগত হইয়া একাম্রনাথ ও বরদ রাজস্বামীর রাতুল চরণে তাঁহাদের মস্তক লুণ্ঠিত করিয়াছেন। তীর্থগুরু ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছেন তাহার অসংখ্য নিদর্শন মন্দিরগাত্রে এখনও খোদিত রহিয়াছে। শিবাবতার ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ স্বামী, প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি যুগাবতার ও ধর্ম্ম সংস্কারক, প্রচারক ও সাধকগণ, যখনই যিনি এই ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান বা বিমল অহৈতুকী প্রেমের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সকলেই উত্তরের বারাণসীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী তীর্থে আগমন করিয়া তাঁহাদের মত প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বিপুল নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন ইতিহাসে অনুরাগী পাঠক এখানে অনুসন্ধানের অনেক বিষয় পাইবেন।

কাঞ্চী অতি প্রাচীন নগরী। মহাভারতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম

স্কন্ধের ৭৯ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাঞ্চীর (১) উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাঞ্চীরাজগণ পাণ্ডব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্য এবং শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, কাঞ্চী কখনও পাণ্ড্য রাজগণের, কখনও পল্লব রাজগণের, কখনও বা চোল রাজগণের রাজধানী হয়। প্রবল পরাক্রান্ত পল্লব রাজগণ, দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া কাঞ্চীপুরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর শিলালিপি পাঠে আমরা অবগত হই যে, সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া উঠিলেও তৎকালীন কাঞ্চীপুরের পল্লব রাজগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল অনুশাসন দ্বারা গ্রাম ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই গ্রামগুলি পূর্ব্বে জৈনগণের অধিকারে ছিল। বোধ হয় হিন্দু-রাজগণ জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া সেই সকল গ্রামে ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন। (Indian Antiquary viii. 287) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ২য় পুলকেশী একবার কাঞ্চীপুরের পল্লব রাজগণকে পরাস্ত করিয়া কিছু দিনের জন্য কাঞ্চী অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭০ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউ এন সিয়ং কাঞ্চীপুর দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন "কাঞ্চী পুরী দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী, ইহা ৪০ লি বিস্তৃত। ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। অধিবাসিগণ বীর, সাহসী, সত্যবাদী, বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক। সে সময় এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং নির্গ্রন্থ অর্থাৎ জৈন, এই তিন দলই প্রবল ছিলেন। তথায় শত সংঘারাম, ১০ সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত ৮০টী (হিন্দু) দেবমন্দির এবং বহু নির্গ্রন্থ ছিলেন। কাঞ্চী ধর্ম্মপাল বোধি-সত্ত্বের জন্মস্থান, এই জন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি মনে করিতেন। তাই নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ-যাত্রী এখানে তীর্থযাত্রায় আসিতেন। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল কাঞ্চীপুরের রাজমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি শুনিয়াছেন তথাগত শাক্যবুদ্ধ জীবিত কালে এখানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিচিহ্নের উপর অশোক রাজা যে সকল স্তূপ নির্ম্মাণ

---

(১) স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ং
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥১৩
কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিদ্বরাম্। ১৪

করিয়াছিলেন তাহা তখনও বিদ্যমান ছিল। * খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সে সময়েও এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী পল্লব রাজগণ রাজত্ব করিতেন। অষ্টম শতাব্দীর এক শিলালিপিতে কাঞ্চী পুরাধিপ নরসিংহ বর্ম্মা আপনাকে শৈব বা মহেশ্বরোপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, চোল রাজ কুলোত্তুংগি কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। তৎপুত্র অদণ্ডি চক্রবর্ত্তী কাঞ্চীপুরে চোল রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় ইহাঁরা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজগণকে পরাভূত করিয়া সমস্ত বঙ্গোপসাগর-তীরবর্ত্তী প্রদেশ, উত্তরে উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত অধিকার করেন। চোল সাম্রাজ্য বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল "চোলমণ্ডলম্"। "চোলমণ্ডলম্" শব্দেরই অপভ্রংশ "করমণ্ডলম্"। চোল রাজগণ এই গৌরবময়ী যুগেই তাঁহাদের প্রাচীন রাজধানী উরিউর ও তাঞ্জোর হইতে কাঞ্চীপুরে উঠাইয়া আনেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উৎকালের কেশরীবংশীয় একজন রাজা কাঞ্চীপুর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৭৭ খৃঃ ব্রাহ্মণ বংশীয় মুসলমান বাদসা মহম্মদ কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। কাঞ্চীপুর কিছুদিন ব্রাহ্মণবংশীয় মুসলমান বাদসাহেব অধিকারে থাকার পর বিজয় নগর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নরসিংহ রায় ব্রাহ্মণবংশীয় মুসলমান নরপতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। খৃষ্টীয় ১৫ দশ এবং ষোড়ষ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কাল। সে সময় দাক্ষিণাত্যে সমস্ত হিন্দুরাজা বিজয় নগরের সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাঁহারা মুসলমান-অধিকৃত সমস্ত স্থানই উদ্ধার করেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের সময় অনেক মন্দির লুণ্ঠিত ও ভগ্ন হইয়াছিল। বিজয়নগর রাজা এই সকল মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং দেব-সেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন এবং ভবিষ্যতের বিধর্ম্মিগণের আক্রমণ হইতে মন্দিরগুলিকে রক্ষা করিার জন্য মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য দুরারোহ দুর্গবৎ প্রস্তরপ্রাচীর এবং দুর্গদ্বারের উপর মনোহর গোপুরম্ সমূহ নির্ম্মাণ করেন, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মন্দিরের সুদৃশ্য গোপুরম্ সমূহ এই বিজয় নগর সাম্রাজ্যাধিপতিগণেরই নির্ম্মিত। নরসিংহ রায়ের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া

---

* Beal's Buddhist Records of the Western World Vol. II. 229.

১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীপুর দর্শন করেন তিনি কাঞ্চীপুরের বিখ্যাত শতস্তম্ভ-মণ্ডপম্ এবং গোপুরম্ নির্ম্মাণ এবং অনেকগুলি মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন। বিষ্ণুমন্দিরগাত্রে ১৪২৮ শকে খোদিত তাঁহার অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে তিনি বিষ্ণু কাঞ্চীর প্রসিদ্ধ বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের ব্যয় কারণ ১১০০৲ শত টাকা আয়ের কতিপয় গ্রাম এবং পুল্লিকেট বিমানেব জন্য ১ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্য যবনরাজ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে, কাঞ্চীপুর গোলকুণ্ডার মুসলমান বাজের শাসনাধীন হয়। তৎপরে ইহা কখনও আর্কটের নবাব—কখনও বা ফরাসীগণের অধিকার-ভুক্ত হইয়া কার্ণাটিক যু'দ্ধর সময় বহু যুদ্ধবিগ্রহেব রঙ্গভূমি হয়। এই সময় ইহা কয়েকবার লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই সময়েই কাঞ্চীর পূর্ব্ব গৌরব বিনষ্ট হয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব ফরাসীদিগকে পরাভূত করিয়া উহা অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত কার্ণাটিক সমরের সময় কাঞ্চীর মন্দিরের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানসমূহ ইংরাজদিগের সৈন্যনিবাসে পরিণত হইয়াছিল। ১৭৮০ খৃঃ হাইদার আলী ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল বেলীকে রণে পরাস্ত করিয়া কাঞ্চী লুণ্ঠন করিতে আসিলে, ব্রাহ্মণেরা দেবতার উৎসব মূর্ত্তি, আভরণাদি রক্ষা করিবার উদ্দেশে চারিপায়ার উপর মৃতদেহের মত সাজাইয়া ত্রিশিরা পল্লীর অন্তর্গত উদেয়ার পলেয়ম নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। কামাখ্যাদেবীর স্বর্ণমূর্ত্তি তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্র রাজার নিকট তৎকালে প্রেরিত হইয়াছিল। হাইদার আলী কাঞ্চীতে উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণেরা একটী মণ্ডপকে মূল মন্দির বলিয়া দিলেন। এবং তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য খুব ধূমধামে ঐ মণ্ডপে উৎসব করিয়া দেবপূজা করিতে লাগিলেন। হাইদার এই মণ্ডপ ভঙ্গ করিয়া মস্‌জিদ বানাইয়া দিলেন। একাম্রনাথের মন্দিরের নিকটেই এখনও এই মুসলমান মস্‌জিদ দৃষ্ট হয়। এই সময় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীর যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল বেলীকে পরাস্ত করিয়া হাইদার আলী আর্কট এবং আর্কটের অধীনস্থ কাঞ্চীপুরী অধিকার করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ণাটিক নবাবের রাজ্যের সহিত কাঞ্চীপুরীতে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রমণী চিরকালই গৃহিণী। অঘটনঘটনপটীয়সী প্রকৃতিরূপিণী বরবর্ণিনীগণ নিয়ন্তরই সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণা। প্রয়োজনানুসারে গুণসমূহ যখন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে তখনই পুরুষগণ তাহা দেখিতে পায় ও বিমুগ্ধ হয়। তাই, পাঠক, ঐ দেখ বরবর্ণিনী সুদেহা কেমন গালভরা পানে লাল হাসি ছড়াইয়া, ব্যজনী-হাতে গজেন্দ্র-গমনে পতির বিশ্রামপালঙ্ক-সন্নিধানে উপনীতা! সুধর্ম্মা মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পর্য্যঙ্কে সমাসীন, সুদেহা তাঁহার চরণসমীপে বসিয়া বীজন করিতেছেন। নবীন পাঠক। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে এমন মধুর লহরী-লীলা দেখিলে তোমার কি মনে হয় বল দেখি? তা যাই হোক;—সুধর্ম্মা প্রধান সংসারী, তাঁহার পক্ষেও প্রকৃতিরূপিণী ললনার এই বিলাসতরঙ্গের মর্ম্মানুধাবন বড় সহজ হইল না। তিনি এই মাত্র বুঝিলেন যে সুদেহার এই প্রমোদোৎফুল্ল হাসির অন্তরালে কিছু না কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে! তাই একটু রসিকতার হাসি হাসিয়া বলিলেন 'ভাটী গাঙ্গে যে জোয়ার ফিরে এলো দেখছি, সুদেহা?'

সুদেহা। আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে; আপনাকে তা' রাখতেই হবে।

সুধর্ম্মা। কি অনুরোধ বল।

সুদেহা। আপনি আর একটী বিবাহ করুন; সন্তান হয়ে আমাদের বংশ রক্ষা হউক।

সুধর্ম্মা। সে কি?

সুদেহা। সে কি—কেন?

সুধর্ম্মা। এ আবার কি পরীক্ষা দেবি! আজও কি তুমি আমার মন বুঝিতে পার নাই!!

সুদেহা। না নাথ। প্রভো! এ পরীক্ষা নয়! আমি মর্ম্মে মর্ম্মে আপনার

গরবে গরবিণী দাসী তাই এ আমার মর্ম্মবাণী ; এই আমার প্রাণের ভাষা, স্বামিন্ !

সুধর্ম্মা। অয়ি প্রকৃতিরূপিণী নারী, তুমি যে আমার প্রকৃতিস্বরূপ, এ তোমার কেমন অনুরোধ, সতি !

সুদেহা। পতির পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই যে নারীর প্রয়োজন ; আপনি তাহা বিস্মৃত হচ্ছেন কেন ?

সুধর্ম্মা। ভাল, আমার দারান্তর গ্রহণে তোমার কি সুখ হইবে ?

সুদেহা। স্বামিন্, দেবতা ! প্রভো !! তোমার পূর্ণত্ব দেখা রমণীর ভাগ্যে হয় কৈ, কোন্ রমণী ভর্ত্তার পূর্ণত্ব উপলব্ধি কবিতে পারিয়াছে বা পারে ? আমার ক্ষুদ্রত্ব দিয়া যে তোমায় দেখি তাতেই আমি ভরপুর। তাই তোমার একটী ছোট্ট ছবি—তোমার অতুল মহত্বের একটী ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব দেখিতেই আমার সাধ ! আমার সপত্নীগর্ভজাত আপনার পুত্ররূপ প্রতিকৃতি দর্শনেই আমার তৃপ্তি ও শান্তি ; আমি তাহাতেই সুখী, আপনার বংশ রক্ষাতেই আমার সুখ ! মহান্ ; তুমি কখনও আমার হইবে না, হইতে পারিবে না, যে রমণী প্রকৃতি হইয়া পুরুষকে আপন করিতে চাহে—সে ভ্রান্ত, সে অতি নির্ব্বোধ, *পুরুষের পদে আপনাকে বিনা মূলে বিক্রীত করাই নারীর ধর্ম্ম, প্রকৃতির* প্রকৃতিত্ব ; আমরা নারী তুমি পুরুষ, আমরা পুরুষের প্রেমে ডুবিতে পারি, মজিতে পারি, লীন হইতে পারি, পুরুষের অন্তরে লীন হওয়াই রমণীর পরম গতি ও চরম লক্ষ্য ; তাই নাথ, তোমার পুত্ররূপী ছোট ছায়াটুকু লইয়া খেলা করাই রমণীর সংসারসুখের পরম আদর্শ, আমাকে সেই সুখ সাধন হইতে বঞ্চিত করিও না প্রভো ; তোমার প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক খেলা খেলিতে চাহে, সে তার খেলা তোমাকে দেখায়, তুমি শুধু একটী বার তাহা দেখিবে তাহাতেই তাহার পরম সুখ !

সুধর্ম্মা। প্রিয়ে, এখন যাহা বলিতেছ কাজে তাহা ঘটিবে কি ?

সুদেহা। কথায় আর তাহা কি প্রকারে জানাইব প্রাণের দেবতা ! তুমিত আমার মর্ম্মবাণী বুঝ নাথ ! তাই বুঝিয়া আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর।

সুধর্ম্মা। সুদেহা, সংসারে সকল বিষয়েরই কাল্পনিক উচ্চ ভাবটুকু কার্য্য-ক্ষেত্রে থাকে না, জগতে যথার্থ তাহার ভাল মন্দ সর্ব্বভাব লইয়াই ফুটে ; যাক্। এখন যে কাল্পনিক সপত্নী-তনয়কে একান্ত আপন পুত্র বলিয়া ভাবিতেছ পরে

যখন যথার্থই সপত্নীকে পুত্রবতী দেখিবে, তখন হয়ত তুমি সপত্নিদ্বেষ বশতঃ বিহ্বলা ও জ্ঞানহারা হইয়া যাইবে।

সুদেহা। আমি আপনার সমক্ষে শপথ করিয়া বলিতেছি সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিলে আমি সুখে থাকিব।

সুধর্ম্মা। তুমি যথার্থই তাহাতে সুখী হইতে পারিবে?

সুদেহা। আমি সত্যই বলিতেছি আমি তাহাতে সুখী হইব। যাহাকে আপনার সহিত বিবাহ দিব সে আমার সহোদরাত্মজা যুশ্মা; সে আমার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। আমরা দুইজনে দুইটী সাগর-সম্প্রাপ্ত তটিনীর ন্যায় আপনার সহিত মিলিয়া থাকিব; আমাদের পরস্পর বিরোধাশঙ্কায় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সুধর্ম্মা। ভাল, তুমি যদি তাহাতে সুখী হও তবে তাহাই হইবে।

সুদেহা মনে মনে অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। 'ভাবিলেন যুশ্মার পুত্র হইলেও যে ফল, আমার হইলেও সেই ফল। স্বামীর প্রতিকৃতি বলিয়াইত পুত্র প্রিয়, তা আমার গর্ভজাতই হউক বা পরের গর্ভজাতই হউক! আর যুশ্মা—সেত আমারই, তাহাতে আবার দুঃখ বা আশঙ্কা কি?' সুধর্ম্মা ভাবিলেন— সুদেহা সন্ততির জন্য উন্মত্তা হইয়াছে। আহা, সুদেহের স্বভাব কি সরল! তাহা না হইলে কে কোথায় সাধ করিয়া স্বামীর পুনরোদ্বাহে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে? স্বামী দিয়া, পুত্রদিয়া, পরকে সুখী করিয়া তুমি সুখী হইবে? তোমার সুখের আদর্শ কত উচ্চ! ধন্য রমণি! ত্যাগ সুখের যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তুমি সংসারের মোহময় রঙ্গালয়ে আনন্দের অভিনয় করিতে বসিয়াছ, অনেক কানন-বাসী যোগীর পক্ষেও তাহা অতীব দুর্লভ। নারীরূপা প্রকৃতি আনন্দের এই আদর্শেইত তুমি জীবকে সংসারের মোহময় পঙ্কিল হ্রদ হইতে উচ্চতার আনন্দের মন্দিরে উত্তোলন কর। ধন্যা নারী, ধন্য তোমার সঙ্কল্প, ধন্য তোমার প্রতিজ্ঞা।

(৪)

সুধর্ম্মার সহিত যুশ্মার পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আনন্দের উচ্চ কোলাহল-মুখরিত হুলুধ্বনির মধ্যে সুদেহা সপত্নীকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। সুধর্ম্মা সুদেহার সরল অপরিমেয় আনন্দ ও উৎসাহ দর্শনে বিস্মিত হইলেন। তাই নবপরিণীতার প্রথম বাসরশয্যায় নবোঢ়ার প্রতি পতির প্রথম উপদেশ এই যে তিনি যেন তাঁহার সপত্নীকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় দেখেন ও তাঁহার একান্ত অনুগতা থাকেন, কোনও মতে ইহার অন্যথা না হয়। যুশ্মা ভাবিলেন

উঁহাকে যে আমি ভালবাসিব ও সম্মান করিব তাহাও স্বাভাবিক; তাহা আবার বলিতে হইবে কেন?

শান্তশীলা ঘুশ্মার রূপ, গুণ বর্ণনার বিষয় নহে, উহা প্রতীতি ও অনুভবের বিষয়। কথায় প্রকাশ্য নয় তথাপি কৌতূহলাক্রান্ত জিজ্ঞাসুর মনোরঞ্জনের জন্য এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঘুশ্মা সুকবির পুণ্যময়ী কল্পনার মূর্ত্তিময়ী প্রতিকৃতি; সাধু হৃদয়ের মর্ম্মগত ধর্ম্মভাবের ন্যায় স্বামী দেবতার একান্ত অনুরাগিণী। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্বধন, মর্ম্মের মর্ম্ম, আমির আমি সমক্ষ্য ভগবান। সুদেহার স্বামী তাহার সংসারের সম্বল, কর্ম্মের নিয়ন্তা, ধর্ম্মের অবলম্বন, সে স্বামীকে লইয়া সংসারে সংসারী সাজিতে চাহে, আর ঘুশ্মা স্বামীতে ভগবৎ জ্ঞানে আপনাকে নিঃশেষে ডুবাইয়া মজিয়া মরিয়া থাকিতে চাহে। পাঠক! ইহা হইতে সুদেহার চরিত্রফলকে ঘুশ্মার ও ঘুশ্মার আলোকে সুদেহার পরিচয় আপনারা নিজে বুঝিয়া লউন; অধিক বলিবার সাধ্য লেখকের নাই।

পতির নিয়োগানুসারে ঘুশ্মা প্রতিদিন একশত একটী করিয়া শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করত অর্চ্চন ও বিসর্জ্জন করিতেন। ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। ঘুশ্মা যখন একাগ্রমানসে দেবাদিদেবের পূজা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার নব-যৌবনোদ্ভাসিত অলৌকিক লাবণ্যসম্ভার ভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এমনই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র শোভা সম্পন্ন হইত যে তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও মোহিত হইত; অতি বড় পাপিষ্ঠও সেই অপার্থিব রূপের নিকট অবনতশির না হইয়া থাকিতে পারিত না। ঘুশ্মার দেহে যত্ন আছে বিলাস নাই, স্বামিসুখে আনন্দ আছে আশক্তি নাই, অথচ ঘুশ্মা সুখী—সদাই প্রসন্ন—সদাই হাসি হাসি মুখ; সে নিরন্তর আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া আনন্দে মগ্ন। সে আনন্দের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, তাঁহার আনন্দ কোনও বস্তু, কোনও ব্যক্তির অপেক্ষা করে না। প্রফুল্ল কমলের ন্যায় হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা সবিতার প্রেমে বিকশিত, রূপে ও সৌরভে পিপাসা বিহীন, অথচ তাহার রূপে ও সৌরভে সকলেই পরিতৃপ্ত। আবাল বৃদ্ধ প্রতিবাসিগণ যেই একদিনের জন্যেও তাহার সহিত আলাপ করিত সে কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাঁহার পতিপ্রেমে চঞ্চলতা বা উদ্বেলতা নাই; মহাসমুদ্রের গম্ভীর প্রশান্ততার ন্যায় উহা এক বিশাল আনন্দের আধার, তাই যখন যে কেহ তাহার সমীপবর্ত্তী হইত সে সেই আনন্দ-শীকরস্পর্শে শীতল হইয়া ক্ষণকালের জন্য জগতের

তাপ বিস্মৃত হইত ও সেই অভিনব আনন্দের স্রোতে জীবনের এক নূতন গতি অনুভব করিয়া তাহার অনুসরণের নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠিত।

স্বামী ঘুশ্মাকে যাহা উপদেশ করেন তিনি তাহাই সুচারু রূপে শিক্ষা করেন। সুধর্ম্মা দেখিলেন ঘুশ্মাতে যে সকল গুণ বর্ত্তমান স্বর্গের দেবতাতেও তাহা দুর্লভ। সুতরাং সুধর্ম্মার মন সহজেই তাহাকে একান্ত ভালবাসিতে লাগিল। এই প্রকারে পূজা আহ্নিকে ও পতি-সেবায় ও সুদেহার যত্নে তাঁহার দিনগুলি পরম সুখে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এক লক্ষ শিবপূজা সম্পন্ন হইলে ঘুশ্মা দেবাদিদেবের অনুকম্পায় সুদেহার চির রঞ্জিত ও পতির আনন্দবর্দ্ধন পবিত্র গর্ভ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে সুদেহা পরম আনন্দিতা হইলেন; সেই আনন্দপ্রবাহে অধিকাংশ সময় তিনি স্বয়ংই অজাত জাতকের সুকুমার ভাব সমূহের অনুধ্যানে অন্তঃসত্বার সুখানুভব করিতেন। সুধর্ম্মা ও প্রতিবাসী বান্ধবগণ ভবিষ্যতে বংশধরের আগমন সূচনায় আনন্দিত হইলেন।

যথা সময়ে ঘুশ্মার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। তখন আর তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। দেহ ও মনের ন্যায় পরস্পর প্রীতিসূত্রে সুনিবদ্ধ সপত্নীদ্বয় স্বামিসেবায় ও সন্তান পালনের নির্ম্মল সুখে ভাসিতে লাগিলেন। সুধর্ম্মা ভাবিলেন—"ভগবানের এত দয়া, অহো এ কেবল সুদেহার পুণ্যে!—ইহা সুদেহার আশ্চর্য্য ত্যাগের ফল।" বাস্তবিকও'ত তাহাই।

মনের মত সেবাপরায়ণ বিশ্বাসী ভৃত্য বা স্বেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত প্রভু আর দ্বিতীয় নাই। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ", বুদ্ধি ও বিবেচনার অধীনে থাকিয়া মন যে প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই; সেই মনই যখন বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উপরে প্রভুত্ব লাভ করে তখন সেই স্বেচ্ছাকারী বিপথগামী মন যে শত সহস্র বিপদ্ আনয়ন করে তাহারও ইয়ত্তা হয় না। তাই যাহারা মনের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করে, তাহারা যেমন ভালও করিতে পারে, মন্দও করিতে পারে, কারণ মনের মত অস্থির ও চঞ্চল আর দ্বিতীয় নাই। সংসারে যত কিছু পাপ ও দুষ্কর্ম্ম তাহার সমুদয়ই মনে উৎপন্ন হয় ও মনেই পুষ্ট হয়। যাহারা বুদ্ধি ও জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক স্বার্থ ও অভিসন্ধিশূন্য প্রেমের বশে কর্ম্ম করেন, তাহাদের কর্ম্মই সতত শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে। মন সততই চঞ্চল। এখন তৃষ্ণা আছে, তাই জল মিষ্ট, কিন্তু পরক্ষণেই তৃষ্ণা মিটিয়া গেলেই আর জল ভাল লাগে না। আজ রোগ

তাই ঔষধ ভাল ও গ্রহণীয়, কাল রোগের অবসান হইলেই আর ঔষধ গৃহে থাকে না, তাহা বর্জ্জনীয় হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় ও বাসনা তৃপ্তির জন্ত এখন যাহাকে বড় আদর করিতেছি বড় আপন ভাবিতেছি, ইন্দ্রিয় বৃত্তি শিথিল হইয়া পড়িলে পরক্ষণেই তাহাকে ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। অসংযত বাসনাভিমুখী মনের খেলা এমনই চপল। কিন্তু ধন্য ভগবান্! ধন্য তোমার খেলা!। এই প্রতারণাপরায়ণ মন এইরূপ প্রবঞ্চনা করিতে যাইয়াও অনেক সময়ে প্রেমের ফাঁসি গলায় পড়িয়া স্বার্থত্যাগ ও পরার্থ-পরতা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তখন 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' পড়ে। আবার কখনও এই প্রতারণায় দণ্ড পাইয়া প্রকৃত পথ দেখিতে পায়। ভগবান্ যে কাহাকেও পতিত ও পরিত্যক্ত করিয়া রাখেন না ইহাই তাঁহার দয়ার অপরিসীম দুর্ব্বোধ্য মহিমা।

সুদেহাই ঘরণী গৃহিণী। সুদেহাই সকল গৃহকর্ম্ম করেন, ঘুশ্মাকে কিছুই করিতে দেন না. সে কেবল স্বামী সেবা ও দেবারাধনাতেই নিমগ্ন, সুধর্ম্মার পত্নী ভাবটী যেন ঘুশ্মা ও সুদেহাতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহার সংসারে প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গা যমুনার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। সুদেহা তাঁহার দেহের ন্যায় সংসারে যাবতীয় ভোগ দ্বারা সুধর্ম্মার অপর প্রকৃতিরূপিনী ঘুশ্মার ও সুধর্ম্মার সেব দ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিতেছেন, আর ঘুশ্মা আপনার সুমধুর প্রেমভাব ঢালিয়া ঢালিয়া স্বামী, সংসার ও সুদেহাকে মধুর রসে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। পুত্র'ত সুদেহারই; সুদেহা নিজের প্রাণ, মন, আশা, ভালবাসা দিয়া আপনার সর্ব্বস্ব ছানিয়া তাঁহার অতি যতনের রতনকে, তাঁহার প্রিয়তম পতির প্রতিবিম্বটীকে, বাড়াইয়া তুলিতেছেন। ঘুশ্মার তাহাতেই সুখ। পুত্র আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া ঘুশ্মার কোলে উঠিলে ঘুশ্মা যে সুখ পায় তাহা যত মিষ্ট লাগে, আবার যখন সুদেহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক তাহার প্রীতি-ভরা গোলাপ-কোরক সদৃশ ওষ্ঠাধরপুটে সুদেহার বদন-চুম্বন করে তাহা যেন আরও মধুর আরও ঘন বোধ হয়।

তাহাদিগের সপত্নীসৌহার্দ্র এতই মধুময় হইয়াছিল যে অনেক পতিসোহাগিনী রমণীও মুক্তকণ্ঠে এই প্রকার সপত্নী কামনা করিতেন।

কথায় বলে 'পাঁচ ফুলে সাজি'। একমাত্র ফুলে ডালি সাঁজাইলে তাহার যে শোভা তাহা অপেক্ষা নানা ফুলে সুসজ্জিত ডালির শোভা অনেক অধিক। সেই ক্ষেত্রে ভাল মন্দ সকলেরই এক একটা স্থানীয় মাণ থাকে। পরস্পরের

গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া নিতান্ত হীন কুসুমও ডালির সৌন্দর্য্যসম্পদের যথাযোগ্য অংশলাভে বঞ্চিত হয় না। দশের সহিত মিলিয়াই একের মান বাড়ে। ভাল মন্দের সমাবেশেই সংসারের সংসারত্ব প্রতিষ্ঠিত। এখানে মন্দের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া ভালর মর্য্যাদা যত বৃদ্ধি পায়, তেমনি উত্তমের সমীপ-বর্ত্তিতায় অধমের হীনতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তড়িৎ বিশ্বব্যাপি হইলেও নবজলধর অঙ্কে তাহার দামিনীচ্ছটা অতুল শোভা ধারণ করে। তাই সুধর্ম্মার প্রতিবাসী নরনারীগণের মধ্যে যাহারা শিষ্ট তাহারা যেমন সুদেহা ও ঘুশ্মায় প্রশংসা করিতেন ও ইহাদের এই সৌভাগ্যের চিরস্থায়িত্ব কামনা করিতেন, অন্যদিকে যাহারা অশিষ্ট তাহারা ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হইত ও নিরন্তর ইহাদের বিচ্ছেদের কামনা ও চেষ্টা করিত। তাহার একটু কারণও ছিল। দুঃশীল দুর্ম্মুখ রমণীগণের পতিগণ সর্ব্বদাই সুদেহা ও ঘুশ্মার মিলনের উদাহরণ দেখাইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "দেখ সতীনে সতীনে ঝগড়ার নামটী নাই আর তোমরা আপনা আপনি কন্দল করে মর।" এই সকল তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ যাহাদের প্রাণে বিঁধিত তাহাবা মনে ভাবিত "ওদের কি মরণ নাই! আঃ সতীনের আবার ভাব!!" বলিত "দেখবে গো দেখবে"—"আগে আমে হক আঁটি, কাঁঠালে হ'ক কোষ। তখনই সে জানা যাবে কার গুণ কার দোষ।" এখনত দেখিতে দেখিতে আমের আঁটি হইল—ঘুশ্মার সন্তান হইল, বড় হইল, বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, কৈ, এখনও ত কারো দোষ গুণ বুঝা গেল না? পাঠক, সবুরে সব জানা যায়। সময়ের ফের এসেছে বটে কিন্তু বয়ে যায়নি'ত।

সুদেহার পুত্র—সুদেহার পুত্রই বলি, কারণ সংসারে তাহার সহিত পুত্রের যতটা নৈকট্য ঘুশ্মার সহিত ততটা নাই—বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বিদ্যাভাস ও উপনয়নাদি হইল, গুরুকুল হইতে সমাবর্ত্তনও হইল; এখন সে যুবক; শাস্ত্রে তাহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছে, বিদ্যায় তাহার চরিত্র ভূষিত হইয়াছে, বিনীত ব্যবহারে তাহার সকল কার্য্য, বাক্য ও মন মধুর হইয়াছে। কাযেই পুত্রের অনুরূপ বধূ লইয়া ঘর সংসার করিতে না পারিলে আশাময়ী সুদেহার সুখ সাধ কিসে মিটে! পুত্রের বিবাহই এখন সুদেহার প্রধান ভাবনার বিষয়।

সুদেহা একদিন গৃহকার্য্যের অবসরে সুতাকাটার উপলক্ষে (নিজহস্ত নির্ম্মিত সূত্রে যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করা ব্রাহ্মণকন্যাগণের অবশ্য কর্ত্তব্য) পুত্রের বিবাহ চিন্তা লইয়া বসিয়াছেন। জনৈকা বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী সহসা তাঁহার গৃহে

প্রবেশ করিল; ইনি সুদেহার গঙ্গাজল। গঙ্গাজল সর্ব্বসন্তাপহারিণী। কিন্তু এই গঙ্গাজল সুদেহার পক্ষে কলের গঙ্গাজল, খুব টল্‌টলে অর্থাৎ কেবল স্তোকবাক্যে তাহার মন ভুলাইতেই তৎপর--নামেই গঙ্গাজল কাজে গঙ্গাজলের কোন গুণই নাই। পক্ষান্তরে সুদেহা তাহার পক্ষে ঘৃত লবণ, তৈল তণ্ডুল তরকারীর পয়সা সাহায্যকারিণী কল্পতরু, সুতরাং তাপহারিণী গঙ্গাজল'ত বটেই।

কাজেই সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষ সিদ্ধ তাহা যদি একপক্ষে বিশেষ ভাবে ও অপর পক্ষে প্রতিকূল ভাবে পাওয়া যায় তবে তাহাকে অনৈসর্গিক বলা যায় না; কারণ বিশ্বই পরস্পর প্রকৃতীর লীলা। গঙ্গাজল গৃহে প্রবেশ করিলে সুদেহা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাকে বসিতে আসন দিলেন ও উভয়ে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য পরস্পর নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। পরে সুদেহা কহিলেন—ভাই গঙ্গাজল, আমার খোকার জন্য একটী ক'ণের সন্ধান কর, খোকা বেশ বড় সড়টী হ'ল এখন।

গঙ্গা। কোথা! কার ছেলে গা?

সুদেহা। কেন যুশ্মার!

গঙ্গা। তা' তার ছেলে বড় হল তাতে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

সুদেহা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সে কি কথা দিদি; আমার'ত আর নাই, এই যে আমার।

গঙ্গা। মরণ আর কি। তাও কি কখন হয়।

সুদেহা। কেন?—

গঙ্গা। এই কি বল্লি? ও কার ছেলে?

সুদেহা। 'যুশ্মার'।

গঙ্গা। তবে,—কই 'আমার' বলতে পারলে না'ত।

সুদেহা। তা আর কি করে বলি।

গঙ্গা। তবে,—ওই রকম! সতীন আর সতীন পো কবে আপন হয়।

সুদেহা। সে কি বলছ দিদি, বাছা আমায় কত শ্রদ্ধা করে সে আমা বই আর কাকেও মা বলে জানে না।—

গঙ্গা। হ্যাঁগো হাঁ, পোড়া কপাল আর কি? আমরা যে সুখ্যাতি করি সে কার সুখ্যাতি করি? যুশ্মার সুখ্যাতি করি। কেন?—না তার ছেলে তার সোয়ামী, তার ঘর তার গৃহস্থি তারই সব। আমরা তোমাকে তাহার দাসী বলেইত জানি। তুমি তাদের অত কর, তা—মা, বলবে না?

সুদেহা। তা', কার মনে কি জানিনা—তা' সতীন ও যেমন নয় ছেলেও তেমন নয় !

গঙ্গা। তা' ভাই তোর মত হাবা মেয়ে আমি দেখিনি যাহ'ক। তোর সোয়ামী কা'কে বেশী ভাল বাসে ?

সুদেহা। তা বোন, যুশ্মা হ'ল ছোট, ওর ছেলে, হলো আমার হ'লো না—যুশ্মা সদাই পূজা আহ্নিক নিয়েই আছে। একবারে তাঁর মনের মতন, তিনি ঠিক যেমনটী চান, তার চেয়েও বেশী তা হবে, তা বলে আমায়'ত আর অযত্ন করে না ! আমার দ্বারা তাঁর যাই সে টুকুর অকুলান হচ্ছে যুশ্মা ত তাই কচ্ছে। তিনিও তাই মনে করেন আমিও তাই ভাবি আমরা দুজনে তাঁর স্ত্রীর যেন দুটী ভাগ,—আমি দেহ আর যুশ্মা মন !

গঙ্গা। তা ভাববে বই কি ভাই ; তোমরা হ'লে ভাবের মানুষ কত ভাবই হবে ! আমরা ভাই অত 'ভাব ভাব ডুমুরের ফুল' 'বুঝি না ! আমরা মোটা মানুষ মোটা বুদ্ধিতে বুঝি। আজ যুশ্মাই ঘরণী, গৃহিণী তার সোয়ামি তারই ছেলে তারই ত ঘর গৃহস্থালী সব। তোর গতর আছে গতর খাটাচ্ছিস' তাই একমুঠা খেতে দেবে না ? তা' গেরস্ত ঘরে ঝি চাকরাণী থাকেই খাটবার জন্য। তা' যখন বুড় হবি আর গতর খাটাতে পারবিনি তখন আর এ আদর থাকবে না ; দূর করে তাড়িয়ে দেবে তখনই বুঝবি সতীন কত আপন হয়ে থাকে। বুঝবি লো বুঝবি—

নিম তেত নিশিন্দা তেত আরো তেত খ(য়ে)র।
তার চাইতে বেশী তেত সতীন পোয়ের ঘর॥"

সুদেহা। যাক ভাই, তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

গঙ্গা। তা পারবে কেন ! "যাদু মন্তর পোড়ে গেছে, দুটি চখ বুজে"। লোকে কথায় বলে–

ঢেঁকিকে বুঝাবো কত—নিত্য ধান ভানে।
অবোধকে বুঝাবো কত বোধ নাহি মানে !

একেত সতীন, তার ছেলে হয়েছে ত ঘরে গেছে ! তার আবার ভালবাসা কি ? অত আদর কিসের ? অত পূজা আহ্নিক কিসের ?—অমনি গোলাপ ফুলের মত হাসি হাসি মুখখানি করেত তুই আর বেড়াতে জানিল্‌নি, পারবিই বা কেন ? তার ঘর, তার সংসার, তারইত সব। তাই অত হাসি, অত আহ্লাদ, অত আদর

অত ভালবাসা, তুই এত খেটে মরিস কেন? তোর কি? তোর ঘর না দোর, ছেলে না পুলে, ঢেকি না কুলো?—

সুদেহা। আমি'ত তা এখনও ভাবতে পারিনি—সুস্মা শুনবে; তুমি আজ যাও ভাই, আমি একটু রকম বুঝে দেখি। আমার মাথাটা বড় ধরেছে।

গঙ্গা। (মনে মনে) মাথাধরেছে, না, আমার ওষুধ ধরেছে। (প্রকাশ্যে) তা' যাই ভাই কিছু মনে ক'বো না। তোমার সতীন, তোমার সতীনপো; হাজার হলেও তোমারইত সব, আমরা কোথাকার কে?—তবে কিনা মানুষকে হিত কথাই বলতে হয়

এই প্রকার বাক্যালাপের পরে, পরম হিতকাঙ্খিনী গঙ্গাজল সুদেহার কক্ষ-কমুণ্ডলু ত্যাগ করিয়া বহির্গমন করিলেন; যাইতে যাইতে তাহার পর হিতৈষণার বৃত্তিটা এতই বাড়িয়া উঠিল যে সুস্মার গৃহে গমন না করিয়া আর তাহার উপায় রহিল না। যাও দেবী দুষ্টা সরস্বতি, যদি সতীর কিছু মাহাত্ম্য থাকে, যদি কায় মন বুদ্ধিতে শিবপূজার কিছু ফল থাকে, স্পর্শমনি স্পর্শে লোহের কাঞ্চনত্ব প্রাপ্তি যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে তোমার ক্রুর কালিন্দা-বিষ-দুষ্ট হলাহল-পূর্ণ হৃদয়-হ্রদে প্রেম-যমুনায় অমৃতময় বারি সঞ্চার হইয়াছে, তুমি বিষ দিতে যাইয়া সতীর কৃপায় অমৃত লইয়া ফিরিয়াছ।

(ক্রমশঃ)

সাধক সর্ব্বানন্দ।

ভৈরবী।

সর্ব্ব। পূণা দাদা দেখ ওই
জননী আনন্দময়ি,
কি রঙ্গে আইল নামি ত্রিলোকীর মাঝে
লয়ে জপমালা করে
পুস্তিকা হস্তেতে ধরে
ত্রিকূট কন্দরে মাতা ভৈরবীর সাজে।

ভব-ভয় বিনাশিতে
রক্তাধর সু-হাসিতে
চতুর্ভূজা দেবী পরি' সুরক্ত বসন,—
গলে দোলে মুণ্ডমালা
ভালে শোভে শশিকলা
সুরক্ত ত্রিপুর পদ্মে করিয়া আসন,—
নব-দ্বারাবতী পুরে
প্রকাশিত স্তরে স্তরে
'পংক্তি' ছন্দ রূপে সর্ব্ব ছন্দের জননী,
ঋষিরূপে পান স্ফূর্ত্তি
শ্রীগুরু দক্ষিণামূর্ত্তি
ধরি অঙ্কে রাজেরঙ্গে বিশ্বপ্রসবিনী
অসিতাঙ্গ আদি করি
ভৈরব ত্রিপুর অরি
অষ্টদ্বারে দ্বারি শিব মঙ্গল আলয় ।
দৈবীশক্তি দ্বারে দ্বারে
অম্বার অর্চ্চনাতরে
সাজাইছে কি সুচারু আজ্যস্থালিচয় ।
এ কি ?　প্রকাশ, বাসনা আর,
ক্রিয়ারূপে সুপ্রচার,
ত্রিকুটের বীজভূতা ত্রিপুরা ভৈরবী ?
পরিয়া আসুরী সাজ
মাগো, তোর এ কি কাজ,
এক ব্রহ্মে বহুরূপে ছিন্ন কর সতি ।
হিরণ, রজত, অশ্মে
মায়ার যা ছাই ভস্মে
ময় রূপে মায়াপুরী করিয়া গঠন ।
ত্রিপুরে, ত্রিপুর নামে
বিরাজিছ সেই ধামে,
দৈত্যরূপে সঙ্গে লয়ে দৈত্য অগণন ॥

নির্জ্জর অমরগণে
পরাজয় করি রণে
প্রবল কঠোর দণ্ডে করিছ শাসন
অসন-বসন হীন
দীন দৈবশক্তি ক্ষীণ
চিরমৃত্যু-ক্লেশে তপ্ত যত দেবগণ।
নিৰ্জ্জিত বাসব স্তব্ধ
আকাশ বহেনা শব্দ
স্পর্শে মাতরিশ্বারূপে না বহে পবন
বহ্নি ভানু তেজোহীন,
বিশ্ব অন্ধকারে লীন
বিরস সলিল তপ্ত বাষ্প প্রস্রবণ॥
গন্ধহীন ভূতধাত্রী
মুহু-বিকম্পিত গাত্রী
বিচ্ছিন্ন পাংশু সে মহীক্ষুব্ধ সুচঞ্চল।
ত্রিপুর ভৈরবি। তার
একি লীলা মহাঘোর,
বিধি বিষ্ণু রুদ্র বসু সবাই বিহ্বল॥
অসুরেও মাতৃ প্রাণ
স্নেহ-সিন্ধু মূর্ত্তিমান,
মাতৃস্নেহ পারাবার সর্ব্বত্র দুর্লভ,
তারো শিরে পদহানি
পিশাচ-রক্ষণ-গ্লানি
ঘৃণ্য নির্দ্দয়তা তোরে মানে পরাভব॥
জননীর স্নেহালয়
স্তনভাণ্ড সুধাময়
অবিশ্বাস নিরাশায় নাহি সেথা স্থান
যা'র দরশনে হৃষ্ট
ক্ষুধা পিপাসায় ক্লিষ্ট,
নির্ভীক সরল শিশু সুখে করে পান ;

সেই—

স্তন পাত্রে পুরি হায়।
কামকটু মদিরায়
বাসনা-রঞ্জিত, উগ্র উজ্জ্বল চঞ্চল,
মধুর অমৃত বলি,
হাসিয়া দিতেছ ঢালি,
আপন সন্তান মুখে তীব্র হলাহল॥

মণির মালায় ঢাকি
সূত্রটি লুকায়ে রাখি'
বহু মন্ত্রে বহু তন্ত্রে খুলে ইন্দ্রজাল,
বহুজীবে বহু বীজে,
বহু রূপে' ব্যাপি নিজে,
দেখাও বিশ্বেতে দৃশ্বভীতির করাল!

সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য
এক ব্রহ্ম পূর্ণ আদ্য;—
আত্মাতে অভেদ বুদ্ধি যে বিদ্যা মহান্
বুদ্ধি বহির্ম্মুখী করি
বহু গ্রন্থে ব্যক্তকবি,
সে বিদ্যার বহুরূপে করিছ বাখান!

পরাজ্যোতি ঢল ঢল,
জ্ঞান ইন্দু নিরমল,
কলা কলা বহুরূপে ছিন্ন করি তায়
রতন ভূষণ করি
ললাটে রয়েছ পরি'
অখণ্ড সে জ্ঞান ভাণ্ড পূরিত সুধায়॥

হাসিয়া মোহন হাসি
পরায়ে' মায়ার ফাঁসি
জীবে বিশ্বে নাচাইয়া খেলায় মায়ার,

অভয় বরদ করে
বুঝাতে চাহ কি তারে
'তোর এই লীলাখেলা, সর্ব্ব সারাৎসার'।
বটে বটে বটে তাই
তাতে মাগো ভুল নাই
মায়াময়ি, জ্ঞানময়ি জননী বরদে!
বাহিরে ভৈরবী লীলা
অশেষ ভীতির খেলা,
অন্তরে আনন্দময়ী তুই যে সারদে!
বাড়ায়ে অভয় কর
সাপটিয়া কোলে ধর
তোর এ খেলায় ভীত দীনার্ত্ত সন্তানে,
শরণ আগত তা'রে
বরদে। বরদ করে
বর দানে তুলে লও আনন্দ সদনে।
এ লীলা'ত মহা কূট
অজ্ঞেয় অপরিস্ফুট।
নশ্বর প্রপঞ্চ এই ইন্দ্রজাল মাঝে
আনন্দ বীজলী রেখা
সম, যাহা যায় দেখা,
তাও তোর আনন্দের ভাণ্ডারেতে রাজে॥
মহাদেবী মহাসুরী
সকল খেলাই তোরি;
মহাবিদ্যা, মহামোহা, স্মৃতি মেধা তুই
অসুরেতে মহাসুরী
মহাশক্তি বলে তোরি
ত্রিপুরারী ধনুধরে দাঁড়ায়েছে ওই।
ত্রিকূট তাঁহার রথ,
দেবশক্তিগণ যত
সে রথের 'সর্ব্ব' অংশ করেছে ধারণ

সারথী হ'য়ে সে রথে
মন্মথ-প্রগ্রহ হাতে
ইন্দ্রিয়-বাসনা-অশ্ব করি সংযমন,
পদ্মযোনী প্রজাপতি
যেন ভয়ে ভীত অতি
ধরি অন্তর্ম্মুখী গতি আছে অবস্থিত
সর্ব্বাধার নারায়ণে
টানিয়া একত্র গুণে,
পরাপর প্রান্তদ্বয় করিয়া যোজিত
শুদ্ধতম অহঙ্কার
শঙ্কর সে রুদ্রাকার
ভৈরব বৈষ্ণব ধনু করি আকর্ষণ
একে রোধি ত্রিধাগতি
সৃজন, প্রলয়, স্থিতি
সূক্ষ্মাগ্র প্রণব শরে পুরিয়া সন্ধান
ত্রিধা ভিন্ন অবস্থিত
পুষ্যালগ্নে সম্মিলিত
ময়-দানবের পুরী করিল দহন।
হর-শরানল দগ্ধ
সে পুরে ভাতিছে স্নিগ্ধ
শিখারূপে তোরি মূর্ত্তি বিজ্ঞানন্দ-ঘন।
বাগ্রূপে প্রকাশ বিশ্ব
যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য
অক্ষর মাতৃকা বর্ণে তোরই মন্ত্রমালা।
দ্রব্যেতে, ক্রিয়াতে, কামে
বিরাজিত বিশ্ব ধামে,
কামরূপ মহাকূট সেও তোরি খেলা।
হ্রীংকারেতে মায়াবীজে
কামরূপে সেজে নিজে
মায়িক কামের ক্ষেত্রে বিরাজিত শিরে

বিপরীত ভাবে সতি
বিশ্বরূপা পরাগতি
লজ্জাবীজ রূপে যাও সহস্রা'মন্দিরে।
প্রকাশ ক্ষেত্রেতে মুখে
কন্দর্প সাজিয়া সুখে
ঐং কারে বিরাজিতা মাতা গুরু-বীজে,
বাহিরের ব্যক্তবিশ্বে
দেখায়ে অনন্ত দৃশ্যে
অন্তরে আনন্দময়ি প্রকাশিছ নিজে।
মন্মথে আধাব করি
কিম্বা পদতলে ধরি
বাহ্য অন্তরঙ্গ দুই ভাবেতে শঙ্করি।
ক্লীং বীজে কলতানে
প্রেমেব উচ্ছল গানে
কামকূটে কামবীজে বাজ কামেশ্বরি।
আত্ম-পর নাশি এ মা'
ধরিয়া মকর-ধ্বজা
রাজগুহ্যে ক্লৃং বীজে মরম কন্দরে
লীলায় মা লীলাময়ি
মীনকেতু রূপে ওই
স্ত্রীং বীজে রাজিতে তারা হৃদয় মন্দিরে।
সেই এক 'পরকাম'
"একোঽহং বহুস্যাম"
নানা রূপে বহুক্ষেত্রে করিতে বিস্তার
ভৈরবী রূপেতে অয়ি
পরব্রহ্মে ইচ্ছাময়ি
পঞ্চকামে, পঞ্চপ্রাণে করিয়া আধার
শক্তিরূপে পঞ্চবাণে
বিস্তারিয়া পঞ্চস্থানে
ত্রিলোকী ক্ষেত্রেতে খেল কিবা চমৎকার॥

বহির্ম্মুখে দ্রাং বীজে
দ্রাবিণী শকতি সেজে
মায়িক জ্ঞানেরে দিয়ে মস্তকে আধার,—
দ্রব্যরূপে সমুদয়
বিশ্বে করি পরিচয়*
দ্রবময়ি জ্ঞান-গঙ্গা নিজ বোধ ধামে
প্রত্যাহার গতি ধরি
সর্ব্ব বিশ্ব এক করি
আমিতে মিলাও সর্ব্ব 'একোহহং' নামে ।
বদনে-উত্তম অঙ্গে
বশিনী সাজিয়ে বঙ্গে
বশ কর বিশ্ব কাল-বীজ কলতানে,
বাহিরে ছড়াও দূরে
পুন আন অন্তঃপুরে
দূর হতে অন্তরঙ্গে ক্লীং মন্ত্র গানে ।
হৃদয়েতে সং বীজে
উম্মা মাতরিশ্বা সেজে
বহির্ম্মুখে বিশ্ব দৃশ্যে করিয়া মোহিত
বিশ্ববিমোহন গানে
মধুর বাঁশরী তানে
হৃদয় নিকুঞ্জপুরে করহ মিলিত ।
ব্লুং বীজে মহাবলে
দ্রব্য ক্রিয়া ভাব ছলে
বহির্ম্মুখী জীবে টান বস্তুর মাঝারে
গুহ্যতম মর্ম্মে থাকি
হাঁবিয়া কি দিয়ে উঁকি
টানিয়া ছানিয়া লহ মরম আগারে ।
আধারে—ও পদতলে
গতির রূপেতে ছলে

---

* পরিতঃ সমন্তাৎ+চিয়তে=চয়ন করা

ক্ষোভিণী শকতি রূপে ঘুরাও ভুবন।
(পুত) ও পদ-রাজিব মূলে
লুব্ধ ভঙ্গ জীবকুলে,
এক লক্ষ্যে হ্রীং বীজে করাও মিলন।
দর দর জীব-ধারা
বাহিরে অন্তরে তারা
তোমা হতে দূরে ঠেলে, তোমাতে মিলাও
সম্মোহন কল গানে
সন্ সন্ বল টানে
সদানন্দ নাথে লয়ে আনন্দে খেলাও।
নব নব নব রঙ্গে
খেলিতেছ নাথ সঙ্গে,
আমি রূপে দ্বারে লয়ে ভৈরবী-রঙ্গিণি
নব দ্বারাবতী পুরে
আনন্দের পংক্তি সুরে
আনন্দে কালীর কণ্ঠে ধরিয়া তারিণী।
নবনটবর শ্যাম ব্রজেন্দ্র নন্দন
পরম পুরুষ কৃষ্ণ শ্রীরাধা-রঞ্জন
অপ্রাকৃত পরধামে কুঞ্জবনচারী
প্রকৃতি লীলায় শিব শ্মশান বিহারী:
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে ছড়ায়ে মাধুরী
কালীতারা রূপে সুখে সাজ নর নারী
রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ করিয়া সংহতি
নব নব রসকেলী করে রসবতী
ভল্লুক, ভীষ্মক, সত্রাজিত সুতাসহ
পরম পুরুষ রঙ্গে রাজে অহরহ।
পূর্ণা দাদা, দেখ ঐ ভৈরবী রঙ্গিণী
দ্বারাবতী পুরে পর পুরুষসঙ্গিনী।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীনকালের শিক্ষার লক্ষ্য।

শুভ্র তুষার-কিরীটিনী পর্ব্বতপ্রাকার ও সুনীল সাগর-পরিখা-বেষ্টিত শ্যামল তপোবনবিভূষিত সূর্য্যকরোজ্জ্বল ভারতভূমি অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের বিচিত্র লীলা-নিকেতন। প্রকৃতিরাণী তাঁহার অপার সৌন্দর্য্য ভারতভূমির অঙ্গে অঙ্গে ঢালিয়া দিতে কৃপণতা করেন নাই। এমন সুন্দর গিরিনদী-সঙ্কুল চিরহরিৎ তৃণশষ্পশোভিত প্রান্তর, এমন তাল তমাল বনরাজি নীলা-সাগর বেলা, এমন চিরতুষারকিরীটী শিখরী, এমন পীযূষপবাহিণী তটিনী—এত প্রাণবিমোহন নয়নাভিরাম দৃশ্য বুঝিবা আর কোথাও নাই। এই ভারতভূমি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুন্দরী, তদ্রূপ জ্ঞান ও ভাব সম্পত্তিতে গরীয়সী। কোন প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীতের শ্যামল স্নিগ্ধ তপোবনের শান্তি ছায়াতলে বসিয়া কাম-কামনাবিহীন ঋষি সমাধিলব্ধ অভ্রান্ত জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে রহস্যময় মানবজীবনের উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য করত মানবজীবনের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—তাহা এখন অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। অতীতের সেই রুদ্ধ যবনিকা উত্তোলন করিয়া অবিশ্বাসী ও অভক্ত মানবের বিস্ময় সঞ্চারের নিষ্ফল প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, সেই পরহিতসর্ব্বস্ব তপঃশুদ্ধ ঋষি সারাজীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় নিরত থাকিয়া অপার সাধনসমুদ্রের অতলতল হইতে, হৃদয়ের রক্তবিন্দুবিনিময়ে, জীবন যৌবন সুখ সম্পত্তির বিনিময়ে, যে রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, আজ একালের অন্ধ অজ্ঞ জীব স্বকপোলকল্পিত সুখ শান্তিলাভ আশায় তাহাতে অনাদর অশ্রদ্ধা করিতে বসিয়াছে। কিন্তু ছিল একদিন—যখন মহাপ্রাণ ঋষির সেই উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত—যখন আপামর সাধারণ ঋষি-উপদিষ্ট বিধি নিষেধ হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইত না;—তখন এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতে ত্রিদিব-আনন্দ-মাধুরীর ললিতমধুর উচ্ছ্বাস মলয়ানিলের সহিত তরঙ্গভঙ্গে মনঃপ্রাণ আকুল করিয়া গৃহে গৃহে উঠিত। তখন এই "অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে, হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে," নিত্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর তাণ্ডব নৃত্য ছিল না—গৃহে গৃহে অকালবিয়োগে পুত্রহারা জননীর গগনভেদী তীব্র হাহাকার ছিল না—বিষয়লালসাতাড়িত অসংযতচিত্ত পরস্বাপহারী রক্ত-লোলুপ নরশার্দ্দূলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না;—ছিল স্বাস্থ্য, শান্তি, সুখ, সম্মান

বোধ, পরার্থপরতা ; ছিল ত্যাগ, ধর্ম্ম, করুণা, প্রীতি, অহিংসা ; ছিল, ধৃতি, পুষ্টি, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য্য ; ছিল সাধনা, অর্চ্চনা, আনন্দ। তারপর কি কুক্ষণে জানি না, শান্তির এই নিভৃত লীলোদ্যান, নির্ম্মম নিষ্ঠুর কালের কঠোর ঝঞ্ঝা-বাতে, নিয়তির তাড়নে, শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। দেশ হইতে সদাচারমূলক শিক্ষা দীক্ষা তিরোহিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-গর্ব্বিত স্বার্থসর্ব্বস্ব বিলাসভোগমত্ত উচ্ছৃঙ্খল জনগণে এই আর্য্যভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাবত্তার পরিবর্ত্তে ধনবত্তার আদর বাড়িয়াছে। বিশ্বহিতৈষণার স্থানে ভণ্ডামি প্রবঞ্চনায় পূর্ণ হইতেছে। 'কায়েন মনসা বাচা'র পরিবর্ত্তে দেশের দশের সেবা কাগজে কলমে চলিতেছে। হায়! হতভাগ্য দেশ, তোমার শেষ পরিণতি কি এই !

সুদূর অতীত যুগের মানবজীবনের সহিত এ যুগের মানবজীবনের বিশেষতঃ গার্হস্থ্যজীবনের পার্থক্য প্রদর্শন ও আলোচনা করিতে গেলে, সে যুগের পুণ্য-কাহিনী আমাদিগের নিকট উপকথা বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সে কালের আচারানুষ্ঠানের তুলনা বোধ হয় স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের তুলনা অপেক্ষাও অধিক। সে কালের কাম্য ও কর্ম্ম ছিল পারলৌকিক ভোগসাধন বা মুক্তি ; আর এ কালের সাধারণতঃ লক্ষ্য হইয়াছে ইহলৌকিক অভ্যুদয় এবং ভোগ। এই ভোগ ও উন্নতির চরম ফল হস্তগত করিবার প্রলোভনে এক্ষণে আমরা স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে কর্ম্মকার কুম্ভকারের বৃত্তি ধরিয়াছে ; দীর্ঘো-পবীতধারী সশিখ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়া হীনজনোচিত ব্যবসায়ে রত ; সন্তোষামৃততৃপ্ত ব্রাহ্মণ এখন লালসাতাড়িত—ভোগোন্মত্ত ; ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বিবর্জ্জিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সচেষ্ট। কিন্তু যতদিন ভারতে বর্ণাশ্রম প্রচলিত ছিল, ততদিন ধর্ম্মার্থের অযথা ব্যবহার ঘটিত না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তাবৎ কর্ম্মই নিবৃত্তিমূলক। অনেকের ধারণা বর্ণধর্ম্মের তাৎকালিক প্রচলন কেবল স্ব স্ব বর্ণের ঐহিক উন্নতির জন্য ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহার চরম লক্ষ্য তাহা নহে। কোন কোন অদূরদর্শী বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত ব্যক্তি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইয়া, শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় না করিয়া, বর্ণধর্ম্মকে ব্রাহ্মণের স্বার্থসাধনের অনুকূল বলিয়া প্রচার করে, এবং বর্ণধর্ম্মের যে কোন সারবত্তা নাই—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে। "বর্ণধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিরোধকঃ" (মীমাংসাশাস্ত্র) বর্ণধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির নিরোধ হয়। স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মানুসারে

আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া সন্তোষামৃততৃপ্ত গৃহস্থ ক্রমশঃ বাসনার বিনাশ করত প্রবৃত্তিমার্গ অতিক্রম করিয়া নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হইতে পারে, অর্থাৎ পার্থিব কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকাতে দুরাকাঙ্ক্ষার আধিপত্যমুক্ত মন স্বতঃই অন্তর্মুখী হয়। মানবের সুমহান্ মঙ্গল সাধন করিবার জন্য এই বর্ণধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন——

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করতঃ আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।

আর এক কথা। যদি বর্ণধর্ম্মকে আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া উহার স্থূলার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহাতেও বর্ণধর্ম্মের উপকারিতা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ করত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যে বিশেষ সুফল হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। একারণ বর্ণশ্রমাচরিত কালে বিষয় বিশেষের যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়, একালে তাহা কোথায়?

এই বিশাল বৈচিত্র্যময় মায়া-মোহ-কণ্টকিত সংসারক্ষেত্র হইতে উদ্ধার লাভই মানবের পরম পুরুষার্থ। কোন্ পথে গেলে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, তাহার যাহা শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়, তাহা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে—সে পন্থা অজ্ঞ শিশু মানবের অজ্ঞাত। তাই পরমকারুণিক ঋষি কোন অজ্ঞাত লোক হইতে মানব সৃষ্টির প্রথম দিনে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া অবিদ্যাগ্রস্ত বিষয়বিলাসী জীবের উদ্ধারের জন্য মানবজীবনকে আশ্রমচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য; দ্বিতীয় গার্হস্থ্য; তৃতীয় বানপ্রস্থ; চতুর্থ সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম মানবের পরম হিতকর এবং বিবিধ সুখশান্তি ও আনন্দের নিলয়। কিন্তু এই আশ্রমধর্ম্ম কোথাও বর্ত্তমান কালের আশ্রমধর্ম্মের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় ছিল না; ইহার প্রত্যেক আশ্রমই সংযমের সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ। অধিকারী ও আশ্রমভেদে বিভিন্নরূপ সংযম ও সাধনা। ইহার প্রথম আশ্রম—

ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রাবস্থা।

প্রচলিত যুগে 'ব্রহ্মচর্য্য' বলিয়া একটি কথা শুনিতে পাওয়া বটে, কিন্তু উহার অনুষ্ঠান বড় একটা দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ছাত্রাবস্থার সহিত উহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমান করিবার উপায় নাই। অতীত

যুগে প্রত্যেক আশ্রমের এক একটি কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। একটী আশ্রমের কাল গত হইলে অন্য আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ হইত। তৎকালে সাধারণতঃ অষ্ট বর্ষ হইতেই ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। সনাতন প্রথানুযায়ী তৎকালে বালকগণ অষ্টমবর্ষেই উপনীত হইত। উপনীত বালক দণ্ডী-গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র পিতা আদেশ করিতেন—এখন হইতে আহার বিহার নিদ্রা বাক্য প্রভৃতির সংযমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে অতিবাহিত করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে। সেই সময় হইতেই বালকের প্রকৃত শিক্ষার কাল উপস্থিত হইত। নিয়ত গুরুসকাশে উপস্থিত থাকিয়া, সর্ব্বথা সদাচার রক্ষা করতঃ গুরু আজ্ঞানুসারী হইয়া গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রম এবং পাঠাভ্যাস করিতে হইত। তদানীন্তন কালের গুরুগৃহে পাঠাভ্যাসের কথা মনে উদিত হইলে এ কালের ছাত্রাবাস-সম্বলিত স্কুল কলেজের কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু তৎকালের গুরুগৃহ আর একালের ছাত্রাবাসের সহিত আদৌ সাদৃশ্য নাই। তৎকালের গুরুগৃহ কোন জনকোলাহল-মুখরিতা বিলাস-বিভ্রান্তা নগরীতে বা উপনগরীতে অবস্থিত ছিল না; উহা সংসার কোলাহলবর্জ্জিত বহুবিস্তৃত অরণ্যের বৃক্ষবিরল প্রদেশে—প্রকৃতির রম্য উপবনে, মধুরনাদিনী নির্ঝরিণী পার্শ্বে অবস্থিত হইত। যেথায় ফলফুল অনায়াসলভ্য, অনুদ্বেগে অকুতোভয়ে প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্য্য ভোগ করা যায়, সেইখানে তাঁহাদের সাধনোপযোগী আশ্রম নির্ম্মিত হইত। তাঁহারাও সর্ব্বাংশে গার্হস্থ্যাশ্রমী ছিলেন। তবে তাঁহাদের গার্হস্থ্যাশ্রম একালের গৃহস্থদিগের ন্যায় ছিল না। তাঁহদের নিত্য অর্থ চিন্তা ছিল না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তাঁহারা কখনও আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। বস্তুতঃ আমরা মুখে যে Plain living and high thinkingএর বড়াই করি, তাহা তৎকালীন গুরুগৃহেই realised হইত।

সেকালেও দীনহীন ভিক্ষুকের সন্তান হইতে হেমমুকুটধারী একচ্ছত্র সম্রাটের সন্তান পর্য্যন্ত একস্থানে শিক্ষা পাইতেন। গুরু ও গুরুপত্নী এই সকল বালকগণের পিতামাতার স্থান গ্রহণ করিতেন। শিষ্যগণ গুরুর যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত রহিত। গুরু শিষ্যগণকে নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন—শিষ্যগণ উৎকর্ণ হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিত। সংসার চিত্ত-বিক্ষেপকারী স্বার্থ কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্ত পবিত্র প্রকৃতির পুণ্যনিলয়ে উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষার মদিরাময় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত একনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত শিষ্যগণের মানস-নেত্রে স্থূল জগতের যাবতীয় রহস্য স্পষ্ট প্রতিভাত হইত;

তখন তাহারা সংসারের অনিত্য প্রলোভন অবজ্ঞা করিয়া আকুল প্রাণে জিজ্ঞাসা করিত ;———

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতা
জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতা কেন সুখতরেষু
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম ॥

হায়! আর হেন প্রশ্নকর্ত্তাই বা কোথা, আর তাহার উত্তরদাতাই বা কোথা? কিন্তু একদিন ছিল যখন এবম্বিধ রহস্যের মীমাংসাই অধ্যাপনা, অধ্যয়নের চরম উদ্দেশ্য ও শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিবেচিত হইত। তখন উপদেষ্টা ও শিষ্য উভয়েরই লক্ষ্য ছিল যে এমন জিনিস জানিতে হইবে 'যস্মিন্ নু বিজ্ঞাতে চ সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।'

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

সুপ্ত।

"আহা, খুলে' দাও ধীরে হৃদয় দুয়ার
প্রবেশিতে দাও আলো
হের বিমল কিরণে বিরাজে সকল
আর কি ঘুমানো ভালো?
ওগো, তোমার আঁধার গভীর মাঝে
কত কাল রবে আর?
ছিছি, পশুক সেথায় জ্ঞানের আলোক
খুলে' দাও ধীরে দ্বার।"
"না, না, আঁধারেরি মাসে জনম আমার
আঁধারই যে ভালবাসি।
এমনি যে গড়া আঁখি দু'টি মোর
সহেনা আলোক রাশি।"
এ নহে প্রখর দিবাকর কর, সুধাকর সুধা ঢালে,
উছলি উঠিছে বাসন্তী গরিমা স্নিগ্ধ কিরণ জালে,
উদ্দাম নর্ত্তন অসংযত গীতি নিশীথে গিয়াছে থেমে
সুপ্ত পদ্মাণী দুয়ার খুলিয়া উদ্যানে এল নেমে।

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ,

মায়ের খেলা।

দ্যাখ্‌রে শ্যামা মায়ের খেলা।
করেছে ঘর কি মনোহর
চন্দ্র সূর্য্য তারার মেলা॥
বীচির ভিতর ছবি এঁকে,
অশথ গাছ রেখেছে ঢেকে,
ডাল, শুঁড়ি ও শেকড় থেকে
ফুলটি ফোটা ফলটি ফলা।
আবার ফলের ভিতর বীচির মিছিল
তারা খাটছে আপন আপন পালা॥
গড়ছে পুতুল দিচ্ছে ছেড়ে
নাচ্‌ছে এটা ওটায় বেড়ে,
কেউবা কাকে' ধরছে তেড়ে
কেউবা কাকে' মারছে ঠেলা,—
এরা কান্না পেলে হেসে মরে
যত কান্না হাসির বেলা॥
কাঠের ছেলে মাটির মেয়ে,
ধুম ধামেতে দিচ্ছে বিয়ে,
একবার হীরা মাণিক গায়ে,
একবার কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা;—
একবার ভুবন ভোলান রূপ
ফিরেই ছাই আর মাটীর ঢেলা॥
এক দিকেতে মুণ্ড অসি,
ভয়ঙ্করী সর্ব্বনাশি,
আর দিকেতে বর, অভয়,
জননীর মাধুরী লীলা
দেবা কয় মা'র করালী রূপ
(কেবল) ছেলে কোলে নেবার ছলা॥

— দেবা—

ক্ষ্যাপার কথা।

যাই বল ভাই, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে আমার হাঁসি পায়। অনেক সময় অন্যায় কাজ করে ভয় হয় এবং কখন কখন সে জন্য তোমার কৃপা চাইব মনে করিও বটে। কিন্তু যখন তোমাকে মনে পড়ে, যখন তোমার "সজল কাজল আঁখি" মনে পড়ে, যখন তোমার শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর হৃদয় খানিকে মনে পড়ে, তখন বাস্তবিকই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা হয়! তোমাকে মনে করলে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমার গৌরব লাঘব করতে ইচ্ছা করে না! প্রিয়তম সখা, বন্ধু, আমার তুমি কি দোষ নাও, তাই যে ক্ষমা চাইতে হবে? তুমি কি দণ্ড দাও, তাই যে ব্যাকুল হতে হবে? যদি সত্যি সত্যিই তুমি দণ্ড দিতে, সে বেশ হ'তো; কেমন তোমার হাতের বেত খেতাম, বেশ লাগতো! হ'ক না বেত, তবু তো তোমার হাতের বেত!! আর এই যে এখানে পড়ে পড়ে এত মার খাই, এতো আমাকে আমি আঘাত করি, তাই বুঝি এত লাগে। আর তা বেতেও বুঝি কিছু ফল হয় না। বেতের ঘা শুকাতে না শুকাতে আবার সব ভুলে যাই! নিজের জিব যখন নিজেই কামড়ে রক্তারক্তি করি, তাতে লাগে খুবই; কিন্তু সে দণ্ড তো আর কেউ দিতে আসে না, সুতরাং তার জন্য আর কারও উপর রাগ করা চলে না। সে দণ্ডে কেবল পুনঃ পুনঃ অপমানিত হই, কিন্তু স্বভাব বদলায় না! কিন্তু তোমার দণ্ড তো সে রকম নয়, তুমি যখন আঘাত কর, সে কি চমৎকার আঘাত; একবারে তা' প্রাণে গিয়ে ঘা' দেয়, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত স্বভাবটা উল্টা দিকে ঘুরে যায়! আমার তাই তোমার হাতের দণ্ড পেতে বড় ভাল লাগে, তুমি বড় দুষ্টু, এত দোষ করি, তবু কিছু বলবে না, কেবল হাঁসবে বসে বসে। কিন্তু জান, এতে আমার কত স্বভাব বিগড়ে যাচ্চে? মন তো মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে, যে তুমি পুংলিঙ্গও নও, স্ত্রীলিঙ্গও নয়, একবারে ক্লীবলিঙ্গ! কাজে কাজে সে নির্ভয়ে বলে বেড়াচ্চে—"কোথা তুমি" সবই শূন্য, সবই ফাঁক! আরে আমার অদৃষ্ট! মেঘগুলো ছুটে ছুটে বেড়ায়, মনে হয় সূর্য্যকে বুঝি ঢেকে ফেললে! কিন্তু হায়রে মেঘের সাধ্য কি সূর্য্যকে ঢাকে। মেঘ ঢাকে আমার চক্ষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকে; সর্ব্বতশ্চক্ষু সূর্য্যকে কি কেউ কোন দিন ঢাকতে পেরেচে? কি দিয়ে ঢাকবে তোমাকে? মন যতই দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে বলুক না কেন "তুমি নেই"—ততই তুমি তার চারি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে তার স্পর্দ্ধাকে বিড়ম্বিত কর!

তোমার প্রকাশকে কি কেউ বন্ধ কর্‌তে পারে ? তুমি যে সবেরই সর্ব্বস্ব। আমি আমার হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে অন্ধ হয়ে বসে আছি, ভাবচি আমিও যেমন কাহাকেও দেখচি না, কেউ বুঝি আমাকেও তেমনি দেখতে পাচ্চে না! লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলি "অন্ধ হয়েছি, দেখতে পাইনা আর," কাকেও বলি "সূর্য্য কি আর আছে, থাকলে তবে তো দেখতে পাব!" এই যে নিজের হাতে চোখ ঢেকে বসে থাকি— এতেই যা কিছু কষ্ট, যা কিছু বেদনা। একে পাপ বলতে হয় বল, শাস্তি বলতে হয় বল, কিন্তু এসব আমারই ন্যাকামী। নচেৎ মাথার শামলা এঁটে হাকিমদের মতন খাতা কলম নিয়ে তুমি বিচার করচ, মনে হলে আমার ভয়ানক হাঁসি পায়! কারণ আমি জানি একদিন গালে চড় মেরে দুখানি হাত চোখ থেকে সরিয়ে দেবে যে দিন, সে দিন অন্ধ মন ঠিকই বুঝবে তোমার অপ্রকাশ এখনও নেই, কখনও ছিলনা, পরেও থাকবে না! এই গালে চড়টি খেয়েই তো আমার একটু হুঁস হয়েছে; আর তোমার কাছে কিছু চাই টাই না বড়! এখন বসে বসে দেখচি তোমার ইচ্ছাই এই জগৎ জুড়ে, "আমি"ও তোমারি ইচ্ছা! তাই পৃথক ইচ্ছার কথা মনে এলেই হাসি পায়! এতদিন যে কষ্ট পেলাম, এ কেবল এই আমার ইচ্ছাটাকে আঁকড়ে ধরে বইত নয়! এখন তোমার ইচ্ছাই সব জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! কি আরামেই দিন কাটাচ্চি বাবা! এই আমার ইচ্ছাটা যতদিন ছিল ততদিন কি জ্বালাতনই করেচে, কেবলই লম্ফন, কেবলই আস্ফালন!—"আমি এই করবো" "এই আমার হতে হবে, এই আমার পেতে হবে," 'এটা না হলে নয়, সেটা না হলে নয়, আমাকে সাধু হতে হবে, লোকহিতৈষী হতে হবে পণ্ডিত হতে হবে, উপদেশ দিতে হবে, দেশ উদ্ধার করতে হবে'—ইত্যাদি কত ভাবনাই ভাবতে হতো। আর কল্পনায় চড়কি গাছে চড়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতাম! তাতে মাথাটাই ঘুরতো, কিন্তু হতোনা কিছুই! এখন দেখচি, যা কিছু আমার হতে হবে বা হয়েছি, এবং যা কিছু আমার পেতে হবে বা পেয়েছি, সে সবই তোমার ইচ্ছা! তুমি যা খুসি কর, আমি অনর্থক মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পাই কেন? মাথা ঘামিয়ে লাভ এক কড়াও নাই? শুধু তাতে মাথাটাই ঘেমে উঠে, কিন্তু বুঝে উঠা তত সহজ হয় না। বরং মাথা না ঘামালে থাকি ভাল! দেখি আমার বিনা চেষ্টায়, সবই ঠিক চলে যাচ্চে, একটী সূচাগ্র ভাগেরও তফাৎ কোনটাতে হয় না! তবে কি জান বন্ধু, মাথা ঘামানোটা এখন এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, যে তা'কে আর থামানো যায় না! দেখচি, বুঝছি সব রোঝা

তোমারই মাথার উপরে, কিন্তু তুমি তাতে ঘামচো না, হাঁসচ, এবং আমাকেও মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্চ—তখন আমার হো হো করে হাঁসি আসে! কিন্তু লজ্জা হয় না, কেনই বা হবে? পরকে দেখেই লজ্জা হয়, নিজের ঘরের লোককে দেখে আবার লজ্জা হয়ে থাকে কার? স্ত্রীলোকের গা খোলা থাকলে কেউ পাছে তা দেখে, তাই লজ্জা হয়। কিন্তু সে স্বামীর কাছে যে সম্পূর্ণ নিরাবরণ, তবু তার লজ্জা আসে না! কেননা স্ত্রী যে স্বামীরই, তা সে জানে। তেমনি আমি যে তোমার—পাপই করি, আর পুণ্যই করি, ভালই করি আর মন্দই করি, "আমি" যে তোমার! তাই ভয়ও নেই, লজ্জাও নেই। এইটা সব সময়ে বুঝে উঠা যায় না বলেই কল্পনায় চড়কি গাছে চড়ে বন বন করে ঘুরে মরি, আর দুঃখ পাই।

(ক্রমশঃ)

শেষের নিবেদন।

দিন যে আমার গেল বয়ে
　　কখন দেখা দিবি গো মা?
ভবের কূলে বসে আছি
　　ঐ চরণ পাব বলে শ্যামা! ১

নয়ন আমার আছে চেয়ে
　　তোমার আসার আশায় যে মা,
দেখা দিতে এ দীন হীনে
　　কৃপণতা কব্‌বি কিমা? ২

জানি আমি পাবই তোমায়
　　হতাশ হতে হবে নাকো,
দয়াময়ী তুমি মা যে
　　দীনের কথা শুনেই থাকো ৩

বিষয় রসে মগ্ন হয়ে
　　থাক্‌লে আমি আনমনা,
তখন, নিজেই এসে মধুর হেঁসে
　　নাড়া দিয়ে জাগাও যে মা॥ ৪

তোমার পরশ পেয়ে মাগো
　　বেজে উঠে হৃদয় বীণা,
তখন, কোন্ পথেতে ছুটে যায়
　　বুঝ্‌তে তা যে পারি না মা॥ ৫

দুঃখ রূপে আস্‌ছে কত
তোমার আশীর্ব্বাদ যে মা,
তাতেই হৃদয় উঠছে ভরে
ভরসা কত পাচ্ছি গো মা ॥ ৬

যতই গভীর বেদন পাব
ততই তোমায় পাব যে মা,
তাই নয়ন জলে পাপের বক্ষ
ধৌত করে তুলে নে মা ॥ ৭

সঙ্গী কেহ নাইকো হেথা
সন্ধ্যা হয়ে এলো যে মা,
(এখন) জগৎ আলো করা তোর ঐ
চরণতলে ডেকে নে মা ॥

গান।

রাগিণী—ভৈরবী।

ভাল ফ্যাসাদ হলো ক্ষেপা ঘরজামাই নিয়ে।
(নয়) থাকত' আমার কুণ্ডলিনী আজন্ম আইবুড়ো মেয়ে।

গুরু ব্যাটার কি ঘটকালী,
ঘটখালি করালে বিয়ে
কর্ত্তে দেহ-ঘটটি কালি,
ভিটে উইল করে দিয়ে ॥
মেয়ে যদি ভাল হ'ত
বুড়ো বুড়ীর সুখ দেখিত,
বাসের ঘর ছেড়ে দিত
শত চকের বাড়ী পেয়ে;
পরলে যেমন বরমালা
অমনি কাল-সর্প-বালা
দেখলে বাসর চন্দ্রশালা,
বসলো লাজের মাথা খেয়ে
মন রাজাকে বল্লুম এত
উলটে সেতো বল্লে কত,
'রাখ কিছু বাসের মত'
মার্ত্তে এল আরও ধেয়ে ॥
শুনেছি সে জামাই ভক্ত
আমি মায়াসক্ত বলে
মেয়ের গুণে অনুরক্ত
দেখলো নাকো মোরে চেয়ে;
মেঁয়ে তারে আদর করে,
আমি এখন কার দোরে যাই,
সে নয় সুখে থাকতে পারে;
কারে ধরে জুড়াই হিয়ে
ভাল কাল যে পুষেছিলাম,
অবশেষে প্রাণে মলাম
স্বামীর ঘরে ঠাঁই না পেলাম
ঝি জামাইয়ের হাতে গিয়ে।

—দেবা—

প্রশস্তিস্তে।

শ্রী—পতেঃ করুণা যত্র রমতে শ্রীঃ সদা গৃহে।
প্র—বীণশ্চট্টলে ধীর দানে ধর্ম্মে সদা রতঃ॥ ১॥
স—বিধে প্রার্থিনোঽপ্যস্য পূর্ণাশা দ্রবিণার্পণা-
ন্ন—বোৎসাহী সদা ন্যায়ে প্রজাপালনতৎপরঃ॥ ২॥
কু—শলো হ্যখিলে কার্য্যে কুশাসনবিবর্জ্জিতঃ।
মা—ননীয়ো রাজগোষ্ঠ্যাং পূর্ব্বপাশ্চাত্যকর্ম্মসু॥ ৩॥
র—ঞ্জকঃ সর্ব্বলোকানাং সদা মধুরভাষণৈঃ।
রা—জেব ভাতি বিমলং ভীমকান্তাদিভিগু´ণৈঃ॥ ৪॥
য—শসা শোভতে নিত্যং দেবভূদেবপালনাৎ।
স্য—ন্দনং নিঃস্বনিকরে ধনপ্রস্রবণং যতঃ॥ ৫॥

স্বস্তি।

প্রসন্নে প্রসন্না সদা পরমা প্রকৃতি।
করুণা করুণাময়ী দ্বারে মূর্তিমতি॥ ১॥
চট্টলে চট্টলাপতি সর্ব্বগুণাধার।
ঈশ্বর-ঈপ্সিত আশীঃ তাহে বিজয়ার॥ ২॥
বিনোদ-বিনোদে সদা, দীনেশ দীনেশে।
ক্ষীরোদ ক্ষীরোদ-প্রায়, তনুজ প্রকাশে॥ ৩॥
তনুজ-তনুজা গিরিনন্দিনীর প্রায়।
নিরখি নরেন্দ্রগৃহে, 'নীহার বালায়'॥ ৪॥
স্নুষা, স্নেহবতী সতী কমলারূপিণী।
ত্রি-মূর্ত্তি মন্দিরে যেন বাসব-ভামিনী॥ ৫॥
৺মহেশ 'মহেশখালি' শৈলশিখরেতে।
আবির্ভূত 'আদিনাথ' প্রসন্ন-ভূমিতে॥ ৬॥

কৈলাস ছাড়িয়া তথা পরম সুখেতে।
আছেন আসন্ন তাহে জলধিবেষ্টিতে ॥ ৭ ॥
রামরূপে 'রায়কোট' বর্দ্ধিত করিয়া।
বিরাজিছে সদা তাতে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥
প্রবেশিয়া শাস্ত্রারণ্যে আপন ইচ্ছায়।
'বিদ্যারণ্য' হইলেন 'সায়ণের' প্রায় ॥ ৯ ॥
যিনি রাজদত্ত 'রায়বাহাদুর'-যুত।
বিদ্যোপাধি 'বিদ্যারণ্য' তাহাতে অর্পিত ॥ ১০ ॥
'ঈশ্বর' ঈশ্বর-ব্রত 'প্রসন্ন'-পালিত।
'বিজয়ার' বিজয়-স্বস্তি করেন অর্পিত ॥ ১১ ॥
যুগল যুগল রাম ব্রহ্ম বৎসরেতে।
কন্যারাশি-একাদশী দিন ভূমিসুতে ॥ ১২ ॥

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীব মনুষ্য দেহরূপ মুক্তিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর উপদেশ দ্বারা স্বরূপ অবগত হইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন। পরন্তু অজ্ঞানরূপ অন্ধতাবশতঃ মনুষ্যদেহকে মুক্তি দ্বারা না জানিয়া নানাপ্রকার বিষয়ভোগ এবং অসদাচরণরূপ দক্রু রোগে সমস্ত আয়ুঃ বৃথা ক্ষেপণ করেন। যে প্রকার দক্রু-কণ্ডূয়ন অত্যন্ত সুখদায়ক, সেইরূপ বিষয়-সুখভোগ মনুষ্যের অত্যন্ত প্রিয়। একারণ জীব বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া কদাচ ঈশ্বর আরাধনায় রত হয় না। বিষয়-সুখ-সম্ভোগ করিয়া আয়ুঃ অনর্থক যাপন করাতে মানবদেহ রূপ মোক্ষ-দ্বার অতিক্রম করিয়া, চৌরাশী লক্ষ যোনি-রূপ নগর প্রাচীর অর্থাৎ গো অশ্ব গর্দ্দভ পশু পক্ষী আদি শরীর প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং সেই সমস্ত দেহে নানা মহাসঙ্কট ভোগ করে এই পশু-দেহে ভারি ভারি বোঝা বহন করিতে হয়। অত্যন্ত প্রহার দ্বারা মনুষ্য ইহাদের নিকট কাজ লয়। কোন ব্যক্তি যখন উহাকে ঘাস দেয়, তখন সে খায়; যখন কেহ

জল দয়, তেখন সে পান করে। প্রত্যুত উহার কোন কার্য্যেই স্বাধীনতা নাই। আহা! ইহাদের কি দুঃখ! চলিতে চলিতে যদি অশক্ত হয় তবুও বলিতে পারে না যে "ভারি কষ্ট হইতেছে আর পারি না।" প্রত্যুত এইরূপ পরাধীন হইয়া পশু নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান সম্পাদন না করে সে চৌরাশী যোনি বারম্বার ভ্রমণ করে। অমূল্য মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে মোক্ষ সম্পাদন না করে, সে বিষয় সুখ ভোগ ও সংসারী মান বৃদ্ধি বিষয়ে আপনার আয়ুঃ ক্ষেপণ করিয়া নিশ্চয়ই পশু-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত দুঃখে পতিত হয়। 'প্রবোধ সুধাকর গ্রন্থে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য' কহিয়াছেন ;—

নরদেহাতিক্রমাৎ প্রাপ্তোপশ্বাদি দেহান্।
স্বতনোরপ্যজ্ঞানং পরমার্থস্য একা বার্ত্তা ॥

আত্ম-বোধ বিনা আয়ু গত হওয়াতে মনুষ্য দেহ নাশ হইলে পূর্ব্বপাপ-কর্ম্মানুসারে জীব যে পশ্বাদি দেহ ধারণ করে। তাহার পশু আদি জন্মে স্ব স্ব শরীরেরই সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই, ত পরম সুখ রূপ পরমাত্মার যে জ্ঞান হইবে ইহাতে কি কথা আছে? অর্থাৎ পশু পক্ষী আদি শরীরে পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতেই পারে না। পশ্বাদি শরীরে জ্ঞান হয় না, তবে উহাতে কি হয়? এই যদি কাহারও শঙ্কা হয়, তাহার উত্তর এই যে ঐ সমস্ত শরীরে কেবল দুঃখ ভোগই হয়। এই বিষয়ে কথিত আছে :—

বৃত্ত আর্য্যা।

সততং প্রবাহমানৈর্ব্বৃষভৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈর্গজৈর্ম্মহিষৈঃ।
হা কষ্টং ক্ষুৎক্ষামৈঃ শ্রান্তৈর্নো শক্যতে বক্তুম্ ॥

ষাঁড়, উট্, গাধা, হাতী এবং মহিষ প্রভৃতি পশুর শরীরের উপর বোঝা রাখিয়া সর্ব্বদা চালান হয়, এই হেতু তাহারা পরাধীন হইয়া বোঝা উঠাইয়া মহা কষ্ট পায়। আহা কিরূপ দুঃখময় জীবন!!! ক্ষুধা লাগিলেও উদর পূরিয়া খাইতে পায় না, তাহাতে দুর্ব্বল হইয়া বোঝা সমেত গাড়ী টানিতে অশক্ত হইলেও বলিতে পারে না যে, আমি আর পারি না আমাকে ছেড়ে দিন্।

হায়! পশুশরীর ধারণ করা কত ক্লেশ! যে কষ্ট পশুরা ভোগ করে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে আত্মজ্ঞান বিনা মনুষ্য-দেহ নাশ হইলে, পশু আদি দেহে যাইয়া জীবের আনন্ত পর্য্যন্ত অনন্ত

কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান বিনা মনুষ্যদেহ বিয়োগ হইলে জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে নানা প্রকার জন্ম মরণ দুঃখ ভোগ করিয়া, অত্যন্ত পরাধীন অবস্থায় দিন যাপন করিতে থাকে। ঐ জীব মাতৃগর্ভে গমন করিয়া তত্রস্থ মল মূত্র রক্ত মাংস কফাদি ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া, নানা প্রকার কৃমি কীট যন্ত্রণা এবং জঠরাগ্নিতে অনেক প্রকার কষ্ট ভোগ করে। বলিতে কি গর্ভবাস ও নরক-বাস ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। পরন্তু গর্ভবাসই মহা নরক-বাস। জন্ম সময়ে মাতা ও সদ্য প্রসূত বালকের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহা বর্ণনাতীত। ঐ সময়ের দুঃখ মাতা ও সন্তানই অনুভব করে আর কে জানিবে? সেইরূপ গর্ভ হইতে বাহিরে আসিলে পর বাল্যাবস্থায় পরাধীনতা হইতে, যৌবনাবস্থায় স্ত্রী পুত্রাদি ভোগ কামনা হইতে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় নানা প্রকার রোগ আসক্তি, তৃষ্ণা, ক্রোধ ইত্যাদি এবং স্ত্রী পুত্রাদির অনাদর হইতে, অনন্ত দুঃখ হইতে থাকে। ইহার অনুভব কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রকার মৃত্যুর সময় সমস্ত শরীরে এক কালে অসংখ্য বৃশ্চিকদংশন-সমান দুঃখ উপস্থিত হয়। জীবিত মনুষ্যের হস্ত পদাদি করাত দ্বারা কর্ত্তন করিলে, উহার যেরূপ দুঃখ হয়: মৃত্যুর সময়েও যখন প্রাণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন সেই প্রকার দুঃখ হইতে থাকে। এই প্রকারে অজ্ঞানী পরাধীন পাপী জীবের বারম্বার জন্ম মরণাদি দুঃখ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীশঙ্করানন্দ মুনি আত্ম-পুরাণে কহিয়াছেন :—

জাতো বালো যুবা বৃদ্ধো মৃতো জাতঃ পুনস্তথা।
পরিভ্রমত্যেষ সংসারে ঘটীযন্ত্রসমোহবশঃ॥

অজ্ঞানী জীব এই সংসারে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় উপর নীচে গমনাগমন করিতেছে। যে প্রকার কুম্ভকারের চক্র, অথবা কলুর বলদ সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করে,— সেইরূপ জীব পরবশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে ক্রমশঃ বালক, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অজ্ঞানবশতঃই ঐ জীব এই প্রকার বারম্বার ঘটীযন্ত্রের ন্যায় জন্ম মরণ পথে গমনাগমন করে এবং মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয়।

এই প্রকার পূর্ব্ব কথিত চৌরাশী লক্ষ যোনি গমনাগমন দুঃখ গ্রহণ করিয়া, শিষ্যের মনে মহাভয় উপস্থিত হওয়াতে, সে জিজ্ঞাসা করিল এই দুঃখ কিরূপে অবসান হইবে? শিষ্য গুরু সমীপে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া বিধিবৎ উপসন্ন

হইয়া জন্ম মরণাদি দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিল। উহা এক্ষণে নিরূপিত হইবে।

বহু জন্মকৃত নিষ্কাম বৈদিক সঞ্চিত শুভ কর্ম্মের ফলে এবং সুপ্রসন্ন জগদীশ্বরের অনুগ্রহে শান্ত, দান্তি, শ্রদ্ধা বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পন্ন জিজ্ঞাসুর জন্ম মরণ কি প্রকারে নিবৃত্ত হইবে, কি উপায়ে ঐ দুঃখ দূর হইবে, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইলে তাহার সমাধান এই যে মুমুক্ষুর সাধু সমাগম করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য।—সাধু শব্দের অর্থ কি? কেবল কৌপীন, কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণকারী ব্যক্তিকে সাধু কহে; কিম্বা সাধুর লক্ষণ অন্য কিছু আছে? হে গুরো! যে যে লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত সাধুকে বাছিয়া লইয়া সাধুসঙ্গ করত জন্ম মরণ দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, সাধুর সেই সেই লক্ষণ আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু।—হে শিষ্য! সাধু তাঁহাকেই কহে, যিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, যাঁহার সমদৃষ্টি, বৈরাগ্য, শান্তি, দান্তি, ধৈর্য্য, দয়া, অদম্ভ, অমান, অক্রোধ, ক্ষমা, অদ্বেষ, শুচিত্ব ইত্যাদি সদ্‌গুণ স্বভাবতঃই বিদ্যমান আছে; যিনি শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মস্বরূপে সত্যনিষ্ঠা রাখেন। যে সাধুর উপরিউক্ত সমস্ত গুণ আছে তাঁহাকে সদ্‌গুরু জানিয়া তাঁহার সমাগম করিবে।

শি।—হে স্বামিন্! আপনি সদ্‌গুরুর লক্ষণে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এই দুই বিশেষণ দিয়াছেন। যদি এই দুয়ের মধ্যে কোন গুরু একটী বিশেষণ যুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহা হইতে কল্যাণ কি হইতে পারে না?

গুরু।—হে শিষ্য! যে গুরু ঐ দুই বিশেষণের মধ্যে একটী মাত্র বিশেষণ-যুক্ত, সে গুরু হইতে নিঃসন্দেহই কখন কখন যথার্থ বোধ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত দুই বিশেষণযুক্ত গুরুর শরণে যাওয়া কর্ত্তব্য। আমি একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, তুমি প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। বুঝিবে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এই উভয় বিশেষণযুক্ত গুরু হইতে আত্মবোধ হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তি রাজমার্গে স্বগৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটী নদী দেখিয়া উহা পার হইবার নিমিত্ত তিনি নদীতীরস্থ এক ব্যক্তিকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া এক অতি হৃষ্ট-পুষ্ট বলবান্ কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীন অন্ধ কহিল, যদি তুমি আমার স্কন্ধের উপরি বসিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে নদীর অপর পার পৌঁছিয়া দিই।'

অন্ধের কথা শুনিয়া উপরিউক্ত পথিক মনে মনে বিচার করিল যে এ ব্যক্তির দুই চক্ষু হীন এবং যে নদীর অপর পার কি কিছুই দেখিতে পায় না, সে আমাকে কিরূপে অপর পারে লইয়া যাইতে সমর্থ। অতএব এরূপ মনুষ্যকে বিশ্বাস করা অতিশয় ভয়াবহ। এরূপ বিশ্বাস আর স্বহস্তে নিজের পায়ে কুঠার-প্রহার তুল্য। ইহা বিচার করিয়া পথিক অন্ধকে বলিল "আমি তোমার সহিত নদী পার হইতে চাহি না।" তৎকালে ঐ স্থানে এক পঙ্গু উপবিষ্ট ছিল। সে দেখিতে পাইত, কিন্তু চলিতে পারিত না। সে পথিককে কহিল, "ভাই হে! তোমার অন্ধের সহিত পারে যাইবার প্রয়োজন নাই। নদীর কোথায় কত জল আছে তাহা আমি খুব জানি। আমি তোমাকে যে পথ বলিয়া দিই, তাহা দিয়া গেলে তুমি অনায়াসে পর-পারে পঁহুছিতে পারিবে।" এই বলিয়া সেই পঙ্গু মার্গের নিদর্শন এই প্রকার কহিয়া দিল :—'এই বাঁধ দিয়া তুমি একটু অল্প নীচে নামিয়া কুড়ি পা বরাবর সোজা চলিয়া যাও, তৎপরে ডাইনে বাঁকিয়া চলিয়া যাইবে; তাহা হইলে একেবারে পারে পৌছিবে।' সেই পঙ্গুর বাক্য শুনিয়া পথিক পুনর্ব্বার বিচার করিতে লাগিল, যাহার নিজের পা নাই, সে কি কোন দিন নদীতে গিয়াছিল সে উহার কোথায় কত জল আছে কোন্ স্থান গভীর কোন্ স্থান চড়া তাহা জানিতে পারিবে? তবে যদি আমি ইহার কথামত নদী পার হইতে যাই, আর উহার কোন স্থানে অধিক জল থাকে এবং তাহার মধ্যে আমি ডুবিয়া যাই, তাহা হইলে সে সময়ে কি ঐ পঙ্গু আমাকে তুলিতে পারিবে? এইরূপে বিচার করিয়া ঐ পঙ্গুর কথাও পথিক শুনিল না। যদিও ঐ পঙ্গু সত্যও বলিয়া থাকে এবং জলও অল্পও থাকে, তথাপি ঐ পথিকের পঙ্গুর কথায় বিশ্বাস হইল না এজন্য পথিক অপর পারে যাইতেও পারিল না।

সৌভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে এক তৃতীয় মনুষ্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সে চক্ষেও বেশ দেখিতে পাইত, পায়েও খুব চলিতে পারিত, এবং নদী পার করিতেও খুব পটু এবং নদীর কোন্ স্থান চড়া তাহাও উত্তমরূপে জানিত। পথিকের কথা শুনিয়া 'সে কহিল তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে অপর পারে পৌছিয়া দিব।' উহার বাক্যে পথিকের তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস জন্মিল, এবং ঐ লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সহজেই নদী পার হইয়া স্বদেশে আসিয়া পৌছিল।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত।

(১) ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত্যভিলাষী মুমুক্ষুর সহিত স্বদেশ-গমনশালী পথিকের তুলনা করা হইয়াছে।

(২) জন্ম-মরণরূপ তরঙ্গ-যুক্ত সংসাররূপা নদী।

(৩) নদীর ধারে উপবিষ্ট অন্ধ, শ্রোত্রিয়; অর্থাৎ কেবল বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত। ইহার শাস্ত্র নিরূপণস্বরূপ পদদ্বয়ও আছে; কিন্তু নদীর অপর পাররূপ ব্রহ্ম-দর্শন হয় নাই। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে কেবল শ্রোত্রিয় গুরুর সাহায্যে স্বরূপ-জ্ঞান হইতে পারে না।

(৪) পঙ্গুকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সহিৎ তুলনা করা হইয়াছে। ইহার সদ্‌গুরুর কৃপায়, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানরূপ নেত্রও বর্ত্তমান; যদ্দ্বারা তিনি সংসাররূপ নদীর অপর-পার সদৃশ পরব্রহ্মকেও দর্শনে সমর্থ,। কিন্তু বেদবাক্য প্রমাণপূর্ব্বক যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা উপদেশ-করণরূপ পদদ্বয় তাঁহার নাই। সুতরাং যদি তিনি জীবের ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া কহেন "সংসার রূপ নদী তুচ্ছ; ঈশ্বর অনুগ্রহে গোবৎস খুরের ন্যায় অল্প স্থান, অনায়াসে পার হওয়া যাইতে পারে; পরমাত্মা এক অদ্বিতীয়, অনন্ত, অসঙ্গ, অক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্গুণ, নিত্য, প্রত্যগাত্মা, দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, পঞ্চ কোষাতীত, ব্যাপক, দ্রষ্টা, স্বয়ং জ্যোতিঃ, সচ্চিদানন্দ রূপ এই ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা সংসার রূপ নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়।" এই উপদেশ সত্য হইলেও মুমুক্ষুর তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপিত হইবে না। সুতরাং তাঁহার বাক্যে সংশয় থাকিয়া যাইবে। অতএব দৃষ্টান্তে যেরূপ অপর পারে যাইতে পারে নাই। কিন্তু নেত্র ও পদদ্বয় এই উভয় যে পুরুষে বিদ্যমান তাঁহার সাহায্যে পথিক নদী পার হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তদ্রূপ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এই দুই বিশেষণ-যুক্ত সদগুরু দ্বারা মুমুক্ষু সংসার রূপ নদী হইতে পার হইতে সমর্থ। অতএব শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণে যাওয়া কর্ত্তব্য।

গুরুর শরণে যাইবার বিধি।

"সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।" অথর্ব্ববেদের মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।১২) জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সম্বন্ধে সমিধাদি হস্তে লইয়া বিনয়পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ উভয় বিশেষণ যুক্ত গুরুরশরণে যাইবার বিধি নিরূপিত হইয়াছে। সেই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে কহিয়াছেন:—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

সদ্‌গুরুকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া, বন্ধ কি? মোক্ষ কি?' বিদ্যা কাহাকে কহে? অবিদ্যা কাহার নাম? আত্মা কে? পরমাত্মাই বা কে? আত্মা পরমাত্মার একতা কি উপায়ে জ্ঞাত হওয়া যায়? ইত্যাদি প্রশ্ন" গুরুর সেবা করিয়া, সুপ্রসন্ন সদ্‌গুরু সমীপে পরম শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ-সাধন, অদ্বিতীয় পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হও। জ্ঞানী (শ্রোত্রিয়) তত্ত্বদর্শী (ব্রহ্মনিষ্ঠ) সদ্‌গুরু তোমাকে উপদেশ করিবেন।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে প্রবুদ্ধ নাম যোগীশ্বর রাজা জনককে কহিয়াছিলেন।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।

ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্ব বিষয়-জন্য যত প্রকার ভোগ আছে, তৎসমুদয় কর্ম্মজন্য; সুতরাং নাশবান্ ও দুঃখদায়ী। এ কারণ, উত্তম (নাশরহিত পরম সুখময়) শ্রেয় (মোক্ষ) জ্ঞানাভিলাষী মুমুক্ষু পুরুষের, বেদের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান (শাব্দে নিষ্ণাতং) শ্রোত্রিয় এবং পরব্রহ্মকে অনুভব পূর্ব্বক অবগত (পরে চ নিষ্ণাতং) ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শান্তিবান (ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্) সদ্‌গুরুর শরণে (আশ্রয়ে) যাওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য।—হে প্রভো! এই প্রকার সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে যাইয়া কি করিতে হইবে?

গুরু।—হে শিষ্য! গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য। "হে দয়ালুগুরু! এই সংসারে আমি যে জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? জপ, তপ কিম্বা তীর্থ দ্বারা, অথবা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা বা দেব উপাসনা দ্বারা কিম্বা অন্য সাধন দ্বারা কিরূপে উহা নিবৃত্ত হইবে, তাহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।" পুনর্ব্বার ঐ সময়ে শিষ্য নিজেও বিচার করিবে 'আমি কে?' এবং গুরুকেও জিজ্ঞাসা করিবে "আমি কে? আমি কি স্থূল দেহ? কি ইন্দ্রিয়? কি প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ আমি? অথবা সকলের সমুদয় রূপ (সমষ্টি রূপ) অথবা ব্যষ্টি রূপ? কিরূপ? তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।"

এই প্রকার শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া সদ্‌গুরু জন্ম-মরণ নাশের উপায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় প্রামাণ্য বিষয়।

সদ্গুরু কহিবেন "হে শিষ্য! তুমি স্ব-রূপকে এই প্রকার অবগত হও, যে আমি সচ্চিদানন্দ; ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষ্য প্রত্যগাত্মা, দেহ ইন্দ্রিয়াদি আমি নহি। দেহের যে ধর্ম্ম বর্ণ আশ্রমাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিগের যে অন্ধ বধিরাদি ধর্ম্মও আমার স্বরূপে কস্মিন্ কালেও নাই। আমি কেবল শুদ্ধ চৈতন্য। এই প্রকার জ্ঞান যখন তোমার বদ্ধমূল হইবে তৎক্ষণাৎ তোমার জন্ম মরণ পথে গমনাগমন ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই বাক্য প্রমাণ-সিদ্ধ; কেন না ভগবতী শ্রুতি এই অর্থকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাই কেবল কৈবল্য মুক্তি হইয়া থাকে, মুক্তির অপর কোন সাধন নাই। "আত্মানং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" আত্মাকেই অবগত হইয়া সাধক মৃত্যু অতিক্রম করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। "ঋতে জ্ঞানাৎ কদাপি মুক্তির্ন ভবতি"। "নান্যঃ পন্থা অয়নায়" জ্ঞান বিনা মোক্ষের অন্য কোন মার্গ নাই। এইরূপ স্মৃতিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। "ন কর্ম্মণা ন তপসা" ইত্যাদি আত্মজ্ঞান বিনা কেবল জপ তপাদির কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হইতে পারে না। সাধন মাত্রই অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত মোক্ষের কারণ; কেবল জ্ঞান "অহং ব্রহ্মাস্মি।" যে প্রকার রন্ধন কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠ, স্থালী অন্নাদি সমস্ত দ্রব্য উপস্থিত থাকিলেও অগ্নি বিনা রন্ধন ব্যাপার হইতেই পারে না, সেইরূপ সর্ব্ব প্রকার সাধন বর্ত্তমান থাকিলেও জ্ঞান বিনা মুক্তি কদাচ হইতে পারে না? এজন্য হে শিষ্য! তুমি স্ব-রূপকে অবগত হও।

এই প্রকারে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ সিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির বর্ণনা করিয়া এক্ষণে জ্ঞান প্রাপ্তি এবং জন্মাদি দুঃখের কারণ রূপ পাপাদি কর্ম্মের নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর উপদেশে বিশ্বাস রাখা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করিতেছি। তুমি যদি সদ্গুরুর উপদেশে বিশ্বাস রাখ তোমার জন্মমরণের কর্ম্মের খাতা কুটী কুটী হইয়া ছিঁড়িয়া যাইবে।

শিষ্য।—হে গুরো! আপনি যে কহিয়াছেন জন্ম মরণের কাগজ কি? তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু।—হে পুত্র! জীব যে যে পাপ পুণ্য আদি কর্ম্ম করেন, তাহা যমরাজের প্রধান মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত লিখিয়া রাখেন। পুনর্ব্বার ঐ ঐ কর্ম্মকারী জীবকে যমরাজ প্রত্যেকের কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখাদি ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত

কর্ম্মের প্রভাবেই জীব চৌরাশী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহার বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা পুরাণে লিখিত আছে। উহাই জন্ম মরণের খাতা। যখন সদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ স্ব-রূপের উপদেশ করেন এবং শিষ্যও সদ্‌গুরুর বচনে দৃঢ় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়, তখন জ্ঞানের প্রভাবে উপরিউক্ত চিত্রগুপ্তের লিখিত কাগজ ছিঁড়িয়া যায় (জীর্ণ হইয়া যায়) অর্থাৎ জন্ম মরণ দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই বাক্যে বোধগম্য হইবার জন্য এক দৃষ্টান্ত কহিতেছি, উহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

কোন একজন মহাজন ভুলক্রমে কতকগুলি দুষ্ট লোকের সহিত ব্যবসায় করিল। পরিশেষে কুসঙ্গ প্রভাবে ঐ মহাজনের সমস্ত ধন নষ্ট হইয়া গেল। লাভ হওয়া দূরে থাক, সে অবশেষে স্বয়ং ঋণ-গ্রস্ত হইল। যখন উত্তমর্ণ তাগাদা করিতে লাগিল, তখন সে মনে মনে বিচার করিল এক্ষণে কোন চাকরী করিয়া টাকা উপার্জ্জন বিনা ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর নাই। এই স্থির করিয়া অল্প মূলধনী ছোট ছোট বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে চাকরী করিতে আরম্ভ করিল। ঐ চাকরী হইতে, উহার বৎসরে দুই শত মুদ্রা আমদানি হইতে লাগিল বটে ; কিন্তু ঐ রোজগার এত অল্প যে উহাতে ঘর খরচা চলা দুরূহ, সুতরাং ঋণের সুদ আদায় হইতে লাগিল না। একারণ মহাজনেরা পুনরায় তাগাদা আরম্ভ করিল, তাহাতে বেচারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনার বন্ধুবর্গকে দুঃখ নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যাহার মনে যেরূপ আসিল সে সেইরূপ বলিল। অবশেষে তাহার একজন বিবেকী মিত্র বলিল, 'হে মিত্র! এত অল্প টাকায় এরূপ ছোট দোকানদারের কাছে চাকরী করিয়া তুমি কদাপি ঋণ মুক্ত হইতে পারিবে না, বরং তদ্বিপরীতে তোমার ঋণ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে, এবং তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখী হইয়া পড়িবে। এজন্য আমি তোমাকে এক যুক্তি বলিয়া দিতেছি। যদি ঠিক সেই অনুসারে চল তবে সুখী হইতে পারিবে এবং পরিশেষে ঋণমুক্ত হইয়া মনের আনন্দে কাল যাপন করিতে পারিবে।' বন্ধুর উপদেশ শুনিয়া মহাজন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হে প্রিয় মিত্র! ঐ যুক্তি কি ? অনুগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র কহ, আমি অবশ্য তদনুসারে কার্য্য করিব।' মহাজনকে ব্যস্ততা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া মিত্র কহিল, "এই গ্রামে বিষ্ণুদত্ত নামে একজন অত্যন্ত ধনী মহাজন আছেন। এবং তিনি অতি উদারচেতাও বটেন। তুমি উহার আশ্রয়ে যাইয়া বিনা বেতনে একান্ত মনে তাঁহার কার্য্য নিজ কার্য্য বিবেচনা করিয়া করিতে আরম্ভ কর।

তিনি যেরূপ আজ্ঞা করেন সত্যনিষ্ঠা সহকারে ঠিক সেইরূপ করিবে। যদি তিনি তোমাকে বেতন দিতে চাহেন, তুমি কহিবে আমার অন্ন বস্ত্রের অধিক কোন বস্তুর আবশ্যক নাই। এইরূপ করিলে তোমার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিবে। তখন তিনি তোমাকে আপনার মনে করিয়া সময় ক্রমে তোমাকে ঋণ মুক্ত করিয়া দিবেন।"

বন্ধুর উপদেশ শুনিয়া সেই মহাজন তখন হইতে নিত্য বিষ্ণুদত্ত শেঠের বাটী যাইতে আরম্ভ করিল। এবং মিত্রের উপদেশানুসারে সত্যনিষ্ঠা সহকারে নিষ্কাম হইয়া একান্তমনে তাঁহার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিন পরে যখন ঐ মহাজনের নিষ্কপটতা ও ভক্তি দেখিয়া তাহার নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতি শেঠ বিষ্ণুদত্তের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল, তখন বিষ্ণুদত্ত মহাজনকে নিজ সরকারে সর্ব্বোচ্চ পদবী দিয়া আপনার সমস্ত কার্য্যের ভার দিল।

এইরূপে উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতে করিতে যখন তাহার দুই বৎসর গত হইল তখন তাহার প্রথম উত্তমর্ণ মনে মনে ভাবিল, এক্ষণে উহার উচ্চ পদ হইয়াছে এবং সে অনেক রোজগারও করিতেছে, এখন আমার টাকা আদায় হইয়া যাইবে। এই প্রকার আশায় কিছু দিন চলিয়া গেলে, যখন সে দেখিল যে ঐ ব্যক্তি আপনার ঋণের এক পয়সা কাহাকেও দিল না, তখন সকলে তাহার নিকট টাকা আদায় করিতে অভিলাষ করিল। তৎপরে একদিন যখন সে আপনার কাজে যাইতে ছিল, তখন এক মহাজনের লোক তাহার নিকট তাগাদা করিতে আসিয়া দশ পাঁচ ভাল মন্দ কথা শুনাইয়া দিল। তাই শুনিয়া মহাজন অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া নিজের শেঠের গৃহে গমন করিল। শেঠ তখন আপনার প্রধান কর্ম্মচারীকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আজ কি কারণে তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি?" শেঠ মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ম্মচারীর চক্ষে জল আসিল। জল আসিতে দেখিয়া শেঠ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি দুঃখ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া কহিলে আমি তাহা নিবারণের উপায় করিব। আমাকে বলিতে তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। যেরূপ কেন দুঃখ হউক না, আমি উহার নিবারণ করিব"। স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কর্ম্মচারী কহিল "হে স্বামিন্! প্রথমে আমি ভ্রম বশতঃ কতকগুলি লোকের সহিত ব্যবসায় করিয়াছিলাম। যাহারা আমার সাথী ছিল তাহারা দুর্জ্জন, আমার সমস্ত কারবার তাহারা লোকশান করিল। যাহা ক্ষতি হইল তাহা ত হইল, অধিকন্তু আমি ঋণী হইয়া গেলাম। ঐ ঋণ অদ্যাবধি আমার মস্তকোপরি

রহিয়াছে। এত দিন উত্তমর্ণ সকলে আমাকে কিছু বলে নাই ; কিন্তু অদ্য তাহাদের মধ্যে এক জনের চাকর ভরা বাজারের মধ্যে আমাকে দাঁড় করাইয়া ভাল মন্দ শুনাইয়া দিল। এই প্রকারে অবমানিত হওয়াতে আমি যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইয়াছি।"

প্রধান কর্ম্মচারীর বাক্য শুনিয়া বিষ্ণুদত্ত শেঠ কহিল "ভাল! এত দিন তুমি আমাকে কেন বল নাই। যদ্যপি এত দিন বলিতে তাহা হইলে কবে তোমার ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইত, আর অদ্য এরূপ অবমানিত হইতে হইত না। ভগবানের ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে তাহার আর কথা কি, এখন বল ঐ সকল মহাজনের নিকট লিখিত কোন কাগজ আছে কি না। যদি থাকে তবে ঐ সকল মহাজনের নাম বল, আমি আজই তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। আমি যাহা করিব তাহার উপর তোমাকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।" কর্ম্মচারী কহিল "আপনি যাহা করিবেন, তাহাই আমার স্বীকার।" তখন বিষ্ণুদত্ত উহার উত্তমর্ণদিগকে ডাকাইয়া সকলের হিসাব করিয়া টাকা পরিশোধ করিয়া কাগজ তাহাদের সমক্ষে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

অজ্ঞানী জীব কাম ক্রোধাদি দুর্জ্জনের সহবাসে স্বকীয় আত্মবোধরূপী ধন হারাইয়া, আমি সংসারী, কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাকার অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ পুণ্য কর্ম্ম করত যমরাজের নিকট ঋণসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। যমরাজ পাপ পুণ্যের ভোগ দিবার জন্য কাগজে লিখিয়া রাখেন, তাহাতেই অজ্ঞানী জীব বারম্বার জন্ম মরণ পথে পরিভ্রমণ করে। এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কর্ম্মের ফল স্বরূপ জন্ম মরণাদি দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত অজ্ঞানী জীব দ্বৈতবাদী গুরুর নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করে। কিন্তু তাঁহার উপদেশ রূপ বেতনে দুঃখ দূর না হইয়া বরং বাড়িয়া যায়। যেহেতু দ্বৈতবাদীর উপদেশ দ্বারা জন্ম মরণ দুঃখ দূর হওয়া অসম্ভব, প্রত্যুত তাঁহার উপদেশে সংসারে বদ্ধমূল হওয়াতে দুঃখ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় বহু জন্মের পুণ্য বলে জনৈক বিদ্বান মিত্র তাহার উপকারার্থে উপস্থিত হইলে পর, সে তাহাকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দেয়, 'যে ভাই ভেদবাদী গুরু স্বার্থপর, কেবল মাত্র তুষ্টিকর-বাক্য কহিয়া তোমার ধন হরণ করিয়া লইতে পটু। ইঁহার সঙ্গ করিলে শোক জন্ম মরণাদি দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। এজন্য তুমি ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈরাগ্যসম্পন্ন ও পরম দয়ালু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া তাঁহার সেবায় তৎপর হও।

যখন তোমার অকপট চিত্ত দেখিয়া সদ্‌গুরু তোমাকে ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করিবেন, তখন তোমার কর্ম্মের কাগজ যাহা জন্ম মরণ দুঃখের মূল তাহা নাশ হইয়া যাইবে।' বন্ধুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অজ্ঞানী জীব ব্রহ্মবেত্তা গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেবা দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করেন। তখন গুরু কৃপা করিয়া কহেন—'ওহে তোমার কি ইচ্ছা, তুমি স্পষ্ট করিয়া কহ। তোমার যে কিছু দুঃখ হইবে তাহার নিবৃত্তির উপায় আমি বলিয়া দিব।"

শিষ্য।—হে ভগবন্! আমি গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে সূর্য্যের সন্তাপের ন্যায় অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই ত্রিবিধ তাপে তাপিত হইয়া রহিয়াছি এবং মদীয় কৃত পুণ্যপাপাদি কর্ম্মের হিসাব যমরাজের নিকট আছে, অতএব কৃপা করিয়া এরূপ উপায় উদ্ভাবন করুন যদ্দ্বারা যমরাজের নিকট কর্ম্ম-রেখা সংশ্লিষ্ট হিসাবের যে কাগজ আছে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু কহিলেন।

গুরু।—সমস্ত পাপ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুণ্য কর্ম্মের ফল পরমাত্মাকে অর্পণ কর; শমদমাদি সাধনকে গ্রহণ, এবং দুর্জ্জন সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক যদি আমার উপদেশে তুমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে।

শিষ্য।—হে প্রভো! আপনার বচনে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শীঘ্র উপদেশ করুন।

গুরু।—মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে তুমি আমার উপদেশ সমুদয় ধারণ করিতে সমর্থ হইবে।

"তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে তুমি স্থূল দেহ নহ। উহা দৃষ্টিগোচর হয়, অতএব উহা দৃশ্য এবং তুমি উহার দ্রষ্টা। এই দেহ মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রজ্বালিত করা হয়, অতএব উহা কর্ম্ম-ফলও ভোগ করিতে সমর্থ নহে। তুমি এই দেহের সাক্ষী—আত্মা, পূর্ণ ও ব্যাপক, তোমার আকাশের ন্যায় গমনাগমনও নাই সুতরাং তুমি কর্ম্মফলের ভোক্তাও নহ। এই এই প্রকারে অবশেষে স্থিত যে চিদাভাসরূপ জীবসংযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ জীবাত্মা সেই পাপ পুণ্যের সংসর্গে নিম্ন উচ্চ দেহ ধারণ করিয়া জন্ম মরণ দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করে। পরন্তু জীব যখন বাস্তবিক স্ব-স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দ আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করে, তখন এই সূক্ষ্ম দেহও নাশ প্রাপ্ত হয়; এবং সর্ব্ব কর্ম্মও, "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। যখন কর্ম্মের কর্ত্তা ভোক্তা কেহই থাকে না, তখন যমরাজের মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত আর কাহার কর্ম্ম

লিখিবেন ? এই জন্যই যমরাজ উহার কাগজ তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন। অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি হইতে অহং বুদ্ধি ত্যাগ করত, উহাদিগকে দৃশ্য অবগত হইয়া আপনাকে উহাদের প্রকাশক সচ্চিদানন্দ, নিত্য মুক্ত, অকর্ত্তা, অভোক্তা আত্মা জ্ঞাত হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই জ্ঞান বিনা জন্ম মরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার দ্বিতীয় কোন পথ নাই। এই জ্ঞান বিনা জন্ম মরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার দ্বিতীয় কোন সাধন নাই। ইহা স্থির নিশ্চয়। এই মর্ম্মে ভগবতী শ্রুতি লিখিয়াছেন—

"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং নান্যঃ পন্থা অয়নায়"।

শিষ্য।—হে স্বামিন্! আমার কর্ম্ম অনন্ত কালাবধি চলিয়া আসিতেছে এবং অসংখ্য বলিয়া পরিগণিত। অজ্ঞানের কার্য্য যে দেহাধ্যাস তাহারও কালের ইয়ত্তা নাই। সুতরাং উহার নিবৃত্তির জন্য বহু কাল প্রয়োজন। কিন্তু আপনি বলিলেন যে সদ্গুরুর বচনে বিশ্বাস রাখিলে তোমার জন্ম মরণ কাগজ কাল-বিলম্ব ব্যতিরেকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে তাহা কিরূপে বিশ্বাসে আসিতে পারে। তাহা আপনি স্পষ্ট অবগত হইয়া আমাকে উপদেশ করুন। তখন গুরু উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ প্রামাণ্য বিষয়।

গুরু—হে শিষ্য! তোমার কর্ম্ম অজ্ঞান এবং দেহাধ্যাস যদিও অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তথাপি আত্মজ্ঞান হইলে পর উহাদের নিবৃত্তি হইতে কিছুমাত্রও সময় লাগে না এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।—এই পঞ্চীকরণের বিচার যে করে তাহার সেই জ্ঞান দ্বারা দেহাধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া জীবদ্দশায় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

ক্রমশঃ।

একটি নিবেদন।

আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট এইটুকু নিবেদন যে, বর্ত্তমান বৎসর সন ১৩২২ সাল প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে কোন কারণেই হউক এখনও অনেকের নিকট হইতে তাঁহাদের বর্ত্তমান সালের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জন্য পন্থা পত্রিকাখানির চাঁদা বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। এ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে পত্রযোগে নিবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্তও তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া চাঁদাগুলি পাঠাইয়া দেন নাই। আমাদের এই নিবেদন যে, তাঁহারা এবার নিশ্চিন্ত না থাকিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা-গুলি যেন পাঠাইয়া দেন। নচেৎ আমাদিগকে পন্থার পরবর্ত্তী সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ ডাক যোগে পাঠাইতে বাধ্য হইতে হইবে। তাহাতে তাঁহারা যেন আমাদিগের ত্রুটি বিবেচনা না করেন এবং ভিঃ পিঃ ফেরত না দেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

নিবেদক

পন্থা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

হিন্দু-সখা।

সম্পাদক শ্রীরাজকুমার বেদ-স্মৃতি-কাব্যতীর্থ ও শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্। হিন্দুসখা মাসিকপত্র ও গ্রন্থপ্রচারক, ধর্ম্ম-সমাজ ও ইতিবৃত্তাদি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশই ইহার প্রধান কার্য্য। তাহা ছাড়া অবশ্য জ্ঞাতব্য সাময়িক সংবাদাদিও প্রচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং একাধারে ইহা সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারক ও সংবাদপত্র স্বরূপ। বার্ষিক মূল্য অতি সুলভ ১৲ টাকা। উপহার কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ—মাত্র ডাক মাশুলে সকলে হিন্দুসখার গ্রাহক হইয়া সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার করুন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দিন।

কৈকালা পোঃ (হুগলী)

হিন্দুসখা কার্য্যালয়ের অন্যান্য বিক্রেয় পুস্তক। ১। ভাষাদর্পণ—বঙ্গভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ইহা হইতে যেমন উপকার পাইবেন, সাধারণ লোকেও তেমনই অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।—মূল্য ৸৹ আনা। (২) সামবেদসংহিতা—প্রথমখণ্ড ॥৹ আনা; মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সহ। (৩) নারীচিত্র—।৶৹। (পৌরাণিক স্ত্রীচরিত্রের সমালোচনাসহ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক)। (৪ তারকেশ্বর তথ্য ॥৶৹ আনা। (বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৺তারকেশ্বর ধামের সচিত্র ইতিহাস)। (৫) উপন্যাস কুঞ্জ ॥৹ আনা (সত্যঘটনা মূলক সমাজ-শিক্ষক উপন্যাস)। (৬) সন্দর্ভহার ॥৶৹ আনা। (ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্ব্বিধ প্রবন্ধের সমবায়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ)। (৭) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্জালিকা—।৶৹ আনা। (বাঙ্গালাপদ্যে স্মৃতিগ্রন্থ)। (৮) কাব্যমালা—।৶৹ (৩য় সংস্করণ) (নানা রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতাবলী)। (১০) কুমারসম্ভবম্ ৶৹ (১ সর্গ)—(বঙ্গাক্ষর, মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)। (১১) দেবসমিতি—।৹ আনা।—(ছাপা কাগজ সুন্দর। রূপক ছলে স্বদেশ কথা)। (১২) নিশীথ চিন্তা—৶৹ আনা। (ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের সুন্দর অনুবাদ)। (১৩) গীতিকুঞ্জ ৶৹ আনা। (নানাবিধ গীত ও গীতমাহাত্ম্য)।

কলিকাতা, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর হইতে
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২২। [৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

কঠোপনিষৎ

(অনুবাদ)

বাজশ্রবা ঋষি অতি মহামনা
চির স্বর্গবাস করিয়া বাসনা
দিতে হয় যাহে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা—
বিশ্বজিৎ যাগ করিল হেন।

লইয়া দক্ষিণা প্রফুল্ল হৃদয়
গেলা চলি গৃহে ঋত্বিক নিচয়
বয়সে কুমার ঋষির তনয়
প্রফুল্ল উষায় তপন যেন।

ধার্ম্মিক পিতার মঙ্গল কারণে
প্রবেশিল শ্রদ্ধা নচিকেতা মনে
ভাবিলা কুমার বীণার নিঃস্বনে
উঠিতে বাজিল বিবেক-সুর।

"পিতায় প্রদত্ত যত গাভীদল
আর না খাইবে শ্যাম তৃণদল,
করিবে না পান আর স্বাদু জল
দুগ্ধ তৃষ্ণা নাহি করিবে দূর।

বিফল দক্ষিণা করিলে প্রদান,
অনানন্দ লোকে, পশে যজমান
কি ফল পিতার এ হেন সন্তান
যদি না উদ্ধারি নিরয় হ'তে।

"বল পিতৃদেব সববস্ব ধন
সন্তান তোমার অদত্ত এখন
বল বল তব সাধের নন্দন
বাসনা কাহারে দক্ষিণা দিতে।"

কহে বার বার শুনিয়া তখন
নহে কৌমার স্বভাব এমন
দিলা অভিশাপ ক্রোধান্বিত মন
"দিলাম তোমারে শমন করে।"

ভাবিছে তনয় "আমি তো উত্তম
বহু শিষ্য হতে অথবা মধ্যম
তিলেকের(ও) তরে নহি ত অধম
কেন দিলা পিতা যমের ঘরে ?

কি করিবে যম লইয়া আমায়
কিবা প্রয়োজন সাধিব তথায়
ক্রোধভরে পিতা দেছেন আমায়
হেন অভিশাপ হতেছে মনে।

জনক সমীপে   পুত্র দাঁড়াইল
কাতরে জনকে   সম্বোধি কহিল
"সাধু, পিতামহ   যে পথে চলিল
ধর সেই গতি মহান্ জেনে!

এ মর জগতে   সত্য সনাতন
সত্যই জগত   করিছে পালন;
সত্যে ব্রহ্ম সদা   প্রতিষ্ঠিত র'ন
সত্য বিনা কারো নাহিক গতি।

মিথ্যা কার্য্যে কেহ   অজর অমর
হয়নি জগতে   হবে নাক' নর;
মানব জীবন   অতীব নশ্বর
যথা অগ্রহায়ণে শস্য তভি।'

*   *   *

গেল নচিকেতা   যম নিকেতন,
না ছিল শমন   ভবনে আপন
তিনটী রজনী   পোহাল তখন
অনশনে শুধু কাটাল কাল।

যম আগমনে   যম প্রণয়িনী
"হের বসে ওই   তিনটী রজনী"
কহিলা "ব্রাহ্মণ   গুরুসম মানি
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজহ, কাল!

"যে গৃহে অতিথি   থাকে উপবাসে
আশা বা প্রতীক্ষা   সকলি সে নাশে
ইষ্ট-পূর্ত্ত পুণ্য   স্বর্গ অবশেষে;
নারায়ণ সম অতিথি হয়।"

কহিছে শমন "তাপস কুমার!
নমস্য অতিথি পূজিত সবার;
উপবাসী গৃহে এ পাপ আমার
নাশ, লয়ে বর করুণাময়!

যাচে নচিকেতা শমন সদন
"ক্রোধ হতে পিতা বিরত হ'ন;
লভি জ্ঞান যবে ফিরিব ভবন
পুত্র বলি যেন আদর পাই"!

"পাবে নচিকেতা পাবে সে আদর
হবে পুনঃ পিতা সস্নেহ অন্তর!
ফিরিলে ভবনে তোমার উপর
না রবে বিরাগ কহিনু এই।"

"শুনেছি স্বরগে রোগ জরা নাই
প্রভুত্ব তোমার সেথা শুনি নাই
পিপাসা বুভুক্ষা আদি ভস্ম ছাই
নাহি কিছু সেথা অশান্তিকর!

আনন্দ-আলয় জগতে অতুল
শুনেছি দুঃখের নাহি সেথা মূল
অধিবাসী তার নহে শোকাকুল
সে স্বর্গ কেমনে পাইবে নর?

সেই সে স্বরগ যা'তে লাভ হয়
জান তুমি তার গূঢ় বিদ্যা চয়
দাও অগ্নি-বিদ্যা; হইতে নির্ভয়
শ্রদ্ধাবান শিষ্যে উদ্ধার কর!

যে প্রণালী ধরি   করি' উপাসনা
স্বর্গ-কামী নর   পুরাবে বাসনা
লভিবে আনন্দ   দেবের কামনা,—
কর দান মোরে দ্বিতীয় বর।

কহিলা শমন   সস্নেহ ভাষায়
"স্বর্লোক ফল   যা'তে পাওয়া যায়
ত্রয়ী অগ্নিবিদ্যা   দিব হে তোমায়
হও নচিকেতা একাগ্র মন!

বিরাট্ রূপেতে   আশ্রয় ধরার
ত্রিলোকের আদি   প্রথম আকার
হেন অগ্নিদেবে   পূজা সবাকার
কর্ত্তব্য, চেতব্য জানিও ভবে॥"

মেধাবী কুমার   শিখিলা তখনি
উচ্চারিলা বাণী   শুনিলা যেমনি
হরষে শমন   কহিলা অমনি
দিব বর সহ চতুর্থ এবে।

এই অগ্নিবিদ্যা   বিরাট বিশ্বেতে
হইবে বিখ্যাত   তোমার নামেতে
সেই যশঃ হার   পরিয়া গলেতে
কর্ম্মময়ী গতি গ্রহণ কর!

নচিকেতা অগ্নি   যেই সাধুজন
বিধি অনুসারে   করিবে চয়ন
জন্ম মৃত্যু আদি   করিয়া লঙ্ঘন
হবে সুখী সেই অবনী 'পর।

একবার দেহ হইলে বিনাশ
না ভুঞ্জিবে পুনঃ জঠর নিবাস
স্বরগে যাইবে অতুল উল্লাস
হেরিবে তথায় কহিনু শুন।

প্রথম দ্বিতীয় প্রার্থনা তোমার
করেছি পূরণ চতুর্থ এ বর
দিলাম তোমায় ঋষি বংশধর
বাকী আছে বর তৃতীয় পুনঃ।"

কহে নচিকেতা, "সেই বিদ্যা দাও
জগতের মহা সন্দেহ ঘুচাও
জীবদেহ হতে কিবা নিয়ে যাও ?
কাহার বিহনে মরণ হয় !

শরীর ইন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধিঃ আর
ইহা ব্যতিরিক্ত আত্মা, আখ্যা, যার ;
আছে কি, না আছে, কহিয়া ধরায়
জ্ঞানতৃষ্ণা যেন নাহিক রয়।"

শুনিয়া প্রার্থনা ভাবিলা শমন
"যাচে নচিকেতা নিঃশ্রেয়ঃ সাধন
করিব পরীক্ষা" করিয়া মনন
কহিলা কুমারে মধুর স্বরে।

"ত্রিদিবেও এতে রয়েছে সংশয়
সূক্ষ্ম আত্ম ধর্ম্ম কেহ জ্ঞাত নয়'
যাচ নচিকেতা অন্য বর চয় ;
ত্যজ উপরোধ, ইহার তরে"।

কহে নচিকেতা "আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান
মোক্ষের কারণ; ইহার সমান
নাহি কিছু আর হেন গরীয়ান
এ বিদ্যা-তত্ত্বজ্ঞ বিশ্বে নাই।

আছে সেই বিদ্যা তব অধিকারে
ক'রোনা বিমুখ যাচক আমারে;
আত্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান সবারে
ঘুচাও মনের সংশয় এই।

কহে মৃত্যু পুনঃ দিয়া প্রলোভন
"পুত্র পৌত্র যাচ রমণী কাঞ্চন
ভূমি পশু আদি কামনা ভাজন,
বহুদিন ধরে জীবিত রও!

বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ধরণীর পরে
কিম্বা চির আয়ু, লহ এই বর,
হৃদয় তোমার যাহা ইচ্ছা করে
হে ঋষি-নন্দন যাচিয়া লও!

যে যে ভোগ্যবস্তু মরতে দুর্লভ
ইচ্ছা অনুসারে যাচগো সে সব
রথাশ্ব অপ্সরা আদি অভিনব
যা কিছু কামনা প্রার্থনা কর।

মরণ সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ত্যজিয়া
প্রার্থনীয় ভোগ চাহিয়া লইয়া
দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ জ্ঞান পাসরিয়া
স্বীয় ভোগদ্বার উন্মুক্ত কর।"

মহা হ্রদবৎ অক্ষুব্ধ হৃদয়
কহে নচিকেতা "এ ভোগনিচয়
তেজো হানিকর যশঃ প্রজ্ঞা ক্ষয়
অপ্সরা সেবায় পরিণাম ফল।

চিরজীবী তুমি করিবে শমন
কতদিন বল তোমার শাসন ?
কতদিন বল ব্রহ্মার জীবন ?
দিতে কি পারিবে অমৃত ফল ?

শুধু বিত্তলাভ নহে তৃপ্তিকর,
অর্জ্জনও যাহার বহু ক্লেশকর ;
হেন বিত্তলাভ চাহিনা নশ্বর
চিরজীবী হ'তে আকাঙ্ক্ষী নহি !

যতদিন তুমি শুন হে অন্তক
রহিবে সুকৃতি— পাপ নিয়ামক
ততদিন রব এ স্থিতিস্থাপক
ধরি বা জীবন স্বরূপ কহি।

নরের ধরম জরা ও মরণ
কল্পব্যাপী শুধুই অমরগণ ;
পাইয়াছি যদি অর্থ সমাগম
চাহিব কেমন কল্যাণ যম।

যাচিবনা কভু অনিত্য বিষয়
কলত্র সন্তান হিরণ্য নিচয়
অসার অপ্সরা— রূপ সমুদয়
সে সবে আকাঙ্ক্ষী নহি' ত, যম !

শুধু স্ব আত্মার   এই সে পরম
করিয়া প্রার্থনা   জানিয়া চরম
এই আত্মা দ্বারা   সেই সে পরম
আত্মারে সাধক জানিতে পারে।

পাপ কার্য্যে সদা   নিযুক্ত যে জন
অশান্ত ইন্দ্রিয়   যার সর্ব্বক্ষণ
বিক্ষিপ্ত সতত   কিম্বা যার মন,
আত্ম-বোধ নহে সম্ভব তার।

দুশ্চরিত হতে   বিরত যে হয়
সমাহিত যার   মনোবৃত্তি চয়
ব্রহ্মের বিজ্ঞান   করিয়া আশ্রয়
লভয়ে মুমুক্ষু মুকতি সার।

পুরুষপ্রকৃতি   যাহার ওদন
কালান্তক যার   অন্নোপসেচন
প্রাকৃত বুদ্ধিতে   মানব কখন
ধারণা তাহার করিতে নারে।

ইতি কাঠকোপনিষদে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ

(২) শক্তিতত্ত্ব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিছুদিন পূর্ব্বে "শক্তিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও বেদমূলত্ব এবং তদীয় প্রামাণ্য সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। এই বিষয়ে পরিশেষে যাহা বক্তব্য ছিল তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি। অনেকের ধারণা আছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র অতি আধুনিক, বেদবিরুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত। সকল তন্ত্রই যে, আচার্য্য শঙ্কর বিরচিত এবং শিব ও শক্তি সংবাদে প্রকাশিত নয়, সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ দ্বারা তাহার সমর্থন করা যায় না, তবে ইহাও বলা উচিত মনে করি যে, মূল তন্ত্রভিন্ন তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রকরণ গ্রন্থ বা সন্দর্ভ সকল আধুনিক সাধক সুপণ্ডিত ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিরচিত। সংগৃহীত গ্রন্থ সকল যে সাধন পথের নানা সুগম উপায়ে পরিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দেশের শুভদিনে আর্য্য গৌরব সর্ব্বত্র সমুদ্ভাসিত হওয়ার সময়ে দেশীয় ধর্ম্ম-প্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশ লোকই সাধন, ভজন, ঈশ্বর-আরাধনে নিরত থাকিয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহাতেই আর্য্যজাতি ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া অপর দেশীয়গণের চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। অনেকের (বিদেশীয় ভাবাপন্ন কোন কোন ব্যক্তির) ধারণা আছে যে, আচার্য্য শঙ্কর ভারতে অদ্বৈতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদ ভারতে সুদৃঢ় ভাবে এখনও রহিয়াছে। কিন্তু দ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি তন্ত্রাদি শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ লিখেন নাই, কারণ দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। শঙ্করের কেবল অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র লক্ষ বলিয়া বোধ হয় না ; তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ভারতে পুনঃ সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাঁহাকে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হয়। তদনুসারে তিনি সে সকল শাস্ত্রে প্রতিপাদিত আরাধ্য দেব দেবীর যন্ত্র, মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, ধ্যান, সহস্রনাম, এবং তাহার ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বৈদিক ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে শৈবাবতার শঙ্কর তদীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভেই স্পষ্টই বলিয়া

দিয়াছেন, 'অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়স-প্রদ বৈদিক ধর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ" প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম অপরাবিদ্যা নামে উল্লিখিত সকল শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম মানবের ঐহিক অশেষ কল্যাণ উদ্দেশে পূজা, যজ্ঞ ব্রত, হোম, বলি, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, দান প্রভৃতি। এই সকল মুখ্যভাবে প্রবৃত্তি লক্ষণের প্রকাশ বা তাদৃশ ফলপ্রসূ হইলেও, গৌণত নিবৃত্তি-লক্ষণের বীজ সে সমুদয়ে অনুস্যূত আছে। কেননা, উক্ত কর্ম্ম সমূহ পরমেশ্বরে উদ্দেশে বা পারত্রিক ফলের নিমিত্ত নিষ্কামভাবে আচরিত হইলে, নিবৃত্তি লক্ষণেরই পরিচায়ক হয়। তদীয় উপনিষদ্ ভাষ্যের অভিপ্রায়ে বুঝা যায় যে, একই কর্ম্ম সকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ঐহিক ফল প্রদান করে বলিয়া তাহাকে 'সকাম, বা কাম্য কর্ম্ম বলে। আর নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, পারলৌকিক ফল প্রদান করে, বলিয়া তাহাকে 'নিষ্কাম, কর্ম্ম বলে। ফল কামনার তারতম্যে এবং ফলরাহিত্যে কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম নামে অভিহিত। এখন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, ফল-বাসনা-বিহীন শ্রীভগবৎ উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যায়। আচার্য্য শঙ্কর যখন প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্মের পরিহার কিম্বা অশাস্ত্রীয় বলিয়া অথবা মোক্ষের সম্যক্ বিরোধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করে নাই, তখন তিনি সনাতন ধর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গ দ্বৈতবাদের এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-মূলক স্মৃতি তন্ত্র গ্রন্থ সমূহের বিরোধী হইতে পারেন না। মহর্ষি মনু ও কণাদ ঐহিক অভ্যুদয় এবং পারলৌকিক নিঃশ্রেয়স ফল যাহা হইতে লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্মের মূল-লক্ষণ করিয়াছেন। অনাদি-সৃষ্টিপ্রবাহ কেবল প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মার্গের উপর চলিয়া আসিতেছে না, উভয়কে আশ্রয় করিয়াই আসিতেছে। তবে আচার্য্য শঙ্কর প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মকর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী নন। কেন? তদুত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম সহজ সাধ্য, তাহার জন্য শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ ও অমূল্য উপদেশের সামান্য প্রয়োজন; নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম বা নিবৃত্তি মার্গ সংসারী মানবের পক্ষে দুর্লভ, এবং তাহার সূক্ষ্ম সুগভীর উপদেষ্টাও বিরল, এইরূপ ভাবিয়া উপনিষদ্ ভাষ্য প্রভৃতি মহিমান্বিত পূর্ব্বাচার্য্য গণের সন্দর্ভ সারের দুর্লভ অদ্বৈতবাদের আচার্য্য শঙ্কর উপদেশ দিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জগতের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া অতুল পরম শান্তি লাভের নিমিত্ত তাদৃশ সুগভীর সূক্ষ্ম মার্গ আচার্য্য শঙ্কর ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। আচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ, যামুনাচার্য্য, শালিক নাথ

প্রভৃতি, জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানের নিত্যতা স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানে কর্ম্মে নিরপেক্ষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদীয় অদ্বৈততত্ত্ব উপদেশের উপাদান কেবল উপনিষদ্ নয়। যোগবাশিষ্ট, বিষ্ণুপুরাণ, গৌড়পাদ ভাষ্য প্রভৃতিও দেখা যায়। তবে অদ্বৈত সাম্রাজ্যে শৈবাবতারই শঙ্করাচার্য্য সম্রাটের যোগ্য। নিবৃত্তিমার্গ মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠার দিক্। প্রবৃত্তি-মার্গ অনেকটা পশু ভাবের দ্যোতক বটে, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহাই মহর্ষি বলিয়াছেন, "নিঃ শ্রেয়সাম্নাত্বৎ কিঞ্চন মহৎ" "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" অতএব চির নির্বৃত্তি বা পরম কৈবল্য লাভ করিতে হইলে, নিবৃত্তি পথ ভিন্ন অন্য উপায় সুগম নয়। বহু সহস্র গ্রন্থ পূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি মার্গের বিপুল উপদেশ বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল প্রবৃত্তির পথ বর্ত্তমান আছে তাহা নয়। নিবৃত্তি সূচক ধ্যান, ধারণা, সমাধি সম দমাদির এবং সাধনের বিস্তর উপদেশ ও প্রক্রিয়া উক্ত আছে। তন্ত্রের উপাদান যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, উপনিষদ্, সুপ্রাচীন সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, শৈবদর্শন, শিবসূত্র বিমর্ষিণী, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস, প্রভৃতিতে যে, ভূরি ভূরি রহিয়াছে তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। সম্প্রতি কেহ কেহ বলেন,—'প্রপঞ্চসার' নামক গভীর গবেষণা ও তন্ত্র ও তত্ত্ব পূর্ণ গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের প্রণীত নয়। আমার বিশ্বাস তাহা তাঁহাদের ভ্রমপূর্ণ ধারণা বই আর কিছুই নয়। কূর্ম্ম পুরাণ ও শ্রীমদ্ দেবীভাগবতে উক্ত আছে যে, দক্ষিণাপথে, ত্রিপুরাশক্তির আরাধনা বহুকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। আচার্য্য শঙ্কর দাক্ষিণদেশীয় ছিলেন। যে সময়ে দক্ষিণাপথের আর্য্যগণ ধর্ম্ম-কর্ম্মে ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন,—সে সময়েই আচার্য্য শঙ্করের তথায় আবির্ভাব হইয়াছিল। শঙ্কর উল্লিখিত সাধনা-পরিপূর্ণ প্রপঞ্চসারতন্ত্র রচনা করেন। ইহাতে শ্রুতি মূলক যোগ, তপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অন্তর্যোগ বহির্যোগ, অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ সায়ণাচার্য্য প্রপঞ্চসার সংগ্রহ ও তদীয় টীকা প্রণয়ন করিয়া প্রপঞ্চসার সন্দর্ভকে বিদ্বদ্ জনগণের অতি সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। সায়ণ, প্রপঞ্চসারকে ভগবৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত বলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে তাহার ব্যাখ্যা রচনা করাতে তাহা দক্ষিণাপথের সুধী সমাজে, শিরোদিত মূলক তত্ত্বের ন্যায় সমাদৃত হইয়াছে। শঙ্কর তদীয় অদ্বৈত গ্রন্থাবলীতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থের নাম প্রপঞ্চসার রাখিয়াছেন। স্কন্দপুরাণীয় "সূতসংহিতা"

অদ্বৈত ও দ্বৈতমতের পরিপোষক গ্রন্থ বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রীয় যোগোপাসনাদি বহু উপাদান তাহাতে বিদ্যমান আছে। এই গ্রন্থের একখানি বিস্তৃত টীকা শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য রচনা করিয়াছেন, এই টীকাতে প্রপঞ্চসারের বহু প্রমাণ "তদুক্তং ভগবৎপাদৈঃ" বলিয়া প্রামাণ্য সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহ পাঠে বুঝা যায় যে, তন্ত্র ও পুরাণের অদ্বৈত এবং দ্বৈতমূলক এই সাধনার সমন্বয় ছিল। এইরূপ কূর্ম্ম পুরাণোক্ত ঈশ্বরগীতা ও তদীয় ভাষ্যে সমন্বয় আছে। এই গীতার ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু। শৈব নীলকণ্ঠভট্ট মহাভারতের টীকার ন্যায় দেবী ভাগবতেরও বিপুল গবেষণাপূর্ণ বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনি দেবী ভাগবতোক্ত দেবীগীতার বৃহৎ ও ক্ষুদ্রসংজ্ঞক দুই খানি টীকাতে অনেক স্মৃতির প্রমাণের সহকারে প্রপঞ্চসারের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনাদি শাক্তিতত্ত্বপ্রকাশক যে সকল শ্রুতি ও উপনিষদ্ প্রমাণ, সে গুলি মূল দেবী ভাগবতে এবং তাহার টীকাতে উক্ত আছে। শ্রীমদ্ লক্ষণাচার্য্য সারদাতিলক নামক একখানি তন্ত্রের সাধন ও মোক্ষ রহস্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। রাঘব ভট্ট সারদা তিলকের টীকায় প্রপঞ্চসারের বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার টীকায় প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রপঞ্চসারের প্রমাণ রাঘব ভট্টোক্ত বলিয়া স্বীয় নিবন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। আট শত বৎসরের প্রসিদ্ধ সংগৃহীত নিবন্ধে প্রপঞ্চসারের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনের ১ম, অধ্যায় তৃতীয় পাদের (৩৭) সূত্রের ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের যোগে ও তদীয় মাহাত্ম্য পরিচায়ক একটী শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ভিন্ন আরও অনেক উপনিষদে যোগতত্ত্ব বিবৃত আছে। উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, ভামতী টীকার ব্যাখ্যাকার যতীন্দ্র অমলানন্দ, বেদান্ত কল্পতরু নামক স্বীয় গ্রন্থে উল্লিখিত শ্রুতি অনুসারে লিখিত প্রপঞ্চসারের একটী শ্লোক "তথাচবোচন ভগবদাচার্য্যাঃ প্রপঞ্চসারে" এই বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন † শ্লোকের অর্থ এইরূপ,—"পাদতল হইতে, ভৌতিক শরীরের সূক্ষ্ম ভূতের চিন্তা আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ।

† "অবনিজলানল মারুত বিহায়সা' শক্তিভিস্তদ্বিবৈঃ। বেদাঃদঃ। স্বকপ্যামাত্মনশ্চ প্রতিত্রীত্বা তত্ত্বদান্ত জয়তি সুধীঃ॥" (প্রপঞ্চসা(রেবেদান্তকল্পতরধৃত) ১-৩ ৮।৩৩

জানু পর্য্যন্ত, অনন্তর জানুদেশ হইতে চিন্তাপ্রবাহ নাভিদেশ পর্য্যন্ত, নাভিদেশ হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত, তথা হইতে কেশমূলদেশ পর্য্যন্ত, তথা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত, ক্রমে উক্ত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মভাবে সংস্থান ধারণা দ্বারা সূক্ষ্ম গুণের আবির্ভাব হয়। সেই প্রাদুর্ভাব যোগগুণে অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয়। তদ্দ্বারা যোগীর দেহ তেজোময় বা ব্রহ্মশরীর যোগীর জরা, শোক, মৃত্যু, শোক হয় না।"

স্থূলদেহেই রোগাদির আধিপত্য,যোগবলেরদ্বারা তেজোময়সূক্ষ্মদেহে সে রোগ মৃত্যু প্রভৃতির কোন অধিকারনাই। এই বেদান্তকল্পতরু যাদববংশীয় দেবাগরীশ্বর সিংহদেব এবং মহাদেবের সময়ে নাসিকত্র্যম্বকে গোদাবরীর প্রত্যাসন্নে রচিতহয়। (শকাব্দাঃ ১১৮২,খ্রীঃ ১২৬০) সেই সময়ে তদানীন্তন দেবগিরিরাজ, যাদববংশের অপূর্ব্ব গৌরব বিস্তার পূর্ব্বক স্বীয়প্রতাপ সংকারে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। বৃহস্পতি-কল্প হেমাদ্রি তদীয় প্রধান সচিবপদে নিযুক্ত থাকিয়া সেই সময়ে চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণি-নামক ধর্ম্মশাস্ত্রের মহানিবন্ধ রচনাকরেন। বোপদেব গোস্বামী উক্ত নৃপতির সভাপতিছিলেন। অতএব বলিতে পারা যে, চতুবর্গ চিন্তামণি ও ভামতীর ব্যাখ্যাবেদান্ত কল্পতরু একই সময়ে রচিত হইয়াছিল। বোপদেব, দক্ষিণাপথের ধন্বন্তরি-কল্প বিপ্র কেশবের পুত্র ছিলেন, তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্যবলে রাজমন্ত্রি হেমাদ্রির বিশেষ বান্ধব হইয়াছিলেন। হেমাদ্রির গ্রন্থের কোন কোন বিষয় কালমাধবে বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যপ্রামাণ্য সহিত উদ্ধৃতকরিয়াছেন। স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নিজগ্রন্থে বহুবার হেমাদ্রির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। বিদ্যারণ্যমাধব ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বলা বাহুল্য মাধবাচার্য্য হেমাদ্রির পরবর্ত্তী ছিলেন। শৈবনীলকণ্ঠের পূর্ব্বে পরম শৈব শ্রীকণ্ঠভট্ট (বেদান্তদর্শনের শৈবভাষ্যকার) শাক্ত ও শৈব-মত-পোষকগ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন। আচার্য্যশঙ্করের শারদা দ্বারকামঠেও প্রপঞ্চসারের দীর্ঘকাল যাবৎ সমাদর রহিয়াছে। বঙ্গদেশে যেরূপ বৃহত্তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী প্রভৃতির সমাদর, মহারাষ্ট্র দেশে সারদা তিলক, রামেশ্বর তন্ত্রাদি প্রতি শ্রদ্ধা, তদ্রূপ দক্ষিণাপথে কালোত্তর শ্রীতত্ত্বনিধি, ত্রিপুরাসার সমুচ্চয় প্রপঞ্চসারের শ্রদ্ধাতিশয় দেখা যায়। বঙ্গদেশে তন্ত্রপ্রণেতা যে, শঙ্করাচার্য্য নামে কোন পণ্ডিত ছিল তাহাতে মৌলিক প্রমাণ কিছুই আছে বলিয়া ধারণা হয় না। শঙ্করাচার্য্য কোন পণ্ডিতের নাম সাধারণ ভাবে হইতেও পারে, তাহা হইলে তিনি প্রপঞ্চসারের প্রণেতা নন যে ইহা ধ্রুব সত্য। বঙ্গীয়

শঙ্করাচার্য্য যদিও তন্ত্রশাস্ত্রীয় অপর কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও তিনি শঙ্কর, সায়ণ, মাধব ভট্টের বহু পরবর্ত্তী হইবেন বলিয়া বুঝা যায়। শৈবদর্শনেও তদীয় ভাষ্য বৃত্তিতে যে সকল তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রে বিবৃত আছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই তন্ত্রোক্ত অন্তর্যোগ বহির্যোগের মূল ভিত্তি। শৈবদর্শনে চিৎ ও অচিৎ স্বরূপ শিবশক্তির ঐকাত্ম ও জ্ঞান বা পতি, (পরমেশ্বর), জীব (পশু), পাশ (সংসার বন্ধন), জীবের পাশচ্ছেদ আত্যন্তিক ভাবে হওয়া কিম্বা পতিতে লয় হওয়াই মুক্তিস্বরূপ কথিত হইয়াছে। কাল-বিলুপ্ত শৈবদর্শন সূত্র আচার্য্য বসু গুপ্ত প্রথমতঃ মহাদেবগিরি উপত্যকায় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া শিলাতলে অঙ্কিত অবস্থায় লাভ করেন। এই আচার্য্য বসুগুপ্ত শৈব-দর্শনের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও অনেক আচার্য্য শৈবদর্শনের বহুবৃত্তি টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধাচার্য্য নাগবোধি, শৈবদর্শনের প্রতিকূলতা করিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই বসু গুপ্তাচার্য্য বৌদ্ধ ছিলেন না। বসুবন্ধু নামক বৌদ্ধাচার্য্য তাহা হইতে ভিন্ন। বসুগুপ্ত পরম শৈব ছিলেন। ইঁহারই শিষ্য ক্ষেমরাজ শৈব দর্শনের "শিবসূত্র বিমর্ষিণী" নামক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি অপেক্ষা উৎপলাচার্য্যের 'স্পন্দকারিকা' এবং তাহার উপর ভট্টশ্রীকল্লটের ব্যাখ্যা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ক্ষেমরাজ, বৃত্তির প্রারম্ভে ভট্টউৎপলের ও কল্লটের প্রশংসা করিয়াছেন, স্বীয়-বৃত্তির অনেক স্থানে স্পন্দকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত নাগবোধি আচার্য্য শৈব দর্শন এবং তন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই যে, বৌদ্ধাবিণী হইতে আর্য্যতন্ত্র শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এই বলা অসঙ্গত। বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রের বিস্তারের বহুপূর্ব্বে শৈবদর্শন এবং তদীয় ভাষ্য, বহু দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদমূলক প্রকরণগ্রন্থ বিরচিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল; যথা কালোত্তর, শ্রীগর্ভশিখা, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, শ্রীমদ্বীরাবলি, শ্রীত্রিক-হৃদয়, শ্রীমালিনীবিজয়, বিজ্ঞান ভৈরব, প্রভৃতি। অদ্বৈতত্ত্ব শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত হইলেও আর্য্যগণ পরমে-শতত্ত্বের জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় প্রথমতঃ দ্বৈত দৃষ্টিতে উপাস-নার নিমিত্ত অতি পূতভাবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠপথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। জগৎ-পিতৃ ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা এবং জগত্মাতৃভাবে পরমাশক্তির উপাসনা সহজ সুগম বোধে দ্বৈতদৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক সম্পৎ-উপাসনা, প্রতীক-উপাসনা প্রভৃতিতেও দ্বৈতভাব প্রকটিত হয়। কাশ্মীর হইতে মুদ্রিত প্রত্যভিজ্ঞা

হৃদয়, শৈবদর্শন (শিবসূত্র বিমর্ষিণী) দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বাবলী যে, অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা জানাযায়। (ক্রমশঃ)।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ।

দুঃখ মুক্তি।

অনিত্য সংসার মাঝে জনমি বার বার
ত্রিবিধ দুঃখের তাপে করি হাহাকার!
কেবা আমি, কেবা তুমি, কেবা পরিজন,
এ ভব সংসার যেন নিশার স্বপন!
দিন যায়, ক্ষণ যায়, গেল পূর্ব্ব মাস,
আশার ছলনে ভুলি পরি গলে ফাঁস!
কুচক্রে মায়ার স্রোতে, অদৃষ্ট তাড়নে,
ঘুরে ঘুরে মরি নিতি মোহ আবর্ত্তনে!
অতৃপ্ত কামনা যত—সুখের স্বপন
আবেশে বিহ্বল করি মজায় গো মন!
নিত্য নব সুখ আশে, বঞ্চিত সন্ধানে,
বিবেকে বিদায় দিয়া উদ্‌ভ্রান্ত পরাণে,
অস্থির প্রবাহরূপে ধায় জীবগণ
গেল দিন মাস বর্ষ যুগ অগনন;
তবুও নাহল কারো চেতন বিকাশ,—
ঘুচিল না বাসনার মোহময় পাশ!
হিরণ্ময় পরে কোশে স্থিত আত্মারাম,
সর্ব্বকর্ম্ম সাক্ষী তোর চির জ্যোতিষ্মান।
মায়াপাশে মোহফাঁস পরশে তাঁরে,
তাঁহারে হেরিলে তোর দুঃখ যাবে দূরে।

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

প্রলোভনে তব ওহে মহাভাগ
অনিত্যে আমার হবে না'ক রাগ,
কৃপা করি তাহা করি পরিত্যাগ
কহ জ্ঞানকথা মুমুক্ষু তবে।

মরণের পর আত্মা থাকে কিনা ?
পরলোক আছে, না আছে, জানিনা ?
সন্দিগ্ধ বিষয় বুঝায়ে দাওনা
প্রার্থনা ইহাই তৃতীয় বরে"

ইতি কাটকোপনিষদে প্রথমা বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয়া বল্লী

এইরূপে বহু পরীক্ষা করিয়া
নচিকেতা শিষ্যে যোগ্যতা দেখিয়া
ব্রহ্মবিদ্যা যম যাইল বর্ণিয়া,
আকাঙ্ক্ষী কুমার যাহার তরে।

"শ্রেয় আর প্রেয়" কহিলা শমন
"এজগতে দুই বন্ধন কারণ
বর্ণাশ্রমী নরে ভিন্ন প্রয়োজন
এই দুই পাশ সাধন করে।

এক নিশ্রেয়সঃ, অন্য প্রিয়কর
শ্রেয়ো পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান কর,
প্রেয়ো দৃঢ় পাশ জগতের নর
পরবশে যা'হে আবদ্ধ রয়

ত্যজি প্রেয়, যেই জানিয়া বিফল
করিয়াছে শ্রেয় প্রধান সম্বল
এজগতে তার সর্ব্বের মঙ্গল
খ্যাত সাধু বলি ত্রিলোকময়।

প্রেয় নামে খ্যাত সে গতি কুৎসিৎ
হেরিয়া তাহার বাহ্যিক চরিৎ
মুগ্ধ মূর্খ লোক হয়ে বিচলিত
সাদরে তাহারে বরণ করে।

তুমি নচিকেতা তাদের মতন
অবিবেকী পথে কর'নি গমন
জেনেছ অনিত্য কামিনী কাঞ্চন
প্রেয় ত্যজি শ্রেয় নিয়েছ বরে!

প্রকাশ চেয়েছ ত্যজিয়া আঁধার
মোক্ষের কারণ উপেক্ষি' সংসার,
চাকচিকাময় মোহ অবিদ্যার
সম্বণ উপেক্ষা করেছ তুমি।

ক্ষুদ্র বুদ্ধি নর অপ্সরা প্রভৃতি
মজে নানা কামে, পাবে বলি প্রীতি,
তুমি ভোগ ত্যজি, বিদ্যার্থীর রীতি
ধরেছ হৃদয়ে না হয়ে কামী।

এ জগতে আছে হেন বহু জন
পণ্ডিত বলিয়া করে অভিমান
অবিদ্যার মহা- মোহ আবরণ
রয়েছে বেষ্টন করিয়া শির।

অন্ধ-জন-নীত অন্ধজন যথা
মন্দ পথে যেয়ে পায় বহু ব্যথা
অনর্থ ঘটায় অবিবেকী তথা
আপনারে নিজে ভাবিয়া ধীর।

পরলোক তরে অবিবেকী জন
শাস্ত্র নিয়মিত বিশেষ সাধন
যথাজ্ঞানে সদা করে আচরণ
মুমুক্ষা এসবে গ্রাহ্য করে।

নারী, অন্ন, পান দৃষ্ট লোক ছাড়া
অদৃষ্ট জগত মানে না কো যারা ;
শাসনে আমার আইসে তাহারা
জন্মে শতবার ক্লেশের তরে,

শুনে আত্ম-কথা সহস্রেতে এক—
বুঝে না শুনেও অভাগা অনেক,
এই আত্ম-বোধ এর অভিষেক
অসংস্কৃত চিত্তে কভু না হয়।

শিক্ষাদাতা এর মিলে কদাচিৎ
সুশিক্ষা পেয়েও নিপুণ কচিৎ
সহস্রেতে এক হয় আত্মবিৎ
ফোটে জ্ঞান জ্যোতি হৃদয় ময়।

নহে হীন নর উপদেষ্টা এর,
কর্ত্তা কি অকর্ত্তা হেন বিচারের
কুহকে পড়িয়া মন তার্কিকের
ভাণে অবিজ্ঞের ; না বুঝিয়া পরে।

ব্রহ্ম আত্মভূত গুরু যেই জন
সুবিজ্ঞের ইহা তাহারি সদন
তিনি ভিন্ন সব কুতর্কে মগন
অণু অণুতর স্থাপন করে।

নহে তর্কগম্যা এই আত্ম-মতি
হয়না সুজ্ঞের নাহি হলে রতি
আত্ম-তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের প্রতি,
নাচিকেতা ইহা শ্রবণ কর ,

তুমি সেইমতি মম বর দানে
করিয়াছ লাভ, তাই তব মনে
এসেছে বাসনা, সত্যের সন্ধানে
শ্রেষ্ঠ প্রষ্টা তুমি অবনী পর।

জানি, নচিকেতা, কর্ম্মফল বিধি
অনিত্য অসার বাহ্য শাস্ত্র-বিধি
তাহাও অনিত্য, এহেন নিত্য নিধি
নাহি লব্ধ হয় অনিত্য দ্বারা।

জেনেও এ সব পারিনি লভিতে
নিত্য সত্য ব্রহ্ম, এখনও পাইতে,
আছে সাধ্য কিন্তু, পারিনা ছাড়িতে
এমনি মায়ার বন্ধন কারা।

ব্রহ্মবিদ্যা তুমি জানিবার তরে
ত্যজেছ সকল থাকি পৃথ্বী পরে।
যোগ্য-বস্তু তরে প্রাণপণে করে
বিশ্ববাসী তাই প্রার্থনা করে।

বিস্তীর্ণ প্রতিষ্ঠা ত্রিভুবন ময়,
কামের সমাপ্তি যজ্ঞ ফল চয়
ত্যজেছ সকলি হেন গুণময়
হেরিনি এমন অবনী পরে।

জানিও তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়
দুঃখ-দৃষ্ট আর গূঢ় অতিশয়
বুদ্ধি-গুহা-স্থিত ব্রহ্মবিদে কয়
বিষয় বিকারে প্রচ্ছন্ন রহে।

পুরাতন তত্ত্ব জানিবার তরে
বিষয় হইতে চিন্তাকর্ষণ ক'রে
আত্মাতে স্থাপন করি ধীর নরে
হর্ষ শোক হতে বিমুক্ত রহে

যেই আত্মতত্ত্ব বলিব তোমায়
মরধর্ম্মী নর আচার্য্য কৃপায়
সম্যগাত্ম ভাবে লভিয়া তাহায়
রহে মগ্ন হর্ষে জীবন ধরি

জানি' সূক্ষ্ম আত্মা ভিন্ন দেহ হতে
পায় যেই হর্ষ এ জড় মরতে,
অভিমুখী তুমি হয়েছ তাহাতে
মোক্ষাসা তোমারে মনেতে করি।"

নাচিকেতা। "প্রসন্ন যদ্যপি অহে ভগবন্
দাও তবে মোরে তাঁর বিবরণ
কালত্রয়ে যিনি পরিচ্ছিন্ন নন
কর্ম্মের গোচর-অতীত যেই

অধর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম অনুষ্ঠাণ
তা হতে পৃথক্ বরেণ্য প্রধান
কার্য্য ও কারণ যাঁর ব্যবধান,
তব জ্ঞান মত বলহ সেই"।

যম। "সর্ব্ববেদ যাঁরে করিছে স্থাপন
সকল তপস্যা যাঁহার কারণ
পূত ব্রহ্মচর্য্য করে আচরণ
ধীর নরকুল যাঁহার তরে।

সেই গমনীয় জানিবার তরে
বাসনা তোমার হয়েছে অন্তরে
সংক্ষেপেতে বলি পবিত্র ওঁকারে
জানে তাঁরে সবে বিবেকী নরে

চির প্রার্থনীয় পর ও অপর
ব্রহ্মের ইসারা এই সে অক্ষর;
জানিয়া ইহারে অধিকারী নর
পরাপরে লীন হইতে যায়;

পরাপর প্রাপ্তি সাধন কারণ
শ্রেষ্ঠ সব চেয়ে ওঁ আলম্বন,
যে জানে ইহারে ব্রহ্মেরি মতন
ব্রহ্মলোক মাঝে অর্চ্চনা পায়।

জন্ম মৃত্যু হীন আত্মা সে পরম
অবিপবি-লুপ্ত চৈতন্য ধরম্
কারণ হইতে আবির্ভূত নন্
অর্থান্তর ভূত কখনো নহে;

অজ আত্মা সেই, ক্ষয় বিবর্জ্জিত
পুরাতন হয়ে নবীন সতত ;
শরীরের ধ্বংস হলে সংসাধিত
ঘটাকাশ মত নির্লিপ্ত রহে।

দেহ-আত্ম দৃষ্টি হন্তা যেই জন
বধিব উহারে করিছে মনন
দেহ-আত্ম-বাদী হত নরগণ
ভাবিছে তেমতি নিহত আমি

নাহি জানে তারা আকাশের মত
আত্মা অবিক্রিয় উছলে সতত
ভাবিছে মানব এই ব্যক্তি হত
এ বধ কার্য্যের আমিই স্বামি।

শ্যামাকাদি হ'তে আরও' সূক্ষ্মতর
পৃথিব্যাদি হতে, আর ও মহত্তর
যত সদ্ বস্তু সবারি ভিতর
আছে তাঁর সত্বা প্রকাশময়।

স্বরূপে সে স্থিত প্রাণীর হৃদয়ে
দৃষ্ট বা অদৃষ্ট বাহ্যিক বিষয়ে,
উপরত বুদ্ধি নরকুল হয়ে
'আমি সেই' জেনে বিমুক্ত হয়।

করণ জনিত (১) ;একদেশ জ্ঞান
তার উপশমে সর্ব্বস্থানে যান্
অচল হয়েও দূর গতিমান্
মন আদি সহ আত্মারে জেনো।

---

(১) ইন্দ্রিয়াদি করণ।

সামান্য বিজ্ঞান তাহাতেই যদি
সর্ব্বত্র আত্মার (১) গতি নিরবধি
বিশেষ বিজ্ঞানে তবে তাঁর স্থিতি
স্বকীয় রূপেতে বলিয়া মেনো

হরষ অমর্ষ সমদ বা অমদ
বিরুদ্ধ ধরমে সে পরম পদ
হইয়া বিযুক্ত যুক্ত অবিরত
তবু দুর্বিজ্ঞেয় কখনো নহে ;

নানা রূপে যথা বিশ্বরূপ মণি
হয় প্রকাশিত, নব-দ্যুতি-খনি
করি উদ্ভাসিত তথা চিন্তামণি
চিন্তা অনুরূপ ভাসিত রহে।

দেব পিতৃ নর সবার শরীরে,
ব্যোম-কল্প আত্মা সতত বিহরে ;
অবিকৃত হয়ে এ বিশ্ব ভিতরে
রয়েছে সংলগ্ন অনিত্য সবে।

সেই ব্যাপী আত্মা তাহারে জানিয়া
আমি সেই ইহা মানসে ধরিয়া
শোকাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া
ধীর নবকুল আনন্দ লভে।

বেদ অধ্যয়ন অথবা মেধায়
কিম্বা শাস্ত্র অর্থ শ্রবণ দ্বারায়
এই আত্মা নাহি লাভ করা যায়,
দুর্বিজ্ঞেয় তাই কহয়ে তারে।

(১) প্রতিবিম্ব রূপে।

অভিনব যুগল।

১ম—শ্রীকৃষ্ণ।

সুন্দররূপ ভুবনমোহন   রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন
পীতবাস সতত বাস ভকত হৃদি নিকেতন।
রক্তরাজীব চরণ ভাতি   মত্ত মধুপ লুটিছে মাতি
ভঞ্জন মনোরঞ্জন তাহে কনক-নূপুর শিঞ্জন॥
নধরাধরে মধুর হাস,   ব্রজগোপীজন-চিত-বিলাস
খঞ্জন-যুগ গঞ্জন আঁখি, জয় বাঁশরী বাদন।
চন্দন সার সিক্তরুচির,   বিকচ কুসুম বিরচিত হার
কুম্‌কুম রাগ সন্ধ্যাকিরণ জলদে তড়িৎ শোভন॥
সুচারু কুসুম কণিকা শোভিত,   ময়ূর পুচ্ছগুচ্ছ রচিত
বামে হেলা কিবা বিনোদচূড়া জগজন-মনোমোহন।
ওরূপ সতত ভাবনা যার,   অবহেলে তরে ভব পারাবার
কুমারের-ভবে ভরসা কেবল, গোবিন্দ যুগলচরণ॥

২য়।

অসিতবরণি, অশুভ-বারিণি; শ্যামা শিতিকণ্ঠ-হৃদিবিহারিণি!
ত্রিদিব-বন্দিনে, ত্রৈলোক্যতারিণে, ত্রিতাপহারিণে তারা ত্রিনয়নে!
রক্তোৎপলরাগ-রঞ্জিত চরণে; অবিরত বত অরাতি দলনে;
বিরূপাক্ষ-বক্ষে রাক্ষত যতনে বিশালাক্ষি শিবে সমররঙ্গিণি॥
চূর্ণকুন্তল চন্দনে চর্চ্চিত; চাঁচর চিকুর (আ) নিতম্বলম্বিত;
উচকুচযুগ সুমেরুলাঞ্ছিত; চিন্ময়ি চঞ্চলচপলা-হাসিনি॥
প্রচণ্ড-রূপিণি নরমুণ্ড করে, গলে মুণ্ডমালা রুধির অধরে;
দশনে দমিত বাসনায় ঝরে; ঘোর হুঙ্কারে কম্পিতা মেদিনী॥
ভীমে ভয়ঙ্করি ভৈরবি ভবানি; নিরয়নিঃস্ত্রি নগেন্দ্রনন্দিনি!
শারদে বরদে দ্বিরজগামিনে; মদন-দমন-মানস-মোহিনি!
করে করবালকরালবদনি; কলুষনাশিনি কালান্ত-কারিণে;
কটিতটে কিঙ্কিণি করশ্রেণী; কুমারে করুণাকর কাত্যায়নি!

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস, বি, এ,

প্রেম।

প্রেমে—ছড়া এ জগত খানি
প্রেমে ভরা বিপুলা ধরণী ;
প্রেম-সুধা ঢালি গায়, মলয় বহিয়া যায়,
প্রেমহাসি হাসে ফুলরাশি ;
প্রেমতারা ঝিকি মিকি, গগন ভরিয়া দেখি,
প্রেমধারা ঢালে পূর্ণশশী।
প্রেম গান গায় পাখী, প্রেম-নাচ নাচে শিখী—
বিজলি—চমকে প্রেম ভরে ;
নর হাসে নারীহাসে, প্রেম সুধা তাতে ভাসে,—
প্রেম-গীতি-বিশ্বের মাঝারে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, প্রেমে-মাখা শুধু দেখি,
প্রেম-নদী যেতেছে বহিয়া ;
প্রেমের এ বিশ্বখানি এক সূত্রে যেন মণি
প্রেমময়ী রেখেছে গাঁথিয়া।

শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী।

কালিয়-দমন।

ঘোর' বিনোদিনী যতেক সজনী দুপুরে বসিয়া ঘরে
রস-ভরপুব কাহিনী বঁধুর মধুর আলাপ করে।
পিঞ্জর মাঝে বসি' মাঝে মাঝে পোষা দুটি সারীশুক
'কৃষ্ণ-কিশোব' 'কৃষ্ণকিশোর' ডাকিছে বাড়ায়ে মুখ।

কাহারো বচন　না শুনে শ্রবণ,　নয়ন না হেরে কিছু,
দেহ পড়ি' রয়,　ভ্রমিছে হৃদয়　কাননে বঁধুর পিছু।
কভু মৃদুহাস　অধরে বিকাশ,　কভু দিঠি ধায় দূরে,
গোচারণ-মাঠে　যমুনার বাটে　মানস-নয়ন ঘু'রে।
মন আঁখি ভরি'　দেখিছে কিশোরী　শষ্পিত নদী-তীরে
শ্রীদাম সুবল,　রাখালের দল　নাচিছে নাথেরে ঘিরে।
মুখে মৃদু হাসি,　করে ল'য়ে বাঁশী　বঁধুয়া তুলিছে তান,
গাহিছে রাখাল,　শুনিছে গো-পাল　উরধ করিয়া কান।
তালে তালে তার　নাচে যমুনার　তরল লহরমালা,
শাখা-বাহু তুলি'　নাচে তরুগুলি　পরাণ পুলক ঢালা।
সহসা মুরলী　থামিল,—বঁধুয়া　তারে বুঝি মনে করে,
এমনি কত না　দিবস-স্বপন　বালারে পাগল করে।

২

কি জানি কি ভাবি'　চমকিল রাই,　কাঁপিয়া উঠিল বুক,—
সেই কালে এক　রাখাল-বালক　আসিল মলিন-মুখ।
কাঁদিতে কাঁদিতে　কহিল করুণ　বিষাদ-কাহিনী তার;
কালিন্দী-কূলে　কালিদহে কি যে　পড়িল বজর ভার।
কেমনে তৃষিত　গোপসুত যত　দহ-নীর করি'পান
বিষে জরজর,　লুটে কলেবর,　দেহে বুঝি নাহি প্রাণ।
দেখি'তা কেমনে　সখা-গত-চিত　যশোদা-পরাণ মরি
ঝাঁপায় পড়িল　কালিদহ-জলে,　আর না উঠিল হরি।—

৩

"ধন্য বঁধুব　সখ্য মধুর"　কহিতে কহিতে রাই
পাগলিনী পারা　ছুটিয়া চলিল,　নয়নে সলিল নাই।
বিশিথিল বেশ,　নাহি লাজ লেশ,　নাহিক জ্ঞেয়ান কিছু,
সখীগণ তারে　ধরিতে না পারে,　ছুটিয়া আসিছে পিছু।
"আকুল পরাণে　ধায় দহ-কূলে　বরজের নারীনর,
যমুনার নীরে　গগনে সমীরে　বহে কি বিষাদ-ঝড়!

৪

মৌনী-বদনা　অনীর-নয়না　কিনারে দাঁড়ায়ে রাই
জুড়ি দুটি কর　রহে জড়সড়　সবার পিছনে যাই

মাতা যশোমতী পাগলী যেমতি কভু কাঁদে, কভু হাসে,
নন্দ ভূপতি বিগলিত-মতি নয়ন সলিলে ভাসে।
'কোথা নীলমণি' বলি' গোপগোপী ধূলায় লুটায় পড়ে,
ভাষা-হীন দুখে নীর ঝরে চোখে ধেনুগণ নাহি নড়ে।
যবে হাহাকার উঠে চারি ধারে, যমুনা কাঁদিয়া বয়,—
দূরে এক কোণে বঁধুর ধেয়ানে রাই নিমগন রয়।
না পড়ে পলক, না দুলে অলক না চলে শোণিত-ধারা,
সুখ দুখ ছায়া না পড়ে বদনে, চিত্র-মূরতি পারা।

৫

সহসা ধ্বনিল চির পরিচিত শ্যামের মোহন বেণু,
চমকি' চাহিল আভীর আভীরা, উৎস-শ্রবণ ধেনু।
অমনি বহিল উজান যমুনা, উথলিল দহ-বারি,
স্তোত্র গাহিল লহর কণ্ঠে শত শত নীর-নারী।
দেখিতে দেখিতে শত ফণা তুলি উঠিল কালিয় ফণী,
চরণযুগল রাখি তার শিরে দাঁড়ায়ে বরজ-মণি।
ফুটিল যেন রে শত শতদল ঝলমল মণি-করে,
তার মাঝখানে দিব্য মূরতি, কোটী ভানু মুখে ঝরে।

মুরলীর রবে চেতন পাইল অচেতন গোপগণ,
বিস্ময়ে অতি সে মহামূরতি করে সবে দরশন।
"গোপাল-গোপাল" বলিয়ে যশোদা বাহু পশারিয়া ধায়,
হরষ-অন্ধ বিবশ নন্দ হৃদয়ে ধরিতে চায়।
নদী কুলুতান তুলে জয় গান, পুলক-আকুল সবে,
"সখা—সখা" বলি হাঁকিছে রাখাল আনন্দ-কলরবে।
বাঁশরীর ডাকে নয়ন তুলিয়া চাহিল যেমতি রাধা—
ধ্যান—সম্ভ্রম— সুখ অবজ্ঞানে চোখে লাগে লাজ-বাধা।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

জীবন-সখা।

বিস্ময়ে আজ জীবন-সখা
অন্ধ সম আছি চেয়ে,
একি মহান রঙ্গ তোমার
অসীম বিশ্ব আকাশ ছেয়ে?
একি বিরাট্ ভাবের লীলা
একি তোমার ধূল' খেলা।
এ যেন এক মরণ-ভূমে,
অলীক মোহ স্বপ্নমেলা॥
তোমার আসন সবার নীচে,—
সবার শেষে, জীবন পারে।
ব্যাকুলতার গণ্ডি ছাড়ি
অসীম এক যে সাগর পারে॥
যেথায় গিয়ে সকল স্রোতের
প্রাণের ধারা মিশে গেছে
এক যে অসীম নিরাবিলের
নিবিড় ধ্যানের পায়ের কাছে॥
তবে কেন অসীম থেকে
বিশ্বখানি তুল্লে আঁকি?
একি অঘোর কুহেলিকা
একি বিরাট্ অন্ধ ফাঁকি?
তৃপ্ত তুমি তোমার মাঝে,
তোমার গানে তোমার তানে।
তোমার অসীম ভাবের মাঝে
মগ্ন তুমি নিরঞ্জনে॥
আপন ভাবে বিভোর তুমি
আপন ঘরে পাতি থানা।
আজ তবে গো কাহার তরে
কর হেন আনাগোনা?

এ আকুলি, এ বিকুলি,
    এ পিপাসা কাহার তরে ?
এ তোমার এ বিরাট্ বুকে
    কেন প্রেমের অশ্রু ঝরে ?
তোমার কাছে উঠ্ছে না ত
    রূপেব চমক আকাশ ছেয়ে।
তোমার কাছে ছুট্ছে না কেউ
    গুণের বিজয়-ধ্বজা ল'য়ে॥
তুমি কোন আশার আশায়
    পুড়্ছো না গো মিছে বুকে,
মরণ সম তুষানলের
    রক্ত অনল প্রলেপ মেখে॥
তবে কেন বিশ্ব-গলা
    ভাবের স্রোতের আপথ ছাড়ি,
বিশ্বকারা ব্যক্ত ভাবে
    কাহার ত'রে আছ পড়ি ?
এ তোমার এ অহমিকা
    কাহার তরে উঠ্ছে ফুটে,
অসীম ছাড়ি সসীমে কা'র
    দিয়েছ দোল হৃদয়-পটে॥
কা'র বিরহে তোমার বুকে
    বেজেছে গো শেলের ব্যথা।
কার হাসিটী তোমার চোখে
    ধ'রে দেছে বিশ্বকথা ?
এ যেন এক বিরাট্ ছায়া
    পড়ল আজি চক্ষু ঘেঁসে,
কুহক-ভরা মায়ার দেশের
    ছন্দহীন এক শব্দ ভেসে॥
বুকের মাঝে বুক খানি মোর
    পড়ছে নুয়ে অবাক-ভারে।

বিশ্বভরা তোমার আঁজি
অপরূপ এ রঙ্গ হেরে॥
এ যে তোমার আকুল আভাস
কি যেন এক স্মৃতির রেখা,
একটা যেন মরণ মাঝে
জীবন দিয়ে দ্বন্দ্ব লেখা॥
ঐগো যেথায় পাখীর গান
উঠ্‌ছে বনে কলধ্বনি,
ঐ যে যেথা ছুটছে নদী
শুনে কাহার আকুল বাণী,
ঐ গো যেথায় তারায় তারায়
হচ্ছে প্রাণের কোলাকুলি,
ওদের মুখে উঠ্‌ছে ফুটে
তোমার প্রাণের আকুল বুলি॥
চক্‌চকে অই গাছের শীরে
স্বর্ণ-কিরণ পড়ছে ঢেলে,
উধাও হ'য়ে লুটছে ভ্রমর
ফোটা ফুলের ব্যাকুল কোলে॥
অই যে বাতাস ঢেউ খেলে যায়
সোণার 'খেতের' বুকের পরে;
উচ্ছ্বাসে ওর বুকখানি মোর
উঠ্‌ছে কেঁদে তোমার তরে॥
ঐ যেখানে নীল আকাশের
অসীম ছেয়ে উঠ্‌ছে গান,
ঐ গো যেথায় সাঁজের আলোর
রক্তফলক মুহ্যমান।
ঐ যেখানে পাপিয়ার যে
আকুল কণ্ঠ ধরেছে তান।
তাহার মাঝে উঠ্‌ছে ফুটি
তোমার হাসি, তোমার গান॥

মুগ্ধ তোমার নয়ন দুটী
পড়েছে গো আমার চোখে।
আর কেনগো লুকাও মিছে
ফুলের স্নিগ্ধ ধবল বুকে?
হরিণীর অই করুণ আঁখি
তোমায় কি গো ঢাকৃতে পারে?
ওযে আমার হৃদয় মাঝে
আঁকা আছে ব্যাকুল করে॥
তোমার চোখে চোখখানি মোর
হ'য়ে গেছে আত্মহারা।
যেথায় খুঁজি যেথায় দেখি
তোমার সে ভাব পাগলপারা॥
সারা ভুবন খুঁজছ তুমি
সারা প্রাণের ঢেউয়ের সাথে,
আলোক পাখা দোলে যেমন—
অসীম শূন্য আকাশ পথে॥
আজ এ আমার পরাণ টুকু
বুকের বাঁধন উছলিয়ে,
উধাও হ'য়ে যাচ্ছে ছুটে
অসীম ঘেরা আকাশ পথে,
বিশ্ব ছাপি কোন সুদূরে
মহাসাগর সম্মিলনে
মানস-গলা প্রেমের নদীর
খর স্রোতের বন্যা সনে॥
যাচ্ছে ভেসে তীরের বাঁধন
ডুবিয়ে দিয়ে দিকের মুখ;
বুকজোড়া এক খোলা হাওয়ায়
আস্‌ছে নেমে নিবিড়-সুখ॥
বিশ্ব তা'রে ধরতে নারে
বিশ্ব ছাড়ি পড়্‌ছে দূরে।

নীল অসীমের অকূল দিকে
　　আকাশ বুকের প্রাণের পরে॥
একি কুহক, মায়ীর মায়া,
　　ইন্দ্রজালের জটিল ধারা।
এযে আমার বুকখানি আজ
　　দিচ্ছে করে পাগলপারা॥
প্রাণের চেয়ে প্রিয় আমার
　　চিরদিনের হৃদয়-রাজ,
একি কঠোর শাস্তি তোমার
　　এ কেন এ মলিন সাজ?
কেন তোমার স্বচ্ছ বুকে
　　পড়েছে আজ বাষ্পরেখা,—
নির্ম্মলতার আঁধার মাঝে
　　কলঙ্কের এক দীপ্ত লেখা?
তোমার দুঃখে বুকখানি মোর
　　যাচ্ছে ভেঙ্গে ব্যাকুল হ'য়ে।
মরণ মত করাল ছায়ায়
　　রক্ত-অনল বরণ হেরে॥
তুমি যে মোর তুফান-ভরা
　　হৃদ্‌সাগরের ধ্রুবতারা,
তোমার অমল মুখখানি মোর
　　মরণ মাঝে শান্তি ধারা॥
তোমার পায়ে জীবন আমার
　　সঁপিয়াছি তোমার তরে,
তোমার তরে রেখেছি নাথ
　　মনের নিগূঢ় গুপ্ত ঘরে।
কাতর প্রাণের অশ্রু ঢেলে
　　ময়লা মাটী ধুয়ে দিয়ে।
ছোট বড় বাঞ্ছা যত
　　আপন করে সাজাইয়ে॥

তুমি আসি উঠবে যেথা
তোমার চরণ পরশ পেয়ে,
বাঁধন খোলা দুহাত তুলি
সবে তারা মুক্ত হয়ে॥
এই আশাতে, জীবন সখা
কত বিকট জীবের সাজে,
কত মরণ মরুর তলে
কত জীবন ঝঞ্ঝা মাঝে,
কত আমার অশ্রু-গাথা
বিয়োগ-শোকের স্তম্ভ পরে,
নীরব হ'য়ে আছি চেয়ে
নিবিড় তার সূত্র ধরে॥
কিন্তু তোমার শান্ত বুকে
উষ্ণ এমন ধারার পাতে,
মুচ্‌ড়ে গেছি প্রাণের মাঝে
প্রাণের সকল আশার সাথে॥
ছিঁড়ে গেছে হৃদয় বীণা
বেসুরে আজ উঠ্‌ছে বেজে।
জীবন কাঠির 'চমক' আমার
অশ্রুতে আজ গেছে বুজে॥
আজ কি সখা তোমার মুখে
তোমার আঁধার বয়ান পরে,
তোমার শোভন আনত আঁখির
বিগলিত অশ্রুধারে,
তুচ্ছ আমার জীবন বলির
উষ্ণ-ধামার শোণিত দিয়ে,
তুচ্ছ আমার ভজন সাধন
ভক্তি ধারায় বিনাদিয়ে,
দেখ্‌তে পাব মধুর হাঁসি
যা' দিয়ে মোর চক্ষু ঘেরা,

যা'র তরে মোর পাগল হৃদয়
  সকল বিশ্ব খুঁজে সারা,
যার তরে ওই বাতাস বুকে
  দীর্ঘশ্বাসে ওঠে প্রাণ?
যা'র তরে ওই জলদ্ মুখ
  পরাণ ছেঁড়া উঠ্‌ছে গান,
তোমার পায়ে পড়বে কিগো,
  আমার বুকের তুচ্ছ দান?
আপ্‌নি তুমি শুন্‌বে কিগো
  ভক্তিবিহীন রুক্ষ তান?
আপ্নি তুমি আপন করে
  ছিন্ন আমার বীণার তুলি
ভগ্ন আমার আঁধার বুকে
  তোমার বিমল আলোক জ্বালি;
শুন্‌বে কিগো তোমার মনে,
  তোমার বুকের শান্ত তান,
তা হ'লে মোর সকল ধারা
  তোমার পদে অবসান॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা গতবারে বালক-সুলভ অপরিস্ফুট মানবের ভাষায় শ্রীভগবানের নিষ্কল বা পুরুষোত্তম ভাবের অনুশীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এইবার তাহার চৈতন্যঘন জ্ঞানঘন ব্রহ্মভাবের বিষয়ে অনুচিন্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ তিনি "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"। ভাগবৎ বলিলেন—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরস্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

৫।১২।১১।

'তর্হি কিং সত্যং ? তদাহ। জ্ঞানং সত্যম্। ব্যবহারিকসত্যত্বং ব্যবর্ত্তয়তি—পরমার্থম্। বৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থানি ষড়্ বিশেষণানি,—বিশুদ্ধং, তচ্চাবিশুদ্ধং। একং তত্তু নানারূপং। অনন্তরম্বং বহির্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং তত্তু বিপরীতম্; ব্রহ্মপরিপূর্ণং তত্তু পরিচ্ছিন্নম্। প্রত্যক্ তত্তু বিষয়াকারম্। প্রশান্তং নির্ব্বিকারং তত্তু সবিকারং, তদেবং স্বরূপম্ জ্ঞানম্ ইত্যুক্তম্। কীদৃশং তৎ ? ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণত্বেন ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্ত। যচ্চ জ্ঞানং বাসুদেবং বদন্তি।" (শ্রীধরঃ)

'তাহা হইলে সত্য পদার্থ কি ? বলা হইতেছে; জ্ঞানই সত্য পদার্থ। তবে কি ব্যবহারিক সত্য ? যাহা তৎরূপী জীব ও সর্ব্বরূপী প্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকটিত হয়, তাহাই কি সত্য ? না। তিনিই পরমার্থ। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বব্যাপারে ব্যবহারের পর অতিগ (transcendent) অর্থ বা স্বরূপ বস্তু (পরম্ = অতিগং অর্থং)। ঘাতপ্রতিঘাত ও প্রকাশের মধ্যে তিনি থাকেন বটে, কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বৈত জ্ঞানের অতিগ; তৎসমুদায়ের তলায় তলায় থাকিয়া *সর্ব্বদা সমরূপে* অবস্থিত আছেন। আর এক কথা। অর্থগুলি যাহা 'আমি'র বাহিরে প্রতিভাত হয় তাহারা বৃত্তিজ্ঞান ও ব্যবচ্ছেদের ফল। বৃত্তাকারে পরিণত জ্ঞানের গতিকে বৃত্তি বলে (circumference)। যেমন আনন্দ ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠে বটে, কিন্তু আমরা সেই অভিব্যক্তিকে 'আমি'র বাহিরে লইয়া গিয়া বৃত্ত বা বিশেষ বস্তুর উপর পরিস্থাপিত করত উপলব্ধি করি। যতক্ষণ এই প্রবণতাটি থাকিবে ততক্ষণ বিশুদ্ধ-স্বরূপ ভগবানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়াও, আমরা বিশেষ বস্তু ও শক্তির খেলা লইয়াই থাকিব। ব্যবচ্ছেদ না হইলে ত আর বৃত্তিজ্ঞান ফুটে না। সেই আনন্দঘন স্বরূপকে টুকরা টুকুরা করিয়া না দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি না। আনন্দের এই ঘন একত্ব ও সর্ব্বাধারত্ব বুঝাইবার জন্য উপনিষৎ দেবতার আনন্দ, পিতৃগণের আনন্দ, মনুষ্যের আনন্দ প্রভৃতিও পরিমাণ করিয়া উপদেশ দেন। এই বৃত্তিজ্ঞান প্রভৃতির অতিগ বলিয়া ভগবানকে 'বিশুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করা হইল। তিনি 'বি' অর্থাৎ পরম-বিশেষ, 'শুদ্ধ' অর্থাৎ বৃত্তি জ্ঞানদ্বারা অপরামৃষ্ট। তিনি এক; বাহ্যরূপে প্রতিভাত বস্তুমাত্রই যাহাকে আমরা ইদং বা ইহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি তাহা নানারূপ। তিনি অন্তর ও অবহি বা বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য। বিষয়গুলি তাঁহার বিপরীত। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, ভিতর বাহির নাই, অবকাশ নাই, ছেদ ও ভেদ নাই, কেবল ভরপুর; কিন্তু উহা পরিচ্ছিন্ন। তিনি প্রত্যক্ (প্রতি অঞ্চতি) সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া একই ভাবে ফুটিয়া উঠেন; কিন্তু উহা

বা জন্য জ্ঞান সর্ব্বদা বিষয়াকারে আকারিত। তিনি প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার,—বিকারের আধার হইয়াও সমরূপে অবস্থিত;—কিন্তু উহা সবিকার। এইরূপ স্বরূপ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া অভিহিত করা হইল। উহা কিরূপ,—বাহিরের ভাষায় বলিতে গেলে কিরূপ?—প্রয়োজনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলে কিরূপ? না—ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ হেতু 'ভগবৎ' শব্দে সঙ্গিত হয়েন। প্রকাশের মধ্য দিয়া দেখিলে, দেখা যায় যে পুরুষ, প্রকৃতি ও আত্মা, সমগ্র বিশ্ব, ছয়টি স্রোতে তাঁহার মহিমা স্ফুরণ করিবার প্রয়াস পায়। এই ছয়টি স্রোতকে "ভগ" কহে। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ"। তিনি স্বরূপতঃ বাসুদেব-রূপ জ্ঞান। বসতে অস্মিন্ ইতি বসু, দিব্যতি স্বয়ং প্রকাশতি ইতি দেব। যাঁহাতে আর সকল জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও প্রাকৃত ভাবরাশি নিঃশেষে মিশিয়া গিয়া থাকে, সেই সর্ব্বাধার অথচ 'সর্ব্ব'ভাবের অতিগ জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া "বসু"; সদা স্বপ্রকাশ, যাঁহার প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় বস্তুর অপেক্ষা থাকে না, এই জন্য তিনি "দেব"। এক কথায় সমগ্র বিশ্বের খেলার দিক্ হইতে দেখিলে তাঁহাকে 'বসু-আবাস আলয়' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। স্বরূপ হইতে দেখিলে তিনি সদাই স্বপ্রকাশ; প্রকৃতি বা তত্ত্বগুলি থাকুক বা নাই থাকুক, বিশেষ উপলব্ধিক্ষেত্রে জীবভাবটি থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি সর্ব্বদাই আপনার মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া প্রকাশ হইতেছেন, সেই জন্য ভাগবৎ অন্যত্র বলিতেছেন সত্যং 'বিশুদ্ধ' বসুদেব শব্দিতং তদীয়তে যত্র পুমান্ অপাবৃতঃ" * * * বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলে—কারণ ঐ তত্ত্বে সর্ব্বভাব ও প্রকাশভাব নিহিত থাকে। সেই বসুদেব রূপ ক্ষেত্রে যে পুরুষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাঁহাকে বাসুদেব বলে। সুতরাং ভাগবতে 'বাসুদেবে ভগবতি' শব্দের যে প্রয়োগ আছে, তাহার যে বিশেষ অর্থ আছে উহা পাঠকগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

এখানে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না। শ্রীভগবানের জন্মের পর কংস-কারাগৃহে আবদ্ধ দম্পতী যে ভাবে ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন—সেই দুটি স্তব পাঠ করিলেই "বসুদেব" শব্দের মর্ম্ম উপলব্ধি হইতে পারে।

"এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।

অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥" ১০—৩—১৭।

অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি বুদ্ধির অনুমান দ্বারা যে সকল বিষয়ের স্বরূপ জানিতে হয়,

সেই সকল বিষয়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের সহিত আপনাকে পৃথক্ করা যায় না। কেন না বুদ্ধির অনুমান-কার্য্য বশে দৃষ্ট বস্তুর উপর মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সংস্কারগুলি মিশাইয়া থাকে। বৃক্ষের স্বরূপ ভগবান্ বটে; কিন্তু আমাদের মলিন বুদ্ধির বৃক্ষজ্ঞানের ভিতর, পত্র পুষ্প আদি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান,—ছায়া তাপ প্রভৃতি বাসনা-জন্য জ্ঞান, উদ্ভিজ্জত্ব প্রভৃতি মানসিক জ্ঞানরাশি অনুরূপে মনন করিয়া মিশাইয়া রাখে। এই জন্যই অর্জ্জুন পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের সঙ্গে এত খেলা করিয়াও, তাঁহাতে মনুষ্য ও সখা বুদ্ধি আরোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বুদ্ধি যখন অনুমানকার্য্য ত্যাগ করিয়া, বৃত্তিগুলিকে অবসান (একদম হজম) করিয়া ফেলে, তখনই উহা বিশুদ্ধ বুদ্ধি; ও সেই বুদ্ধির দ্বারাই ভগবানের অনুভূতি হয়। সে যাই হো'ক বসুদেব বলিলেন—"হে ভগবন্ আপনি সর্ব্বস্বরূপ—সর্ব্বের আত্মা বা আপনি সর্ব্বের ব্যাপক পরমার্থ তত্ত্ব, সুতরাং আপনার অন্তর বাহির ভেদ নাই। অতএব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ ও প্রসব ব্যাপারটি মায়াবিলাস ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেনা।" এ প্রকার উক্তি 'বসুদেবের' পক্ষেই সাজে। কিন্তু যখন দেবকী স্তব করিলেন, তাঁহার দৃষ্টি শ্রীভগবানের নিষ্ফল তত্ত্বের উপর নাই। কারণ তিনি প্রকাশ-শীলা, তত্ত্বস্বরূপিণী। তাই তাঁহাকে দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং (ভাগ। ১০।৩।৮।) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনিও ব্রহ্মজ্যোতি নির্গুণ ও নির্ব্বিকার তত্ত্বের স্তব করিলেন বটে; কিন্তু তাহার দৃষ্টি-রূপ বা প্রকাশ ভাবের উপরেই রহিল।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং সত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

ভাগ।১০।৩।২৪।

বসুদেব হতাশ হইয়া বলিয়াছিলেন—যে "হে ভগবন্! তোমার জন্ম-ব্যাপার তোমার মায়াবিলাস ব্যতিরেকে অপর কিছুই হইতে পারে না। তাহার মতে ভগবান্ এরূপ মহৎ, অবিজ্ঞেয় ও বৃহৎ সত্তা, যে তাঁহাতে বিরুদ্ধ সত্তাগুলিও সম্ভব—

ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ।

ভাগঃ।১০।৩।১৯।

ভূত সকলের সহিত, সৃষ্টির সহিত, এই জ্ঞানঘন আনন্দঘন ভগবানের কোন সম্বন্ধ তাহাতে হইতে পারে না। তাঁহাতে এই সমুদয় বুদ্বুদের মত উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু তিনি তাঁহাতে নাই। কিন্তু দেবকী দেবী দেখিলেন যে তত্ত্বসমূহ

প্রলয় সময়ে শেষ-সংজ্ঞ ভগবানে মিশিয়া যায়। সংসারের লীলার আভাসটুকু যেন কি আশ্চর্য্য মায়ার প্রভাবে, উহার শরীরের জ্যোতিরূপে অবস্থান করে। বসুদেবের মতে ভগবানের যে প্রকাশ তাহাতে সূর্য্য চন্দ্রাদি ও উড়ুগণও নাই; উহা নিরূপ, নিগুর্ণ, কাল, কৃষ্ণবর্ণের ধাম বা জ্যোতি—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ গীতা

হইবার কথাও বটে; কারণ বসুদেব পুরুষ তত্ত্ব ও দেবকী শুদ্ধা প্রকৃতি স্বরূপিণী, পরন্তু উভয়েই শ্রীভগবানের বিলাস ক্ষেত্র।

ভগবান্ ব্রহ্মা কৃত শ্রীভগবানের স্তবেও ব্রহ্মা বলিলেন—"হে ভূমন্! কি, সগুণ কি অগুণ, তুমি উভয় প্রকারেই দুর্ব্বোধ্য, তথাপি যাঁহারা ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে রুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা বিশেষাকার-রহিত, বিষয়-হীন, স্বপ্রকাশ বলিয়া স্ফূর্ত্তিশালী আত্মাকার প্রাপ্ত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং অগুণ নারায়ণ-স্বরূপ তোমার মহিমা কথঞ্চিৎ জানিতে পারেন। অন্যথা হয় না।"

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্যতে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতোহ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া নচান্যথা ॥

ভাগ ১০।১৪।৬

"হে ভূমন্ অপরিচ্ছিন্ন গুণস্য তে মহিমা অমলৈরন্তরাত্মভিঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ৈ-বিবোদ্ধুং বোধগোচরীভবিতুং অর্হতি যোগ্যো ভবতি। অথবা বিবোদ্ধুং জ্ঞাতুমর্হতি অর্হ্যতে ইত্যর্থঃ। যদ্বা মহিমেতি মহিমানং কশ্চিদ্বোদ্ধুং অর্হতীত্যর্থঃ। কথং স্বানুভবাৎ আত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ। নম্বন্তঃকরণমপি সবি-কারমেব বিষয়ীকরোতীতি, কথমাত্মাকারতা; তত্রেত্যত আহ—অবিক্রিয়াদিতি। বিক্রিয়া বিশেষাকারস্তদ্রহিতাৎ বিশেষপরিত্যাগ এবাত্মকারতেত্যর্থঃ। নম্ব-ন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বে অনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাদত আহ—অরূপত ইতি। রূপং বিষয়ঃ অবিষয়াৎ বৃত্তিবিষয়ত্বমেবাত্মনো ন ফলবিষয়ত্বম্ অতোনায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কথং তর্হি স্ফূর্ত্তিঃ অনন্যবোধ্যাত্মতয়া স্বপ্রকাশত্বেনৈব নত্বন্যথা ইদং তদিতি বিষয়ত্বেনেত্যর্থঃ। অথবা যা সর্ব্বতোহন্তরঙ্গা লক্ষ্মীরপি অগুণস্য তে মহি মহিমানম্ অমলৈরন্তর্বৃত্তিভিরিন্দ্রিয়ৈরপি তথা যাদৃশস্তত্তস্তেন রূপেণ বিবোদ্ধুং কিমর্হতি নার্হত্যেবেত্যর্থঃ। কথং তর্হি অর্হতি, তদাহ স্বানু-ভবাদিত্যাদিনা। উক্তার্থমেবৈতৎ। (শ্রীধরঃ) হে ভূমা, অপরিচ্ছিন্নগুণ,

বা গুণের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তোমার মহিমা,—যাহাদের অন্তঃকরণ ও আত্মা মলশূন্য সুতরাং প্রত্যাহৃত-ইন্দ্রিয়াদি যোগী ভক্তগণের দ্বারাই বোধের গোচরীভূত করিবার সমর্থ হয় তোমাকে কি করিয়া বোধের গোচরী করা যাইতে পারে? না,—স্বীয় আত্মার অনুভবের দ্বারা। অন্তঃকরণ ত সবিকার বস্তুই গ্রহণে সমর্থ; সে কি প্রকারে তোমায় অনুভব করিবে, কি করিয়া আত্মার আকারত্তা প্রাপ্ত হইয়া তোমার মহিমা গ্রহণে ক্ষমবান হইবে? না, অবিক্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়া। বিক্রিয় শব্দে বিশেষ আকার; তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষ ভাব অতিক্রম করিলে,—চিত্তকে বিশেষভাবে পরিসমাপ্তি করিবার প্রবৃত্তি লীন হইলে, অন্তঃকরণ আত্মার আকারে আকারিত হয়; রূপ বা বিষয় ভাব ত্যাগ করে। আত্মা অন্তঃকরণের বৃত্তির বিষয় হয় না বটে; তথাপিও অনন্যবোধস্বরূপ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন আত্মভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। অর্থাৎ বৃত্তি ও বিষয়শূন্য চিত্তে আত্মার ভাব আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। সেই আত্মস্ফূর্ত্তিকে আধার বোধে প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ আত্মা বা আমি জ্ঞানের ভিতর দিয়া আমির মতন অথচ এক জ্ঞানঘন অমল, গুণাতীত, নরমাত্রেরই আশ্রয় রূপ নিষ্কল জ্ঞান ফুটিয়া উঠে; ইহাই শুদ্ধ ব্রহ্মভাব। স্বানুভব বা নিজ আত্মার অনুভবই ব্রহ্ম দর্শনের এক মাত্র ইন্দ্রিয়। এক কথায় যখন আমিতে আর ব্যক্ত বিশেষ ভাবের প্রবৃত্তি থাকে না, যখন আমিটীকে বিগত-শেষ বা শেষশূন্য বলিয়া বোধ হয়, সেই বোধ বা অনুভবটিই আধার হইয়া ব্রহ্মভাবের ইঙ্গিত করিতে পারে। সমস্ত আমিটাই ইন্দ্রিয় হইয়া যাওয়া চাই। সমস্ত আমিটীকে সেই রসরাজের ইঙ্গিত বা ইসারা বলিয়া বুঝিতে পারা চাই। উচ্চনীচ, আদি অন্ত, প্রভৃতি ভাবগুলি একে বারে ডুবিয়া গিয়া কেবল একমাত্র ভরপুর "অস্তি" এই ভাবটীতে আমিকে লইয়া যাওয়া চাই। তার পর ই বিশুদ্ধ আমিরূপ দর্শনটীকে যখন বিস্মৃত হইবে, যখন এইটীকেও ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ স্ফূর্ত্তি আভাস বা রূপের দিকে চাহিতে পারিবে তখন দেখিবে যে কি এক স্ব-প্রকাশ, নির্ব্বিকার, নিষ্কল, নিরাধার অথচ ঘন 'অস্তি ভাতি ও আনন্দাত্মক' এক মহান্ পদার্থ রহিয়াছে। আর কিছুই নাই। ইহাই শ্রীভগবানের ব্রহ্মভাব।

যদি বল ইহাতে আমার 'আমির' কি হইল?

ফুল ফুটিলে গাছের কি হয় বলিতে পার? যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইলে বাল্যাবস্থার কি হয় জান? সমস্ত প্রকৃতিগত বিলাস মাত্রই ত নিজের জন্য নহে।

সকলই ত' আর কিছুর জন্য, আর কাহার জন্য। যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমার 'আমি' জ্ঞানটী খেলিতেছে, যাঁহাকে ইঙ্গিত করিবার জন্য বিশ্বের অন্তর, বাহ্য সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইতেছে, তাঁহাতেই যদি উপনীত হও, তবে 'আমির' ভাবনা কেন? আর এক কথা—বালক যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, যুবক যখন প্রৌঢ় হয়, তখন কি তাহারা কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া বলে—'ওগো! আমার কি হইল'? ব্রহ্মরূপী ভগবান আমি কিনা, তাঁহার চৈতন্যও আমি-ভাবে আছে কি না, এ কথা কে বলিবে? তবে মনে হয় যে সেই সৎ পদার্থটী 'অহং' বর্জ্জিত নয়; সে যে অহমেরি পরিসমাপ্তি,—সমস্ত অহং তৃষ্ণার শান্তি স্থান। অবশ্য এই অহং এ 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত বর্ণমালা না থাকিতে পারে, নাম ধাম প্রভৃতি নির্দ্দেশ না থাকিতে পারে, -কিন্তু ইহাতে যে অহং বোধের সমাপ্তি (সম্ + আপ্তি) হয় তাহাত স্থির। ইহাতে যে অহংটী সর্ব্বতো ভাবে আপনাকে পাইয়া যায়, তাহাত অবধারিত। ভগবান যে ব্রহ্মকে তাহার প্রতিষ্ঠা ও শাশ্বত পদ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাঁহাকে শূন্য-বাচক কিম্ভূত কিমাকার বলিয়া ভাব কেন? সত্যবটে, এই ব্রহ্ম তত্ত্বে আর ছোট আমি লইয়া থাকিতে পারিবে না আর আমি "আমি" বলিয়া কিছু নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না। কিন্তু সেটা কি অহং বোধবাচ্য পদার্থের নাশের জন্য, না সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন, অবিক্রীয় 'আমি' হইয়া যায় বলিয়া?

মনে হয় ভগবান, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ভাবটি, বুঝিতে গেলে Proff Myer's প্রমুখ মনীষিগণ যে বড় 'আমি'র কথা বলিয়াছেন সেই তত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগের অববোধের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা বলেন যে 'আমি রাম শ্যাম' প্রভৃতি যে আমি জ্ঞানটী আছে, উহার সহিত শরীর ও প্রকৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি বিরোধী। শরীর ও প্রকৃতির বিপরীত ভাবে আমিটী কার্য্য করে। ঘাত প্রতিঘাতেই যেন আমির বিকাশ ও অস্তিত্ব সূচিত হয়। হৃদয় পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র গুলিকে চালাইবার ক্ষমতা এই 'আমির' নাই। বাহিরের সহিত মিশিতে গেলে ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই আমির মিলন সংঘটিত হয় না। ক্রিয়াই এ আমির সর্ব্বস্ব, তাই বুঝি এই জাতীয় 'আমি' বা আমাদের ব্যক্ত জীব-ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিলেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" * * * কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন যে সম্মোহনী শক্তি প্রভৃতির প্রয়োগে এই আমিটী পড়িয়া যায়, এবং স্তরে স্তরে উচ্চ ও উচ্চতর প্রশান্ত ও প্রশান্ততর, অভিনব আমি জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে। স্থূল আমিটী পড়িয়া যাইবার পরে, যে 'আমি' জাগরিত হয় সে অনায়াসেই শরীরস্থ অনু ও

যন্ত্রনিচয়ের সহিত আপনাকে সম্মিলিত করিয়া তাহাদিগের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হয়। মনে কর শরীরে একটা দূষিত ক্ষত হইয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না; এমন কি তাহার কারণ পর্য্যন্ত নির্ণয়ে চিকিৎসকগণ অসমর্থ। কিন্তু ঐ উচ্চতর আমির বিকাশ হইলে, ইচ্ছামাত্র রোগ অপনোদিত হইয়া যায়; রোগের কারণ নির্ণয় করিবার জ্ঞান নির্ম্মলভাবে ফুটিয়া উঠে। কোন্ জন্মে কৃত, কোন্ পাপের ফলে, বা পূর্ব্ব পুরুষগণের শারীরিক কোন বিপর্য্যয়ের ফলে রোগের উদ্ভব হইয়াছে, এই 'আমি' তাহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেয়। শ্বাস হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রের ক্রিয়াও এই আমি ইচ্ছামত স্তম্ভিত বা বর্দ্ধিত করিতে পারে। অথচ জাগ্রত আমিটীকেও এই 'আমি' চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে। সে যেন স্থূল জাগ্রত আমির—তাহার শরীর ও অনুগুলির ঈশ্বর স্বরূপ। একদিকে সেই ব্যক্ত আমির প্রকাশিত হইবার প্রকৃতিটীকে ও অপরদিকে শরীর ও অণুসমূহের আধার স্বরূপ প্রকৃতিকে যুগপৎ নিয়মিত করিয়া, এই 'আমি' প্রকাশিত হয়। তারপর আরো উচ্চতর আমির বিকাশ হইলে, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি প্রাকৃতিক স্তর ও সে সকলে অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম আমিজ্ঞানটী নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। অতএব ইহা হইতে যে উচ্চতর আমিতে নিম্নতর আমি ও প্রকৃতি নিঃশেষ মিশিয়া যায় ইহাই প্রতিপাদিত হইল। একেবারে না মিশিলেও নিম্নতর আমি ও প্রকৃতির কল্যাণ বা উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বিপরীতভাবে হিন্দু যোগশাস্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিতে গেলেও এই একই তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়। যদি 'বড় আমির' ভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত ক্রিয়া করা যায়, তাহা হইলে ভিতরে বড় 'আমিটীই' ফুটিয়া উঠিবে। শরীরাদিতে এই 'বড় আমির' অংশ না থাকিলে. যোগক্রিয়ায় কোনও ফলই দর্শিত না। শরীরের পাশব ধর্ম্ম হিংসা; তাহার ফলে এক জীবের শরীর নাশে অপর জীবের শরীরের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই হিংসা ত্যাগ করিতে পারিলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেহই বৈরী থাকে না; সকলেই আমির অনুকূল হইয়া পড়ে। তা'র পর একদিকে ব্যক্ত 'আমি' ও অপর দিকে প্রাকৃতিক বিলাশ যখন সমাধিতে উচ্চতর ভাবে মিশান যায়, তখন উচ্চতর 'আমিতে' প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। সুতরাং বড় 'আমিটী' স্ব-শক্তি বলে ছোট্ট আমি ও প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হয়, ইহাই সমাধির প্রকৃত উপদেশ। অতএব বুঝা যাইতেছে যে কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য চৈতন্য-বিজ্ঞান শাস্ত্রের (psychology) উপদেশে আমাদিগের ভিতরেই বড় আমির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাশ্চাত্য চৈতন্য বিজ্ঞানের প্রমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে আমাদিগের ভিতর এক বড় আমি আছে, ঐ বড় আমিটীর সহিত আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধির আমিটী ও শরীর এবং তাহার যন্ত্রাদি এমন কি বাহ্য জগৎও নিগূঢ়ভাবে সম্বন্ধিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধ সকল নির্ণয় করিতে যাইয়া যে সকল তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। বড় আমির সহিত ছোট আমির সম্বন্ধ। ছোট আমির সকল কার্য্যই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের শৃঙ্খলার দ্বারা নিয়মিত। সে একেবারে সবটা দেখিতে পায় না, স্তবে স্তবে দেখিতে ও কার্য্য করিতে পারে। এই মুহূর্ত্তে বিলাতে কি হইতেছে জানিতে হইলে, তাহাকে বিলাত যাইতে হয়, ও 'গমন' নামক ক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞান ফুটিতে থাকে। পর্য্যায় বা শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে তাহার কোনও ভাবই প্রকাশিত হয় না। কিন্তু বড় আমিটিকে এই নিয়ম বাধা হইতে হয় না। ইচ্ছা মাত্রই তাহার পক্ষে ব্যবধান বা স্তরসমূহ অন্তর্হিত হয়; ও একেবারেই সে সবটা দেখিতে পারে। ছোট আমির জ্ঞানকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ raticionative বা মনের পর্য্যায়-বদ্ধ জ্ঞান নামে, ও বড় আমির জ্ঞান Intuition নামে অভিহিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহাই বুদ্ধির প্রথম বিকাশ। উহাতে দেশ, কাল প্রভৃতির ব্যবচ্ছেদ নাই। যাহা ছোট আমির অত্যন্ত অপ্রীতিকর তাহা হয় ত বড় আমির অতিশয় প্রিয় বা শ্রেয়। ছোট 'আমি' রোগে পড়িলে কাতর হইয়া পড়ে; বড় 'আমি' তাহার শেষ ফল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় বলিয়া, 'তাহাতে' আনন্দিত হয়।

তারপর পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, ছোট আমির কার্য্যের সমস্ত ফল বড় আমিতে মিশিয়া যায়। সে ছোট আমিটীকে তাহার অংশ বলিয়া ভাবিতে ও তদনুরূপে কার্য্য করিতে পারে। অর্থাৎ ছোট আমির পরিচ্ছিন্নতা ও ক্রিয়া-জনিত সঙ্কীর্ণতা বড় 'আমির' প্রশান্ততায় মধ্যে অবস্থিত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার উপর কোনও ক্রিয়া বা শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। বড় আমিটী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে ছোট আমিটী সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য, হারাইয়া ফেলে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ না হইলে, ছোট আমিটী বড় আমিকে তাহার শাস্তা ও নিয়ামক সুতরাং ভয়প্রদ বলিয়া মনে করে। সে বড় আমিটীকে তাহার বাহিরেই দেখে, যেন তদতীত অপর কোন ব্যক্তি বা পুরুষ। মনে কর 'বড় আমিটী' স্বপ্নাবস্থায় ছোট আমিকে মটরগাড়ী চড়া হইতে

ভাবী বিপদের কথা জানাইয়া দিল। এই জানান ব্যাপারটী একটী ঘন জ্ঞানের প্রকাশ; কিন্তু ছোট আমি উহা ঘন ভাবে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, সে ঐ জ্ঞানকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া, ঘটনার মধ্য দিয়া বুঝিতে প্রয়াস পায়, ও উর্ণনাভের ন্যায় আপনার ভিতর হইতে ঘটনাবলীর অবতারণ করিয়া, সে স্বপ্নে দেখিতে থাকে যে রাম নামক অপর ব্যক্তি যেন মটরগাড়ী চড়িয়া যাইতে যাইতে সহসা অপর গাড়ীর সহিত প্রতিহত হইল ও গাড়ী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মস্তক কাটিয়া গেল, সে যেন রামের এই ঘটনাটি দূর হইতে দেখিল। শারীরিক আঘাতের প্রতি তাহার বিরুদ্ধ বুদ্ধি থাকা প্রযুক্ত, সে আপনাতে বড় আমির ইঙ্গিত আরোপ করিতে পারে না বলিয়াই, সে উহা অপর ব্যক্তি, 'রামের' উপর আরোপ করিয়া দেখে। এক কথায় বড় আমির ক্ষেত্রে ও তাহার চক্ষে ছোট আমির সুখ-দুঃখাত্মক ঘটনাগুলি স্বপ্নবৎ ও খেলার মত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ছোট আমির চক্ষে, বড় আমির খেলাসমূহ বাহ্য বা জগদ্ভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহা হইতে ধীর পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা ছোট আমির পক্ষে বাহ্য বা জগদ্ভাব, বড় আমির পক্ষে তাহা স্বশক্তির প্রকাশ ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই যে যত ছোট, তাহার জগৎ তত বড়; আর যে যত বড়, তাহার জগৎ ততটা অন্তর্মুখী হইয়া ছোট হইয়া যায়।

তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে বড় আমিটী ফুটিলে শারীরিক যন্ত্র মাত্রই অনায়াসেই তাহার বশ হয়। তাহার ইচ্ছামাত্রই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তম্ভিত হইতে পারে, শরীরের ক্ষতাদি অনায়াসেই সুস্থ ভাব প্রাপ্ত হয়; এমন কি বাহ্যশক্তি-সমূহকেও কিয়ৎপরিমাণে চালনা করিতে পারা যায়। ছোট আমির পক্ষে যাহা বিরোধজনক জগদ্ভাব,—বড় আমির পক্ষে তাহাই শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ও একতারই বিকাশ। ছোট আমির পক্ষে যাহা ফলভোগ ও নূতন বলিয়া অনুভূত হয়,—বড় আমির পক্ষে উহা চিরপরিচিত ও পূর্ব্বানুভূত জ্ঞানেরই স্ফুরণ মাত্র, সে তাহাতে সুখদুঃখ বোধ করে না বা আশ্চর্য্যান্বিত হয় না।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে বড় আমিটী একটী বৃহৎ বস্তু প্রশান্ত, স্থির ও জ্ঞানঘন। ছোট আমি ও তাহার জগৎ থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে বড় আমির কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। এমন কি ছোট আমির মৃত্যু সময়ে, তাহার সাধের খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া দলিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতে, তাহার কষ্টবোধ হয় না। ছোট আমি ও তাহার জগৎ বড় আমির অন্তর্ভূত ও তদ্দ্বারাই

নিয়মিত। কিন্তু এই নিয়মন কার্য্যটী ছোট আমিটী যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই নিয়ম রূপে থাকে, কিন্তু উহা বড় আমিতে জ্ঞানরূপে মিশিয়া যায়, তখন শক্তিও থাকে না, আমিও থাকে না, আর তাহার জগৎও থাকে না। আমরা বুঝিতে পাইলাম বড় আমটী যাই আপনাকে ছোট করিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিল, অমনি শক্তির কিয়দংশ ছোট আমিটী, জগৎ রূপে, তাহার ভোগ্য বস্তুরূপে, ও ক্রিয়ার ক্ষেত্ররূপে যেন বাহির হইয়া গেল। আরও দেখিলাম যে বড় আমি শান্ত দ্রষ্টারূপে ছোট আমিকে দেখে। তাহারই শান্তি ছোট আমির ক্ষেত্রে সুখ শান্তি পাইবার প্রবৃত্তি; তাহারই মহিমা ছোট আমির ক্ষেত্রে জগতে বড় হইবার প্রবৃত্তি প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হয়। দেখলাম যে বড় আমির ইঙ্গিত ও সঙ্কেত গুলি ছোট আমির কাছে বিশেষ ব্যক্তি শক্তি প্রভৃতি বলিয়া উপলব্ধ হয়। আমরা বুঝিলাম যে সেই বড় প্রশান্ত স্বতঃসিদ্ধ আমিটী তাহার ক্রিয়া ক্ষেত্র ও প্রকৃত পক্ষে মিথ্যাভূত প্রতিচ্ছায়া মাত্র ছোট আমিকে নিয়ত প্রেমের চক্ষে অবলোকন করেন ও ভিতর হইতে প্রয়োজিত করিয়া আপনার অভিমুখে লইয়া যাইতে যত্নবান আছেন।

(ক্রমশঃ) যোগানন্দ ভারতী।

সহজ যোগ।

অনেক দিন যাবৎ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, যোগসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার অবসর পাই নাই। গত বৎসরে 'চিত্ত' সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে লেখা বন্ধ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য আপনাদিগের ও গ্রাহকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রথমে একটু গতানুশীলন করিলেই বোধ হয়, সকলেরই সুবিধা হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের ভিতরে দুইটী চৈতন্য-গত প্রবণতা আছে। একটী ভিতরের দিকে যাইয়া 'আমি' বা তদনুরূপ ভাব ফুটাইতে চেষ্টা করে; ইহাকে পুরুষ বলে, প্রত্যেক পুর বা চিত্তবৃত্তি সমূহের বৃত্তের অভ্যন্তরে, যে ভাবে প্রাকৃতিক খেলা গুলির অবসান হয় তাহাকেই 'আমি' বলে; এই আমিটিকে বিশেষ করিয়া দেখিবার ইচ্ছার নামই জ্ঞান-শক্তি। চৈতন্যের আর একটি প্রবণতা আছে তদ্দ্বারা পুরুষ বা আমিকে সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া দেখিতে ইচ্ছা

হয়, ইহাই প্রকৃতির মূল প্রবৃত্তি। 'প্রকৃতই যে সব' তাহা দেখানই তাঁহার খেলার অর্থ। 'সব' কথাটির অর্থ আবার 'আমি'র ভাবের অনুসারে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। 'পুরুষ যে ভাবে থাকে, 'সব' কথাটির অর্থও সেই ভাবেরই হয়। ইহা বুঝিলেই যোগ শাস্ত্রের অববোধ অনেকটা সহজ হইয়া আসে। যাহার 'আমি' জ্ঞানটী ছিন্ন, সে 'সর্ব্ব শব্দে কতকগুলি বাহ্য বস্তু ও শক্তি দেখে। 'আমি' জ্ঞানটী ক্ষণিক ও চঞ্চল হইলে, 'সর্ব্ব' জ্ঞানটীও ক্ষণিক ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির পরিচর্য্যায়, যাহারা জগতের মধ্যে নিয়ম বা শৃঙ্খলা দেখিতে পাইয়াছেন তাঁহাদের আমিটীও নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসে। হিন্দু শাস্ত্রে 'অপরা বিদ্যা' সমূহ এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রভেদ অনুধাবন করিলে, এই তথ্য অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পাশ্চাত্যগণের আমিটী অতিশয় বিশিষ্ট ও তাহাকে ভাবে আমি যদি তুমি হইতে পৃথকৃই না হইল, তাহা হইলে আর আমি কোথায়?' তাঁহাদের আমি জ্ঞানটী স্থূল ও ছিন্ন ভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এতাদৃশ অভ্যুদয় সত্ত্বেও তাঁহারা বিজ্ঞানের স্থূল ভাব ও স্থূলভাবে প্রয়োগের ইচ্ছা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তৃতীয় কথা এই যে তাঁহাদের আমি জ্ঞানটী সক্রিয়। যাঁহার আমি বাহ্য জগৎ ও জীবের উপর কোনও কার্য্য না করে, তাহাকে তাঁহারা মনুষ্য মধ্যে গণনা করেন না।

আমি জ্ঞানের এই তিন তথ্য কি প্রকারে 'সর্ব্ব'ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, দেখা যাউক। তাঁহাদের মতে রোগ সমূহ বিশিষ্ট বীজাণুর (Bacilli) কার্য্য। ঐগুলি এত বিশিষ্ট যে পরস্পরের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম ব্যাপারে লিপ্ত, ও একটী আর একটীকে কবলিত করিতে নিরন্তর প্রয়াস পায়। ঐ বীজাণুগুলি সক্রিয়, এবং সর্ব্বদা স্ব স্ব অনুরূপ বীজাণু উৎপাদন করত 'জার্ম্মন সম্রাটের যুয়োক অভিজানের মত' সমস্ত দেহটীকে আচ্ছন্ন করে, ও 'কৈসরে'র মত যেন তাহারা বলে "আমাদের ভোগের জন্যইত সব, স্বেচ্ছায় না দেওত, জোর করিয়া দখল করিব।" পরের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যেমন তাহাদের ধর্ম্ম, চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজাণুগুলিও তদ্রূপ স্ব স্ব প্রভাব বিস্তারের জন্য চেষ্টিত থাকে। শরীরের অভ্যন্তরে রোগ-বীজাণু যে তাহার রোগোৎপাদক প্রভাব বিস্তার না করিয়াও থাকিতে পারে, পাশ্চাত্য শারীর-তত্ত্ববিৎগণ তাহা মানিয়া উঠিতে পারেন না।

আয়ুর্ব্বেদের পথ অন্য ভাবে। শাস্ত্র প্রণেতাগণ ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিকে জানেন বলিয়াই, শরীরেও সেই ত্রিধাতুর সাম্যাবস্থা (Harmonions co-ordination) দেখিতে পারেন। তাঁহাদের বায়ু সত্ত্ব গুণের প্রতিচ্ছায়া। সত্ত্বগুণে জীব আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের বায়ুতেও চৈতন্যের উচ্চ, উচ্চতর বিকাশ হয়। বায়ুরোগের কারণ উচ্চতর দেবতা বা অন্য কোন চৈতন্যও হইতে পারে; বা পিশাচাদি নিম্নযোনি; বা চৈতন্যের প্রকাশ ক্ষেত্র (nervous system) হইতেও রোগোৎপন্ন হইতে পারে। যোগী তম ও রজোগুণকে পরিষ্কার করত এই উচ্চতর চৈতন্য সমূহ লইয়া খেলা করেন। তাহা রোগ নহে; কারণ তাহার ভিতরে তম ও রজোগুণাত্মক প্রকৃতিও উচ্চতর হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য রজ ও তমের মোহে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে, তাহার মধ্যে সহসা সত্ত্বের উৎকর্ষ হইলে, উহাই রোগে পরিণত হয়। বসন্ত রোগে বীজাণু স্বীকৃত হইলেও, তাহার অধিনেতৃ বীজাণু নহে, সত্ত্বগুণাত্মিকা শ্রীশীতলাদেবীরই খেলাই রোগের কারণ। সুতরাং তাঁহারা রোগের কারণ নির্ণয়ে ত্রিধাতু, চৈতন্য ও আধ্যাত্মিক বা জীব চৈতন্য গত পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যাদির পরিপুষ্টি, দৈব বা বিশ্বের চৈতন্য বা চৈতন্য সত্ত্বা বা দেবতা, পিতৃগণের সহিত বৈষম্য ও অবশেষে স্থূল ধাতু, বার্য্য, প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের বৈষম্যই রোগের কারণ বলিয়া অভিহিত করেন। মহামুনি চরকের মতে আধ্যাত্মিক কারণ অর্থাৎ জীবের অহং চৈতন্যের বিকাশ যদি ভগবৎ চৈতন্যের প্রতিকূলে খেলা হয় তাহাই "প্রজ্ঞাপরাধ"; দ্বিতীয় কারণটীকে তিনি "অসাত্মইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ" বলেন, ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ শব্দে মন ও বুদ্ধি হইতে নিম্নতর ইন্দ্রিয় নিচয়ের বিশ্বজনীন (cosmic) প্রয়োজন (function and purpose) বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা জীব বিশ্বের সহিত সংযোজিত; ইহারাই জীবের ভোগ ও অপবর্গের কারণ। তাহাদের কার্য্যও সর্ব্বাত্মিক—সমগ্র বিশ্বের জন্য—ক্ষুদ্র অহমের জন্য নহে। আর একভাবে 'ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ' শব্দে ইন্দ্রিয় এবং অর্থের সংযোগ হইতে পারে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিশেষ অর্থ উপাধি বা প্রাকৃতিক উপাদান আছে, ও তদনুরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবও আছে। জননেন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ভগবানের সৃষ্টিশক্তির অনুরূপ সৃষ্টিকরণ। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই রূপ সৃষ্ট হয়; তবে জননেন্দ্রিয় দ্বারাই জীব আপনার প্রতিরূপটী সৃষ্টি করিতে পারে। আত্মপ্রীতি ইহার উদ্দেশ্য নহে; জীব-প্রবাহ সংরক্ষণই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা না হইয়া, যদি

জীবের হৃদয়ে আত্মপ্রীতি বা কাম প্রবল হয় এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার তদনুমোদিত হয়, তাহা হইলে উহা দৈব ভাবের প্রতিকূল এবং তাহা হইতে রোগোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। 'সাত্ম' অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তি জীবের প্রকৃত অহং ভাবের অনুকূল প্রকাশভাব বুঝায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে যে পুনর্জ্জন্মের প্রাক্কালে, মহর্লোকে জীব তদীয় অহংএর কিয়দংশ প্রাকৃতিক বা সর্ব্বভাবে বিকীর্ণ করেন। ইহাই তাহার কর্ম্মাংশ (aspect of function)। এই অংশটি মেঘ, তৎপরে বৃষ্টি হইয়া পশু, পক্ষী, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ প্রভৃতি পদার্থে আসিয়া পড়ে। যে উদ্ভিদাদি পদার্থ জীবের আত্মাংশ দ্বারা পরিপুষ্ট, সেই গুলিই তাহার অনুকূল। একই রোগাধিকারে হয়ত দশ প্রকারের অনুপান ব্যবস্থিত আছে, কিন্তু কোনও ব্যক্তির জন্য কোন অনুপান ব্যবস্থা করিতে হইলে, কোন্‌গুলি তাহার অহংভাব দ্বারা পরিপুষ্ট তাহা জানিতে হইবে। ফলিত জ্যোতিষ বিদ্যার সাহায্যে ইহা নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। সেই নিমিত্তই পূর্ব্বতন ভিষকগণকে একটু যোগ, একটু জ্যোতিষ ও এমন কি সকল শাস্ত্রেরই কিছু কিছু জানিতে হইত, এবং সেইজন্যই তাঁহারা 'কবিরাজ' নামে অভিহিত হইতেন। রোগের আধিদৈব কারণ সমূহ জানিবার নিমিত্তই রোগীর স্বপ্নাদির বিচারের প্রয়োজন হইত। অধিভূত ভাবে একই কারণের নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, তাহার সহিত পশু পক্ষ্যাদির সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইত। সুতরাং 'বাঁধি গতের' চিকিৎসা তখন চলিত না।

সে যাহাই হউক, বুঝা গেল কেবল অহংজ্ঞানের অধিষ্ঠান ভূমির পার্থক্য বশতঃ কি প্রকারে আর্য্য ও পাশ্চাত্যগণের চিকিৎসার ভিত্তি পৃথক্ হইতেছে; বুঝা গেল কিরূপে প্রকৃতি বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবটী পুরুষের অনুরূপা হইয়া পড়েন। প্রথম পুরুষ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত; শুদ্ধ বোধই তাঁহার শক্তি, এবং সর্ব্বভাবেই এক জাতির বোধ উৎপন্ন হইলে ক্ষেত্রজ্ঞের সিদ্ধি হয়। তখন 'আমি'='আমি' এই জ্ঞানই সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠে। তাহা হইতে গেলে তাহার ইন্দ্রিয়টী এমন হওয়া আবশ্যক যে সর্ব্বভাবেই একরূপে কার্য্য করিতে পারে ইহাই চিত্ত, চৈতন্যের সর্ব্বপ্রবণশীলতা বা সর্ব্বভাবে স্পন্দনগ্রহণ শক্তি (the primitive receptivity of consciousness)। ইহাই চিত্তের ভাষা। ক্ষেত্রজ্ঞ আধ্যাত্মিক শক্তি, চিত্ত আধিদৈবিক শক্তি এবং মহত্তত্ত্ব ইহার আধিভূত বা আধার। এইরূপে 'সর্ব্ব'ভাব যে সেই শুদ্ধ 'আমি'তে সংযুক্ত, তাহা প্রদর্শিত হইল। সর্ব্বত্র সমরস বুদ্ধিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পরিপুষ্ট।

কিন্তু তাহা হইলেইত চলিবে না। ভগবান যে আপনাকে 'একোঽহং'

রূপে দেখিতে চাহেন এবং এই মৌলিক ইচ্ছাটি সকল জীবের ভিতরেও "আমি একমাত্র" এই বোধের সাহায্যে বিকশিত হইতে চাহে। আমিতেও সর্ব্বেতে মিলন না হইলে ত 'আমিই এক' এই জ্ঞানটি পরিপুষ্ট হইতে পারে না! 'আমি এক' ও 'আমি একই' এই দুই বোধেও একটু পার্থক্য আছে; একটি অবিশেষ প্রধান, অপরটি বিশেষ প্রধান। অবিশেষভাবে একত্ব সিদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু আত্মার বিশেষ ভাব সিদ্ধি না হইলে ত, আত্মার অদ্বিতীয়ত্বা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেই জন্যই চিত্তের "আমি এক" হইতে অহংকারের 'আমিই এক' ভাব ফুটিয়া উঠিল। ব্যক্ত আমি ও ব্যক্ত সর্ব্ব; ব্যক্ত অথচ বিচ্ছিন্ন নহে এরূপ 'সর্ব্ব'—আছে। সর্ব্বের প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়া যদি একই আমিজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলেই 'আমিই এক' এই জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই তত্ত্বটি অহঙ্কারের মূলভাব।

যোগশাস্ত্রের অহঙ্কার ও সাধারণ ভাষার অহঙ্কার এক বস্তু নহে। যে শক্তিদ্বারা বৃত্তি-সমূহের মধ্য দিয়া, একটি বিশিষ্ট 'অহং' ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহাই যোগের অহংকার। অহংকে প্রকাশ বা নির্দ্দেশ করে বলিয়াই উহা অহঙ্কার। এ শক্তির অস্তিত্বও অনেকের জ্ঞাত নাই বলিয়াই, ভক্ত কায়মনো-বাক্যে ভগবানের অনুচিন্তনাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিতে করিতে সহসা একদিন দেখিতে পান, যে তাহার আমিটী সূক্ষ্ম অথচ বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শক্তির বলে এক ব্যক্তিকে কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত কৃত্রিম তন্দ্রাভিভূত (Hypnotise) করিয়া রাখিতে রাখিতে, তাহার ভিতর আর একটী 'আমি' জ্ঞান জাগরিত হয়। মনে কর জনৈকা অশিক্ষিতা কৃষকরমণীকে এইরূপে তন্দ্রাভিভূত করিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্য তাহার স্থূল নামটিই বলিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া 'সে কি বা কে' তাহার কোনও ইঙ্গিত না দিয়া, তাহার ভিতরে সূক্ষ্ম ও সংস্কৃত ভাবের সঞ্চার করিতে থাক; তাহার ভিতরে দয়া, প্রেম প্রভৃতি ভাবের উন্মেষ করিতে চেষ্টা কর ও তাহাকে গভীর চিন্তা করিবার উপদেশ প্রদান কর। অবশ্য এরূপ করিতে হইলে বহু সময় ও প্রযত্নের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এরূপ করিতে করিতে, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে অমনি আপনাকে কোনও 'সূক্ষ্মতর আমি' রূপে নির্দ্দেশ করিবে; ও স্থূল কৃষকরমণীকে তাহার আত্ম তিরিক্ত বাহিরের কোনও রমণী বলিয়া দেখিতে থাকিবে। মায়ার্স (Myers) সাহেবের উক্ত লিওনী (Leone) ও লিওনারার (Leonara) ঘটনাগুলি এই জাতীয়। কৃষক-

রমণী মেরীকে (Mary) এইরূপে ১নং লিওনী, ২নং লিওনী, ৩নং লিওনী, তিনটি বিশেষ ব্যক্তি ভাবে দেখা গেল। জড়প্রকৃতি মেরী 'লিওনী ১নং' হইয়া রসিকা ও সুচতুরা হইয়া গেল; তাহার ঠাট্টার কাছে দাঁড়ায় কে? তাহার পর চিন্তাশক্তির সংস্কারে আপনাকে '২নং লিওনীতে' পরিবর্ত্তিত করিল। তখন সে চিন্তাশীলা, চঞ্চলও নহে, জড়ও নহে। দর্শন বিজ্ঞানাদির আলাপ করিলে, তাহা লইয়া ভাবিতে সে বিশেষ পটুত্ব প্রকাশ করে। তারপর ভগবদ্ভক্তি প্রবণতা দ্বারা, সে 'লিওনী ৩নং' হইয়া সাধক রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। লিওনী ৩,—লিউনী ২, ১, ও মেরীকে দেখিতে পায় ও তাহাদিগকে অন্য ব্যক্তি ভাবে। লিউনী ২,—৩নং কে দেখিতে পায় না; নং ১ ও মেরিকে দেখিতে পায়।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত রহস্যের কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল ইহাই দেখিয়াছেন যে আমাদের আমি জ্ঞানটী বিভিন্ন ভাবের-বশে থাকিলে বিচ্ছিন্ন-প্রায় ও টুকুরা হইয়া যায়। অহঙ্কার তত্ত্বের এই নিয়ম,—সচরাচর যে জাতীয়বৃত্তি অনুশীলন করা যায়, আমিটীও তদ্ভাবাপন্ন হইয়া উঠে। স্থূল ও বিশিষ্ট বস্তু লইয়া যাহার 'আমি' নিত্য ব্যাপৃত, তাহার আমিটিও স্থূল হইয়া যায়। কিন্তু বস্তু ত্যাগ করত দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ ও ভালবাসার অনুশীলনে যাহার চিত্ত নিত্য আকৃষ্ট সে অনায়াসেই স্থূল ভাবটী পরিত্যাগপূর্ব্বক আমির সূক্ষ্মভাব প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়। যে রমণী প্রীতির আশা পরিত্যাগ করত স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিতে সমর্থা—তিনি অনায়াসে স্থূল আমির ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করতঃ স্বামীর সহিত চিতারোহণে সমর্থা হয়েন। যিনি স্বামাকে ভগবদ্ জ্ঞানে অকামভাবে ভক্তি করিতে পারেন, তিনি তাঁহার আমিটীকে একেবারে কারণশরীরে উন্নীত করিয়া ফেলেন। এজন্যই, জীবের আমি-জ্ঞানটাকে উন্নত করিবার নিমিত্ত, সনাতন ধর্ম্মের সমস্ত বিধি ও নিষেধসমূহ প্রযুক্ত রহিয়াছে। স্থূলাভিমানী অহংজ্ঞানটিকে সূক্ষ্মাভিমুখী করিবার নিমিত্তই তপঃ, কৃচ্ছ্রাদি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। শীতকালে লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া থাক, অত্যন্ত সুখদায়ক; কিন্তু তদ্দ্বারা স্থূলাভিমানই প্রবর্দ্ধিত হয়। করুণাময় শাস্ত্রপ্রণেতাগণ সেইজন্য মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা করিলেন? গ্রীষ্মকালে জীব সহজেই তাপে ক্লিষ্ট হয়; কিন্তু তাহার ফলে যে অভিমান উদ্রিক্ত হয়, তাহার প্রশমনের জন্যই গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাশ্চত্য ভাবে অনুপ্রাণীত 'রাবীয়' নবীন হিন্দু, এই সমুদয় ব্যবস্থা বিসদৃশ বলিয়া মনে করেন; কোথায় ভোরের বেলা স্বর্গীয়

দ্বিজেন্দ্রলালের এক পেয়ালা চা, ও গ্রীষ্মে ইলেক্‌ট্রিক পাখা ও বরফ জল, না বাবা! একদম সব উল্টা।

আজ এই অবসরে পাশ্চাত্য ও সনাতন ভাবের বিভিন্ন গতিটীর অনুশীলন করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। বারান্তরে অহংকারের অনুশীলন ইচ্ছা রহিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার গতি—'স্থূল মানবকে স্থূলভাবে রাখিয়া তাহার ভোগসুখের বৃদ্ধি করা।' কি উপায়ে শীত গ্রীষ্মের শক্তি পরাভূত হয়,—কি উপায়ে স্থূল আমিটী একই ভাবে রাখিয়া প্রকৃতিকে এই ক্ষুদ্র স্বার্থে বিনিয়োগ করিতে পারা যায়, ইহাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। সনাতন ধর্ম্মের শিক্ষা অন্যরূপ। শাস্ত্র সুখভোগ নিষেধ করেন না; কিন্তু এমন করিয়া সুখভোগ করিতে হইবে, যাহাতে মানব-চিত্ত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর সুখের আস্বাদ পায়, তাহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। সুতরাং ক্রিয়া, বস্তু ও চিন্তা এই তিন ক্রমে, শাস্ত্র, অল্পে অল্পে সূক্ষ্মভাবসমূহের বিকাশ করিবার চেষ্টা করে। পিতা কেবল Governor নহেন—'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ।' স্ত্রী কেবল জীবনের সঙ্গিনী নহেন, তিনি সহধর্ম্মিণী। পুত্র কেবল কামক্রিয়ার স্থূল ফল নহে,—ভিতরের আমির যাহা আদর্শ, তাহারই প্রতিচ্ছায়া।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলঙ্কবেদান্ত।

বাজি।

এমন করে ভোলালে মা,
ভুলবে না, কে আছে এমন!
যা'দেখি তা সবই তুমি
　　তবু ভাবি তুমি কেমন।—

পুত্র রূপে শিখাও স্নেহ,
প্রেমরূপা নারী দেহ—
আমার কাছে কামের গেহ—
　　ছেলের খেলা ভেকের শমন।

আপনি তুমি হলে 'আমি,'
রইলে তুমি যেমন 'তুমি,'
আমির আবার 'আমার আমি'
　　মস্ত আমির হল জনম!

'আমার' পুত্র পরিবার
সুখ দুঃখ সবই 'আমার'
'তোমার' সঙ্গে সম্বন্ধ তার
কোন রকম নাইকো যেমন।

দেবা বলে ভোলা জানা,
য়া' খুসি তাই করগে' শ্যামা,
পাব যখন চরণ রাঙ্গা,
ভুলব তখন ভোলায় মতন॥

দেবা।

বিরহ।

নাম শুনিয়াই পাঠক মহাশয় চমকিয়া উঠিবেন না। আমরা নাটুকে বিরহের কথা বলিতে চাহি না। আপনাদের বিরহে আকাশের চাঁদ চাই, মলয় সমীর চাই, কোকিল-কূজন ভ্রমর গুঞ্জন চাই, অভিসারিকা ভাবের বেশ বিন্যাস চাই, সময়োপযোগী হাব ভাব চাই, আর মাঝে মাঝে 'হা প্রাণনাথ' বলিয়া,—আস্তে আস্তে—খুব সাবধানে—শুইয়া পড়া চাই। তার পর ঠুংরির মাত্রায়, নূপুর কিঙ্কিণীর সমতালে,—এক অধিকটা মিষ্টি গানও চাই।

সুধু নাটুকে বলিলাম কেন? আজ কাল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাভিনয়েও কতকটা এই জাতীয় বিরহই চলিয়া আসিতেছে। কলিকাতায় যেমন বিশুদ্ধ ঘৃত ও তৈল পাওয়া যায় না বলিয়া, আইনের ভয়ে এই পদার্থগুলিকে 'বাজার চলন' ঘৃত ও তৈল নামে অভিহিত করা হয়,—আমরাও তেমনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধুনিক বিরহকে 'বাজার চলন' বিরহ নামে অভিহিত করিতে পারি। পোয়াটাক্ দীর্ঘ নিশ্বাস, এক ছটাক অশ্রু ও কম্পন, ও বাকীটা সময়োপযোগী বিলাপ, এই কয়টী পদার্থকে উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিতে পারিলেই 'বাজার চলন' বিরহ তৈয়ার হইতে পারে। পরলোকগত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামীর নিকট শুনিয়া ছিলাম যে কতকগুলি কুৎসিৎ প্রক্রিয়া দ্বারা বাউলআদি সম্প্রদায়ে ইচ্ছামত স্বেদ কম্পনাদি "সাত্বিক চিহ্ন" উৎপাদন করিবার উপায় প্রচলিত আছে। ইহার উপর যদি একটু ফরসামত, লম্বাটে, একহারা চেহারা, ও বাবরী কাটা চুল থাকে,—তাহলেও এই যে কি বলে,' পাথরে পাঁচ্ কিল, খোরায় তিন লাথি।

আসল বিরহটা কিন্তু একদম্ ও জাতীয় পদার্থ বলিয়াই মনে হয় না। তাহাতে আর বাহিরের বস্তুর বিকাস থাকে না। তখন জীব 'বি' অর্থাৎ সেই পরম বিশেষ ভগবৎ পদার্থে, 'রহ্' অর্থাৎ একা থাকিয়া যায়; আর কিছুই থাকে না। বাহিরের ভাষায় যাহাকে সন্ন্যাস বলে, ভিতরের ভাষায় তাহাই বিরহরূপে পরিণত হয়। তবে প্রভেদ এই যে সন্ন্যাসে বাহিরের বিশেষ ভাবটীর ত্যাগ হয়, আর বিরহে ভিতরের প্রকৃত বিশেষ ভাবটী ফুটিয়া উঠে। ভগবৎ প্রেমের প্রথম বিকাশে সর্ব্বের রূপান্তর হয়। তখন ভগবান সর্ব্বের ভিতর দিয়া জীবকে আকর্ষণ করেন। তাই—

আঁখি পালটীতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম।

* * * * *

হিয়ার হিয়ায়　　লাগিবে বলিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া　　বায়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তখন— মো যদি সিনানে　　আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়
মোর অঙ্গের জল　　পরশ লাগিয়া
বাহু পাশরিয়া রয়॥

তখন বিশ্বের প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়া কে যেন কি এক অপরিজ্ঞাত ভাষায় শ্রীভগবানের হৃদয়ের আকুল পিয়াসার, অচ্ছেদ্য আকর্ষণের পরিচয় দেয়। ভগবান যেন—

মনের আকুতি ব্যাকতি করিতে কত না সন্ধান জানে।

কালের প্রবল প্রতাপে পরিপূর্ণ ভগবানের এই পবল পিপাসার অভিব্যক্তি দেখিয়া আধুনিক ভক্ত আর মানুষ স্বরূপ দেখিতে পান ন। তাহারা "আমার জন্য ভগবান এরূপ করেন" এই অহঙ্কার-বুদ্ধিতে নিমজ্জিত হইয়া যান। কৈ, আমিকে ত ভুলিতে পারেন না; আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির কুটিল কুহেলিকাজাল অতিক্রম করিতে পারেন না'ত?

এইরূপে সর্ব্বের ভিতর দিয়া ভগবানের আকর্ষণ প্রকটিত হইলে জীব বুঝিতে পারে যে আমি কত ছোট ও নীরস, আর তিনি কত বড় ও রসময়!

জলে, স্থলে, রমণীর কামকটাক্ষে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সুষমার মধ্য দিয়া কি এক রসসমুদ্রের তরঙ্গ নিচয় মরমের কূলে আসিয়া প্রতিহত হয়। যখন সেই রসসাগরে অভিস্নাত হইয়া বাহ্য পিয়াসা মিটিয়া যাইতে থাকে জীব তখন পুলক-কম্পিত কলেবরে দেখিতে পায়—

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল,
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল ॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল,
চন্দন চাঁদ চিত বহি গেল ॥

তখন— কি কহব সে সময় সোহাগ
নিবীড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ,
লুব্ধ মনোভাব নহ পরিচ্ছেদ

সোহাগা যেমন কাঞ্চনকে অগ্নির সহিত সম-ভাবাপন্ন করিয়া দেয়, তেমন সেই সর্ব্বাত্মিকা প্রেমের রসে হিরণ্ময় কোষস্থ অহংজ্ঞানটী দ্রব হইয়া যায়; আর সাধের আমিটীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় না। কুল, গোত্র, বংশ বা বেদান্তের জাতিজ্ঞান, শীল বা সাধনার সম্পত্তি জ্ঞান ও অভিমানটি সেই সর্ব্বাত্মক আকর্ষণের ফলে পড়িয়া যায়। সে নিবিড় আলিঙ্গনে সেই ওতঃপ্রোত আত্মার নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণে, 'স্ব'টি ইদং হইয়া বা 'স্বেদ' হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে, এবং জীব তাহার আমিটীকে "স্বস্থ আত্মনঃ ইদং" 'আত্মারই কিছু একটা' বলিয়া চিনিতে পারে। আর সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন সঙ্কল্প শক্তিটীকে ভগবানের (সং+ক্লিপ্) সর্ব্বাত্মিকা ভাবের মধ্যে হারাইয়া ফেলে, ও (বি+ক্লিপ্) বিকল্পটী সেই পরম বিশেষের অনুভবে মিশিয়া যায়, আর ছেদ থাকে না, আবরণ থাকে না।

এটাত বিরহ নয়, এ যে সেই রসময়ের রসের উদ্গার। শাস্ত্র ইহাকে "সর্ব্বভার পরিত্যাগ সমাধিরিতিকচ্যতে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবান এইভাবে না খেলিলে, জীবের বাহ্য মোহ কি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইতে পারে? জীব তাঁহাকে কেমন করিয়াইবা সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস বলিয়া চিনিতে পারে? কি করিয়াই বা জীবের জন্মজন্মান্তর-পুষ্ট বিশিষ্ট অহং জ্ঞানটী প্রসুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং কি করিয়াই বা সে সেই অহংজ্ঞানের উপরেও যে কিছু আছে তাহা চিনিতে পাইবে? তাই, যখন ভগবান জীবকে এইরূপে আলিঙ্গন করেন,

শ্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল,
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।—

তখন জীবের আমি জ্ঞানটী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও—

এত কহি সুন্দরী   দীর্ঘ নিশাসই
মূরছি হরল গেয়ান।

তখন সে সর্ব্বাত্মক ভগবানের পরশনে, কর্ম্মজন্য প্রাকৃতিক ছোট 'আমি জ্ঞানটী' মূর্চ্ছিত হইবার কথাই ত বটে। কূলের দ্বারা আবদ্ধ বলিয়াই ত তটিনী তটিনী। কূল ত্যাগ করিয়া যখন সমুদ্রে মিশে তখনই ত (উপনিষদের ভাষায়) 'নাম রূপ' পড়িয়া যায়। তখন সে ('আ' বা নিঃশেষিত কূল) আকুল; আর ঠাকুরটি ত (নামরূপের অতীত বলিয়া) ঘোর 'কাল' বা শ্যাম, তা হইলেও তিনি 'পর' (transcendent) 'বোধ' স্বরূপ। তাই প্রেমিক গোবিন্দ দাস, জাব ভাবটী মূর্চ্ছিত হইবার কারণ নির্ণয়ে বলিলেন—

আকুল রাই   শ্যাম পরবোধই
গোবিন্দ দাস পরমান॥

প্রেমের ও জ্ঞানের প্রথম বিকাশে, ভগবান সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া জীবের নিকট উপস্থিত হন। জীব সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখে। তাহার প্রাণের ভিতর যে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহারই সাহায্যে বাহিরে আসিয়া সর্ব্বভাবের অভ্যন্তরে সেই স্ফূর্ত্তির অনুরূপ খেলা দেখিতে পাইয়া তৃপ্ত হয়। ইহাই নবীন সাধকেরা সাধনার চরম ফল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন না যে এ দর্শনে ত তৃপ্তি নাই; এ দর্শন ইন্দ্রিয়মন প্রভৃতির খেলার সাপেক্ষ; কাজেই উহা পরোক্ষ, অপরোক্ষ নহে। উহার কার্য্য ও উদ্দেশ্য তৃপ্তি নহে, লালসার বৃদ্ধি। আমির সবটা তাঁহার আমির সহিত মিশিতে পারে না।

প্রণয়ী যুগলের আলিঙ্গনে বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যে রূপ প্রতিবন্ধক বলিয়া অনুমিত হয়, তদ্রূপ ভগবানের স্ফূর্ত্তিটীও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি করণের দ্বারা কতকটা প্রতিহত হয়। মিলনের অমৃতরসের কতক অংশ করণ সমূহে খাইয়া ফেলে— না খাইবেই বা কেন? তাহারাওত সেই রসের প্রয়াসী, সেই রসে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণীত! ইহাই প্রেমের সর্ব্বাত্মিকা অবস্থা বা স্তর। ইন্দ্রিয় কাম, মন বুদ্ধি প্রভৃতি এইরূপে ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরিশুদ্ধ হইয়া আসে; ও ছোট আমির সংস্পর্শ এবং তাহার উপাধি হইয়া যে দোষসমূহ সংক্রামিত হয়। তাহা অল্পে অল্পে বিদূরিত হইয়া যায়। আমাদের আমির অভিব্যক্তির জন্যই করণ সমূহকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছি; ও তাহার ফলে সেইগুলি ছোট

আমিটীকে দেখাইবার জন্যই প্রবৃত্ত থাকে ; ইহাকেই কাম বলে—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।

ব্যক্তভাবে ভগবানের সহিত মিলনের দ্বারা এই কাম পরিতৃপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সেই জন্যই "প্রতি অঙ্গ লাগি ঝুঁরে প্রতি অঙ্গ মোর।"

কিন্তু তৃপ্তি হয় না কেন? রসোদ্গারান্তে সাধক কেন বলেন—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ (হাম) হিয়ে হিয়ে রাখনু
হৃদয় জুড়ল নাহি গেল।

সেই রূপকেই সর্ব্বরূপে দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হয় না কেন? তাঁহারই আকর্ষণে, তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি ও আধার স্বরূপ জীবকে বুকে বুকে করিয়াও তৃষ্ণা মিটে না কেন? কেন জ্ঞানের পথে সন্ন্যাসরূপে সেই ব্যক্ত ভাবগুলিকে ত্যাগ করিতে হয়? কেন প্রেমের পথে, তাঁহার জন্য সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জন্য কুলটা হইতে হয়।

কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহুঁ না দেখি।
কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিকে একি॥

আমাদের বিদগ্ধ প্রাণ সর্ব্বদা রসের জন্য এত আকুল থাকিলেও রস পাইয়া তাহার অনুভব করিতে পারে না কেন? যাহার রস সে ত ভিতরে আসিয়া স্বরূপে দেখা দেন না। রসের মোহও মোহ। তাই বৈষ্ণব, তুমি ত ভগবানকে চাহ না, তাঁহার রস উপভোগ করিতে চাও। যাহা চাও তাহাই পাও। তাঁহার ব্যক্তভাবের লীলায় মসগুল হইয়া থাক, কিন্তু তোমার অহঙ্কারটীও ছাড়না! ভগবানের স্বরূপানুভূতি বা অপরোক্ষানুভূতি ত হয় না!! তাই লালসার বৃদ্ধি হয়। এক ভাবে তাহার রস ভোগ করিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহাকে ভোগ করিতে চাই। এ ভাবের আবশ্যকতা আছে ; এ লালসা না জাগিলে ত সর্ব্বভাবে এক রস দেখিতে পাইবে না। জগৎ ভাব, বস্তু ভাব ত পড়িবে না। জগৎভাব পড়িতে পারে, আমির'ত তৃপ্তি হইবে না! তাই ভগবান বলিলেন—

রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

তাই ভাগবৎ বলিলেন—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি·· ······দৃষ্টেবাত্মনিশ্চয়ে। সেই পরপুরুষকে আমির ভিতরে না দেখিলে ত রসের তৃষ্ণা মিটে না।

সেই জন্য প্রেমের পথে বিরহের আবশ্যকতা আছে। বিরহ, বিচ্ছেদ, সন্ন্যাস, ত্যাগ, একই ভাবের ব্যঞ্জক। ব্যক্ত মূর্তির ভিতর প্রিয়জনরূপে অভিব্যক্ত ভগবান্ যখন নিজ মূর্তি অন্তর্হিত করেন, তখন লালসালোলুপ-চিত্ত ব্যকুভাবে তাঁহাকে না পাইয়া প্রথমে কাঁদিয়া ফেলে। তার পর দায়ে পড়িয়া অন্তর্মুখী হইতে শিখে। তাই পুত্রশোকে কাতরা জননী পুত্রকে বাহ্যভাবে দেখিতে না পাইয়া, প্রাণের দায়ে মানসপটে তাঁহাকে দেখিতে আরম্ভ করেন। বাহ্য গোলমালের ভিতর অন্তঃকরণের নিভৃত-নিকুঞ্জকুটীরে প্রিয়তমের প্রতিরূপ স্থাপিত হয়। যোগী জ্ঞানপূর্ব্বক স্থূলশরীর প্রভৃতিকে অনিত্য জানিয়া, 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' প্রভৃতি ভগবদ্বাক্যের উপলব্ধির নিমিত্ত যোগের কৌশলে দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি একে একে পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়েন, তেমনই প্রেমিক অথচ ব্যক্ত ভাবের লালসায় নিমজ্জিত জনকে বিরহের সাহায্যে অল্পে অল্পে ভিতরে লইয়া যান। ধ্যানে যোগী যে সদৃশ প্রবাহতা অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তিসমূহের অভ্যন্তরে এক স্রোতের ভাব চিনিতে শিক্ষা করেন, বিরহে ও বিচ্ছেদ সেইরূপ সদৃশ প্রবাহতা আনয়ন করে। সকল বস্তুই তখন প্রেমময়ের কথা—তাঁহার সহিত মিলনের কথাটি বলিয়া দেয়। পরম বিশেষকে ধরিতে চাহিয়া ও স্থূলভাবে তাঁহাকে না পাইয়া কাজেই ভিতরে ঢুকিতে হয়। তাই বিদ্যাপতি বিরহের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য বলিলেন—

অনুখন মাধব　　　　মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।

প্রতিক্ষণ তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে কালের পরিচ্ছিন্ন ভূত ও ভবিষ্যত ভাব পড়িয়া যাইয়া তাহার ভগবানের নিত্য সত্য বর্ত্তমানরূপ জাগিতে আরম্ভ করে। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন, প্রভৃতি পরিত্যাগ করত তখন স্মৃতিরূপে খেলিতে আরম্ভ করেন।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। পা ১।১১। সমাধিপাদ যোগীর অন্তর ও বাহ্যজ্ঞান আছে, তিনি ভেদবুদ্ধিতে বর্ত্তমান না থাকিলে ক্রিয়া করিবেন কেন? তাই তিনি পাতঞ্জল সূত্রের অর্থ এই করেন যে "যে অবস্থায় অনুভূত বিষয়সমূহ আমাদের চৈতন্যের ক্ষেত্রে একেবারে না মিশিয়া গিয়া আমাদের আমির কাছে

কাছে গ্রাহ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে তাঁহার নাম স্মৃতি।" কল্যকার ল্যাংড়া আমটী একেবারে হজম হইয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি তাহার রসের কথা মনে পড়িলে আবার প্রাণটা কেমন কেমন করে। কিন্তু আমি বলি ইহাও ত বাহিরের কথা। আরে! ভিতরের অর্থ কি করা যায় না। যে পরম "বিশেষ" পদার্থে আর সকল বিষয়ের অবসান হয় তাহাকেই ত বিষয় বলে, আমাদিগের চিত্তের ভিতরে যে বিশেষ পদার্থ আছে তাহার কতকটা সৌসাদৃশ্য পুত্রাদিতে আছে বলিয়াই ত আমরা পুত্রের চাঁদমুখ দেখিয়া জাগতিক বহু ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে পারি, সেই জন্য পুত্রও কতকটা বিষয় বটে, কিন্তু পুত্রে ত সর্ব্বভাব শেষ করিতে পারি না, পুত্রে ত স্ত্রী মাতা গুরু প্রভৃতি ভাবের অবসান হয় না? পুত্রকে দেখিয়া অর্জ্জুন ত বলিতে পারেন না—

* * * * * *

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

গীতা।১১।৪৪।

কাজেই বিষয় সেই পর "বি-শেষ" ভগবানকেই বুঝিতে হইবে, কারণ তাহাতেই সর্ব্বভাবের অবসান বা পরিত্যাগ হয়। তাঁহাকে পাইলেই আর চাওয়া পাওয়া, খাটা খাটুনী প্রভৃতি কিছুই থাকে না। যদি বল ভাই কি করে তাঁহাকে পাইব। তাই পাতঞ্জল বলিলেন তিনি "অনুভূত" তিনি তোমার "আমি" জ্ঞানটীর ভিতরেও পূর্ব্ব হইতেই অনুরূপে বর্ত্তমান আছেন। তাই শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "বাপু একটু উল্টা করিয়াও বুঝিয়া দেখ তোমার আমিটাও তাঁর (অনুর রূপ বা) অনুরূপ। অতএব কোথায় বাহিরে তাঁহাকে খুঁজিব, আমির ভিতরেই তাঁহাকে দেখ, সেই আমিরই মত আমির আমিটি যখন আর বাহ্য ঘাতপ্রতিঘাতে আপনার স্বরূপ ভাবটী চুরি করিয়া ফেলেন না, যখন তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া পুত্রমূর্ত্তির আবরণে তাঁহাকে হারাইয়া মেয়েলী কথায় "সোণা ফেলে আঁচলে গিরা দিয়া" বসি না তখনই ত স্মৃতি বা স্মরণ।

তারপর আর এক কথা; স্মৃতি ও বুদ্ধি কতকটা এক জাতীয়। প্রভেদ এই—স্মৃতি গ্রাহ্যাকার প্রধান ও ভাবিতস্মর্ত্তব্য, বুদ্ধি গ্রহণাকার প্রধান ও অভাবিতস্মর্ত্তব্য। স্মৃতিতে আমাদের চৈতন্য গ্রাহ্য ভাবটীকে প্রধান করিয়া দেখায় ও ভাবিত বস্তুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বুদ্ধিতে গ্রাহ্য ভাবটা অপ্রধান হইয়া বোধিশক্তি গ্রহণ ভাবটি প্রধান হয়। বুদ্ধির বিষয় ভাবিত বা পূর্ব্ব হইতে

অনুভূত না হইলেও চলে। কারণ বুদ্ধি বস্তুকে দেখে না, গ্রাহ্য যাহাই হউক না কেন তাহাতেই চৈতন্যের বৃত্তিগুলিকে অবসান করিয়া শেষভাবটী দেখাইয়া দেয়। এক কথায় স্মৃতিতে বিশেষ ও বুদ্ধিতে শেষ ভাবের খেলা হয়। স্মৃতিতে অনুভূত ও বুদ্ধিতে অনুভবের পরভাব ফুটিয়া উঠে। সেই জন্যই প্রেমমার্গে স্মৃতির প্রাধান্য ও জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির প্রাধান্য। যদি তোমার আমির ভিতরে অনুভূত ভগবানকে ধরিতে চাও, তাহা হইলে স্মৃতির অনুসরণই প্রকৃষ্ট পন্থা। যদি তাঁহাকে আমিরও পর ও অতিগ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে বুদ্ধির শরণ গ্রহণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। ভগবান্ পক্ষে ফলে বোধ হয় কোনও পার্থক্য হয় না। সেই জন্য জারবুদ্ধিতে উপগতা গোপিকাগণও ভগবানের নিজ স্বরূপগত বিশেষত্বের প্রভাবে স্মৃতির সাহায্যে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিল। তাঁহাদের বুদ্ধির মলিনতা তদীয় স্বপ্রকাশ সত্তার তেজে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, ইত্থম্ভূতগুণঃ হরেঃ।

সে যাহাই হউক না কেন, অনুক্ষণ স্মরণের ফলে কি হইল বুঝা যাউক। আমাদের বিশেষ আমি জ্ঞানটীর আধার কোথায়? ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে স্মৃতির সাহায্যেই ঐ বিশেষ জ্ঞানটী জাগ্রত থাকে। আমি অমুক, অমুকের পুত্র ইত্যাদি নানা প্রকার স্মৃতিসমূহের বৃত্তের অন্তরালে আমিটীকে কেন্দ্ররূপে দেখা যায় সে জন্য বৃত্তটী যতক্ষণ অপসারিত না হয় ততক্ষণ কোনও সাধক ছোট আমি জ্ঞানটী ত্যাগ করিতে পারেন না। এমন কি স্মরণেই আমাদের জীবন ও বিস্মরণেই মৃত্যু। যখন আমাদের বাহিরের ক্ষুদ্র ভাবগুলিকে স্মরণ করিতে পারে না তখনই আমি জ্ঞানটী দেহাবচ্ছিন্ন ভাব অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। সেই জন্যই বিরহরূপ সাধনার চরম স্তরে আমির পরিবর্ত্তে "অনুক্ষণ ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী ভেলী মাধাই।" আর কি চাহ! আমিটি যদি তাই হইয়া যায় তবে আর বাকী কি রহিল? তবে এই স্মৃতিতে ভগবান্ গ্রাহ্যরূপে প্রধান ভাবে থাকা চাই। বাহ্য বিষয়ের রূপ, গুণ, শক্তি প্রধান ভাবে থাকিলে হইবে না, তাহার ভিতর যদি ভগবানই প্রধান ভাবে থাকেন তবেই এই স্মৃতির সম্ভব। সেই জন্য বিরহের ভিতর দুইটী স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে বাহ্য বস্তুগুলিই পরোক্ষভাবে ভগবানের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, এখন মেঘ দর্শনে, কালিন্দীর কাল সলিল সন্দর্শনে তমালতালী বনরাজী নীলার পর্য্যবেক্ষণে এক সদৃশ প্রবাহের উদ্‌গম হয়, প্রেমিক পরবশ হইয়া পরম আকর্ষণের বশে—ধ্যান-দুর্লভ সদৃশ প্রবাহে সিদ্ধ হইয়া যান। এই জন্যই

ভগবান্ "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভেদ ভাব, অন্য দেবতা, সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রতি বিদ্বেষ থাকিলে প্রবাহ বিসদৃশ হইয়া যায়। সর্ব্বজীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান দেখিতে না দেখিতে সংসারের স্রোতে, জীব-প্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে সদৃশ প্রবাহতা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের ভক্তিসাধনে এই সমুদয়ের এত আবশ্যকতা। বৈষ্ণবমহাজনগণ ধ্যানের কথা না বলিয়াও সাধককে ধ্যান পথে আনিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। এই ভাবে পুষ্ট হইলে জীব সংসারে থাকিয়াও সেই পরম বিশেষ বিগ্রহের সহিত সততই একান্তে বিহার করেন। প্রকৃত বিরহের ভাষা আরও কঠিন। যখন আমিভাব স্ফুরিত হইলেই তাঁহার অভাব জাগরিত হয়, যখন শান্ত সমাধিপরিশুদ্ধ আমিটীতেও আর নির্ভর করিতে পারা যায় না, যখন আমিটীও চৈতন্যের প্রকাশের শেষ কথা বলিয়া বোধ হয় না তখন এক অভিনব সংস্কার-মাত্রদ্বারাপরিপুষ্ট স্মৃতির খেলা জাগিয়া উঠে। ইহাই গোবিন্দদাসের পরবোধের প্রকাশ। বস্তু নাই, জগৎ নাই, আছে কেবল এক প্রশান্ত সমুদ্র প্রায় আমি। এই আমির ক্ষেত্রে স্বজাতীয় সংস্কার তরঙ্গরাজির খেলার মধ্যে কিসের অভাব ফুটিয়া উঠে, এই নিগ্রহ অহঙ্কার শূন্য আমিটী লইয়াও আর থাকা যায় না।

হইবার ত কথাই বটে। অহংও যে ব্যক্তভাব। তাহার পশ্চাতে তাহার স্বরূপভূত, সজাতীয় ও এমন কি স্বগতভেদশূন্য আর একটী পর, ব্যক্তের অতীগ ভাব আছে, সেই ভাবটীকেই বেদান্তে স' এবং ভাগবতে ভগবান্ বলেন। 'স' ও অহং দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে ও সোঽহং শব্দে আচার্য্য দুইটী বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণের কথা বলেন নাই। অহংএর যে স্বরূপভূত পরাভাব তাহাই 'সোঽহং' শব্দে ইঙ্গিত করা হয়। 'স'এর স্বরূপ গত ব্যক্ত বা অহংভাবের প্রবণতাকে 'হংসঃ' বা 'অহংসঃ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। একটী বস্তু, ঘন এক রস তাহার দুইটী প্রবণতা আছে। কখনও সে অব্যক্তস্বরূপ 'স'কে প্রধান করিয়া আপনাকে দেখে, আর কখনও ব্যক্তস্বরূপ 'অহং'কে প্রধান করিয়া দেখে, ঐ ব্যক্ত প্রধান ভাবটী ভগবানের সিসৃক্ষা ভাব, উহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন বলিয়া ব্রহ্মা হংসবাহন। আমাদিগের জীবনের নিম্ন স্তরেও এই দুই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণ ভক্ত ভক্ত হইলেও অহং প্রধান; প্রকৃত ভক্ত জ্ঞানী বলিয়া অহংটী তাঁহার ছায়ার ন্যায় দেখেন ও সেই জন্যই তাহার— নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে। তাই প্রকৃত ভক্তিতে 'আপনার নাম সখি নাহি পড়ে মনে।' অহংএর এই পরাভাব বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণবশাস্ত্রে জীবকে

ভগবানের সম্বিদাংশ প্রধান প্রতিবিম্ব বলিয়া বর্ণিত করা হয়; এই জন্যই প্রকৃত অহংভাবে সিদ্ধ নিরহঙ্কার ঋষিগণও সেই পর ভগবানে নিত্য অনুরক্ত থাকেন—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকী ভক্তি ইত্থম্ভূতগুণাঃ হরেঃ॥

ইহাই প্রকৃত বিরহের স্ফুরণ। যাহার হৃদয়ে এই অহংএর ভিতরে 'স'এর একবার উদ্বোধিত হইয়াছে, যে এই আড-নয়নের ইঙ্গিতে ডুবিয়াছে, সে আর অহংভাবের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াও স্থির থাকিতে পারে না। সাধারণ ভাবে আমরাও পারি না। যদি অহংজ্ঞানটিই সব হইত তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান ক্ষুদ্র অহং লইয়াই তুষ্ট থাকিতাম, তাহা হইলে অহংক বিশেষ ভাবে দেখিবার পিপাসা হইত না। মায়ার জটিল ও কুটিল ভাবপ্রসূত অহংকে দেহাবচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবার শক্তিটী লইয়াই আমরা তৃপ্ত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু এই দেহাত্মবুদ্ধি আপাততঃ আমাদিগের স্বামীর ন্যায় অনুমিত হইলেও আমাদিগকে ত ভোগ করিতে পারে না, সুখবোধের মুহূর্ত্তে দুঃখের খেলায় স্মৃতিতে নিদ্রারও মৃত্যুতে দেহাত্মক ছোট আমিটী পড়িয়া যায়। সেইজন্যই বুঝি বৈষ্ণব শাস্ত্রের শুদ্ধজীব রাধার বিবাহিত স্বামী আয়ান হইলেও রাধা আয়ানের ভোগ্যা হয়েন নাই। এই যে অহংকে বিশেষই বল বা নির্ব্বিশেষই বল কি একরকম করিয়া দেখিবার ইচ্ছা, যাহাকে তোমরা অহংকারতত্ত্ব বল এইটীইত নিত্য বলিয়া দেয় যে শুধু ব্যক্ত ও পরিচ্ছিন্ন অহংটীতে শান্তি পাইবে না। উহার পশ্চাতে কি এক ঘনানন্দ স্বরূপ আমির মত পদার্থ আছে। রাধার সৌন্দর্য্যরাশিকে যোগশাস্ত্রে দৈবী সম্পদ বলে, তাঁহার যৌবন পরিশুদ্ধ অহংতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ, সমগ্র জগৎ তাঁহার ক্ষেত্র বলিয়া তিনি রাজকন্যা, কিন্তু ঐ দেখ তিনিও আর আমিতে থাকিতে পারিতেছেন না। তোমরা যে স্থির আমি লইয়া আমির কথা বল, তাহাতেও তিনি অসন্তুষ্টা, যেন কিসের অভাব, যেন কোথায় সে আমির পরিপূর্ণতার একটুকু অঙ্গহানি হইতেছে, তাই বিরহ-বাসরেও তিনি বলিয়া উঠেন—

মেরে গেছ আড় নয়ন
জান নাকি প্রাণধন
তখনি মজেছে মন হৃদয়ে মুরতি আঁকা।

কে গো তুমি, আমার এই সাধের সমাধিপুষ্ট স্থির আমি-জ্ঞানের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া আমাকে এক পরভাবের ইঙ্গিত করিয়া গেলে। প্রশান্ত সমুদ্র

প্রায় আমিটী উদ্বেলিত হইয়া তাহার কূল অতিক্রম করিল, কূলের কুকুরের কর্কশ নাদে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িতেছি, তাহারা যে কেবলই 'অহমিতি অহমিতি' বলিয়া কলরব করিতেছে! কে গো তুমি, প্রাণ তোমার সেই নেতির ইঙ্গিতে আর প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভের খেলায় তৃপ্ত নহে, অথচ সেই প্রাণের ভিতর দিয়া তোমারও কি টানের স্রোত বহিয়া যাইতেছে? এই স্রোতে পড়িয়া স্ব, মহ, জনলোকে কতই তোমায় খুঁজিলাম—আর কত দিন এই স্রোতে ভাসিতে থাকিব? গতি যে আর ভাল লাগিতেছে না। আমির এত সৌন্দর্য্য, এত ভরা যৌবনের লালিত্যও যেন অপরিপূর্ণ বোধ হইতেছে! এবার এস সখা, এই আমিটাকে যা করিবার তাহা কর, আর তোমাকে ফেলিয়া একাকী আমি লইয়াও থাকিতে পারিতেছি না।

শূন্য প্রাণে আশা স্রোত
আশার খেলায় রব কত
আঁখি ঝরে অবিরত যৌবন যায় না রাখা।

ইহাই বিরহ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সন্ধ্যাতত্ত্ব।

(শান্তারাম স্বামীর কথা)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

আমি। জগতীচ্ছন্দের কথা কতকটা বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হয়। সর্ব্ব পদার্থই যে গতিশীল, কিছুই যে স্থির নহে, ব্যক্ত মাত্রেই যে অব্যক্তের অভিমুখপ্রয়াসী, ইহা বুঝিয়া যিনি স্থূল প্রাণের গতিকে সেই তানে মিশাইয়া কার্য্য করিতে পারেন তিনিই এই ছন্দের সাধক হইয়াছেন। কিন্তু সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারি না।

স্বামী। মনে কর, আজ তোমার একটা বিশেষ সুখকর ঘটনা হইয়াছে সাধারণ জীবের ধর্ম্ম এই যে, সুখ আসিলেই তাহাতে ডুবিয়া যায়। কিন্তু জগতীছন্দের সাধক জানেন যে সুখটীও পরক্ষণেই কি একটী অব্যক্ত তত্ত্বে লীন হইয়া যাইবে, তাই তিনি সুখে থাকিয়াও সুখের পশ্চাতে কি আছে এবং এই সুখ

কোথায় যাইয়া মিশিয়া যাইবে তাহা দেখিবার জন্য প্রাণে প্রাণে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন; এবং হয়'ত দেখিতে পান যে এত মিষ্ট সুখও যেইখানে মিশিয়া যায় সেই পরমার্থ তত্ত্ব কতই মধুর। সেই আত্মতত্ত্ব যে সর্ব্বত্র বিরাজমান ইহা বুঝানই সুখের ভাষা বা ইঙ্গিত। সুখ না থাকিলে আমরা ভগবানের সর্ব্বগ, সর্ব্বাত্মিক ভাব বুঝিতে পারি না। তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে আছেন বলিয়াই সর্ব্বত্র সুখবোধ হইতে পারে এবং ইহাই বাহ্যজগতের আকর্ষণের মূল তত্ত্ব, ইহা বুঝিয়া সেই জগতীচ্ছন্দের সাধক সুখে না ডুবিয়া এই আকর্ষণের তত্ত্বটুকু বা সেই পরমাকর্ষক কৃষ্ণতত্ত্বের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া চরিতার্থ হয়েন। তাহার পর যখন দুঃখ আসে সাধক তখন দুঃখ পরম গুরুতর হইলেও চিরস্থায়ী নহে বুঝিতে পারেন, দুঃখ-রাত্রির অবসানে বিমল অরুণ কিরণের সুস্নিগ্ধ প্রভায় হৃদয়-গগনের আলোক সম্পদের অভিধ্যানে আনন্দিত হয়। বালকগণ রাত্রি ভালবাসে না, কারণ তখন খেলা যায় না। কিন্তু আমরা জানি রাত্রি ও নিদ্রার দ্বারা দেহ-মন বিগতক্লম না হইলে আগামী দিবসের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াদির সাধনসৌকার্য্য হইতে পারে না। তেমনই সাধক জানেন যে পুরাতন ভাবের কার্য্য যখন হইয়া যায়, নূতন ভাবের উন্মেষ আবশ্যক হয়, তখন সেই পুরাতন ভাবটীও দুঃখের পথ দিয়া কোথায় চলিয়া যায়। শিশুকালে ঝুম্‌ঝুমি ভাল লাগিত বলিয়া তুমি কি ঝুম্‌ঝুমি লইয়া খেলা করিতে ভালবাস? তবে পুত্ররূপ খেলানার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে যখন সেই খেলানাটী পরিত্যাগ করার আবশ্যক হয়, তখন রোদন করা কেন? আমরা ভুলিয়া যাই যে এক পরমাত্মা ভিন্ন কোনও বস্তুই স্থির নহে, আর সকলই গতিশীল। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ভগবানকে চিনিতে পার না বলিয়াই ত তিনি পুত্ররূপে তোমার কোলে আসিলেন, সংসারতাপক্লিষ্ট স্বার্থসিদ্ধিযন্ত্রের আবর্ত্তনে নিষ্পেষিতপ্রায় হৃদয় সুমধুর, ভাবে স্নেহের সুমধুর পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিল, জগৎ মধুময় মূর্ত্তি ধারণ করিল, কিন্তু এই মধুরতার কারণ দেখিতে পাওয়া গেল না'ত, এই প্রেম-প্রস্রবণের উৎস'ত দেখা গেল না! পুত্র-মূর্ত্তিকেই ভগবৎ বুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া পাইলাম! ভগবানের যে ব্যাপক ভাব শিক্ষার জন্য পুত্রের আবশ্যকতা তাহারই অপলাপ হইয়া গেল, তিনি যে ভিতরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ক্রীড়া করেন তাহা বিস্মৃত হইলাম, তাই বুঝি পুনরায় তাঁহার হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য পুত্রমূর্ত্তি অপসৃত করিয়া ফেলিলেন, স্থূল পুত্রমূর্ত্তি স্মৃতিময় মানসমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইয়া রহিল। তার পর সাধক বুঝিতে পারেন স্মৃতিরও

অন্তরালে,—তাহার আমিরও অন্তরালে শ্রীনন্দের ব্রজে, প্রকৃত আনন্দের আকর রহিয়াছে।

গড গড বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে
যাঁর যৈছে মন হৈছে সে তৈছে শুনে।

সুখে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় নবীন কিশোরমূর্ত্তির বিকাশ আর দুঃখের ভাষায় মহামহিমময়ী জগদম্বার কালীমূর্ত্তির করাললীলার অভিনয় দেখাইয়া স্থির শাশ্বত ভাবে আনয়ন করাই জগতীচ্ছন্দের ছন্দ।

তাহার পর বাসনার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত পংক্তিচ্ছন্দ ও বরুণ দেবতার খেলা দেখা আবশ্যক। এই বিচ্ছিন্নপ্রায় বিশেষ বস্তু, শক্তি ও ক্রিয়ার খেলার মধ্যে কে প্রথম শৃঙ্খলা আনিয়া দেয়? কে জগতের বালুকাকণাসদৃশ বস্তু-রাশিকে একত্রিত ও পুঞ্জীকৃত করিয়া বংশ, পরিবার, সমাজ, জাতি প্রভৃতির সমাবেশপূর্ব্বক পারম্পর্য্য ও নিয়ম সংস্থাপন করে? ইহাকেই আতত্ত্ব বা কাম বলে। ভাগবতে আছে যে আর্দ্রীকরণ (মোলায়েম করা), পিণ্ডীকরণ (জড় করা) প্রভৃতি জলতত্ত্বের ক্রিয়া। যেমন বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলিকে কথার ভিতর দিয়া পংক্তি (line) রূপে একত্রিত করিয়া ভাবের বিকাশ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ সাধক দেখিতে পান যে জগতের বাসনা ও কাম লইয়া এত মারামারি কাটাকাটি থাকিলেও তাহার মূলে এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা বা একত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং এত বিবাদ বিসম্বাদের মধ্য দিয়াও ভগবান তাঁহার আপনার কার্য্য সাধিত করিতেছেন।

তার পর ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের গতি বুঝিতে হইবে। সকল পদার্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন রূপে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে, ইহাই ত্রিকোটী শব্দে নির্দ্দেশ করা হয়। এই নিয়মের বশে চিন্তা হইতে বাসনা, বাসনা হইতে ক্রিয়া ও জগৎ প্রসূত হয় ও, পুনরায় জগৎ হইতে কামনা ও তাহা হইতে চিন্তা বা ভাব উৎপন্ন হয়। যিনি এই নিয়ম অবগত আছেন তিনিই মানবাদিকে পরিচালন করিতে সমর্থ; সেই জন্যই ত্রিলোকীর পরিচালক ইন্দ্রদেব। তিনিই জন-সমাজকে মেঘরূপী বাসনা-কণা দান করেন ও তাহা হইতে অন্ন বা ভোগ্য বস্তু সকল উৎপন্ন হয়।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

গীতা ৩।১৪।

মনস্তত্ত্বকে ইন্দ্রদেবের অনুকূলে পরিচালন করাই প্রাণায়ামের তৃতীয় স্তর। মনের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া আর মনের পশ্চাতেও ত্রিলোকীর চালককে অবলোকন করত সেই ভাবে মনকে গঠন করা, দুইটী বিভিন্ন পদার্থ।

আমি। আপনি ছন্দের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে'ত কার্য্যটী আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়।

স্বামী। প্রাণ বা ব্যক্ত ভাবের প্রকাশকে, ভগবানের ব্যক্ত ভাবের প্রকাশের সহিত মিশাইয়া দেওয়াই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ। ভগবৎ-সত্তা যে যে ভাবে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া বাহ্যভাবে প্রকটিত হয়েন, এবং যে ভাবের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিলে বাহ্য আচ্ছাদনটী বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যায় তাহাই ছন্দ। ভগবানের ছন্দের সহিত প্রাণের সুর মিশানই প্রাণায়াম ; ইহাই ঈশোপনিষদের প্রথম উপদেশ—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ জগত্যাং জগৎ।' সুতরাং সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়ামটী কেবল কুস্তি করা নহে। সর্ব্বাবস্থায় বাহ্যসত্তা মাত্রের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ও তাহার মধ্য দিয়া পরমার্থ-তত্ত্বের নিত্যত্বের ইঙ্গিত যে না বুঝিয়াছে সে, কি প্রকারে স্থূলভাবে প্রাণকে ভগবানের সহিত মিশাইতে পারিবে ? তার পর যখন ভোগ-লালসায় বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তখনই দ্রবময় আকর্ষণের স্রোত দেখিতে পাইয়া কামনা-বাসনাগুলিকেও ভগবানের সহিত মিশাইতে পারা যায়। তার পর, মনের ভিতরে চালনাশক্তির খেলা ও শৃঙ্খলা যখন অনুভূত হয়, তখন জগতের ভিতরও পরিচালকতত্ত্বের ইঙ্গিত পাইয়া, তাহার অন্তরালে ভগবানের 'অনুমন্তা'ভাব পর্য্যবেক্ষণ করত তৃতীয় ছন্দের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যায়। *এই তিনটীই জীবভাবে কথঞ্চিৎ অনুভূত হইতে পারে।* ছোট্ট আমিটী থাকিলেও যেমন আমরা সৌন্দর্য্যের মহিমা অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ ছোট আমিটী রাখিয়াও জগতী, পংক্তি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের সাধনা হইতে পারে। কিন্তু 'বৃহতীর' ভাষা বুঝিতে হইলে ছোট আমিটীকে ত্যাগ করা আবশ্যক।

আমি। কথাটি আর একটু বুঝাইয়া বলুন।

স্বামী। ত্রিলোকীর মধ্যে যে খেলা সাধিত হয়, তাহা প্রায়ই আমাদিগের ছোট আমিটীকে আধার করিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাহিরের খেলাগুলি যেখানে পরিসমাপ্ত হয়, তাহাকেই আমরা 'আমি' বলিয়া থাকি। ক্ষণভঙ্গুরত্ব, কামদাতৃত্ব ও নিয়মন ভাবগুলি ছোট আমিরই ভাষা। আমিটী ছোট না হইলে পরিণাম থাকিতে পারে না। ছোট আমি কোন বিষয়েরই সবটা দেখিতে পায় না বলিয়াই বিষয়ের পরিণাম আবশ্যক, পরিণাম না থাকিলে আমরা কোনও

বিষয়েরই সবটা দেখিতে চাহিতাম না। সেই জন্যই সাংখ্য ও বেদান্তের আমিতে পরিণাম নাই। তেমনই আমিটী ছোট না হইলে, তাহার প্রাপ্য কিছুই থাকে না ও কামও থাকে না, সুতরাং ভগবানের কামদ ভাবটীও থাকিতে পারে না। বড় আমি'তে কাম থাকে না।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। গীতা ২।৫৭।

তেমনই নিয়ন্তৃ ভাবটীও ছোট আমির ক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হয়। কারণ বড় আমি, আর বাহিরের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ামকের আবশ্যক করে না। যে ছন্দের ফলে ত্রিলোকীর ছিন্ন জ্ঞানসমূহের ভিতর দিয়া মহত্তর ও বৃহত্তর প্রজ্ঞার ভাবা জাগিয়া উঠে—যাহার বশে জীব আপনাকে বৃহৎ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া চিনিতে আরম্ভ করে, তাহাই 'বৃহতীচ্ছন্দ'।

আমি। দুই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইয়া দিন।

স্বামী। তোমরা'ত সাধারণতঃ দেখিতেছ যে, সংসারে প্রত্যহ কত শত সহস্র জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয় জনকে কাতর হইয়া এই বারংবার জন্ম-মরণ-যন্ত্রণার কাতরতা প্রকাশ করিতে দেখিয়াছ? সংসারে অনেকেই তাহা করেন না; তাই যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

এইরূপ ভাবের লোকই অধিক। তাহাদিগের ভিতরে এখনও জগতীচ্ছন্দের আভাস পতিত হয় নাই। কিন্তু যাঁহাদিগের হৃদয়ে জগতীচ্ছন্দের আভাস ফুটিয়া উঠে, তাঁহারাই বারংবার জন্ম-মরণে ব্যথিত হইয়া বলিয়া উঠেন "গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি।"

এই জাতীয় সাধকেরা পুনর্জ্জন্মকে বড় ভয় করেন না; কেবল ছিন্নভাব লইয়া খেলা করিতে তাঁহারা চাহেন না; বাসনার রজ্জুতে আবদ্ধ হইতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই, মনের চালনা করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত নহেন। কিন্তু ইহাও ছোট ভাবের খেলা। শ্রীবুদ্ধদেবও এই ভাব হইতে তাঁহার সাধনা আরম্ভ করেন। কিন্তু যখন বৃহতীচ্ছন্দের প্রকাশ হইল তখন আর জন্মান্তরের জন্য ভাবিতে হইল না;—দুঃখ দৈন্য আর তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারিল না। এই খেলার মধ্যে, এই ক্ষণভঙ্গুরতার পশ্চাতে তৃষ্ণার অন্তরালে তিনি এক শান্ত ঘন

সত্তার আভাস পাইলেন ও বলিয়া উঠিলেন The Soul of things is sweet eternal rest। এই ভাব ফুটিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের আমিটী কত বড় ও কত স্থির, এবং কি প্রকার বিভু পদার্থ। আমিটী এত বড় বলিয়াইত, তাহার বৃহত্তর সত্তা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য প্রকৃতি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইতেছে। আমিই কীট, আমিই বৃক্ষ, আমিই পশু, আমিই মানব, আমিই দেবতা প্রভৃতি অনন্ত ভাবের খেলা দেখিয়া, একদিন আমাদের আমিটী বুঝিয়া লয় যে, উহা এত বড় পদার্থ যে অনন্ত অংশ করিয়াও উহা শেষ করা যায় না। যে ক্ষুদ্র আংশিক ভাবসমূহ হইতে সাধারণ সাধক জন্মমৃত্যু-দোলাব গতি দর্শনে আতঙ্কিত হয়েন, প্রাণ দেবগুরু বৃহস্পতির কৃপায় সেই খেলাগুলি দেখাইয়াই সেই সমুদয়কে এমন করিয়া যোগ করিয়া ফেলে যে ছিন্নভাবের পরিবর্ত্তে অপরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্রভাবের পরিবর্ত্তে মহত্তর ও প্রশান্ত আমির দশন লাভ করে। ইহাকেই বৃহতীচ্ছন্দের প্রাণায়াম কহে।

বৃহতী ভাবে মহত্তর আমিকে সূত্ররূপে বুঝিতে পারা যায়। জন্ম-মৃত্যুগুলি তাহার মালা; বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রেব সমুদ্র ভাবের ন্যায় ইহাতেও একটু খেলা আছে, প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে। তাহার পর 'অনুষ্টুপ্' ছন্দের প্রকাশে আমিটীকে ঘন অণুরূপে অনুভূত হয়। খেলাগুলি, তরঙ্গগুলি তখন অণুতে মিশিয়া যায়। 'আমার' ভাব তখন আমিতে ডুবিয়া যায়। তাহার পর 'উষ্ণিক্' ছন্দের প্রকাশে 'অণু'রূপ আধারটীও ত্যাগ করিয়া আমিটী 'উৎ' অর্থাৎ 'পর' হইয়া যায়। সূর্য্যদেবকে জোয়ার ভাঁটার কর্ত্তা বলিয়া ভাবিলে, উহা অনুষ্টুপ্ ছন্দের খেলা। তাহার পর যখন দেখা যায় যে সূর্য্যদেব নিয়তই আকাশে নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় ও স্বমহিমায় প্রকাশিত, জগৎ থাক্ বা যাক্, তাঁহার কিছু আসে যায় না; কারণ তিনি সর্ব্বদাই 'উপর'। ইহাই 'উষ্ণিক্' ছন্দের ভাষা। এত কর্ত্তৃত্বের খেলার মধ্যেও যখন ভগবানকে অকর্ত্তা বা দ্রষ্টা বলিয়া বুঝা যায়—তখনই উষ্ণিক্ ছন্দের প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। তাহার পর যখন সমস্ত প্রকাশ ভাবটী তাঁহার আনন্দময় চৈতন্যের স্থির সৌদামিনী জ্যোতি বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই অমিতাভ জ্যোতির প্রকাশে মহামায়া "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি"রূপে ভগবানে মিশিয়া স্থির হয়েন আর খেলা থাকে না।

প্রাণ শব্দের—এত বড় অর্থ। আচার্য্যদেব মাণ্ডূক্যভাষ্যে এই জন্যই

হিরণ্যগর্ভকেও প্রাণাত্মক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিলে প্রাণ ও জ্ঞানের প্রভেদ কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। স্বপ্রকাশার্থে জ্ঞান ও সর্ব্ব প্রকাশার্থে প্রাণ,—এই কথাটি স্মরণ রাখিও। আজ এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য—

২। সন্ধ্যাতত্ত্ব—শাস্ত্রীয় কথা।

সন্ধ্যার কাল বিচার।

(৪)

সন্ধ্যার সময়ে দ্বিজাতিগণের যজ্ঞোপবীত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। আশ্বলায়ন সূত্রে উক্ত আছে যে;—"যজ্ঞোপবীতী নিত্যোদকঃ সন্ধ্যামুপাসীত" যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়া স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে আচমন ও মাজ্জন কার্য্য করিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। কেবল যে কুশহস্ত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে এমন নয়, বৈধ-স্নান, মার্জ্জন, সন্ধ্যাবন্দন এবং দেবপ্রদক্ষিণ প্রভৃতি করিবে। স্নানদ্বারা শারীরিক বাহ্যমল অপহৃত হয়, স্নিগ্ধতা এবং মনঃপ্রসাদ, ইন্দ্রিয়-নির্ম্মলতা, বায়ু ও পিত্তের সাম্যভাবও হইয়া থাকে। শ্রৌত পরিভাষায় মহর্ষি আপস্তম্বও বলিয়াছেন;—"যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়া দৈব, পৈত্র্যকর্ম্মসমূহ ও প্রদক্ষিণ করিবে"। পূর্ব্বে সংক্ষেপে সায়ংসন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উক্ত হইয়াছে; সংপ্রতি সে সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলিতেছি। সাম-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—"সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত আজ্যোতিষোদর্শনাৎ সন্ধিঃ";—অর্থাৎ সন্ধি কালে সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। জ্যোতিষ অর্থাৎ নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন পর্য্যন্ত সন্ধি-সময়, অর্দ্ধ-অস্তমিত সূর্য্য দর্শন কাল আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র উদয় পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে 'সন্ধি' বলিয়া শাস্ত্রকার অভিহিত করিয়াছেন। সেকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। মহর্ষি বলিয়াছেন। যথা—

"অর্দ্ধাস্তমিত কালাদূর্দ্ধঃ সন্ধিরাতারকোদয়াৎ।
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত সায়ংকালে সমাহিতঃ॥"

অর্দ্ধ-অস্তমিত কাল হইতে নক্ষত্রাবলি উদয় পর্য্যন্ত যে কাল তাহাই সন্ধি, সেই সন্ধিকালে পবিত্র ও সংযত ভাবে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

"উদয়াৎ প্রাক্তনী সন্ধ্যা ঘটিকা-ত্রয়মুচ্যতে।
সায়ংসন্ধ্যা ত্রিঘটিকা অস্তাদুপরি ভাস্বতঃ॥"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘটিকা ত্রয় প্রাতঃসন্ধ্যার কাল। এবং সায়ংসন্ধ্যা সূর্য্যাস্তের পরে তিন ঘটিকার মধ্যে জানিবে। ইহাকে সন্ধ্যার উত্তম কাল বলা হয়। শাস্ত্রে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ কাল বর্ণিত আছে।

তথা চ স্মৃতৌ,—

"উত্তমা সূর্য্যসহিতা মধ্যাঽস্থুদিততারকা।
অধমা তারকোপেতা সায়ংসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥"

সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে সন্ধ্যা অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা উত্তম সংজ্ঞায় কথিত। আকাশে নক্ষত্র উদয় হওয়ার পূর্ব্বে যে সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা মধ্যম। তারকাদি উদয় হওয়ার পরে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহা অধম সন্ধ্যা কাল জানিবে। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার ত্রৈবিধ্য, মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন যথা—

"উত্তমা তারকোপেতা মধ্যমা লুপ্ততারকা।
অধমা সূর্য্যসহিতা প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিধা মতাঃ॥"

নক্ষত্রযুক্ত প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা উত্তম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, এবং তারকাগণ বিলুপ্ত হইলে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা মধ্যম সংজ্ঞায় অভিহিত, প্রাতঃসূর্য্য উদয় হইলে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে অধম প্রাতঃসন্ধ্যা বলে। যথাকালে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যার ফল শাস্ত্রে অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে, যথা—মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন,—

"কালে তু বন্দিতা সন্ধ্যা স্বর্গমোক্ষপ্রদায়িনী।
অকালে বন্দিতা সন্ধ্যা সা চ বন্ধ্যা বধুরিব॥"

যথাকালে সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী হয়। অসময়ে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা, বন্ধ্যা বধূর ন্যায় নিষ্ফলা হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

অশৌচেও সন্ধ্যা করা যায়,—ইহা শ্রৌত সূত্রকারগণ বলেন। দক্ষিণাপথের শ্রৌত ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারে কেহ কেহ বলেন সন্ধ্যা করা যায়। যে হেতু শ্রুতিতে "প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনার আদেশ আছে। যথা,—

"সন্ধ্যামিষ্টিঞ্চ হোমঞ্চ যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।
ন ত্যজেৎ সূতকে বাপি ত্যজন্ গচ্ছত্যধোগতিং॥'

সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি যাগ, হোম, প্রত্যহ করিবে। সূতকাশৌচে ত্যাগ করিবে না, ত্যাগ করিলে অধোগতি হইবে। কোন কোন নিবন্ধকার বলেন তাহা সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পক্ষে কথিত হইয়াছে।

অপর নিবন্ধকায় বলেন এই স্মৃতি বচনটী, মানসিক সন্ধ্যা বন্দনের অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, বাহ্য অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নয়। এই বিষয়ে মহর্ষি পুলস্ত্য বলেন। যথা—

"সূতকে মৃতকে চৈব সন্ধ্যাকর্ম্ম ন সন্ত্যজেৎ।
মনসোচ্চারয়েদ্ মন্ত্রান্ প্রাণায়ামরতো দ্বিজঃ॥

জনন ও মরণ অশৌচে সন্ধ্যা কার্য্য ত্যাগ করিবে না। প্রাণায়ামপরায়ণ দ্বিজাতি মানসিক মন্ত্রোচ্চারণ করিবে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ বচনে উক্ত উভয় বিধ অশৌচে সন্ধ্যার নিষেধ আছে, যথা ;—

"সর্ব্বকালমুপস্থানং, সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাদৌ চ বিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥

প্রতিদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে, কেবল সূতকাশৌচ, চিত্তবিভ্রান্তি, এবং জ্বরাদি রোগ ভিন্ন। মহর্ষি মরীচি বলেন ; যথা—

"সূতকে কর্ম্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে॥

সূতকা শৌচে সন্ধ্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। মহর্ষি পরাশর বলেন ;—

"উপাসনে তু বিপ্রাণাং অঙ্গশুদ্ধিশ্চ জায়তে।"

উপাসনা কালে বিপ্রগণের অঙ্গশুদ্ধি থাকে। পরাশর মাধবীয় মতে প্রাণায়াম ভিন্ন মানসিক সকল কার্য্য (জপাদি) করিতে পারা যায়। মহর্ষি গোভিল বলেন ;—

"অগ্নিহোত্র প্রভৃতি হোমের নিমিত্ত সেই সেই কার্য্যকালে শারীরিক শুদ্ধি থাকে।"

এতদ্দেশে সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও শ্রাদ্ধ দিন, দ্বাদশীতে স্মৃতি বচন অনুসারে সায়ংসন্ধ্যা করে না। দক্ষিণাপথে প্রত্যহ সন্ধ্যানুষ্ঠানের শ্রুতি বচন প্রবল হেতু, তাহারা উক্ত স্মৃতিবাক্য মানে না। এই দেশের নিবন্ধকারগণের স্মৃতি-মীমাংসা অনুসারে সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, কাম্য কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত-কার্য্য অশৌচে অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ।

সন্ধ্যার আচমন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সামান্যতঃ আচমন করিবে, এই আচমন তিন প্রকার ;—শ্রৌত, স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক। প্রত্যক্ষ শ্রুতি-প্রতিপাদিতই 'শ্রৌত আচমন,' ইহা সকল বৈদিক কর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ ; দর্শপূর্ণমাস যাগাদিতেও করিতে হয়।

কল্পসূত্র প্রভৃতিতে উক্ত আচমনকে স্মার্ত্ত-'আচমন' বলে। কেশব বা বিষ্ণু প্রভৃতিতে নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যে ত্রিবার জল পান করিতে হয়, তাহা "পৌরাণিক আচমন"। আচমন-পূত ব্যক্তি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকারী হয়। "মন্ত্রপূত জলে মান্ত্রিক ঐশী-শক্তি প্রভাবে বিশিষ্ট দেবভাবের ও পবিত্রতার বিকাশ হয়। সেই জল পান করিলে আন্তরিক পবিত্রতা জন্মে, এবং মানসিক স্থৈর্য্য ও শান্তির প্রাদুর্ভাব হয়। স্থির চিত্ত এবং পবিত্রমনা অধিকারী যে কোন (শ্রীভগবৎ উদ্দেশ্যে) কার্য্য করেন, তাহা অচিরে সম্পন্ন ও ফলপ্রদ হয়। এই ভাবে আচমনীয় জল দ্বারা অন্তঃকরণ এবং বাহ্য শুদ্ধিপূর্ব্বক আচমনান্তে স্পৃষ্ট ইন্দ্রিয় ও শরীরাবয়বের পবিত্রতা জন্মে। সেই সেই অবয়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্ন হইয়া কর্ম্মাধিকারীকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম উপযোগী ও শ্রীভগবচ্চিন্তাপরায়ণ করিয়া তুলেন। আচমন ও আসন শোধন দ্বারা শারীর ও মানসিক স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য হইলে, কর্ম্মকর্ত্তা সুদীর্ঘকাল একাগ্রমনা হইয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। কোন কোন ঋষি বলেন 'ভূঃ' প্রভৃতি ব্যাহৃতি দ্বারা দ্বিজাতিগণ আচমন করিবে; বিষ্ণু-নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অদ্বিজাতিগণ আচমন করিবে। আচমনে জলের পরিমাণ ও শরীরাবয়বের সংস্থান প্রভৃতি শাস্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থা উক্ত আছে। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের পূর্ব্বে আচমনের ন্যায় শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রুতিতে উক্ত আছে,—"কথমযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণঃ" যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে দ্বিজাতির দ্বিজত্বই থাকে না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কথিত আছে,—"যৎকিঞ্চ ব্রাহ্মণো যজ্ঞোপবীত্যধীতে যজত এব তৎ তস্মাৎ যজ্ঞোপবিত্যেবা ধীয়ীত যাজয়েত বা॥" যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ যাহা কিছু (বেদাদি শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন ও করান এবং অপর (হোম, দেবার্চ্চনাদি) করেন ও করান, সেই সমুদয় আশু ফলদায়ক হয়। অতএব যজ্ঞোপবীতি হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে। গৃহ্য সূত্রকারগণ বলিয়াছেন, যথা—"যজ্ঞোপবীতে শৌচে চ নিত্যে" সকল শ্রৌত-স্মার্ত্ত কার্য্যে শৌচ ও যজ্ঞোপবীত সতত আবশ্যক। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে উক্ত আছে,—"উপাসনে গুরূণাং বৃদ্ধানাং অতিথীনাং চ হোমে জপ-কর্ম্মণি ভোজন-আচমনে স্বাধ্যায়ে চ যজ্ঞোপবীতিস্যাৎ"। কল্পসূত্রকার বলিয়াছেন যে,—"দ্বিজাতি, পূজ্য অতিথি, এবং বৃদ্ধগণের নমস্কারাদিতে হোম, জপ, আহার, আচমন, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কার্য্যে যজ্ঞোপবীতযুক্ত হইবে"। যজ্ঞপরিভাষা গ্রন্থে উক্ত আছে যে,—"দৈব পৈত্র্য কার্য্যে যজ্ঞোপবীত ধারণ নিত্য কার্য্য"

আশ্বলায়ন সূত্রেও কথিত আছে,—"যজ্ঞোপবীত হইয়া আচমনপূর্ব্বক কার্য্য করিবে"। মহর্ষি ভৃগু বলিয়াছেন,—'সতত যজ্ঞোপবীত ধারণ, শিখাবন্ধন, উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া দৈব, ও পৈত্র্য কার্য্য করিবে। এই তিন শূন্য হইয়া কার্য্য করিলে (অন্তর ও বাহ্য শুদ্ধি না হওয়াতে) অনুষ্ঠিত কার্য্য ফলদায়ক হয় না।' এখনকার বাজারে বিক্রীত মার্জ্জিত বিদেশীয় সূত্র অনেকে ধারণ করিয়া উপবীতের কার্য্য সমাধান করেন; কিন্তু তাহা উপবীত নয়। দেশজাত কার্পাসসূত্র দ্বারা (দ্বিজাতির) কুলাঙ্গনা (শুদ্ধান্তচারিণী) কর্ত্তৃক প্রস্তুত উপবীত (পৈতা) মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিলে প্রকৃত উপবীত ধারণ করা হয়। মণি, মন্ত্র, ঔষধীর শক্তি মানববুদ্ধির অগোচর;—সূত্র হইলেও যজ্ঞোপবীতে মন্ত্রশক্তিবলে তাহাতে দৈব ভাবের প্রাদুর্ভাব হয়।

যেরূপ মন্ত্র ও চৈতন্য যোগে জড়বস্তুতে চেতনার বিকাশ হয়। চেতনা শক্তি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোথাও ব্যক্ত আর কোথাও অব্যক্ত। *শুষ্ককাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতিতে অব্যক্ত। সজীবদেহ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদিতে* সুব্যক্ত; ইহাই "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবৎ"। এই শ্রুতি দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

শ্রৌত-সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল সৃষ্ট বস্তুই চেতনকার্য্য, যেহেতু কার্য্য সমূহে (দৃশ্যবস্তুজাতে) ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে ঐশীশক্তি বা প্রাকৃতিক চেতনাশক্তি বিদ্যমান আছে। আচমনের বিস্তৃত প্রণালী আহ্নিক-আচারতত্ত্বে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এখানে সে সমুদয় উল্লিখিত হইল না। জলেতে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, এই চারিটী গুণ যেমন অনুভূত ও প্রত্যক্ষ হয়, সেরূপ শৈত্য, স্নিগ্ধতা, মাধুর্য্য, নির্ম্মলতা প্রভৃতিও অনুভূত হয়। সেইহেতু মন্ত্রপূত বারি হস্তে জড়দেহের ইন্দ্রিয়সমূহ স্পর্শ করিলে সেই সেই ইন্দ্রিয়-প্রসাধন, প্রার্থর্য্য, স্নিগ্ধতা, নির্ম্মলতার বিকাশপূর্ব্বক দেহে শান্তি আবির্ভূত হয়।

উক্ত ত্রিবিধ আচমন ভিন্ন তান্ত্রিক বা আগম, উক্ত আচমন ও উপাসনা কালে সন্ধ্যা-সময়ে করিতে হয়। আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব, শিবতত্ত্বের আচমনের সময়ে উল্লেখ করিতে হয়। বাহিরে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান, স্বচ্ছজল পান, মন্ত্রোচ্চারণ, মানসিক মন্ত্র স্মরণে মানসিক ও দৈহিক প্রসাধন হয়। আত্মতত্ত্ব—আত্মা (ব্রহ্ম) শক্তির অভিব্যক্তি মন্ত্র স্মরণে ব্যক্ত হয়। বিদ্যাতত্ত্ব—চেতনা শক্তি বা জ্ঞান শক্তির প্রাদুর্ভাব সূচক। এই জ্ঞানশক্তি বা বিদ্যাশক্তি পরা ও অপরা উভয় শক্তিপর, তাহা জাগতিক কারণ—শক্তি ও কার্য্যস্বরূপ জানিবে। শিবতত্ত্ব

নিখিল ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ-শক্তির পরিচায়ক। উক্ত ত্রিবিধ শ্রৌত, স্মার্ত্ত, পৌরাণ আচমনের মূলেও এই তিন তত্ত্ব নিহিত আছে। আদি দর্শন সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে উক্ত আত্মতত্ত্ব—পুরুষস্থানীয়; বিদ্যাতত্ত্ব—প্রকৃতি স্থানীয়। শিবতত্ত্ব—মহত্তত্ত্ব স্থানীয়। তিনবার আচমনীয় জলপানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই দেহস্থিত দেবতাত্রয় প্রীত হন তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্ যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ-রুদ্রশ্চ ভবন্তি হি ন সংশয়ঃ॥"

আচমনকালে যে তিন বার জলপান করা হয়, তদ্দ্বারা জলপানকর্ত্তার দেবগণ প্রীত হন। (বিশেষতঃ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রসন্ন হন ইহাতে কোন সংশয় নাই। অনন্তর প্রাণায়ামের বিষয় উল্লিখিত হইবে। প্রাণায়াম—প্রাণবায়ু, আয়াম—তাহার নিরোধ। ইতি (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুদেহার 'গঙ্গাজল' যুশ্মাবও গঙ্গাজল! গঙ্গাধরসেবিকা যুশ্মার মস্তকে পতিত হইবার সময় 'সুদেহার গঙ্গা জলের' প্রাণের ভিতর কি জানি কেমন একটু আকুলি বিকুলি হইয়া উঠিল। কৃত্রিম সোহাগমাখা হাস্যবিস্ফারিত বদন খানিতে কি জানি কিসের একটু কালিমাছটা জাগিয়া উঠিল, ঘরের চালায় টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। প্রাণ মন কাঁপিল, তবু—'ঘিয়ে ভাজা নিমের পাত না ছাড়ে যেমন নিজের জাত'—তেমনি তাহার সেই সাজান গোছান ঠমকের ভাষায় নাকিসুরে যুশ্মাকে সম্বোধন করিয়া 'গঙ্গাজল' কহিল, "আহাহা একলাটি, —অমনি,—ধূলায় শু'য়ে,—কেন? কি হয়েছে বৌ!!"

যুশ্মা। কে গঙ্গাদিদি!—এস।" বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উঠিয়া প্রণাম করিল ও বসিবার আসন দিল।

গঙ্গা। থা'ক্, থা'ক্, জন্মায়তি হয়ে সোয়ামি পুত্তুর নিয়ে সুখে থাক; পাকা চুলে সিন্দূর পর; হাতের নোয়া অক্ষয় হ'ক। আমায় আবার গড় ক'র্ব্বা কেন ভাই? এমন একলাটী—মনমরা হয়ে, ভূঁয়ে শুয়ে কেন ভাই!—

যুশ্মা। (হাসিয়া) আমাকে কি একলা দেখলে ?

গঙ্গা। (চারিদিকে চাহিয়া) কই এখানে আর কে আছে ?

যুশ্মা উচ্ছ্বাসদীপ্ত মধুর হাসিতে হাতের নোয়া ও কপালের সিন্দুর দেখাইয়া কহিল, "দেখতে পাও না দিদি, সীমন্তে এই যে উজ্জ্বল সিন্দুর ! এই হাতে নোয়া ! রমণীর যিনি চির-জীবনের সাথী এই যে তিনি সিন্দুরের ঔজ্জ্বল্য ও লৌহের দৃঢ়তা লইয়া অনুক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন।"

গঙ্গাজল প্রেমপূর্ণহৃদয়ী যুশ্মার ওজস্বিনী বাক্যাবলী শ্রবণে তাহার কোনও অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কেবল 'নোয়া' ও 'সিন্দুর' কথা দুটীর ভরসায় বলিল —"বালাই, নোয়া, সিন্দুর থাকবে না'ত কি ?—তা ব'লে কারো ভালবাসা কি যত্ন না পেলেই একলা থাকতে হয়।"—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু আসান লাভ করিল।

যুশ্মা। আচ্ছা বল এই যে আল্‌তা—এই যে সিন্দুর—এ চিহ্ন কি তোমাকে তোমার রূপের বাহার দেখাচ্ছে ? না আর একজন যিনি প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের দেবতা তাঁকেই দেখায়ে দিচ্ছে। এই আল্‌তা এই সিন্দুরের সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার সেই প্রাণের ঠাকুরটীর কথা—রমণীর চির-বাঞ্ছিতের কথা মনে না পড়ে—তবে যে তেমন আলতা সিন্দুর পরে তা'র মরণই উত্তম।

এই বলিয়া যুশ্মা ছুটিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল ও আল্‌তা ও সিন্দুরাদি সহকারে গঙ্গাজলের দেহ প্রসাধন ও কেশরচনায় প্রবৃত্ত হইল। 'গঙ্গাজল' আনন্দের আবেগে বাস্তবিকই জল হইয়া যাইতেছিল—কি বলিতে আসিয়াছিল ভুলিয়া গেল। তবু কতকটা পূর্ব্বভাব আচড়াইয়া হাতড়াইয়া টানিয়া আনিয়া বলিল, "তা—ছোট বউ, এমন ধূলোয় শু'য়ে থাকিস্ কেন ভাই ? তোর দেহের কি যত্ন নাই ?—আর ভাই সতীনের সংসার কেই বা যত্ন ক'রবে ?"

কেশরচনা করিতে করিতে যুশ্মা উত্তর করিল, "এ দেহে আমার এমন কি অধিকার আছে যে অযত্ন করিব ? যেদিন এই দেহ অপরের পদে উৎসর্গিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে, সেই পরদেবতার দেহও যেমন আদর ও যত্নের অধিকারী হইয়াছে, এই দেহও তেমনই আদর ও যত্নের অধিকার লাভ করিয়াছে। আমার দেহ এখন আব আমার নয়, তিনি ইহার অধিকারী, আমাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার প্রয়োজন ও মমতা অনেক অধিক। তাহা না হইলে এদেহের কোনই আবশ্যক থাকিত না। আর ভাই, যদি দেহ অন্তকেই দিয়ে দিলাম, এবং সুখ দুঃখের স্রষ্টকর্ত্তা মনটীও যদি তাকেই দিলাম—তবে

আর এই দেহকে মিছামিছি আমার বলিয়া আমার সুখসম্ভোগের জন্য ব্যবহার করা উচিত হয় না।"

গঙ্গা। তুই ক্ষেপলি নাকি? তুই কি পাগল হ'লি?

যুশ্মা। কেন, পাগল হওয়া কি মন্দ?—দেখ দিদি, রাগ হলে লোকে পাগল হয়, জ্ঞান হারায়, কেমন? আমি না হয়—ভগবান্ যাঁহাকে ভালবাসিতে দিয়াছেন তাঁহার কথায় পাগল হইয়া, জ্ঞান হারাইয়া, আপনা হারাইয়া, দুটা মনের কথা যদি বলেই ফেলি!—দেখ ভাই,—ভগবান্ স্ত্রীজাতির আমার বলিতে কিছুই রাখেন নাই, তা পাগল হব না কেন?—যে পাগল বুদ্ধি হারা হইয়া সকল ভুলিয়াছে সেও তার আপনাকে হারাইতে পারে নাই। আমরা যে ভাই আমাদের আপনার আপন—যথাসর্ব্বস্ব—সেই পরপদে বিসর্জ্জন করে বসে আছি। তবুও পাগলের মত পাগল হওয়া আমাদের চলে না, আমাদের এই আত্মসমর্পণেই জীবনের সুখ, মরণে আনন্দ, ভোগে তৃপ্তি অভোগে স্পৃহা। সামান্য পাগলের তাহা নাই, তাহারা বাতিকগ্রস্ত বলেই পাগল। তবে সংসারের যেটুকু সুখ, সে কেবল, পাগলের মত আত্মহারা হইতে পারিলেই পাওয়া যায়। নিজের ভোগে লাগাই'তে হইলে সুখে সুখ থাকে না। তুমি কি কখনও আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলনি দিদি?

গঙ্গা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অভাগা কপাল! কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া।

যুশ্মা। যখন ঝগড়া কাকে বলে জানতে না—যখন সেই প্রথম চারি চোখের মিলন—গোড়াগুড়ি থেকেইত আর ঝগড়া নিয়ে এসেছিলে না।

গঙ্গা। সে কথা আর তুলিস নি; কেন, সেই সুখের স্বপন'ত ভেঙ্গে গিয়েছে।—এই ছোট ভেয়ের সংসারটা নিয়ে হাড় জ্বালায়ে দিলে!

যুশ্মা। না দিদি ও তাড়াতাড়ি চলবে না, বল দিদি—সেই প্রথম শুভ দৃষ্টির কথা!

গঙ্গা। যা' গেছে, তা গেছে, আর ফিরবে না। এখন যা হচ্ছে তা'ই বল।

যুশ্মা। কেন, মরা গাঙ্গে কি আর বাণ আস্‌তে নাই?—

এতক্ষণে যুশ্মার সিঁদুর দেওয়া শেষ হইয়া ছিল। তখনই একখানি মুকুর লইয়া তাহার অগ্রে ধারণ করিয়া বলিল "বল দেখি দিদি সিঁদুরের নীচে ঐ ডবডবে চ'খ দুটী কার?

গঙ্গা একবার চাহিল, দেখিল চ'খ দুটী সুন্দরই দেখাইতেছে। অমনি দর্পণখানি সহসা অপসারিত হইয়া গেল ও তাহার স্থানে দুইটী প্রেমাশ্রু-পুরিত সজল নীলোৎপল ভাসিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণটা কেমন ভিজিয়া আসিল। ঈষৎ হাসিয়া গঙ্গা দিদি বলিলেন "মুখ বাদ দিয়া দেখিলে সকল চোখই সমান দেখায়।"

যুম্মা বলিল—তবে দিদি, এই তোমার চক্ষু নয়—যখন প্রতিদিন চারিটী চোখের মিলন হয় তখন তুমি তোমার চোক দেখিতে পাও। তেমন দুইটী মনের মিলন ক্ষেত্রে একটী মনই দেখিতে পাইবে। সেখানে নিজের মনটী খুঁজিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তাহা দেখিতে যাই চেষ্টা করিবে তখনি তোমার সকল সাধে বাধা পড়িবে। চক্ষু নিয়তই আমাদিগকে এই ধর্ম্মই শিক্ষা দেয়, যে আপনাকে বাদ দিয়া, আপনা ভুলিয়া, স্বরূপ বিবর্জ্জিত হইয়া পরের রূপে মুগ্ধ হয় সে আপনার বলিতে কিছুই রাখে না। যখন অমনি করিয়া চারটী চক্ষু মিলিত হয় তখন মনের কত সাধ কত আশা, কত কথা, সব ভুলিয়া যাই—আর আমার মনটিকে সেই আনন্দের তুফান হইতে তুলিয়া লইতে পারি না পৃথক করিতে পারি না!

যুম্মার নয়নযুগল হইতে তখন দরদর ধারে অশ্রুকণারাশি বিগলিত হইতেছিল। আর সেই প্রতিবেশিনী রমণী তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেছিল। গঙ্গাজলের নয়ন দুইটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে যুম্মার চক্ষুর সহিত আলাপ করিল, এবার তাহার হৃদয়ের পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়নের প্রান্তদ্বয় বহিয়া দুইটী উষ্ণ প্রস্রবণধারা প্রবাহিত হইল।

যুম্মা আবার বলিতে লাগিল "দেখ ভাই, আমরা বিবাদ করিয়া মনোদুঃখে কাল কাটাইবার জন্যই কি এই খেলার ঘর পাতাই?—জীবনের প্রথম সম্মিলনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, কত সাধ, কত আশা, কত ভালবাসা বুকে বাঁধিয়া সংসার-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তারপর—তারপর নিজের ইচ্ছা, নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে যাইয়া নিজের দোষে এ কূল ও কূল দুকূল হারাইয়া বসি। ভগবানের সংসারযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্যই রমণীর সৃষ্টি, প্রকৃতি-রূপিণী কুলরমণী জ্বলন্ত পাবকরূপ পুরুষহৃদয়ে পতঙ্গের মত আপনাকে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্তই এই সংসারে আবির্ভূত। যাহার এই নশ্বর দেহ, মন, প্রাণ জীবনের সর্ব্বস্বসার সেই পরদেবতার পদে উৎসর্গিত হইয়াছে তাহারই নারী জন্ম সার্থক। যাহার পদে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া কেবল ভালবাসা অবলম্বন

করত জীবন মাত্র ধারণ করিয়া থাকিতে পারি, সেই প্রাণের প্রাণ পরম দেবতা পতি আমার—তদীয় চরণাশ্রিতার—যাহা মঙ্গল যাহা শুভ অবশ্য তাহার বিধান করিবেন। তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে সন্দিহান হইবার বা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। আর যদি নাই করেন তাহা'তেই বা দুঃখ কি ?—এ যে তাঁহার আপনার বস্তু, তাঁহার আপনার জিনিস ; নিজের মনোমত ব্যবহার ই ত করিবেন। তাই যাহাকে ভালবাসি তাঁহার অত্যাচার অবহেলাই যদি সহ্য করিতে না পারিলাম, তাহার জন্য সুখেই হ'ক বা দুঃখেই হ'ক যদি কাঁদিয়া সুখী হইতে না পারিলাম, তবে সে ভালবাসা ভালবাসাই হইল না, উহা কেবল ঝুটা মালের দোকানদারী! মনসাধের অপূর্ণতা বুকে লইয়া না হয় নিজেই কাঁদিলাম! যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, গুরু বলিয়া যাঁহার চরণকমলে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছি, আমার সেই অপূর্ব্ব বাসনার প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালায় তাঁহার আমার সেই প্রাণের প্রাণের মর্ম্মে কেন যাতনা দিই!! ইহকাল'ত গেলই, পরকালও নষ্ট করি কেন ?

গঙ্গাজল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে যুশ্মার নিকট কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাহার অপূর্ণ আশার অনেক দুঃখ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। দুইজনে এরূপে কতক্ষণ কাটাইলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু গঙ্গাজল বাড়ী যাইবার পথে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন "তুই সতীনে আজীবন সুখে থাক, আর আমি উহাদের সর্ব্বনাশ করিতে যাইব না।"—যশ্মার চরিত্র চিন্তা করিয়া ভাবিতে লাগিল "এ কে ?—একি ?—" ফলতঃ সেই দিন হইতে সুদেহার 'গঙ্গাজল' এক নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন লাভ করত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গঙ্গাজলের পরিবর্ত্তনের কথা স্মরণ করিলে স্বতঃই মনে হয়—

চাঁদেরে ঢাকিতে ধায় কালো মেঘদল,
তাহার জ্যোতিতে তারা হয় সমুজ্জ্বল॥   শান্তি

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনাদি কালের কর্ম্ম প্রভৃতি নিবৃত্তি বিষয়ে গুহাস্থিত অন্ধকারের দৃষ্টান্ত।

কোন পাহাড়ের গুহাতে অন্ধকার অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছে। যদি তপ দ্বারা, জপ দ্বারা অথবা যষ্টি প্রহার দ্বারা কেহ তাহাকে গুহা হইতে দূর করিতে চায়; তাহাতে কদাপি সে যাইতে সমর্থ নহে। কিন্তু প্রকাশ মাত্রই ঐ অনাদি কালের অন্ধকার তৎক্ষণাৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে। যে সময়ে প্রদীপ গুহাতে লইয়া যাওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার পলাইবে। উহা কদাচ ইহা কহিতে পারিবে না যে, আমি অনাদি কাল হইতে এখানে আছি এজন্য শীঘ্র যাইব না। কিন্তু অন্ধকারের বিরোধী প্রকাশ উপস্থিত হইবামাত্রই অন্ধকার এত অল্পকাল মধ্যে সে স্থান হইতে পলাইবে যে সে সময়ের জ্ঞানও হইবে না। এই প্রকারে সিদ্ধান্ত অজ্ঞান, তজ্জন্য দেহাধ্যাস এবং কর্ম্ম অনাদি কালসম্ভূত, সত্য বটে কিন্তু "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই অপরোক্ষ জ্ঞান রূপ প্রকাশ উপস্থিত হইবামাত্রই ঐ অজ্ঞানাদি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে বেদবচন প্রমাণ যথা—

"ব্রহ্মদেবকে জানিলে সর্ব্ব বন্ধন নিবৃত্তি হইয়া যায়"—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব পাশাপহানি।"

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন"—

"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।"

"ঐ আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইবে"—

"তরতি শোকমাত্মবিৎ।"

"মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে গেলে জ্ঞান বিনা অন্য পথ নাই"—

"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং নান্যঃ পন্থা অয়নায়।"

এই প্রকার জ্ঞান দ্বারাই সর্ব্ব পাপকর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা ভগবান্ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে কহিয়াছেন :—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"

টীকা—হে অর্জ্জুন! যে প্রকার অতি প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ দহনপূর্ব্বক তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকার নিবৃত্তির অভ্যাস দ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নি, পাপ, পুণ্য ও উভয় মিশ্র সর্ব্বকর্ম্ম নাশ করিয়া দেয়। "অগ্নি ইন্ধনাদিবৎ" ইহা ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে।

শিষ্য।—হে ভগবন্! আপনি কহিয়াছেন আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তা' জিজ্ঞাসা করি, ঐ আত্ম জ্ঞান আমার কি প্রকারে হইবে যাহাতে আমি মুক্ত হইব? তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।

শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তর গুরু চতুর্থ প্রামাণ্যের উত্তরার্দ্ধে দিয়াছেন।

চতুর্থ প্রামাণ্যের উত্তরার্দ্ধ:—হে শিষ্য! যদি তুমি এই পঞ্চীকরণের বিচার কর তাহা হইলে তোমার আত্মজ্ঞান হইবে এবং ঐ জ্ঞান দ্বারা তোমার দেহাধ্যাস নিবৃত্তি হইবে সুতরাং তুমি এই শরীরেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

শিষ্য।—হে ভগবন্! আপনি বলিলেন এই পঞ্চীকরণের বিচার দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইব, কিন্তু পঞ্চীকরণ কি? তাহা আমি জানি না। অতএব আপনি দয়া করিয়া পঞ্চীকরণ কাহাকে কহে তাহা বলুন।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে গুরু পঞ্চীকরণ কাহাকে কহে তাহা কহিতেছেন।

পঞ্চম প্রামাণ্য।

গুরু কহিলেন, হে শিষ্য! এই পঞ্চীকরণে পঞ্চ ভূতের বিচার বর্ণিত হইয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহাদিগকে পঞ্চ ভূত কহে। পঞ্চীকরণে এই পঞ্চ ভূতাত্মক স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ রূপ তিন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিভাগের বর্ণনা আছে এবং এই ভৌতিক তত্ত্ব হইতে ভিন্ন অথচ ইহাদিগের সাক্ষী দ্রষ্টা আত্মতত্ত্বস্বরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পঞ্চীকরণের অর্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকটে শ্রবণ করিয়া সম্যক্ অবগত হইলে আত্মতত্ত্ব অনুভবে আসিবে। উহা প্রাপ্ত হইলে জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মসুখ অনুভব করিতে পারিবে।

শিষ্য।—হে ভগবন্! ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ করিবার আবশ্যকতা কি? পঞ্চীকরণ তো বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। উহা আমি পড়িয়া, অর্থজ্ঞান দ্বারা তাৎপর্য্যও বোধ করিতে পারি তবে সদ্‌গুরুর নিকট

যাইয়া অধ্যয়ন করিবে, এ কথা আপনি কেন বলিলেন? তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।

গুরু।—হে শিষ্য! বাঙ্গালা পড়িতে পার সত্য, অর্থও বুঝিতে বেশ পার কিন্তু সদ্‌গুরুর উপদেশ বিনা শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞানে সমর্থ হইবে না এবং আত্মবোধও কদাপি হইবে না। এ সম্বন্ধে এইটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।

বেদ উদধি বিনু গুরুমুখ লখে, লাগত লোনে সমান
গুরু মুখ বাদর দ্বাব হৈ, অমৃত তো অধিকান॥

বিচারসাগর তৃতীয় প্রকরণ।

অর্থ—গুরু মুখ হইতে উপদেশ বিনা বেদ রূপ সমুদ্রোদক, লবণাক্ত (ক্ষার) প্রতীত হয়। কিন্তু যখন ঐ উপদেশ গুরুমুখ রূপ বৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, তখন তাহা অমৃতোপম হইয়া থাকে।

মন্দিরস্থ গুম্বজের দৃষ্টান্ত।

কোন ধনবান্ পুরুষ আপনার মনে বিচার করিল আমার নিকট ধন অনেক আছে, এই সময়ে উহার মধ্যে কিছু ধন লুকাইয়া রাখিলে সময় ক্রমে আমার অথবা আমার পুত্রের কাজে লাগিলে। এই স্থির করিয়া তিনি আপনার বাটীর সমীপবর্ত্তী স্বনির্ম্মিত সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের গুম্বজদার শিবালয়ের গুম্বজে লুকাইয়া কিছু ধন রাখিয়া দিলেন। যে ধন রাখিলেন তাহা কেহই দেখিল না। তৎপরে তিনি আপনার খাতায় এই প্রকার লিখিয়া রাখিলেন যে 'সম্বৎ ১৭২৪ সালে উত্তরায়ণ সূর্য্য, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে মধ্যাহ্ন বার ঘটিকার সময় সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গুম্বজ মধ্যে পোনের লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা রাখা গেল, যখন কার্য্য পড়িবে তখন বাহির করিবে।" এই প্রকার রীতিমত খাতায় লিখিয়া খাতাটী লোহ পেটকের মধ্যে রাখিয়া ধনী নিশ্চিন্ত হইল। কিছু দিন পরে উপরি উক্ত ধনী তীর্থপর্য্যটনে গিয়া দৈবযোগে সেই তীর্থেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সুতরাং সে ব্যক্তি আপনার সঞ্চিত ধনাদির বিষয় সন্তানকে কিছুই বলিতে পারিল না। পরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে তাঁহার সঙ্গী তাঁহার পুত্র পরিবারাদির সহিত গৃহে প্রতিগমন করিল। সময় ক্রমে তাঁহার পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। ব্যবসায় লোকসান হওয়াতে তাহার ধনের আবশ্যক হইল। পুনর্ব্বার সে ঋণ করিয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। দৈবযোগে পুনরায় ব্যবসায় লোকসান হওয়াতে

ধারের টাকাও ডুবিয়া গেল। যখন পাওনাদারেরা তাগাদা করিতে লাগিল, তখন সে ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিল, আমার বাপ দাদা খুব ধনী ছিলেন, পুরাণ বই খাতা দেখি, যদি কিছু সন্ধান পাই। যদি কোথাও কিছু গহনা পাওয়া যায় ত কাজ চলে। তাহার নিকট আদায়ের চেষ্টা দেখা যায়। এই বিবেচনা করিয়া বই খাতা দেখিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে যে বহিতে গুম্বজ মধ্যে পোনের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কথা লেখা ছিল সেই বই পাওয়া গেল। উহা দেখিয়া গৃহস্বামী অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মজুর আনাইয়া শিবালয়ের গুম্বজ ভগ্ন করিল। গুম্বজ তো ভাঙ্গিল কিন্তু উহার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার চিহ্নমাত্র পাওয়া গেল না।

তখন সে বিচার করিতে লাগিল, খাতাতে যে স্বর্ণমুদ্রার কথা লেখা আছে তাহা কি মিথ্যা ? কিম্বা যাহা লেখা আছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তখন পুনর্ব্বার আপনার বন্ধুকে পড়াইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে অন্যান্য খাতা বই অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে ঐ বর্ষে পোনের লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ওয়াশীল পাওয়া গেল এবং খরচের স্থানে এরূপ লেখা পাওয়া গেল যে 'পোনের লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা খরিদ উসুল বহিতে গুম্বজের নামে লেখা আছে। এরূপ খরিদের সহিত সম্পূর্ণ কারবার লেখা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কহিল হিসাব বই সব ঠিক, লেখাও পরিষ্কার ; তবে কি কারণে কথা মিথ্যা হইতেছে। খাতাতে ত মিথ্যা কথা লেখা থাকিতে পারে না। তাহাতে বোধ হইতেছে গুম্বজ হইতে কেহ অর্থ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে অথবা রাখিবার সময় কিছু ভুল হইয়া গিয়া থাকিবে। এই প্রকার সন্দিগ্ধ বাক্য শুনিয়া মহাজনের পুত্র অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। সে যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইতে লাগিল তাহাকেই বই দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু বহু দিন পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশেষে আপনার কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এক বুদ্ধিমান্ পুরুষের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল এবং খাতাও দেখাইল। পুনর্ব্বার কহিল "ধন পাওয়া যায় নাই তাহাতে অণুমাত্রও চিন্তিত নহি, কিন্তু মন্দিরের শিখর ভাঙ্গাতে অতিশয় চিন্তিত হইয়াছি। এখন আমি কাহারও সম্মুখে মুখ দেখাইতে সমর্থ নহি। সকলে যখন কহিতে থাকিবে যে 'ছোকরা এমত কুপুত্র জন্মিয়াছে যে তাহার পিতা দেবস্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে আর এ ভাঙ্গিয়া দিল' এই প্রকারের নিন্দা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইবে। বরঞ্চ মৃত্যু শ্রেয়ঃ, তথাপি এরূপ

নিন্দিত জীবনে সংসারে থাকা ভাল নহে। অতএব যদি আপনি কিছু উপায় উল্লেখ করিতে পারেন যাহাতে আমি দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি ত ভাল নতুবা আমার মৃত্যু ব্যতিরেকে অন্য পথ দেখিতেছি না। আমার নিকট এরূপ অর্থও নাহি যাহাতে মন্দিরের গুম্বজ ঠিক প্রস্তুত করাইয়া দিই। তাহার উপর পাওনাদারের তাগাদাতে আরও প্রাণ দুঃখিত হয়।" মহাজনের পুত্রের বাক্য শুনিয়া ঐ বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ পুরুষ উহাকে সন্তুষ্ট করিল এবং বই খাতা ভাল করিয়া দেখিয়া তিনি তাহাকে কহিলেন, ভাই, তুমি কোন চিন্তা করিও না। খাতাতে যাহা কিছু আছে সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিন্তু তুমি প্রথমে এক কার্য্য কর, আমি তোমাকে টাকা দিতেছি তাহাতে মন্দিরের শিখর যেরূপ ছিল ঠিক সেইরূপ নির্ম্মাণ করিয়া দাও। দেখিও প্রথমে যেরূপ গুম্বজ প্রস্তুত ছিল ঠিক সেইরূপ প্রস্তুত করাইবে, তাহাতে অণুমাত্রও ফেরফার না হয়। অনন্তর যখন চৈত্র সুদী অষ্টমী আসিবে সেই দিন প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিবে। বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং টাকা লইয়া সে আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং মন্দিরের শিখর পুর্ব্বে যেরূপ ছিল ঠিক ঐ রূপই প্রস্তুত করাইয়া চৈত্র সুদী অষ্টমীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যখন চৈত্র সুদী অষ্টমীর দিন আসিল তখন উপরিউক্ত বৃদ্ধ পুরুষকে নিজ গৃহে আনাইল। এবং উহারই অনুমতি ক্রমে ঐ দিবস খুব উৎসব করিল। উৎসাহ ও আনন্দে যখন মধ্যাহ্ন বারটা হইল তখন ঐ বৃদ্ধ পুরুষ বলিল "চল সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিতে যাই।" তখন পুনরায় সকলে দর্শন করিতে গেল। দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গুম্বজের ছায়া দেখিয়া উক্ত বৃদ্ধ পুরুষ কহিল, ভাই! মন্দিরের শিখা যেখানে আছে সেই খানেই তোমার পোনের লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা পোতা আছে। ঐ স্থান খনন করিলে ঐ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। তখন পুনর্ব্বার মহাজনের পুত্র মজুর ডাকাইয়া ঐ স্থান খনন করাইল। এবং সেই স্থান হইতেই মুদ্রা বাহির হইল। তখন মুদ্রা পাইয়া মহাজনের পুত্র পুনর্ব্বার ধনবান্ হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

হে শিষ্য! দেখ খাতা বহিতে যাহা কিছু লেখা ছিল তাহা মিথ্যা নহে। অক্ষরও স্পষ্ট, সকলেই তাহা সুন্দর রূপে পড়িতে সক্ষম, অর্থও বুঝিতে সমর্থ, গুম্বজেও সুবর্ণমুদ্রা সমস্ত ছিল কিন্তু অন্য দ্বারা সুবর্ণমুদ্রা অনুসন্ধান হইল না। কারণ পাঠ ও অর্থ বোধ বিষয়ে ত সকলেই নিপুণ ছিলেন কিন্তু "চৈত্র মাসের অষ্টমীতে দিবস বার ঘটিকার সময় মন্দিরের শিখরদেশে স্বর্ণমুদ্রা রক্ষিত হই-

যাছিল" এই বাক্যের তাৎপর্য্য কাহারও বুদ্ধিতে আইসে নাই। অবশেষে ঐ বৃদ্ধ বিবেচনা করিল যে পোনের লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা মন্দিরের উপরিস্থিত শিখরে রাখা যাইতে পারে না, যেহেতু এরূপ ক্ষুদ্র শিখরদেশে পোনের লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা ধরা অসম্ভব। একারণ মন্দিরের ছায়া ভূমিতে অবশ্য রক্ষিত হইয়া থাকিবে। যেহেতু যেরূপ খাতাতে লিখিত আছে সেই সময়ে মন্দিরের শিখরের ছায়া যে স্থানে পড়িবে ঐ স্থানকেই মন্দিরের শিখর বলিয়া ধরা উচিত। কিন্তু যদি লিখিত সময়ের বিরুদ্ধ কোন অন্য মাস অথবা তিথিতে শিখরের ছায়াও দেখা যাইবে তাহা হইলে সুবর্ণমুদ্রাব কদাপি প্রাপ্তি হইবে না। সুতরাং ঐ লেখার যথার্থ অভিপ্রায় কোন বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ অবগত হওয়ায় ধন পাওয়া গেল।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে এবং তাহার শব্দার্থ বুঝিতে অনেক মহাত্মা সমর্থ আছেন এবং তাঁহারা ইহাও অবগত আছেন যে পরমাত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণ দেহত্রয়ের দ্রষ্টা, অবস্থা-ত্রয়ের সাক্ষী, পঞ্চ কোষাতীত এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এবং এ কথাও সত্য যে, দেহরূপ শিখরমধ্যে সচ্চিদানন্দ আত্মারূপ ধন নিহিত আছে এবং শ্রুতি স্মৃতি পুস্তকেও এ কথা স্পষ্ট লিখিত আছে যথা "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হৃদয়স্থ-জ্যোতিঃ" (শ্রুতি) "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" (গীতা)। তথাপি ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু দ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সবিশেষ অবগত হওয়া ব্যতিরেকে আত্মধন প্রাপ্তি কদাপি হইতে পারে না।

ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি ঋগ্বেদাদি চারি বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন "ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং ভগবন্ বেদ্মি" কিন্তু আত্মজ্ঞান না হওয়াতে মহান্ শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। অবশেষে যখন কিছু-তেই শান্তি না পাইয়া সনৎকুমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার উপদেশে নিরতিশয় সুখস্বরূপ পূর্ণ আত্মাকে অপরোক্ষ রূপে অবগত হইয়া দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদে বিশেষরূপে বিস্তারিত নিরূপিত আছে। এই গুরুমূর্ত্তি সনৎকুমারকে আবার পরম গুরু দেবাধিদেব শঙ্কর ভগবান্ দক্ষিণামূর্ত্তি রূপে উপদেশ প্রদান করেন। অতএব গুরু শিষ্য পরম্পরা বেদজ্ঞ অপরোক্ষ জ্ঞানী গুরুর নিকট হইতেই শিক্ষা

ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যদি কেহ বিবেচনা করেন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহার নিতান্ত ভ্রম। গুরু শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এইরূপ এই উভয় না হইলে কদাচ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই। আজ কাল কৃতবিদ্য অনেক সম্প্রদায় ভ্রমে পতিত হইয়া বৃথা জ্ঞানের লালসায় কালাতিপাত করিতেছেন।

কথিত আছে—"সদ্‌গুরু মুখে সমজী লেজো।
তো ব্রহ্ম সুখ পাবে আজো।

প্রথমে কহিয়াছি যে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণে যাইয়া তাঁহার উপদেশ বিনা কেবল নিজের বুদ্ধি বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার রূপ অপরোক্ষ বোধ (জ্ঞান) হয় না।" এজন্য একপ গুরুর শরণে যাইয়া তাঁহার কথা প্রমাণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ মুমুক্ষু নিশ্চয় করিয়া নিজের হৃদয়ে ধারণ করিবে। এক্ষণে ঐ সদ্‌গুরুর উপদেশ নিরূপণ করিতেছি।

ষষ্ঠ প্রামাণ্য বিষয়

হে শিষ্য! মুমুক্ষু পুরুষকে গুরু যেরূপ উপদেশ দেন তাহাকে শিষ্য আপন মন নিশ্চল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে। মন নিশ্চল রাখিবার বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছি তাহা মন দিয়া শ্রবণ কর।

(গুরুর উপদেশ একাগ্রচিত্তে ধারণ করিবার বিষয়ে চারিটী দৃষ্টান্ত)

(১)

কোন স্থানে দুই প্রতিবেশীত পরস্পর ঈর্ষা দ্বেষ বিবাদ চলিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন আপন গৃহে বসিয়া আছে এমন সময়ে তাহার একটী বন্ধু তথায় উপস্থিত হইল। বন্ধুর সহিত প্রতিবেশীর নানা প্রকার গুহ্য নিন্দাবাদ হইতেছে এই বার্ত্তা কোন লোক প্রতিবেশীর নিকট বলিয়া দিল। সে তাহা শুনিয়া সেই গৃহের কানাচে কিম্বা অন্য যে কোন স্থান হইতে প্রতিবেশীর কথা উত্তম রূপে শ্রবণগোচর হয় সেইরূপ স্থানে গোপন ভাবে বসিয়া শুনিতে লাগিল। কথা শুনিবার সময় প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ ও নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও চিত্তকে একটুও অন্যমনস্ক হইতে দেয় না, বরঞ্চ সমস্ত কথা একাগ্রচিত্ত হইয়া শুনিয়া স্মরণ করিয়া রাখে। সময় ক্রমে উহা পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

ঐ ব্যক্তির ন্যায় মুমুক্ষুও সদ্‌গুরুর উপদেশ সম্বন্ধে মনে রাখা আবশ্যক।

এবং শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা মান অপমান সহ্য করিয়া গুরুর উপদেশ হইতে আপনার মন কদাচ অন্যত্র বিক্ষেপ হইতে দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে।

(২)

যে প্রকার ধনাভিলাষী কোন ব্যক্তি ধন প্রাপ্তির জন্য নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিয়া থাকেন। যদি উহাকে কেহ কহে, আমি তোমাকে ধন প্রাপ্তির উপায় কহিব, যদি তুমি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য কর তাহা হইলে তোমার অনেক ধন প্রাপ্তি হইবে। উহা শুনিয়া ধনাভিলাষী যুবা যে প্রকার একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার কথিত উপায় শুনেন সেই প্রকার।

(৩)

কোন স্বর্গপ্রাপ্তি-ইচ্ছু পুরুষের সমক্ষে যদি কেহ স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় কহে তাহা হইলে সেই স্বর্গেচ্ছু যেরূপ একাগ্র মনে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন সেই প্রকার।

কোন রাজ্যপ্রাপ্তেচ্ছু পুরুষকে যদি কেহ বিজয়ের যুক্তি এবং সন্ধান কহেন তাহা হইলে তিনি যেরূপ উহা অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া শুনেন সেই প্রকার।

মুমুক্ষু সচ্চিদানন্দ আত্ম-বোধের নিমিত্ত সদ্গুরুর উপদেশ একাগ্র অন্তঃকরণে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু দ্বারা শ্রুত বেদান্ত বাক্য নিদিধ্যাসন করেন।

শ্রবণ বিষয়ক দৃষ্টান্ত

যে প্রকার বীণা সহ তান মান লয় শ্রবণ করিয়া বনের হরিণ নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া তন্ময়চিত্তে গান শ্রবণে নিমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ একাগ্রচিত্ত শিষ্য গুরু-মুখনিঃসৃত তাৎপর্য্য সহিত বেদান্তবাক্য শ্রবণ করেন, পরে শ্রুত গুরূপদেশ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত না সংশয় নাশ হয় তদবধি মনন করেন।

মনন বিষয়ক দৃষ্টান্ত

গাভী মাঠ হইতে চলিয়া আসিয়া একান্তে বসিয়া গিলিত চর্ব্বণ করিতে থাকে, তাহাতেই তাহার অতিশয় তৃপ্তি জন্মে; সেইরূপ বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ একাগ্রচিত্তে খুব মনন করিলে দৃঢ় বোধ হওয়াতে অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হয়।

যে প্রকার বাদাম, পিস্তা, মিছরী এবং সুস্বাদু দ্রব্য প্রভৃতি যতই দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া আহার করা যায় ততই উহাতে সুস্বাদ অনুভূত হয় এবং উহার পরিপাক কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া দেহকে পরিপুষ্ট ও দৃঢ় করে সেইরূপ বেদান্ত বাক্য বারম্বার মনন দ্বারা অভেদ জ্ঞানরূপ আস্বাদ জন্মে এবং আত্মজ্ঞান পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

নিদিধ্যাসনের দৃষ্টান্ত

এইরূপ মনন করিবার পর সজাতীয় প্রত্যয়ের গ্রহণরূপ এবং বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার রূপ নিদিধ্যাসন করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে বিশুদ্ধ আত্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ এই যে আমি সচ্চিদানন্দ কূটস্থ, অক্রিয়, অজর, অমর পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এবং সদা মুক্ত স্বরূপ আত্মা। তদ্রূপ বিজাতীয় প্রত্যয়ের প্রবাহ এই যে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র নহি; আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী নহি; আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, পুরুষ, স্ত্রী, বালক যুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুঃখী নহি। এই প্রকার বিচার দ্বারা বারম্বার দেহাধ্যাসের তিরস্কার করিবে।

হে শিষ্য! এই প্রকার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে করিতে তোমার জ্ঞান এপ্রকার দৃঢ় হইবে যে আমি আত্মা নির্বিকার, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ ইহাই অনুভব করিতে পারিবে। এইরূপ সাক্ষাৎকার হইলে তুমি নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ব্ববৎ কথিত দ্বিতীয় প্রামাণ্য স্থলে শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছিল যে "জন্মমরণ কিরূপে নিবৃত্ত হইবে" তাহাতে যদিও গুরু শিষ্যকে ঐ প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট কহিয়াছিলেন "সদ্‌গুরু কহেন, স্ব-স্বরূপ অবগত হও তাহা হইলে জন্ম মরণ দুঃখ নিবৃত্ত হইবে" তথাপি আরও স্পষ্টরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত প্রথমে "অহং মমেতি" ইহার ব্যাখ্যাতে বিস্তারপূর্ব্বক কহিতেছেন শ্রবণ কর।

গুরু:—হে শিষ্য! তুমি প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে "আমার জন্ম মরণ কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ আমার বন্ধন কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ আমার বন্ধন কিরূপে যাইবে।" ইহার উত্তর এই যে "কোন বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান বিনা গ্রহণ বা ত্যাগ হইতে পারে না।" অর্থাৎ যে যাহাকে উত্তমরূপ জানে সে তাহাকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারে।"

আর যে পর্য্যন্ত বন্ধনের স্বরূপ জ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত কিরূপে তাহার নিবৃত্তির উপায় হইতে পারে? যেরূপ কোন রোগের যথার্থ নিদান না জানিলে তাহার পরীক্ষা হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ তুমি যে পর্য্যন্ত না বন্ধনের স্বরূপ জানিবে সে পর্য্যন্ত উহার নিবৃত্তির উপায় কিরূপে করিবে? এজন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি অদ্যাবধি বন্ধনের স্বরূপ জান কি না?

(ক্রমশঃ)

বিশেষ নিবেদন।

ছাপাখানার গোলমাল ও যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে পন্থার প্রকাশ কার্য্যে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের একতম স্বত্বাধিকারী অঘোরনাথ দত্ত মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমননিবন্ধন আমাদের পন্থার প্রকাশ কার্য্যে অনেক বিলম্ব হইয়াছে। অঘোর বাবু সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের শান্তি কামনা করি। ভরসা করি আমাদের গ্রাহকগণও এই পরলোকগত আত্মার ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিমিত্ত তাঁহাদিগের শান্তিময়ী চিন্তা বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

হিন্দু-সখা।

সম্পাদক শ্রীরাজকুমার বেদ-স্মৃতি-কাব্যতীর্থ ও শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্। হিন্দুসখা মাসিকপত্র ও গ্রন্থপ্রচারক, ধর্ম্ম-সমাজ ও ইতিবৃত্তাদি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশই ইহার প্রধান কার্য্য। তাহা ছাড়া অবশ্য জ্ঞাতব্য সাময়িক সংবাদাদিও প্রচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং একাধারে ইহা সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারক ও সংবাদপত্র স্বরূপ। বার্ষিক মূল্য অতি সুলভ ১৷৷ টাকা। উপহার কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ—মাত্র ডাক মাশুলে সকলে হিন্দুসখার গ্রাহক হইয়া সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার করুন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দিন।

কৈকালা পোঃ (হুগলী)

হিন্দুসখা কার্য্যালয়ের অন্যান্য বিক্রেয় পুস্তক। ১। ভাষাদর্পণ—বঙ্গভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ইহা হইতে যেমন উপকার পাইবেন, সাধারণ লোকেও তেমনই অনেক কথা শিখিতে পারিবেন। মূল্য ৷৷০ আনা। (২) সামবেদসংহিতা—প্রতিখণ্ড ৷৷০ আনা; মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সহ। (৩) নারীচিত্র—৷৵০। (পৌরাণিক স্ত্রীচরিত্রের সমালোচনাসহ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক)। (৪) তারকেশ্বর তথ্য ৷৷৵০ আনা। (বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৺তারকেশ্বর-ধামের সচিত্র ইতিহাস)। (৫) উপন্যাসকুঞ্জ ৷৷০ আনা (সত্যঘটনামূলক সমাজ-শিক্ষক উপন্যাস)। (৬) সন্দর্ভহার ৷৷৵০ আনা। (ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্ব্বিধ প্রবন্ধের সমবায়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ)। (৭) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা—৷৵০ আনা। (বাঙ্গালাপদ্যে স্মৃতিগ্রন্থ)। (৮) কাব্যমালা—৷৵০ (৩য় সংস্করণ) (নানা রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতাবলী)। (১০) কুমারসম্ভবম্ ৷৵০ (১ সর্গ)—(বঙ্গাক্ষর, মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)। (১১) দেবসমিতি—৷০ আনা।—(ছাপা কাগজ সুন্দর। রূপক ছলে স্বদেশ কথা)। (১২) নিশীথ চিন্তা—৵০ আনা। (ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের সুন্দর অনুবাদ)। (১৩) গীতিকুঞ্জ ৵০ আনা। (নানাবিধ গীত ও গীতমাহাত্ম্য)।

কলিকাতা, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর হইতে
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ কর্তৃক প্রকাশিত।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।]	মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২২।	[৭ম সংখ্যা।

গৈবীনাথ দর্শনে।

এই কি সে গিরি গঙ্গা বক্ষে, যার
শৃঙ্গে গঙ্গাধর ত্রিশূল ধারী
লিঙ্গ মূর্ত্তি ধরি বিরাজেন সদা
এই রম্য স্থান পবিত্র করি ॥

জটা বিহারিণী পবিত্রা জাহ্নবী
স্বামী শিরো-বাসে না বাসি সুখ,
পূজিতে তরঙ্গে পাদদেশ তাই
ধরে গৈবী-গিরি পাতিয়া বুক ॥

অর্দ্ধ নিমজ্জিত শিলা খণ্ডচয়,
ফুল্ল কোকনদ শোভিছে স্থান,
কটি তটোস্থিত শ্যামল পাদপে
তুলিছে বিহগ মধুর তান ॥

হরষিত চিত সাধক সেবক
পবিত্র সলিলে করিযে স্নান
"হর হর বম্ হর হর বম্"
সঘনে গাইছে বিভুর গান॥

নাহি দ্বেষ লেশ কুটিল কুভাব
হিংসা প্রলোভন হেথা না পশে,
শান্তিময় এই শান্তি নিকেতন
সকলে বিভোর ভকতি বসে॥

কি বৃদ্ধ বালক ভক্তির প্রসঙ্গ
সকলেই গুরু সকলে চেলা,
সব ভক্তিবাদ নাহি প্রতিবাদ
বোধ হয় যেন ভক্তির মেলা॥

কামিনী কাঞ্চন কামনা রহিত
ভব শোক তাপ গিয়াছে ভুলে
বিভুর প্রভাবে যেন মায়া তার
ছিন্ন, জ্ঞান চক্ষু গিয়াছে খুলে॥

গিরি-বক্ষ-ধৃত খোদিত সোপানে
উঠিছে সকলে ভকতি ভরে
ফল বিল্বদল চন্দনে চর্চ্চিত
লয়ে পুষ্পহার পূজিতে হরে॥

মন্দির প্রাঙ্গনে উপনিত হ'যে
"জয় গৈবীনাথ" সকলে গায়
কি ভাব তখন উপজে হৃদযে
লেখনী বর্ণিতে না পারে তায়॥

সকলের যেন একটি হৃদয
সকলের যেন একটি প্রাণ

"হর হর বম্ হর হর বম্"
এক কণ্ঠে যেন উঠিছে তান ॥

অর্পি উপহার নমি কৃত্তিবাসে
গললগ্ন বাস যুড়িয়া করে
প্রেমেতে বিভোর করে কত স্তব
কেহ বা ভূমেতে লুটিয়া পড়ে ॥

"কে বুঝিবে লীলা ইন্দু বিভূষিত
দেবেন্দ্র পূজিত শ্মশানে বাস
কাঙ্গালের বেশ, তুমি আশুতোষ
প্রসন্নে করহে চরণে দাস ॥

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস, বি, এ।

শর্ম্মার পত্র।

২য় সংখ্যা।

শ্রীযুত পন্থা সম্পাদক মহাশয়েষু—

মহাশয় মুক্তকণ্ঠে আপনার গুণ-গান কচ্ছি। আশীর্ব্বাদ করি আপনার প্রতি সদানন্দের অসীম কৃপা বর্ষিত হউক, সদানন্দে আপনার মতি সুদৃঢ় হউক। মহাশয় এ শর্ম্মার সদানন্দ সেবার সুবিধা করিয়া দিয়া যে অক্ষয় পুণ্য ও কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন তাহাতে আপনার পরমার্থ লাভের যে বেশী বিলম্ব নাই—শর্ম্মা তাহা দিব্য-চক্ষে দেখতে পেয়ে একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন যে আপনি যদি সহসা এই ধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তবে মাদৃশ মহাপুরুষের কদর কে বুঝিবে? যাক আপনি চিরঞ্জীবি হয়ে শর্ম্মার সদানন্দ সেবায় সুব্যবস্থা করিতে থাকুন, আর

পন্থার ছাপাকারদিগের মুণ্ডপাত করুন, উহারা কোন সাহসে শ্রীকমলাভ্রান্ত শর্ম্মাকে 'কমলাকান্ত' করিল।। এজন্য মানহানীর মোকদ্দমা রুজু করিব নিশ্চয়ই, কিন্তু কাহার নামে? যে ব্যক্তিই দোষী হক যদি রফা করিতে চাহেন তবে অতি শীঘ্র সেবার ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না, আপনাকেই ওকালত নামা দিলাম। দ্বিতীয় কথা এরূপ মূর্খ লইয়াই যখন কায করিতে হইবে তখন আর বিশেষ নামাদির পাঠ তুলিয়া শ্রী—শর্ম্মা বলিয়া দস্তখত করিলেই আমাকে চিনিয়া লইবেন এবার থেকে আমি তাহাই করিব।

কিন্তু যাই বলুন আর যাই করুন—শর্ম্মা কিন্তু তাহার আসল খেই ছাড়ছেন না। আমার আমি বদলান চাই। আমার আমির মজার কাহিনীর কতকটুকু লিখে জানিয়েছি, কিন্তু আমির যে অনন্ত লীলা তাহার কত টুকুই বা লিখা যায়।—

ব্রহ্মাণ্ড কাগজ যদি মৈনাক লেখনী
কালি তোয় নিধি কিম্বা মম স্বেদ পানি
তবুও লিখিতে নারি 'আমির কাহিনী'

তথাপি যখন আপনাকে আমার আমির ভবরোগ—থুড়—আমি-রোগবৈদ্য নির্ব্বাচন করিয়াছি তখন আপনাকে যথাসম্ভব কিছু না বললেও চলছে না, তাই বলা। আপনারও বিরক্ত হইলে চলবে না, শুনে বুঝে রোগ নিদান ঠিক ক'রে নিন।

বাবা সদানন্দের অনুকম্পায় যখন আমি-আমি হয়ে সেই ইচ্ছা আমাকে নিয়ে খেলা কর্‌তে থাকি তখনকার রঙ্গরস, লীলাবিলাসের কথা'ত বলা যায়ই না, আর বললেই বা বুঝে কে? যাক—আমি'ত ঐ রকম বার বার মরি, অর্থাৎ মরিয়াও মরি না, এক একটা সাজ ছাড়ি মাত্র, ধরুন যেন পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরি, কেবল একটা রকম বদলাই মাত্র, তাতে'ত আর আমি বদলাই না একথাটা সকলেই বুঝে। ফলে কিন্তু আমার আর মরা হচ্ছে না। ফল কথা যখন আমি একান্ত বিরহে—'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব'—বলে কাঁদুনে সুরে গান ধরি তখনই ইচ্ছা ঠাকরুণ পিঠে হাত বুলিয়ে ঠিক সুর করে বলেন—"আহা, ষাট মরবে কেন? রাঙ্গা কাপড় দিব"—ব'লে নূতন রাঙ্গা কাপড খানি পরিয়ে দেন ও রঙ্গরসের খেলা জুড়ে দেন।।

ঐ ইচ্ছা-আমি ঠাকুরুণ আমি-আমিকে কত-কি করছেন। কত-কি দেখাচ্ছেন॥ তাঁর নিজের মরমের আদরে মাখিয়ে, কত রকমের সাজ দিয়ে, কত মুখোস পরে, কত নূতন সং হয়ে আসছেন—কত মধুর আলাপন কত প্রাণের কথা বলছেন। আর একটু যাই বিরক্ত হয়ে উঠছি দেখছেন, সব যেন ভেঙ্গে চুরে দিয়ে সোঁ—করে আমায় কোলে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছেন, সেই উধাও হয়ে যাওয়াটা-কেই আমি ভাবছি মরণ, তা ফলে কিন্তু মরা টরা কিছু নয় কেবল সাজ বদলান, খেলায় নূতন রং ঢালা মাত্র। যাকে এবারও আমি ভাবছি বুঝি মরে গেলাম, কিন্তু আমি'ত আর মরব না। তিনি যেমন এক দিকে ফট্, ফট্ করে ফেটে ফেটে অনেক হয়ে গিয়েও ঠিক একই থেকে যাচ্ছেন, আবার সেই অনেক গুলি ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক নিয়ে কি এক মজার কায়দায় একটা বড় আমি হচ্ছেন, সেই বড় আমি গুলি কিন্তু অনেক নয় বোধ হয়, যেন একটাই, তবে ক্ষুদে 'আমি'রা কেবল যার যার চোখে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখে। যেমন শিশুরা চাঁদ দেখে সকলেই বলে এটা আমার বাড়ীর চাঁদ। এই সকল ক্ষুদে আমি দিয়ে একটা বড় 'সব' গড়া যে বললাম তা ব্যাপারটা যে কি তা আপনারা বুঝতে পারবেন কি ? বোধ হয় না। তবু বলি যেমন এই সাহেবরা মনে করেন তাঁদের শিকার বৃত্তির ও উদর বৃত্তির তৃপ্তির জন্য সংসারের যত পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট, পতঙ্গাদির সৃষ্টি, আর হিন্দুরা কেউ কেউ ভাবেন দুনিয়ার যত কিছু সবই তার সুখের আস্পদ, তার সুখ হবে বলে ভগবান সব গুলি সাজায়ে গোছায়ে রেখে দিয়েছেন। কথাটা হল এই, প্রত্যেকেরই এই ধারণা এই জগতের যাহা কিছু সকলই তার নিজের জন্য, কাযেই তার তিনি একটা আমি আর সকল দুনিয়া আর একটা 'সব' হয়ে পড়ল। এইটা ঠিক তেমন। ক্ষুদে-আমি কথাটা শুনে আপনারা ভাবতে পারেন যেমন ক্ষুদ মানে হল চাউল বা গমের কণা, আপনারা যাকে আটা বলেন, তা কথাটা ঠিক তেমনই খানিকটা বটে। খুব অণু অণু'ত বটেই পূর্ব্ব বঙ্গের কবিরাজ মহাশয়েরা যাকে 'ফাকি' বলেন, শুদ্ধ কথায় ফল্গু বা ফা'গ। এই ক্ষুদে আমি গুলিও ফাকিই। সেই কতকগুলি ক্ষুদে আমি যেন কলের যাতায় পেশা হয়ে আটা হয়ে আছে আর খানিকটা স্নেহ দ্রব্য (যেমন ঘি) মেখে তার সঙ্গে খানিকটা রস দ্রব্য, অর্থাৎ জল দিয়ে সেনে এক খানি অখণ্ড মণ্ডলাকার লুচি গড়িয়ে ফেলেছ। না ? কথাটা মোটা মুটি বুঝিতে গেলে

তেমনই বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র বা বড কেবল বোধের তফাৎ, আকার আয়তনের কোনও কথাই তাতে নাই। আরো একটু মজা এতে আছে। সেইটুকুই হল আসল মজা—ঐ যে ছোট আমিও ভাবছে আমি-আমি, আর বড আমিও ভাবছে আমি-আমি, সেই দলটার মধ্যে থেকেই ছোট্ট আমিটা তার নিজকে বাদ দিয়ে ভাবছে ঐ দলটা আমার পাওয়া চাই, আর বড আমিটা হাসছে "ও আমায় ছাড়া বলে ভাবছে ওকে আমার করা চাই।" এই দুই আমির মধ্যে এক মহা টানাটানি ব্যাপার। তা বলতে পারেন যে এ আবার কেমন টানা টানি? গায়ে গায়ে লেগে থেকে কি আর টানাটানি হয়? দূরে দূরে থাকলেই সে টানাটানি চলতে পারে? তা সত্য' কিন্তু এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে যদি পরস্পরের বিচ্ছেদ বিরহ সম্ভব হয় তবে এই টানাটানিও হয়, কারণ এ হাত পায়ের টানাটানি নয় এটা হল বোধের টানাটানি কিনা? তবে এই বলতে পারেন দুইটাই যখন দুটিকে টানছে তবে দুটা মিলে একটা হয়ে থাক না কেন? কথাটা বলা বড়ই সহজ। কিন্তু মজাটুকই ঐ খানে। যার যার বাড়ীতে অনুসন্ধান করে দেখবেন কেন হয় না? দুটা মিশে একটী হয় না কেন?

কিন্তু হয় হয় হয় হয় না—

হয় যদি তাও ক্ষণেক থাকে আবার কেন রয় না?

এই পিরীতের এখানেই মজা। সবাই যার যার কোলের দিকে টানে বলেই হয় না। যেখানে এর টান আর ওর টান মিশে গিয়েছে সেখানে আর টান নাই বলেই বোধ হচ্ছে। সেখান থেকেই দু টান দু দিকে চলে যাচ্ছে, ফলে যার টান তার কাছেই হাজির হচ্ছে। বড়র টান ছোটর কাছে গেলে ছোট তাকে তার নিজের টান মনে করে আরো জোরে টানছে আর হাগবাণ হচ্ছে, ফলে টানাটানিই সার, কেউ কাহাকেও পাচ্ছে না।

ফলে যেয়ে,—"যার টান তারি আছে মিছা বলা গেল গেল।" এই টানের মজা যে একবার টানে পড়েছেন তিনি টের পেয়েছেন, যে গা ভাসান দিযাছে সে বুঝেছে এই টানেই কিন্তু রাধা কলঙ্কিনী, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি।

এবার—শর্ম্মার আমি এরই একটা আমি হ'য়ে পড়ল। তাহলেও সেই অগাধ অপরিসীম সমূদ্রে ভাসাটা ঠিকই ছিল। শর্ম্মার বোধ হচ্ছিল

সেই মরে, গিয়েও শর্ম্মা অপরিসীম সাগরেই ভাসছিল ও ভাসতে ভাসতে একটা কিছু হয়ে পড়ল। এখন কথাটা হচ্ছে ভাসা ও হওয়ার মধ্যে কোনটা তার স্বভাব? এই ভাসাই যদি স্বভাব হয় তবে আবার হওয়া কেন? আর হওয়াই যদি ঠিক হয় তবে ভাসা কেন? যাক, সেই ভাসতে ভাসতেই একটা আমি হল। আর আমির যদিও হওয়া হবি কিছুই নাই তবু কথার খাতিরে বলছি ঐ যে ক্ষুদে আমি তারই একটা ক্ষুদে আমি হওয়া গেল। ক্ষুদে আমি বলাটা কিন্তু আপনাদের কথায় আর শর্ম্মার নিজের কথায় বলতে হলে শর্ম্মার আমিই প্রকাণ্ড আমি, আর যে একটা সবআমির কথা বলা হচ্ছিল ওই শর্ম্মার বাহিরের যা কিছু তাহার অনেক গুলি কিনা-কিছু মিলিয়ে জুলিয়ে নিয়ে একটা খিঁচুড়ী বা হ-য-ব-র-ল। শর্ম্মা ভাবছেন ঐ খিঁচুড়ীর দলাটা আত্মসাৎ করাই চাই কারণ আমি যা চাই তা ঐ দলাটায় সবই আছে। শর্ম্মা ভাবছেন যা করেই হ'ক ঐ সবটা ভোগ করতেই হবে, তাই খুব জোর করে ঐ দিকেই চলছেন, ঐ দোটানার মাঝখানে গিয়েই আহ্লাদে আটখানা, আর যাবে কোথা? এই যে আমিই সবার মালিক, আমিই কর্ত্তা আমি সর্ব্বে সর্ব্বা।। ওঃ যাঃ, সব ভোঁ—ভাঁ। ঐ গাঁটটার কাছে যেতেই দেখছি 'তুমি সে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'—আবার সেই ভাসা সেই ভাসা অর্থাৎ লোকের কথায় আমি মরে গেলাম।

আমার কিন্তু ঐ দলটা নেওয়া চাইই চাই। এমন করে কতবার জলে ডুবে, কতবার আগুণে পুড়ে, কতবার রোগ ভুগে মরলাম, কতবার কত লোকে, পশুতে আমাকে মেরে ফেল্লে আমি কিন্তু কিছুতেই মরি না। প্রত্যেক বারেই মরে বাঁচি, আর আমার ইচ্ছা-আমির নূতন নূতন খেলা দেখে হেসে হেসে ভাসি, সবগুলিই খেলা, বেশ স্বপনখেলা, বলে মনে হয় এমন করে যে কত খেলাই খেলছি। কতবার কত অদ্ভুত চেহারা হল, কত অদ্ভুত নাম হল আর কত অদ্ভুত জীবের সঙ্গে দেখা হল। কত কি? কত রঙ্গ কত দুঃখ, কত সুখ, কত মজা।।

এবার আমি একটা খুব জাঁদরেল আমি হলেম। আমার জানি কি জানি-কেমন একটা কি নাম হল, আবার তার কি রূপ—বাহবা, যে দেখে সেই রূপ দেখে ভুলে যায়। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে—

"দেখে আমার রূপের বাহার সবে করে কানাকাণি
ত্রিভুবনের মধ্যে আমি হলেম একটা কি জানি ?"

আমার বাড়ী, আমার ঘর সব অত্যাশ্চর্য্য, সে কি বিরাট পুরী। চারি-দিকে কত দেয়াল, কত পরিখা, কত কি ? সাত সাতটা অঙ্গন, নয়খানি ফটক তার প্রত্যেক দুয়ারে মস্ত মস্ত জোয়ান দারোয়ান। আমি আমার সেই পুরীর ভিতরে থেকে শত শত সুন্দরী রমণী, মধুর উপাদেয় খাদ্য পানীয় ও সুগন্ধ ও সুরুচীর দ্রব্যাদি ভোগ কচ্ছি ? সুখ বলে সুখ—সুখের আর সীমা নাই। কিন্তু ও যাঃ কোথা থেকে একটা কাল সাপ এল। বাবা।। তার ফণাগুলি কি প্রকাণ্ড। মুখটা কি বিশ্রী, হাঁ টা কি বিকট, টুক টুক করে সে, আমার সেই যে এমন সুন্দর পুরীখানি তা খেতে লাগল। বেশ অনায়াসে খাচ্ছে। কোনও গোল নাই, শত বাধা দিতে যাও, তার তাতে দৃকপাত নাই, অবলীলা ক্রমে খাচ্ছেই। শেষ কালে আমাকে বেশ স্বচ্ছন্দে গিলে ফেল্লে আমি মরে গেলাম। মরার আগে ভেবে ছিলাম এমন পুরীর মধ্যে এত সাবধানে থেকেও মরতে হল, কিছুতেই না মরে পারলাম না। কিন্তু যাই দেখলাম যে মরে গিয়েছি তখনই দেখি যেন মরি নাই' ত। আমি ঠিক আমিই আছি। যাক আমার এত করেও ঐ দলাটী পাওয়া হচ্ছে না। যাই ওর একদিকে একটু পাই পাই করি অমনি মরে যাই।

আমি ঠিক বুঝিয়াছি ঐ দলাটা আমার পাওয়াই চাই, ওটা আত্মসাৎ করাই চাই না হলে আমার সুখ নাই, সোয়াস্তি নাই। কিন্তু কি করে ওকে পাব, কি করে ধরব, কে আমাকে সেই কৌশল বলে দিবে ? এই প্রকার একটা বুদ্ধি মনে এল। সেই বুদ্ধিরই আর একটা দিক যেন বলে উঠল "কর্ম্ম কর কার্য্য না করলে, খাটা-খাটুনি না করলে, কষ্ট না করলে ওকে পাওয়া যায় না।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করলাম' মহাশয়, আপনি কে ? তিনি বল্লেন, আমি কে তা তুমি এখন জানতেও পারবে না বুঝতেও পাবরে না, তবে এ পর্য্যন্ত জেনে রাখ আমিও তোমার মতই কিছু, তোমার মত অনেক কষ্টে অনেক সন্ধানে ঐ দলাটা আমার আত্মসাৎ হয়েছে। এখন যা'রা ওটা সব চায় আমি তাদের কৌশল বলে দিই, সন্ধান বাতলে দিয়ে থাকি ; তোমাকে সাহায্য করাই আমার কায, আমি তোমায়

বড় ভাল বাসি, অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে পেছনে ফিরছি।

আমি। তবে কি আপনি আমার গুরু ?

তিনি। গুরু বল, দাদা বল, বাবা বল, ও সব তোমাদের কথা। তোমরা সংসারের লোক একটা সম্বন্ধ না হলে, মমতা না হলে,—তোমাদের আপনার বোধ হয় না। আজ তুমি আমাকে পৃথক দেখছ বটে, কিন্তু পরে দেখতে পাবে 'তুমি আমি মূলে অভেদ,' ঐ যে বড় আমি টা দেখছ, ওটাও তোমারই বড় দিকটা, আমি ও তাই। যাক তোমার না ঐ দলাটা পাওয়া চাই ?

আমি। হ্যাঁ মহাশয়।

তিনি। কতবার ঐটা পেতে চেষ্টা করেছ, কিন্তু কোনও বারই ওকে ধরতে পাচ্ছনা, কেন বলতে পার ?

আমি। না, তা'ত বলতে পারি না।

তিনি। আচ্ছা তুমি একটা কাজ করতে পার ? তোমার এই ধরাধরির কুস্তি কসরৎ খানিকটা ছেড়ে দিয়ে, তোমার ও ওর টানের দিকে চোখটা ফেলতে পার কি ?

আমি। তা পারব না কেন, মহাশয়।

তিনি। তাই দেখ দেখি কি দেখতে পাও ?

আমি। তাইত। দেখছি—মাঝখানে একটা জায়গায় যেন টান, মান কিছুই আর নাই। আমার টানটা যেন ওখানে গিয়ে থেমেছে, ওখান থেকে আমার টানই যেন আমার দিকে ফিরে আসছে। আমি যে কেবল আমাকেই টানছি ? বাহবা। গল্পের গেঁজেল মাঝির 'মত' খোঁটার বাঁধন না খুলে রাত ভোর নৌকা বেয়েই যাচ্ছি, ফলে ঘাটের নৌকা ঘাটেই থেকে যাচ্ছে।

তিনি। তবে বাপু বল দেখি, তোমার এখন কি করা চাই ?

আমি। আমার টানটা যাতে সোজা যেয়ে ওর উপরে পড়ে, তাই করতে হচ্ছে। তা কি করে হবে ?

তিনি। তার জন্যই 'কর্ম্ম' চাই। যেই বাঁধন গুলি তোমাকে আট্‌কে রেখেছে, সেই বাঁধন গুলি ছাড়াতে হবে। এই সাবেক বাঁধন ছাড়ানের নামই হচ্ছে "কর্ম্ম।" শাস্ত্রে আছে "ভূত ভাবোদ্ভবকর বিসর্গঃ

কর্ম্ম সংজ্ঞিত"। বাবা এখন কর্ম্ম কর, বাঁধন খোল।

এই বলেই তিনি কোথায় কি করে, চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারিলাম না। প্রাণটা কেমন কেমন করতে লা'গল, বড়ই হাবু ডুবু খেতে লাগলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল "আমাকেত কর্ম্ম করতে হবে।"

"আজকে রে তোর কায করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই—"

পুরাণ কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে,—ভূত-ভাবের উদ্ভাবক বিসর্গ গুলি ছাড়তে হবে। যে গিঁটে আমি বাঁধা পড়ে আছি, ভাল সেই গিঁট গুলি কি? দেখাই যাক। ও বাবা কি গেরো। এই গুলিই যে দেখছি গেরো (মানে) গ্রহ। এই যা চন্দ্র সূর্য্য আদি নবগ্রহ বলা হয়, তারি বাঁধন। হেঁয়ালির কথায় বলেছে যে,—

নয়টী গিরার বারটী বাঁধ।
তা'রি মাঝে তপন চাঁদ॥
তার ভিতর দিয়া আসে যায়।
ডুবে ডুবে জল খায়॥

এ যে দেখছি তাই। নয়টী গ্রহ আর বারটী ভাব।—শাস্ত্র এসে পড়ছে।— জ্যোতিষ শাস্ত্র বলছেন—

তনু ধন সহজশ্চ বন্ধু-পুত্র রিপু স্তথা।
জায়া চ নিধনং ধর্ম্ম কর্ম্ম লাভ ব্যয়োঽপি চ॥

এই বার খানা ভাব নিয়ে জীব সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ সংসারে জীব এই বারটী গাঁটে বাঁধা পড়েন। জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়েরা যাহাই বলুন, আমার কিন্তু মনে হয় আমরা এই বার খানি গাঁটে বদ্ধ হয়ে সংসারের বার-বনিতা হয়ে আছি। যখন যে যে গ্রহ এসে যে যেখানে যেমন করে আমাদের নিয়ে খেলা করে, আমরা তেমন তেমন চলি। আমরা—

"যখনি যা'র কাছে থাকি,
তখনি তা'র মন জোগাই"—

মহাশয় এই বারটী ভাবের ব্যাখ্যা আপনারা বুঝতে পারেন কি? না পারেন, শর্ম্মা স্বয়ংই আপনাদের সে বিপদ দূর ক'রে দিচ্ছেন—

১। তনু—তনু ভাবের মানে হল যখনই যা' হইনা কেন আমার আমিটা ঠিক আমি থাকিলেও সেটা ঠিক কোন্‌ঠেসা হয়ে থাকতে পারে না বা চাহে না। সে চায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়তে, অর্থাৎ "যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য থাকে সবটাই তাহার অন্তর্গত হক" এটা সে চায়। তাই বাউল সম্প্রদায়ের কেউ কেউ গান ক'রে থাকেন—"মন পাগলারে।"

আপন দেহের মাঝে কত রং দেখ চেয়ে রে॥"—

আপনারা এটাকে স্থূল দেহই বলুন, সূক্ষ্ম বা কারণ দেহ, যাহাই বলুন,—আর শর্ম্মার কথায় আমিই বলুন! এক কথায় এরই মধ্যে দুনিয়ার সব দেখতে পারলেই দেখতে পাওয়া যায়, সদানন্দের অনুগ্রহে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। যা'ক সাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ মহাশয়েরা যাহাকে দেহ বা শরীর বলেন—আমি যখনই যা কিছু-একটা হইনা কেন আমার একটা তনু চাই-ই। সেই দেহটা দিয়া আমার কতকগুলি ভোগ চাই। 'সুখ' নাম দিয়া কতকগুলি ভোগ আত্মসাৎ করি। আর যে গুলির 'দুঃখ' নাম দিয়ে থাকি, সে গুলি বাধ্য হয়ে ভোগ করতে হয় ছাড়াতে পারি না বলে—। কিন্তু সেটা ভীম কর্ত্তৃক কীচকের মত আমাকে গুটি সুটি করে একবারে আমার মর্ম্মের অন্তঃপুরে এনে ফেলে। মোট কথা এই সুখ দুঃখ দুইটাই ভোগ করতে হয়। তবে দুঃখের পরে সুখটা বেশী মিষ্টি লাগে, কাযেই সমারোহের নিমন্ত্রণের কুলের চাট্‌নীর মত, দুঃখটাকে একেবারে ছেড়ে দিতেও পারি না—প্রাণে সয়না।—এই সুখ দুঃখের টান এক খানা মস্ত টান, আর যত কিছু টান, বাঁধন বা ভাব প্রায়—প্রায় কেন?—সকলই এর সঙ্গে ছড়িয়ে আছে। এর সঙ্গেই যত ভাব, যত কার্য্য, যত বস্তু জড়ান রয়ে গেল।

২। ধন—ঐ যে আমার সুখ-দুঃখের কতকগুলি সামগ্রী হল তার সুখের গুলি হল ধন, অর্থ বা সম্পদ। আর যা আমি চাই না অথচ পাই—বা অতি গোপনে চাইও — তাহা হলেন অনর্থ বা বিপদ। কাযেই সম্পদ বিপদ, আলো ছায়ার মত এক খানা যুগল মিলন। একটী চাইলে তার সঙ্গে অপরটীও আসে। কবিবর চণ্ডিদাস বিচ্ছেদ বিধুরা শ্রীমতি রাধাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—শোন বিনোদিনী—

সুখ দুঃখ দুটী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তা'র ঠাঁই ॥

৩। **সহজ**—সহজ নামের মধ্যে অনেক পদই আছে—যেমন জর্ম্মণীর বিস্ফোরক বম্‌শেল। এক কথায় বলতে গেলে (সহজ) 'সঙ্গে সঙ্গে যাহা জন্মে'—আমার শারিরীক মানসিক ও চিত্ত-বৃত্তি ইত্যাদি সকলই, সকলেই এখানে বাঁধা পড়লেন। সাধারণতঃ দৈবজ্ঞ মহাশয়েরা সহোদর ভাই, বোন্ ইত্যাদিই এই ভাবের মধ্যে গণনা করে থাকেন। তা তা'ও বটে।

৪। **বন্ধু**—যিনি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে বদ্ধ করেন, যিনি ত্যাগ সইতে অক্ষম, তিনি বন্ধু। এই হিসাবে অনেক ব্যক্তিই যেমন আমাদের বন্ধু তেমন অনেক ভাবও আমাদের বন্ধু হইতে পারে। অনেক ভাবই আমাকে মরণান্ত পর্য্যন্ত করে থাকে।

৫। **পুত্র**—পুত্র ভাবের মধ্যে যেমন একটা আত্ম-বিস্তৃতীর প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়, তেমনি আমার সমস্ত গুলি বিশেষত্ব বা ভাব যেন সংসার হইতে লোপ না হয়, অর্থাৎ আমি যেন আমার নূতন কলেবর নিয়ে সংসারে থেকে যেতে পারি এই ভাবটা পুত্রের গোড়ায় গোড়ায় দেখা যায়।

৬। **রিপু**—আমি যতই কেন ছাড়াতে না চাই, আমার যত গুলি ভাব সকল ক্ষেত্রেই তাদের এক একটা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব দেখিতে পাই। তাহারাই রিপু। এ'রা যেন আমাদের কায়ার ছায়া, ঠিক কায়ারই অনুরূপ অথচ উল্টা, কায়া না থাকিলে ছায়া থাকে না কিন্তু ছায়াটী কায়ার সহিত লেগেই আছে।

৭। **জায়া**—সকল জীবেই দাম্পত্য (জায়া ও পতি) ভাব আছে। জায়া ও পতি যেন একটা-কিছুর দুইটা ভাগ। সেই দু'টা ভাগ না হলে যেন একটা পুরা হয় না। জায়াটী চাহেন পতিকে একেবারে আয়ত্ত করে নিতে, পতি কিন্তু হাসেন। জায়া যেন এক খানি আয়না, তাই পতির প্রতিবিম্বটী ধরে—খোকা ভুলানর মত করে দেখান যে এই দেখ তোমাকে আমি ধরে হৃদয়ে পুরে রেখেছি,'। পতি হাসে, যেন সে ভাবে "ও যে উল্টা হয়ে গেলরে, পাগলি"। শাস্ত্রকারেরা পুরুষ প্রকৃতির খেলার কথাটা সকল শাস্ত্রেই বলে গেছেন। শর্ম্মার

কথায় আমির সহিত নাম ও রূপের সম্বন্ধটা সকল ক্ষেত্রেই আছে, ওটা একটা সার্ব্বভৌম উপাধি। যে সকল প্রকার উপাধির ভিতর দিয়া আমি খেলি সব গুলিই আমার আমির ছায়া, সুতরাং এক কথায় আমি ভিন্ন সর্ব্ব ভাবই আত্মার জায়া ভাব।

৮। নিধন—নিধন ভাবটী কে সচরাচর মৃত্যু বলেই ধরা হয়। মৃত্যুও এক রকম নিধন। কারণ যেখানে ধন ভাবের নিঃশেষ হয় সেটাই নিধন, কাযেই মৃত্যুতে স্থূল ধনের খানিকটা নিঃশেষ'ত হয়ই। আরো কথা যাতে যেয়ে আপনা আপনি একান্তে গুটিয়ে সুটিয়ে থাকা যায়, তাকেও নিধন বলে (নি-ধিয়তে)। কাযেই মৃত্যুতে যখন স্থূল শরীর থেকে গুটিয়ে সুটিয়ে চলে যাওয়া যায়, তখন এও এক প্রকার নিধন। ফলে কিন্তু সম্যক প্রকার শান্তি বা অবসান হবার যে একটা মৌলিক ভাব বা বৃত্তি আছে, সেটাই নিধন ভাব। সেই ভাবটার প্রথমটা বিরাগ, আর শেষটা নিধন।

৯। ধর্ম্ম— ধর্ম্ম বলতে আমরা মোটামুটি সংসারের কতকগুলি কুস্তি-কসরৎ ও খুঁৎখুঁতুনী বুঝি, যেমন হিন্দুর ধর্ম্ম "ছুঁসনে ছুঁসনে" করা, মুসলমানের ধর্ম্ম "হয় বল আল্লা, ন'য় কাটি কল্লা" * খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম সর্ব্ব প্রযত্নে "পরোপকার।" সে বিষম পরোপকার, তার ভাবটা এই যে "বাপু, তুমি সংসারের ধন সম্পদের ভার বইতে পার্ না ওই সমুদয় আমাকে দিয়ে তুমি বেশ সবে পড় নয় মর। যদি ইচ্ছায় না দেও তবে জোর করে নিয়েও তোমার এই ধনের বোঝা কেড়ে নিয়ে তোমার উপকার করব, কারণ ঐ উপকার করাটাই আমার ধর্ম্ম" ইত্যাদি। সর্ব্ব প্রকার জীবে ও মানবের ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায় যে তাহারা যেন জীবনের সকল কার্য্য ও ভাবাদির একটা কি বিশেষত্বের সেবা করিয়া যাইতেছে সেই বিশেষত্বটা জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়াও তাহাদের সঙ্গ ছাড়া হয় না। দীর্ঘতম ভ্রমনের পথ মধ্যবর্ত্তী নানা প্রকার উপল খণ্ড ও স্তুপাদি লক্ষ্য করত তাহার সমীপবর্ত্তী হইলে যেমন পথিকের লক্ষ্য দূরতর অপর বস্তুকে লক্ষ্য স্বরূপ দেখিতে পায় ও লক্ষ্য করে,—সেই প্রকার যে ভাবটী জীবনে ও মরণের অনুসঙ্গীরূপে থাকিয়া জীবকে তাহার গন্তব্য পথের চরম লক্ষ্যের দিকে চালাইয়া লয় তাহা ধর্ম্ম।

* কল্লা পারসিক শব্দ ইহার অর্থ গল-নলী বা গলা।

১০। কর্ম্ম —সংসারে জন্ম গ্রহণ করিলে ত' আর কর্ম্মের অভাব নাই, শয়নে স্বপনে সর্ব্বদাই ক্রিয়া আর কর্ম্ম। কর্ত্তা কর্ম্ম, অধিকরণ অপাদান, সম্বন্ধ এমন কি সম্প্রদান ও করণ পর্য্যন্তও কর্ম্মের সঙ্গে লেগেই আছে। এই গুলি পৃথিবীর সকল জীব ও মানব সমাজের মধ্যেই প্রচারিত আছে। হিন্দুদের মধ্যে আবার একটু বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা সব কর্ম্ম গুলিকে দশটা শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন। তাকে তাঁরা দশকর্ম্ম বলে নাম দিয়েছেন। এই কর্ম্মের সংস্কারের জন্য তাহারা দশ প্রকার সংস্কারের ও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে আবার দশটী মহা (অবিদ্যা বা বিদ্যা) বিদ্যা নামে এক মহাশক্তির দশ প্রকরণের উল্লেখ দেখা যায়। দশ কর্ম্ম ও দশ সংস্কারের সঙ্গে অবিদ্যা বা বিদ্যাভাবে এই মহা-শক্তির একটা যোগাযোগ আছে বলিয়া বোধ হয়।

১১। লাভ। লাভটা সকলেই বুঝে' তবে কথাটা ভাবতে গেলে একটু গোলমেলে বটে। কারণ যেটা সর্ব্বদাই আমার হাতের উপরেই আছে বা যাহা পেয়েই বসে আছি, তাকে আর লাভ বলা যায় না। কিন্তু যা ছিল না বা পাই নাই, তা' পাওয়াটাই লাভ। সংসারের নূতন নূতন ভা'ব ও তত্ত্বের অনুভূতিটাও তেমনই লাভ। আবার পুরাতন বিষয় বা তত্ত্ব যদি নূতন করিয়া পাওয়া যায়, তাহাই লাভ।

১২। ব্যয়। লাভের দিকটা বেশী হ'য়ে গেলে'ত আর পাল্লা ঠিক থাকে না—টল খায়—কাযেই খানিকটা ব্যয়েরও প্রযোজন। সাধারণ জিনিশ পত্র এই জামাটা কাপড়টা পুরানা হলে যেমন ফেলে দেওয়া আছে, তেম্নি ছেলে বেলায় ধুলা খেলা ইত্যাদি যৌবনে ছাড়তে হয়, যৌবনের খানিকটা প্রৌঢ়ে, প্রৌঢ়ের খানিকটা বার্দ্ধক্যে ছাড়তে হয়। এই ছাড়া-ছাড়ি না থাকলে, পাল্লার ফের ঠিক থাকেনা 'কাজেই পাষাণ ভেঙ্গে' নিতে হয়। তা না হলে নূতন যা লাভ হবে তা রাখবে কোথায়?

তবেই দেখতে পেলাম আমি (অর্থাৎ আমি ও আমার রূপ-নাম-রূপের) ডিঙ্গা খানি এই বার গাছি দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, ভাগ্যিস্ কুলে এসে দেখতে পাচ্ছি খোঁটা মাত্র নয়খানি, মহাশয় এই নয় খানি খোঁটাকে

আপনারা বোধ হয় বিশুদ্ধ ভাষায় গ্রহ বলেন, তা বলুন যে গ্রহণ বা ধারণ করে সে যদি গ্রহ হয়, তবে এই খোঁটাও'তাই। তা, এখন কূলের খোঁটাই তুলি কি দড়ির বাঁধই ছাড়াই। উভয়ই ভাবি মুস্কিল, এই খসাতে হলে অনেক ধৈর্য্য চাই ও গিঠ খসাবার কৌশল জানা চাই, দড়ি গুলি কাটতে হলেও দা ছুরি কাটারি প্রভৃতি ধারাল অস্ত্র চাই। কূলে এসে খোঁটা ভাঙ্গা অসম্ভব। ঐ গুলি গঙ্গার জেটীর (jetty) লোহার থাম্বা, উহা যেমন তেমন কুস্তি কসরতে ভাঙ্গা যায় না।

মহাশয়, বলব কি এই রকম বসে বসে ভাবছি যে এই বাঁধন গুলির কি করি ?—এরই মধ্যে সেই কাল সাপ এসে হাজির দেখছি। আমার সাধের তরণী" ময় প্রিয়তমা তরুনী প্রেয়সীগণ সহ আমাকে শুদ্ধ সব অবলীলা ক্রমে গিলে ফেল্লে। মনে মনে একটা আসান পেলাম, ভাবলাম বাবা দড়া-দড়ির বাঁধ ছাঁদ, কাটা কুটি, সব ফুরায়ে গেল— হরণ বাবুর গৃহ-দাহের সময় তাহার ভৃত্য রামধন যেমন চুপ করে দাঁড়ায়ে দাড়ায়ে গৃহদাহ দেখে হাঁসতে ছিল। তখন বাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কিরে রামা হাসিস যে' রামা এক গাল হেসে উত্তর করল "আঃ কর্ত্তা বাঁচা গেল। আপনার টাকা আছে নূতন ঘরের জন্য চিন্তা নেই, শালার ছার পোকার যে বেচন শুদ্ধ গেল, সেই আনন্দে আমার হাসি পাচ্ছে।" আমারও তেমনই দড়াদড়ি ছিড়ে গেল ভেবে খুব একটা হাসি পেল। কিন্তু যাই দেখলাম ও যাঃ আমি যে মরে গেলাম।"

—"না হতে মোর কাযের শেষ ভেঙ্গে গেল হাট।
সব দোকানই বন্ধ হল, উঠল দোকান পাট।।—

হায় আমি মরে গেলাম—তবে এখন উপায়। বস্ আর কোথায় মরা। যেই ভাসা সেই ভাসা ; সেই মহা সমূদ্রে বোধ হয় ঐ কাল সাপটার পেটের ভিতরেই ভাসছি। কিন্তু এবারকার ভাসাটা আগের মত ভাসা নয়গো দাদা!! এবার কিন্তু মরিলাম না—ভেসেও ভাসছি না। যেন একটা মজার দেশে আমি একটা মজার আমি হলেম। আমার ইচ্ছামত সবই হচ্ছে, যাই ইচ্ছা হল আমি অমুক জায়গায় যাব, অমনি সেখানে হাজির, যাই ইচ্ছা হল অমুক জিনিষ খাব, অমনি মুখ হাঁ না করেই খেলাম। কি জিনিষটা উদরস্থ হল কি হল না তাও ঠিক

বুঝছি না, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা বগড এই যে আগে অর্থাৎ বেঁচে থাকতে যেমন একেকটা জিনিসের এক একটা বস পেয়েছি এখানে তা পাচ্চিনা। ধরুণ বালিকে চিনি ভাবে খেলেই সে চিনি, আব নুন ভাবলেই নুন। অর্থাৎ যা ভাবি তাই হয়, ওব তবল কঠিন ভেদ নাই। মোট কথা, একটা ভাবলেই হইল। যাক এখানেও কিন্তু আমাব সেই বড দলাটা আছে, যাই আমি তাকে পেতে চাইলাম অমনি পেলাম ও বটে, কিন্তু ও পাওয়াটা পাওয়া পর্য্যন্তই, বস নাই। কেবল ভাবা পর্য্যন্তই সাব আসলেব কিছুই নয় এখানে এসেও আবাব আমাব সেই দলাটা গ্রাস করে ফেল্লে এবাব আমি ঠিক মবলাম—ঠিক মবলাম কেন? এবাব আমি সেই ভাসছি ত ভাসছিই।।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভ্রান্তবাম শর্ম্মা।

মাতৃ-বন্দনা।

(১)

শক্তিহীন শিশু আমি জড-পিণ্ড প্রায়
ভাষা হাবা, জন্ম লাভ কবিলে ধবায়,
যে দিন প্রথম মোব কোমল চবণ
ধবণীব শ্যাম বক্ষঃ কবিল চুম্বন,
সে দিন ও হৃদয়েব স্নেহ বাশি দানি
উদ্বেলিত হৃদি মাঝে নিলে মোবে টানি'
চিব কল্যাণীব বেশে, আয মা আমাব
সুমঙ্গলে, পদে তোব কোটী নমস্কাব।

(২)

তার পরে শৈশবের সুন্দর উষায়
হাঁটিতে শিখাতে যবে মোরে পায় পায়,
হঠাৎ আছাড়ি ভূমে পড়ি কভু গেলে
দেবী বেশে আসি' তুমি স্নেহ বসে গলে,
আদরে যতনে মোরে বুকে নিয়া টানি
প্রকাশিতে স্নেহ ভরা মধুময় বাণী
ওই তব হৃদয়ের পুলকে অপার,
করুণার বাণী দেবী, তোরে নমস্কার।

(৩)

প্রথম কৈশোরে যবে সহচর সহ
খেলা ধূলা শেষ করি ল'য়ে ক্লান্ত দেহ,
প্রতি মধু সায়াহ্নেতে আসিতাম ফিরে
তোমারি করুণাপ্লুত আনন্দ কুটীরে,
তাড়াতাড়ি আসি তুমি উচ্ছ্বসিত প্রাণে
আঁকিতে এ গণ্ড মোর চুম্বনে চুম্বনে
চির স্নেহময়ী রূপে, আয়-মা আমার
আনন্দ নির্ঝর দেবী, তোরে নমস্কার।

(৪)

রোগে শোকে কভু মোরে করিলে কাতর
আমার শিয়রে বসি' নিত্য নিরন্তর,
বিশ্ব জননীর পদে জানায়ে বেদনা
আমার আরোগ্য, দেবি, করিতে কামনা
তব স্বাস্থ্য বিনিময়ে আকুল অন্তরে,
রাখি তব স্নেহ হস্ত মোর শিরোপরে,
পুত্র স্নেহাতুরা রূপা জননী আমার
স্নেহ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তোরে নমস্কার।

(৫)

আজি এ কৈশোব শেষে প্রবাস আবাসে
শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যবে ম্লান দিবাশেষে
ফিবে আসি আপনাব নির্জ্জন ভবনে,
তখনই জাগি' উঠে এ বিবহী মনে
তোবি মধুময বাণী সাদব আহ্বান,
তোমাবি করুণাপ্লুত স্নেহ ছবিখানি,
তখনই এ শিব মম আবেগে অপাব
উদ্দেশে চবণে তব কবে নমস্কাব।

শ্রীহরিকৃপা বর্ম্মণ চৌধুরী।

গঙ্গা-তটে।

এই ত সেই পুণ্য-তোযা গঙ্গা। কত শত প্রাণী আসিযা এই সলিলে তাপিত প্রাণ শীতল কবে। কত শত প্রাণী দেশ দেশান্তব হইতে আসিয়া এই সলিল স্পর্শ কবতঃ জীবন সার্থক কবে। শুনিযাছি এই পুণ্য সলিল, পতিত ব্যক্তিব পাপ-ক্ষালন কবিয়া মুক্ত কবিযা দেয়—ভব-বন্দন বিনষ্ট করে।

মা গো, তুমি পতিতপাবনী—ত্রিভুবনতাবিণী। মা, সর্ব্ব-সন্তাপহাবিণী ভাগীরথি। মা তুমি, তুমি অমূল্য মোক্ষ-ধন লইযা সকলকেই বিলাইবাব জন্য সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছ। কি বাজা, কি প্রজা, কি ধণী, কি নির্ধন, কি পাপী, কি পুণ্যাত্মা, সকলকেই সমান ভাবে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা কর। তাই মা বড আশা কবিয়া তোমাব কূলে আসিযাছি যদি হতভাগ্যেব তাপিত প্রাণ শীতল হয। বল মা তোমাব ওই পুণ্য কোলে এই পতিত

জীবের প্রাণের আগুণ নিবিবে কি? তোমার এই পবিত্র জলে গায়ের জ্বালা যেমন জুড়ায় মনের জ্বালা তেমনই জুড়াইবে কি?

বিয়োগ-বিধুর, গুরুতর শোকাতুর মনুষ্যহৃদয়ের জ্বালা কালে জুড়াইয়া যায়, আবার সেই স্থলে নূতন ইন্ধনে নূতন আগুণ জ্বলিয়া উঠে। অতিলোভী-বিষয়াসক্ত পুরুষের হৃদয়ে বিষয়ের আগুণ নিবিয়া গিয়া আবার তাহা অপেক্ষা অধিকতর জ্বালাময় নূতন আগুণ জ্বলিয়া উঠে। বল মা, কোন্ আগুণ তোমার সলিলে নির্ব্বাপিত হয়? মা গো, মনুষ্য-হৃদয়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গিয়া মরীচিকা মুগ্ধ প্রাণীর ন্যায় বাসনার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া নিরতিশয় দুঃখ ভোগ করে। বল মা, এই বাসনার জ্বালা তোমার জলে জুড়াইবে কি?

ওই যে অশীতিপর বৃদ্ধ তোমার জলে স্নান করিতেছে, তাহার প্রাণে কি আশ্বাস, কি ভরসা ঢালিয়া দিতেছ। সে জানে আবার আজ হইতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিল—জীবনের পনেরআনা অংশ অত্যাচারে অনাচারে কাটিয়াছে, আজ মা তোমাকে স্পর্শ করিয়া গত কর্ম্মের কালী মুছিয়া গেল। এখন নূতন উৎসাহে নূতন সাহসে নূতন জীবন আরম্ভ করিবে। তুমি তাহার সভক্তি প্রণতি গ্রহণ করিয়া অনুতাপের অনল হইতে তাহাকে ত্রান করিলে আর বর্ত্তমান কর্ম্মের জন্য উৎসাহ দিলে। এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যদি জীবনের শেষ মূহূর্ত্তে একবার এই পতিত পাবনী শক্তির স্মরণ করিতে পারে, যদি পুত্র কন্যার চিন্তা ছাড়িয়া, বিষয়ের অভিলাষ ছাড়িয়া, পঙ্কিল সংস্কার ভুলিয়া, নূতন সংস্কারে সংস্কৃত মনে সেই অন্তিম কালে একবার তোমায় স্মরণ করিতে পারে, তবে তাহার ওই একবার মাত্র তোমার পরশন, শত শত তপস্যার ফলকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে লইয়া যাইবে। মা, তোমার কলিযুগে অবতরণ সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু মা, এত দয়া, এত ক্ষমা, এতদূর পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিয়াও মনুষ্য প্রাণে নব-জীবন আনিল কৈ?—হৃদয়ের স্রোত ফিরিল কৈ?—মনের মলিনত্ব ঘুচিল কৈ? যাঁর এতদূর ক্ষমা—যিনি সকল পাপ, সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া, সাক্ষাৎ মোক্ষ-ফল লইয়া দণ্ডায়মান, তাঁহাকে আত্মসমর্পন করিতে পারিলাম কৈ? তাঁহার মূলমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হইলাম কৈ?

কৃতজ্ঞতার পুণ্যময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে প্রণিপাত করিতে পারিলাম কৈ? তুমিই যে পরমা গতি এ ভাব বুঝিতে পারিলাম কৈ? আর যদি কেহ পারে তবে সে কয়জন? লক্ষের মধ্যে একজন। মা, তাহাতে তোমার মহিমা কি বুঝিলাম? দুর্লভ বস্তুকে সুলভ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে জ্বালাময় পাপপূর্ণ জগতে তোমার অবতরণ। তবে কেন মা, তোমার জলে স্নান করিয়া তোমার চরণে আত্ম সমর্পন না করিয়া বাসনার ভারে ডুবিয়া যাইতেছি মা?—ব্যক্তিগত পাপের ক্ষয় জন্য ও ব্যক্তি-গত পুণ্যের জন্য এই তোমার জলে দাঁড়াইয়া শত শত কামনা লইয়া, বাসনা বিজড়িত মনকে শত গুণে বাসনার পঙ্কিল সংস্কারে ডুবাইয়া দিতেছি মা? নিজকৃত কর্ম্ম-দোষে জলন্ত হৃদয়ে তোমার কূলে আসিয়া আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করি আমার পাপের ভার মোচন কর, আর যেন আমার স্বর্গ-গতি হয়,—যেন আমার সকল দুঃখ মোচন হয়। হায় অবোধ মন, দুঃখের মোচন কি পূর্ণ মনোরথে হয় না, দুঃখের মোচন কেবল মাত্র বাসনার নিবৃত্তিতেই সম্ভব হয়।

তবে স্বর্গ হইতে তোমার অবতরণ কেন মা? যদি আমাদের পাপ তোমাতে বিধৌত না হইবে, যদি আমরা তোমার সলিল স্পর্শ করিয়া স্বর্গ কামনা করিতে না পাইব, তবে তোমার অবতরণ কেন মা? কেবল মাত্র কি ধরনী পৃষ্ঠে জলজন্তুগণের বাস হেতু তোমার আবির্ভাব?—আর শাস্ত্র বাক্য সমস্ত মিথ্যা? অথবা কেবল মাত্র সগর সন্তানগণের উদ্ধার হেতু তোমার আনয়ন? যে সকল ঋষিদিগকে ভগবান স্বয়ং পূজা করিয়া থাকেন তাঁহাদের ইচ্ছা মাত্রেই সগর বংশ উদ্ধার হইতে পারিত আর তাহা হইলে তাঁহাদের বিনাশেরই বা প্রয়োজন কি ছিল? সেই মনস্বী ঋষি কপিল দেব কি রিপু পরবশ ছিলেন—তিনি ক্রোধ বিমূঢ় হইয়া ষষ্ঠী সহস্র জীবকে একবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন? সেই ত্রিভুবন পূজ্য ঋষির এই লোম হর্ষণ ক্রোধ কি উদ্দেশ্য বিহীন? ইহার মধ্যে কি ঋষি-স্বভাব-সুলভ অপার করুণা অনন্ত জীবহিতৈষিতা লুকায়িত নাই? না-মা, তুমি পৃথিবীর পাপ হরণ করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছ। যখন আমাদের পাপের কথা স্মরণ করিয়া রাজ ভাগীরথকে প্রশ্ন কর যে মনুষ্য যে তোমাতে পাপ ক্ষালন করিবে তোমার

সেই পাপ পুনরায় কিসে মোচন হইবে, তখন রাজা ভগীরথ বলিয়াছিলেন যে মুক্ত ঋষিগণ নিত্য যে তোমার জলে স্নান করিবেন তাহাতে তাঁহাদের অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়া তুমি কলুষ-মুক্ত হইবে। মা আমরা অতি পাপী, কেমন করিয়া সেই মুক্ত ঋষিদিগের চরণ বারি স্পর্শ করিব। কেমন করিয়া তাঁহাদের করুণা লাভ করিব? কোথায় নিত্যমুক্ত লোক-হিত-ব্রতধারী বাসুদেব পরায়ণ ঋষিগণ—আর কোথায় আমরা—পাপ ভারাক্রান্ত বাসনার তীব্র বিষে জর্জ্জরিত অধোগতির বিস্তৃত সোপানে নিরন্তর ধাবমান নরনারী। কোথায় স্বর্গের মন্দার কুসুম আর কোথায় নরকের পতিত জীব। মা, পতিতোদ্ধারিনি ভাগিরথি, তুমি অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া এই দুইটী জগৎকে তোমার পুণ্য প্রবাহ দিয়া সংমিলিত করিয়া দিতেছ—আর ওই কুলু কলু স্বরে সেই সুরনর পূজিত ঋষিদিগের গতি শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে এই ধরাতল ধন্য করিতেছ। মা, তোমার জলে দাঁড়াইয়া মনুষ্যগণ সেই ঋষিদের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ সম্পন্ন পুণ্য-জল মস্তকে দিয়া, মনে মনে আপনা-দিগকে তাঁহাদের চরণ তলে সমর্পণ করিয়া, তোমার কোলে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া যদি পরিত্রাণ না পায় তবে আর কোথায় গিয়া তাহাদের পরিত্রাণ হইবে মা? না—মা, আমরা সে ঋষিদের করুণা চাহিবার যোগ্য নই কেন না তুমি অহোরাত্র পরের জন্য—পরের পাপ প্রক্ষালন করিবার জন্য, বিশ্বজনের সুখের জন্য প্রবাহিত হইতেছ,—তাই ভাগবত গনের সঙ্গ লাভ করিতে পারিয়াছ। মা, আমরা যে স্ব স্ব বাসনার ভারে ডুবিয়া যাইতেছি মা কেমন করিয়া ওই আশীর্ব্বাদ পাইব? আমরা যে পরের জন্য এতটুকু প্রাণ দিতে পারি নাই পরের জন্য অতি সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে পারি নাই তবে আমাদের গতি কি হইবে? তবে মা এ বাসনার আগুন নিবিল কৈ? তোমার এই পুণ্য জলে প্রাণের আগুন নির্ব্বাপিত হইল কৈ? মন নিষ্পাপ হইল কৈ? বাসনাই ত পাপের মূল মা। কলুষ নাশিনি গঙ্গে, তুমি দয়া কর মা, বাসনার কালী ধুইয়া দাও মা, তোমায় একবার প্রাণ ভরিয়া প্রণিপাত করি।

দেখ, মা, মনের কেমন একটা স্বভাব সে একটু বাসনায় আশ্বাস না পাইলে কিছুই করিতে চায় না। যখন শুনি যে তোমার জলে স্নান করিলে স্বর্গ হয় তখন বড় উৎসাহ। কিন্তু যদি শুনা যায় যে আমা ব্যতীত সকল

প্রাণীই এই জল স্পর্শ করিয়া উদ্ধার পাইবে তখন সেই লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মঙ্গল না ভাবিয়া তিলার্দ্ধ সে চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া গভীর বিষাদে মন বিষন্ন হইয়া পড়িবে। মনের এই কু-অভ্যাস কিসে যায় মা? তোমার জলে যদি কুঅভ্যাস বিসর্জ্জন দিতে না পারি তবে আর কবে দিব মা?—আর কোথায় গিয়া জুড়াইব মা? যখন রাজা ভগীরথ তোমাকে আনয়ন করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন তখন যদি সেই ধর্ম্মাত্মা রাজার মনে নিজের স্বর্গ কামনা থাকিত তবে কি মা মর্ত্তে তোমার আবির্ভাব সম্ভব হইত? একবার রাজা ভগীরথের হৃদয়ে স্বর্গ কামনা জাগিয়া উঠিল অমনি ঋষি-বাক্য তাঁহার বাসনাকে সংযত করিল, রাজা শুনিলেন যাবৎ তাঁহার পিতৃ পুরুষের উদ্ধার না হয় তাবৎ তাঁহার স্বর্গ গমন হইতে পারে না। রাজা বুঝিলেন স্বীয় স্বর্গ কামনা স্বার্থ পরতা মাত্র—যে অপরের স্বর্গ কামনা না করিয়া নিজের স্বর্গ কামনা করে, যে নিজের পিতৃপুরুষ প্রভৃতি স্বজন বর্গের উদ্ধার কামনা না করিয়া নিজের স্বর্গ-সুখ কামনা করে, তাহার স্থান স্বর্গে হইতে পারে না। রাজা দিলীপ গঙ্গাবতরণের জন্য তপস্যা করিতে করিতে অপারগ হইয়া আয়ু শেষে স্বর্গে গমন করেন। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গাবতরণ, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে স্বর্গে গমন করেন কিন্তু যদি স্বীয় সুখ মাত্র লক্ষ্য হইত তাহা হইলে রাজা দিলীপের কোন গতি হইত তাহা কে বলিতে পারে? রাজা ভগীরথ অবিচলিত চিত্তে ও অবিকৃত হৃদয়ে পিতৃপুরুষ বর্গের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পরবশ হইয়া রাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনাকে গঙ্গাবতরণের জন্য একান্ত ভাবে উৎসর্গ করিলেন তাঁহার হৃদয়ে পিতৃ-পুরুষের উদ্ধার চিন্তা, বিশ্বজনের উদ্ধার চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল। আর রাজার সেই স্বর্গ কামনা, সেই বিশ্ব জনীন বিশাল ভাব রাশির মধ্যে কোথায় হারাইয়া গেল। তখন মা, তুমি মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার প্রিয় সাধকের মঙ্গলময় প্রার্থনা মধুর বচনে পূরণ করিলে। মা, তোমার জলে ওই ইতিহাস তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে এবং বলিতেছে "পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর, প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। তাই বোধ হয় শত শত তরঙ্গে মিলিয়া তোমার বুকে লয় হয় আবার সেই শত শত তরঙ্গ মিলিয়া তোমারই বুকে একটি হয়। এই অভিনয়ে যেন তাহারা বলাবলি

কবে যে এই নিধন ও সৃষ্টি এই গঙ্গা বক্ষে তবঙ্গেব খেলা—একটি প্রাণীতেই শত শত প্রাণী আব শত শত প্রাণীতেই সেই একটী প্রাণ। সেই একই বহু হইয়া এই জগতে তবঙ্গেব ন্যায়-এই আছে, এই মিলাইতেছে এই উঠিতেছে, আবাব সেই প্রতি তবঙ্গই সেই একই বস্তুর আপাততঃ প্রতীযমান ভিন্ন—দেশে কালে রূপে প্রকাশ মাত্র। মা আমবাও তোমাব বুকে ওই তবঙ্গেব মত এই ধবনীতলে সবাই মিলিয়া একটী হইনা কেন?—আবাব একেব মধ্যেই কেন সবাইকে, সকলেবই সুখ দুঃখ, সকলেবই অস্তিত্ব দেখি না কেন? তুমি মা একলা এই মহা সত্য লইয়া খেলা কবিতেছ? আমবাও কেন এই মহা সত্য লইয়া খেলা কবিতে পাই না মা? তাইত মা মনেব মধ্যে সদাই আগুন জলে, তাইত মা এই সংসাবে জুড়াইবাব এতটুক স্থান নাই।* তবে আমি মা কি কবি? আমি মা তোমাব ওই মহাসত্য প্রকাশিনী পুণ্য তবঙ্গ মস্তকে তুলিয়া লইয়া একবাব বলিঃ—ও আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি ইত্যাদি মাতবঃ। ওঁ জনযথা চনঃ।* এই অতি প্রাচীনতম চিব প্রচলিত ঋষি বাক্য হৃদয়ঙ্গম কবিয়া সকল সকল প্রাণীব তৃপ্তিকব, সকল প্রাণীব সুখকব, সকল প্রাণীব কল্যানকব তোমাব ওই পুণ্য তবঙ্গে সকল প্রাণীব তৃপ্তির জন্য সকল প্রাণীব সুখেব জন্য সকল প্রাণীব কল্যানেব জন্য ডুব দিই, আব মা তোমাব জলে দাঁড়াইয়া ওই প্রাচীন ঋষিবাক্য স্মবণ কবিয়া তোমাকে নমস্কাব কবি। কিন্তু এই উদাব ভাব-এই বিশ্বজনীন ভাব আমাব ক্ষুদ্র হৃদয়ে কেমন কবিয়া ধবিবে মা? এই সামান্য গোষ্পদে ওই অনন্ত সাগবেব স্থান কেমন কবিয়া হইবে মা?—না না এই গোষ্পদ সাগব তবঙ্গে ভাঙ্গিয়া যাক্ এই ক্ষুদ্রতাব পরিসব চূবমার হইয়া যাক ছাবখার হইয়া যাক। তোমাব

* ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবস্তু-ন উর্জ্জে দধাতন মহে রণায চক্ষসে—হে জল তোমরা অতি সুখদায়ী, অতএব আমাদিগের ইহকালে অন্ন বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মহা রমণীয় পরোক্ষের সহিত সংযোজিত করিও। ওঁ যো শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তে্য ন উশতীরিব মাতবঃ—হে জল তোমরা হিতাভিলাষিণী মাতার ন্যায় ইহকালে অতি কল্যাণ কর স্বীয় রসের ভাগী আমাদিগকে করিও। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ আপো জনয়থা চ নঃ—হে জল তোমরা যে রসে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতেছ তাহাতে আমরা তৃপ্তিলাভ করি।

পুণ্য সংস্পর্শে হৃদয়ে দেব ভাবের সঞ্চার হইবে—বাসনার জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। আবার সেই ভুল!—আবার সেই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাময় পূর্ব্বতন বাসনা জাগিয়া উঠিল। তবে মা এ অধমের উদ্ধার হইল কৈ? এ পতিত জীবের উদ্ধার হইল কৈ? এ বাসনা কলুষিত পাপীর উদ্ধার হইল কৈ? মা, ভাগিরথী একবার মুখ তুলিয়া চাও মা! সন্তান যোগ্য হইলে কোলে স্থান দিতে সবাই চায় মা, অযোগ্য সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও মা—তোমার মহত্বে আমার ন্যায় শত শত প্রাণীর ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। তোমার মহত্বে আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণের আগুণ নির্ব্বাপিত হইবে।

মা তোমার এই পবিত্র জলে আসিয়া সুখ দুঃখ দুইই বিসর্জ্জন দিতে পারিলাম না। পাপ বিসর্জ্জন দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মা ইচ্ছাই থাকিয়া গেল। মা, শুনিয়াছি নাকি তোমরা কেবল দুঃখ টুকু লইতে চাওনা। ভক্ত যখন একান্ত অন্তরে পুষ্পোপহারের ন্যায় তাহার হৃদয়ের সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য ভাল মন্দ এই দুইই তোমার চরণে সমর্পন করে তখনই মা তোমরা প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী তাহার অধিকার অনুযায়ী, তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া থাক। তাই! তু মা তোমরাও কি আমাদের মত ব্যবসায় কর আউকেল দরে জিনিষ নাও—একটী নিলে কি কিছু লোকসান হয় মা? স্বর্গেও কি আমাদের এই পতিত ব্যক্তির হৃদয়ের মত দোকানদারী আছে? সুখটী সমর্পন কর তবে দুঃখটী দিতে আসিলে লইব? পুণ্যটী সমর্পন কর তবে পাপটী দিতে আসিলে ক্ষালন করিব? —হায়রে অদৃষ্ট!—তাই যদি পারিতাম তবে কেন পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়াও বারে বারে এত দাগা পাইয়াও আমার ওই কালভুজঙ্গিনী বাসনাকে হৃদয় স্থান দিতাম? সুখ ও দুঃখ যে একই বেদনা এই সংস্কারটী হৃদয়ে বদ্ধ মূল করিয়া দাও মা তবে ত সুখ দুঃখ দুইই তোমার জলে বিসর্জ্জন দিব তবেত তোমার ওই দুই কূলে সারি সারি আমার মত অনন্ত কোটী জীব শোকে মুক্ত হইয়া তোমার যশোগান করিবে—তবে তু মা এই মনুষ্য-হৃদয়ে আবার নব জীবন সঞ্চার হইবে—তবে ত মা এই অনন্ত জীব জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে—তবে ত তাহারা নিষ্পাপ হইয়া তোমার পদ প্রান্তে প্রণিপাত করিবে।

আচ্ছা, মা, বল দেখি এই যে সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়া এত গোল করি—এ সুখ দুঃখ কার ? আমি বড়ই মূর্খ আমায় একটু জ্ঞান দাও না আমায় বুঝাইয়া দাও মা এই সুখ দুঃখ কার ? যদি বল "আমার" তবে মা আমার মনে বড়ই গোল বাঁধে। "আমার" কথাটি অতি সহজ, অতি প্রাঞ্জল, অতি অভ্যস্ত—কিন্তু তাহার অর্থ ভাসা ভাসা, ডুবিতে গেলে কিছুই পাই না। পাপের ভারে ডুবিয়াই যাই, ভাসিতে পারি না যে মা ! 'আমার' বলিতে কার মা ? আমরা যাহাকে "আমি" বলি—তাহার ? তাহার সম্পত্তি ? সে কি রকম অধিকার মা ? আচ্ছা না হয় বুঝিলাম যে "আমি" এক জন আছে তাহার যে সম্পত্তি তাহাকে "আমার" বলে। কিন্তু সে আমি কে মা ? সে কোথায় মা তাহাকেত' কখন দেখিনা তাহাকে ত কখন বুঝিনা "আমি" "আমি" বলিয়া কাহাকে লক্ষ্য করি মা ? তাহাকে না দেখিয়া, তাহাকে না বুঝিয়া "আমার" কথাটী এত অভ্যাস কি করিয়া হইল মা ? এই মিথ্যাচার কি পাপ নয় মা ? ইহা কি তোমার জলে ধুইবে না মা ? তোমার জলে ডুব দিলে যদি সত্যের সন্ধান না হয়, সত্যের দর্শন না পাই সত্যকে হৃদয়ে স্থান না দিতে পারি তোমার জলে স্নান করিয়াও যদি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, প্রতি মুহূর্ত্তে মিথ্যা লইয়া ,ঘর কন্না করিতে হয় তবে তোমার জলে ডুব দিয়া ও পুনরায় জীবন ধারন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ।

মা তোমার জলে এই যে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহাতে কি তোমার কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হয় ? যে দেশে তোমার প্রবাহে জোয়ার ভাঁটা হয় নাই সে দেশে কি তাহারা কিছু কম বা কিছু বেশী পায় ? তোমার মহিমায় কিছু হ্রাস বৃদ্ধি দেখে ? সেখানেও তুমি যেমন মোক্ষময়ী গঙ্গা আর এখানেও তেমনই মোক্ষ-ময়ী, গঙ্গা জোয়ারেও যেমন তুমি পতিত পাবনী আবার ভাঁটাতেও তেমন পতিত পাবনী। আমাদের মধ্যেও মা এমনি একটা জোয়ার ভাঁটা আছে। যখন মন সুখে মগ্ন থাকে তখন মনে হয় "আমি টা" না জানি কত মস্ত আবার যখন দুঃখ আসে তখন মনে হয় আমি এতটুকু হইয়া গেলাম। এই আমি এত বড় হইলাম আর এই আমি এতটুকু হইয়া গেলাম এই চিন্তা লইয়াই আমরা ডুবিয়া আছি। আমি ছাড়িয়া "আমির" এই অপ্রকৃত জোয়ার ভাটা লইয়া ভাসিয়া গেলাম, মা

তোমার জল বাস্তবিক বৃদ্ধি পায বা হ্রাস হয়, কিন্তু আমরা যে ভাবি এই আমি বুঝি বাড়িয়া গেলাম আর এই আমি বুঝি কমিয়া গেলাম ইহার যে মা কিছু সত্যই নাই। কেন না যখন আমিকেই বুঝিতে পারি না তখন তাহার হ্রাস বৃদ্ধি সত্য তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? কিন্তু মা এই দুঃখ হয় যে বুঝি আর না বুঝি কাজে করিয়া যাইতে হইতেছে। এই সুখ দুঃখ লইযাই ত মা যত গোল, আর ত গোল কোথাও নাই। আমার আমিকে ছাড়িয়া আমি জ্ঞান ছাড়িয়া, আমির এই মিথ্যা জোয়ার ভাঁটার জ্ঞানটী জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গভীর জলে মা যেমন জোয়ারও যায না ভাঁটাও যায না তেমনই এই "আমির" একটী গভীরতর প্রদেশে যেখানে তাহার জোয়ারও নাই ভাঁটাও নাই তাহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই। তোমার জলে ডুব দিলে তোমার জলে জোয়ার ভাঁটায় অতীত গ্রামে পৌঁছাইতে পারি কিন্তু আমার এই হৃদয়ে "আমিতে ডুব দিলে, মা ডুবিতে পারি না। কেননা সেখানে ত তুমি নাই। তাই মা এই, জোয়ার ভাটায যে অতীত আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই সুখ দুখের যে অতীত আমি তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি নাই। মা, তুমি আমার হৃদয মধ্যে প্রবাহিত হও মা। আমি হৃদয মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে নিষ্পাপ হইয়া সেই সুখ দুঃখের অতীত "আমির" সাক্ষাৎকার লাভ করি।

মা, তোমার কূলে বসিয়া আজি একটী প্রাণের দুঃখ কহিব, সেই দুঃখই জীবনের প্রথম বা শেষ দুঃখ। যাহার জন্য বাঁচিয়া থাকা, যাহার জন্য এই সংসারে অহোরাত্র খাটিয়া মরি, যাহার ঘর যাহার সংসার করিতে আসিয়াছি, সে বড় নির্দ্দয়, বড়ই নিষ্ঠুর, তাহার প্রাণে মা গো দয়ার লেশ মাত্রও নাই। বল মা মানুষ হইয়া মানুষের হৃদয় লইয়া কেমন করিয়া, এমন পাষাণ লইয়া জীবিত থাকি? মাগো পাষাণকেও গলান যায়, মনের মতন করিয়া লওয়া যায়—সে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। মা, যে দেশে দয়ার আধার দেবতারা থাকে, সে দেশের সে নয়, যে দেশে মানুষ বাস করে সে দেশেরও নয়, কেন না তাহা হইলে তাহার হৃদয় থাকিত। যে দেশে রাক্ষস পিশাচ থাকে, সে সে দেশেরও নয় কেন না ভাল হউক মন্দই হউক হৃদয়ের বাসনা থাকিত। তাহাকে মা এত করিয়াও আমার, করিতে পারিলাম না। এ জগতে যাহা কিছু সকলই তাহার "আমার", আর "আমার" এই ভিন্ন তাহার আর কিছু কথাই নাই। "আমার"

দেহ, "আমার" রক্ত, "আমার" প্রাণ, "আমার" মন, আমার ইন্দ্রিয়, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান আমার কর্ম্ম, আমার গতি, আমার ভক্তি, আমার সাধন আমার মুক্তি, সকলই তাহার। এই যে সকল বস্তুরই উপর একটা আমার জ্ঞান আনিয়া দেয় সকল বস্তুর উপর একটা মমতা আনিয়া দেয় এ কে মা? যাহাকে জানি না—যাহাকে চিনি না তাহাকে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিতেছি, আর তাহার প্রতিদানে সে যথা সর্ব্বস্ব আত্মস্মাৎ করিবার জন্য এক অস্পষ্ট আমি জ্ঞানের মধ্য দিয়া "আমার" "আমার" করিয়া আমাকে আমার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে, এ কে মা? সুখ হলেও বলে আমার সুখ, দুঃখ হইলেও বলে আমার দুঃখ। মা তাহাকে আনন্দিত হইতেও দেখি না দুঃখিত হইতেও দেখি না। কেন না সব যাহা কিছু সকলই আমি করিয়া মরি, অথচ তাহার মধ্যে যেন আর এক জন আছে সে বলে "আমার" দুঃখ "আমার" সুখ। ওই নিষ্ঠুরকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াও উহাকে আমার করিতে পারিলাম না। উহার প্রাণে ভালবাসা নাই, কখনও কাহারও ভালবাসা লয়ও নাই, কাহাকেও ভালবাসা দেয়ও নাই। আমরা ভালবাসা চাই—এই প্রাণটাকে বিক্রয় করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই। মা লতা বৃক্ষ আশ্রয় না করিলে কি দাঁড়াইতে পারে? আমরা একটা প্রাণের মনের দাঁড়াইবার আশ্রয় খুঁজিতে চাই। মাগো পরের নিকট এই প্রাণটাকে বিক্রয় করিতে পারিলে 'পরের' পায়ে প্রাণটাকে সঁপিয়া দিতে পারিলে আর কিছুই চাই না। কিন্তু ওই নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজার ন্যায় "আমার" "আমার" বলিয়া সকলই অধিকার করে। কিন্তু মা তাহাতে প্রাণে এতটুকুও শান্তি পাই নাই অধিকন্তু জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলাম. আর তখন সেই নিষ্ঠুর সেই জ্বালার উপর দাঁড়াইয়া বলে "আমার" দুঃখ "আমার" শোক, "আমার" কষ্ট "আমার" ভোগ, তখন মা গো কোথায় জ্বালায় জ্বলিয়া আমি জ্ঞানকে লুকাইয়া রাখিব, আমি জ্ঞানকে সঙ্কুচিত করিয়া গুটাইয়া আনিব, তা নয় তখন সেই নিষ্ঠুর পুনঃ পুনঃ আমি জ্ঞানকে সেই দুঃখের উপর স্থাপন করে আর দ্বিগুণ আগুন জ্বলিয়া উঠে। বল এ নিষ্ঠুর কে মা? মাথা খুঁড়িয়া মর, বুক ফাটিয়া মর আর যাহাই কর সে তাহাতে দৃক্‌পাতও করে না। বল মা এমন করিয়া মানুষ কয় দিন বাঁচে? এমন নিষ্ঠুরের হাতে কেন জীবন সঁপিলাম? হায়! হায়!

দারুণ দুঃখের সময় মা যদি তোমার কোলে মাথা দিয়া আমি জ্ঞানকে হৃদয় মধ্যে আনিয়া তোমার পায়ে আপনাকে সঁপিয়া দিতে পারিতাম তাহা হইলে কি আর ওই নিষ্ঠুর "আমার" দুঃখ "আমার" ইচ্ছা বলিয়া আবার আত্ম-জ্ঞানকে ওই বস্তুর সহিত সম্পর্কিত করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থাপনা করিতে পারিত? পারিত? মা গো তোমার কুলে আজি ওই নিষ্ঠুরকে বলিদান দাও মা— তোমার জলে ভাসাইয়া দাও মা, তোমার কুলে তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি।

মা, তুমি এই যে অবিশ্রান্ত কুল কুল করিয়া প্রবাহিত হইতেছ, বল দেখি মা তুমি ও কি এই পতিত জীবের ন্যায় আমার আমার করিয়া অন্ধকারে ডুবিয়া থাক? না, মা, আমাদের প্রাণের ভাষা "আমার" কিন্তু তোমার ভাষা "সবার"—"সবার"। তুমি মা সবার যে তোমার কাছে যায়, যে তোমার স্মরণ করে, যে তোমায় নমস্কার করে, তুমি তাহারই। যে তোমার জল স্পর্শ করে যে তোমার জলে পবিত্র হইতে আসে, তুমি তাহারই। আবার কেবল তাহার নয়, তাহার মোক্ষ স্বরূপিনী। কিন্তু মা তোমার এই ক্ষমতা তুমি তোমাতে না দেখিয়া তোমার ভক্ত মধ্যে দেখিয়া থাক—আর তাহাকে তোমার সেই বরদ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া "বল, আমি তোমার, আমি সবার।" আর আমরা পতিত জীব নরকের কৃমিকীট সমস্ত ক্ষমতাই আমাতে দেখি, আবার দেখিয়া আমার ক্ষমতা বলিয়া অহঙ্কার করি, তাই মা আমরা পতিত হইয়া আছি। পাপ আর কোথায় মা? এই ত' পাপের মূল। এই পাপ যদি তোমার জলে বিধৌত না হয় তবে আর এ অরণ্যে রোদনে ফল কি মা? দেখ মা এই হৃদয়ে সর্ব্বদাই এক পুরুষ বাস করেন তিনিই সকল পাপের মূল। তিনি কেবল এ জন্মের নয়, কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া হৃদয়ে বাস করিয়া আসিতেছেন আর সেই সংখ্যাতীত জন্মজন্মান্তরের পাপ রাশিতে আত্ম কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাকে ঋষিরা পাপ-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সেই পাপ পুরুষ হৃদয় মধ্যে থাকিয়া, ভেদ বুদ্ধি, মিথ্যা জ্ঞান আনিয়া দিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই ত মা সত্যের সমাদর করিতে পারিনাই—সত্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারি নাই। আমরা যে মা অহোরাত্র তোমার ওই পুণ্য প্রবাহের মত পরের জন্য চলিয়াছি, সে কথা হৃদয়ে স্থান দিতে দেয় না—স্থান দিলেও কষ্ট বোধ হয়—বোধ হয় আমি-জ্ঞানের বুঝি কিছু অঙ্গহানি হয়। আমার

অর্জ্জিত অর্থ যে কেবল আমার নয়, সবার, এবং অনেকের দ্বারায় অর্জ্জিত—আমার কৃত কর্ম্ম যে আমার নয়,—সবার, এবং অনেকের সাহায্যে কৃত—আমার যে জ্ঞান যে আমার নয়, সবার, এবং অনেকের সাহায্যে অনুভূত হইতেছে তাহা চিন্তা করিতে কষ্ট বোধ হয়। এই যে জীব প্রবাহ একটী সূত্রে গ্রথিত এবং তোমার ওই সমষ্টী কৃত বারি বিন্দুর ন্যায় একটী প্রবাহে প্রবাহিত তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি না। মাগো লক্ষ লক্ষ জন্মের অর্জ্জিত কর্ম্মে পুষ্ট কলেবর সেই পাপপুরুষ হৃদয়ে অবস্থিত কেমন করিয়া বিশাল পুণ্যময় ভাব রাশিকে হৃদয়ে ধারণা করিব? মা পূর্ব্বতন ঋষিগণ আত্মশুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রাণের দেবতার নিকট অগ্রসর অভিলাষী হইলে, অগ্রে মন্ত্রের দ্বারায় এই পাপ পুরুষকে বিদায় করিয়া অমৃত সিঞ্চন দ্বারা নব-জীবন লাভ করিতেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের দেবতার নিকট অগ্রসর হইবার প্রয়াস করিতেন। মাগো যদি সেই ক্ষমতাই থাকিত, তবে আমি আজি তোমার কূলে আসিয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় রোদন করিতাম কেন?—কলি-যুগে ওই পাপপুরুষকে বিনষ্ট করিবার জন্যই 'ত' মা তোমার অবতরণ। তাই 'ত' মা তোমার এক বিন্দু মোক্ষদায়িণী বারির জন্য এত লালায়িত,—এত আকিঞ্চন—এত আরাধনা। আমরা অতি দুর্ব্বল আর সেই দূরদর্শী ঋষিগণ তাই তোমায় আনিয়া সেই মন্ত্র ও মন্ত্র-চৈতন্য সাধারণের নিকট হইতে অপসৃত করিয়াছেন। এখন এ অকূলে তুমি কূল না দিলে আর কূল কে দিবে মা? কেমন করিয়া আত্মসমর্পণের জন্য লালায়িত প্রাণকে লইয়া প্রাণের দেবতার নিকট দাঁড়াইব মা?—যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা দেখিয়া গহনতর প্রদেশে গিয়া পথভ্রান্ত হইয়া হাহাকার করে, মা তেমনই ভালবাসার জন্য প্রেমের জন্য লালায়িত প্রাণ বস্তুর মধ্যে—ক্ষুদ্রতার মধ্যে তাহার প্রাণের দেবতা—তৃষ্ণারূপিণী দেবীকে সন্ধান করিতে গিয়া অনতিক্রমণীয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে,—মা তুমি জন্মজন্মান্তরীন পাপ রাশি বিধৌত কর মা এ নরক যাতনার শান্তি হউক।

অনেকে বলিতে পারেন যে তোমার জলে স্নান করিলে স্বর্গ হয়, না* হয় মোক্ষ হয়, অহংকারের যে নাশ হয় তাহার প্রমাণ কি?—প্রমাণ কি তাহা জানি না। এই অগাধ শাস্ত্র জলধির মধ্যে আমি মূর্খ কীটানুকীট, শাস্ত্রের কতটুকু

জানি কতটুকু বুঝি মা ?—কিন্তু বড় যে পাদ-পদ্ম স্বর্গ হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া অতি দর্পী বলিরাজকে দেখাইল যে, যত বড় অহঙ্কারই হউক না কেন, যত বড় আমি জ্ঞানই হউক না কেন, এই বিষ্ণু-শক্তির পরে আর কিছুই নাই এবং এই বিষ্ণু-শক্তি ভিন্ন কিছুই নাই এবং কিছুই থাকিতে পাবে না —যে দিন সেই সত্য পরায়ণ বলিরাজ দেখিলেন যে ভগবানই একমাত্র জীবেব আশ্রয় ও গতি—যে দিন সেই সুর—অরি বলি সভক্তি প্রণতিব জন্য চেষ্টা করিলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে সম্পন্ন করিতে না পারিয়াও সেই ভগবানের অপাব করুণা-রাশিতে মুগ্ধ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ভক্তি গদ-গদ স্ববে বলিলেন যে, "দেব, নমস্কাবেব চেষ্টা মাত্রে যখন এত অনুগ্রহ—এত আনন্দ, তবে নমস্কাব করিলে না জানি তোমাব কতই করুণা, কত শান্তি অনুভব হয়" সেই দিন, মা, তুমি সেই স্বর্গরাজ্যে সেই ভেদ ভাব বিনাশন অভয়-চবণ হইতে প্রথম প্রবাহিত হও। তোমার জলে যদি অহঙ্কাব বিধৌত না হয়, দর্পহাবী সাক্ষাৎ মধুসূদনেব চবণামৃত ধাবণ কবিয়াও যদি অহঙ্কাব বিনষ্ট না হয়, তবে মা আব এ অধম সন্তানগণেব উদ্ধাবেব আশা কোথায় ?—অহঙ্কাবেব বিনাশেবই বা অন্য উপায়েব আশা কোথায় ?—স্বর্গ-লোক অতিক্রম কবিয়া অনতিক্রমণীয় ধ্রুব-লোকে থাকিয়াও, বাসুদেব পবায়ণ ধ্রুব কেন গঙ্গা-বাবি মস্তকে ধারণ কবেন ?—এই গঙ্গা আমাদেব কুল দেবতা হরিব চবণোদক এই বলিয়া ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে সেই জল মস্তকে ধাবণ কবিয়া কেন পবমাশান্তি লাভ কব ?—কেন, না তোমাব জলে অহঙ্কাব বিনষ্ট হয—ভক্তি স্রোতে ভেদভাব ঘুচিয়া যায়। একদিন অহঙ্কারেব প্রতাবণায় প্রতাবিত হইয়া ভগবানেব সাক্ষাৎকাব লাভ করিলেও সেই ভগবানে আপনার চিব বিসর্জ্জন প্রার্থনা না কবিয়া ভেদ ভাবাপন্ন বুদ্ধিতে স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলেন—রত্ন প্রার্থনা না কবিয়া ধুলিমুষ্টি ভিক্ষা কবিযাছিলেন। আবাব ভগবানের কৃপায় যখন সে ভুল বুঝিতে পাবিলেন তখন সেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব বিষাদে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। আহা! মাগো! আজিও ভক্তকুল-তিলক ধ্রুব তাই সেই অহঙ্কারেব বিষময় দংশন—পঞ্চম বর্ষীয় শৈশব হৃদয়ে ঘোবতর দংশন—ভুলিতে পারেন নাই। তাই তোমাব জল মস্তকে ধারণ কবিয়া সেই বিষ্ণুপাদ পদ্মে হইতে বিচ্ছিন্ন ধ্রুব-লোকে থাকিয়াও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান

করেন। তাই বলি মা, ত্রিতাপ হারিণী মা, ত্রিতাপ হারিণী গঙ্গে তুমি সেই নৃশংশ অহঙ্কারকে বলিদান দাও মা—সেই বিষধর সর্প তুল্য অহঙ্কারকে বলিদান দাও মা—মুক্ত হইয়া ভক্তি ভরে একবার তোমার বারি মস্তকে ধারণ করি আর তোমার একবার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রণিপাত করি। মাগো বড় সাধ এই অনন্ত জীব প্রবাহের সহিত মিলাইয়া যাই দেখি যদি কোন দয়াময় প্রাণের দেবতার দর্শন পাই, যাঁহাকে ভালবাসিলে তোমার ও আমার এই দুইটী জ্ঞান মিলিয়া একটী হয়। মা, সপ্তর্ষি মণ্ডলী তোমার জল জটা মধ্যে ধারণ করেন, কেন না তাঁহারা জানেন তুমি মা তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি—তোমায় পাইলে আর কোন তপস্যার বা তপস্যার ফলের প্রয়োজন হয় না। মা গো কত আদরে, কতই যতনে তাঁহারা তোমাকে শিরোদেশে ধারণ করেন। তুমিও মা তাহাদিগকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদ প্রদান কর, কেন না সেই সকল তপস্বী সেই বিষ্ণুপদ ভিন্ন আর অন্য কিছু ফল প্রার্থনা করেন না। তুমি মা সেখানে কত দুর্লভ। কিন্তু মা এখানে তুমি এত সুলভ। তাই ত মা তোমার আদর করিতে পারি নাই, তাইত মা তোমাকে বুঝিতে পারি নাই—তাই ত মা তোমাকে ভক্তি করিতে পারি নাই। মা, যদি এত দয়া করিলে তবে এত টুকু ভক্তি দাও মা, আমার অহঙ্কারের বলিদান দাও মা, আমার প্রাণের দেবতাকে, আমার ভালবাসার দেবতাকে একবার খুঁজিয়া দেখি,—দেখি যদি তুমি ও আমি মিলিয়া একটী হইতে পারি—দেখি যদি সেই ভাবের মধ্যে আমার প্রাণের দেবতা লুকাইয়া থাকে আর আমার মধ্যে—সেই দেবতার মধ্যে এই জীব প্রবাহের অনন্ত বাসনা-তরঙ্গ দেখিয়া একবার আমার সেই তৃষ্ণা-রূপিণী দেবীকে প্রণিপাত করিতে পারি—আর সেই তৃষ্ণারূপিণী দেবীকে সবারই বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সেই জীব-প্রবাহের মধ্যে মিশিয়া গিয়া আত্মহারা হইতে পারি—একবার প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণা রূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

তোমায় মা বাসনার সিংহাসনে বসাইয়া প্রাণে তৃপ্তি হয় না, এই অতৃপ্ত প্রাণ আরও গভীরতার মধ্যে ডুবিতে চায়—এই বাসনা ক্রান্ত হৃদয় আরও অতল জলে তলাইয়া যাইতে চায়। তখন স্বতঃই

মনে হয় যে মা তোমার এই মোক্ষদায়িনী জলে নিশ্চয়ই অহঙ্কারের বিনাশ হয়, নিশ্চয়ই এই বিচ্ছিন্ন আমি-জ্ঞান নষ্ট হইয়া একটী উচ্চ ভাব আনিয়া দেয়। নচেৎ মা তোমার গুণ-গরিমার লাঘব করা হয়। যদি স্বর্গ ফলই তোমার এক মাত্র দেয় হয়। তবে মা স্বর্গে তোমার অবতরণের কি প্রয়োজন ছিল? ধ্রুবলোকস্থিত ধ্রুব কেন তোমার ওই বারি মস্তকে ধরিয়া আপনার অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয় শান্ত করে মা—কেন তোমার শিরোদেশে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হয় মা? না, মা, তোমার ওই পুণ্য সলিল অহঙ্কারের কৃতান্ত স্বরূপ। কেন না দর্পহারী মধুসূদন যে দিন ত্রিভুবন বিজয়ী, ধর্ম্মানুবর্ত্তী দ্বিজ-পরায়ন, সত্য-ব্রত কলিরাজার দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কারকে চূর্ণ করিয়া স্বর্গ রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করেন সেই দিন সেই মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম হইতে তোমার জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ) "দিশেহারা।

নির্ম্মাল্য।

শারদ প্রভাতে তপণ রশ্মি পূবরে উঠিল ধীরে
মিলন অন্তে বিরহ ক্লিষ্ট বিহগ জাগিলে নীরে
কর্ম্ম-ক্লান্ত নিদ্রা অলস চন্দ্রমা গতি হীন
ঊষা খুলে দিলে শির হ'তে তার আবরণ খানি দীন।

লাজ-নত আঁখি শেফালিকা বধূ পতির বিরহ ভরে,
প্রভাত সমীর পরশে পড়িলে একটী প্রান্তে ঝরে।
নিখিল বিশ্বে পথ হারা জন বাসনার সীমা নাই
শিথিল সাধনা শ্লথ কর-পুট খসিয়া পড়িছে তাই;

অবশ অঙ্গ শারদ প্রভাতে ধরণী পড়িল লুটি,
সুদূরে কাহার মঞ্জীর রবে আবেগে ধাইল ছুটি।
ছিঁড়ে গেল তার হৃদয় তন্ত্রী মুখে বিষাদের ছায়া
তাপিত পীড়িত তাই বুঝি তার ছিন্ন মলিন কায়া।

সহসা উঠিল জগৎ ভাতিয়া দিব্য জ্যোতিতে যা'র
মন্দ মধুর গন্ধ বহিল ত্রিদিব মাঝারে তা'র॥

শ্রান্ত পথিক পড়িল আবেগে দেবীর যুগল পদে
বহিল তড়িৎ হৃদয়ে তাহার দেবীর প্রসাদ মদে
নিল সে কুসুম আপনার শিরে মায়ের চরণ হ'তে
রঙ্গরঙ্গে গাইল পথিক যুঝিতে আহব পথে।

শ্রীকমলা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেখা দে-মা।

একবার দেখা দে-মা। এই দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে, এই কাম-বাসনার অনন্ত যাতনার মধ্যে একবার দেখা দে-মা। মায়ের কোলে বসিয়া মা বলিয়া ডাকিব, মায়ের বুকে শুইয়া, মায়ের মুখের দিকে চাহিব, তাঁহার চরণ তলে বসিয়া শিশু খেলা খেলিব।—সন্তানের এই আকিঞ্চন চিরকালই অবিতৃপ্ত—কেন না এ তৃপ্তির শেষ নাই—এ পিপাসারও অন্ত নাই। মাতা ও সন্তানের মিলিত হৃদয়ের এই অবিতৃপ্ত তৃষ্ণাই ইহার তৃপ্তি।

তবে কেন ডাকি?—আমরা যে সেই মায়ের চরণ তলে বসিয়াই শিশু খেলা খেলিতেছি। এটী "কথার কথা" শ্রুতি মধুর রচনা মাত্র, মায়ের সন্তান মায়ের কোলে থাকিলে কি যাতনা হয়? সংসারের শোক-তাপ তাহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? আহা! এই সংসারে স্নেহময়ী জননীর কোলে বসিয়া—তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে মানব মৃত্যু-যাতনার সময়েও একটু উপশম অনুভব করে ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহার দয়া বুঝিতে পারি না—তবু ডাকি "একবার দেখা দে মা"। সংসারের ভালবাসায় যাঁর দয়া এত পরিস্ফুট না জানি সেই জগজ্জননীর নিরাবরণ ভালবাসা কেমন! কত মধুর!

মা গো, তোমার ওই রাঙা চরণ দুটী আমাদের বড় লালসার সামগ্রী তাই ডাকি "একবার দেখা দে মা"।

মা, গো তোমায় দেখিতে সাধ হয়,—কিন্তু এ সাধ লালসার এ সাধে পবিত্রতার সৌগন্ধি নাই, —এই সাধ যে কাম-বাসনার পুতি-গন্ধ-ময় নীচতায় পরিপূর্ণ, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। আমাদের মনের এই ভাষা মায়ের অফুরন্ত ভালবাসার সহিত মিলে না। তাই সেই স্নেহময়ী মা আমার খড়্গ-কম্বুসমাযুক্ত বরাভয়াম্বিত চারি হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিত করেন—"বাছারে ও কথা বলিতে নাই" কিন্তু তবু আমরা বলি "একবার দেখা দে মা" হায়! মা আসিবেন কেন? মায়ের অভয় চরণের আসন—সেই শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তির আসন এই কদর্য্য হৃদয়ে কই? তবে মা আসিবেন কোথায়?

তবে কি দয়াময়ী মা আমার হৃদয়ের বাহিরে আসিবেন? তাঁর এত দয়া যে তাহাও স্বীকার করেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি অন্য প্রকার, তাঁহার আহ্বানও অন্য প্রকার, সন্তান মায়ের কোলে বসিয়া কত আব্দার করে। মা সন্তানকে তখন পয়সা দিলে টাকা দিলে, কড়ি দিলে, সে কচি ছেলে ফেলিয়া দেয়, মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, খেলনা দিলে খেলিতে খেলিতে কোল ছাড়িয়া দেয়, খেলায় ভুলিয়া যায়, তার পর যখন "জুজুর" ভয় দেখান তখন সন্তান 'মা' বলিয়া আবার কোলে আসে। সেই কচি ছেলে পয়সা টাকা চেনে না, কিন্তু "জুজু" চিনিতে পারে। মা গো, স্বার্থশূন্য ভক্তি শিক্ষার জন্য পিতা মাতা, নিষ্কাম প্রেম শিক্ষার জন্য পত্নী, সহানুভূতি শিক্ষার জন্য ভ্রাতা, স্বার্থ ত্যাগ ও দয়া শিক্ষার জন্য ধন অর্থ এই সকল দিয়া, যখন পুত্রকে খেলায় মাতাইয়া দাও তখন সে তোমায় চিনিতে পারে না ভুলিয়া যায়। তার পর যখন একটী একটী করিয়া বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত সেই গুলি খসিয়া যায়, যাতনার দারুণ মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তখন সেই "জুজুর" ভয়ে ডাকি "একবার দেখা দে মা" তখন প্রাণের কথা বাহির হইয়া পড়ে" মা তুমি দেখা দাও আর না দাও কিন্তু এমন "জুজু" "সাজিও না" কিন্তু ওই "জু জুর" সাজটী ফেলিয়া দিতে পারিলে যে আসল মাকে ধরিয়া ফেলি তাহা বুঝিয়াও বুঝি না আর সেই ভয় ব্যাকুল অন্তরে ডাকি "দেখা দে মা"।

যখন সাধের সুখ-স্বপনে মগ্ন ছিলাম তখন সুখের তরঙ্গ গুলি বেশ একে একে আসিয়া আমার সহিত মিলিয়া যাইত। মিলিয়া আমার মোহই বৃদ্ধি

করিত। সেই সুখের তরঙ্গে তোমাকে দেখিতে পাইতাম না। তোমার ভক্তি করিবার যে কালাকাল নাই, বয়স বিচার ও জ্ঞানের বিচার নাই, তাহা তখন বুঝিতাম না বুঝিলে এ যাতনা হইত না। একটী দুঃখের তরঙ্গ হৃদয়ে আসিয়া পড়িলে এখন বুক ভাঙ্গিয়া যায়, অস্থি-পঞ্জর ভগ্ন হইয়া যায়, তেমন সুখের তরঙ্গের মত এক হইয়া আমার সহিত মিলিয়া যায় না। অভিনিবেশের পুণঃ পুণঃ আঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, জীব মৃত্যু যাতনা অনুভব করে। তবুও আত্ম জ্ঞান টুকু ছাড়িতে পারি না সেই কাম বাসনার বহির্মুখী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ডাকি "দেখা দে মা" আহা! তখন স্নেহময়ী মা বলেন "বাছারে, বলিতে নাই" আর অমনি আশায় কুসুম গুলি কালের কোলে ঝরিয়া পড়ে। তখন বহির্মুখী আমি জ্ঞান টুকু যেন কোন বিষের আঘ্রাণে হত-চৈতন্য হইয়া পড়ে। মা গো, চৈতন্যময়ি, এত করিয়া চৈতন্য হইল কৈ? তোমার স্বরূপ বুঝিলাম কৈ? তাই ডাকি" একবার দেখা দেমা"।

এই আমিজ্ঞানের উপর এত কোপ কেন মা?—বিষয়ে ও ভোগ-সুখে আমি থাকি আর আমার হৃদয় পিঞ্জরে তুমিও থাক—একি হয় না? এই কথা যে ভক্তের কথা নয়, সন্তানের মত কথা নয়—অসুরের মত অহঙ্কারের কথা তাইত মা মা তোমার এই রণ-মূর্ত্তি। তাই প্রথমে সন্তানকে সুশিক্ষা দিবার জন্য বার-ম্বার ইঙ্গিত কর "বাছারে বলিতে নাই' তাহাতেও যখন না শুনে তখন মা তুমি ওই রণ সাজে সজ্জিত হইয়া—দুর্জ্জন দলনী মহানবমীর ঘন-ঘোর সাজে সজ্জিত হইয়া নাচিতে নাচিতে সন্তানের বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাও আর তোমার ওই —সে অভয় পদ নয় মা—লোক ভয়ঙ্কর চরণ তাড়নায় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সব চুরমার করিয়া দাও সোণার গৃহ, আশায় মোহ হৃদয়ের অস্থি পঞ্জর সব ভাঙ্গিয়া চুর্-মার করিয়া দাও। তখন কোন সন্তানের সাধ্য তোমার দিকে চাহিয়া দেখে! তাইত মা তোমার পূজার প্রয়োজন বিধি পূর্ব্বক সংযত হইয়া, পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র আসন পাতিয়া তোমার ওই লোক ভয়ঙ্করী মহানবমীর মূর্ত্তিকে আহ্বান করে "এস মা"।

আহা! মাগো সন্তানের ভাগ্যে শেষে ওই লোক ভয়ঙ্কর রণ-মূর্ত্তি ছিল মা? তাহার আশায় সামগ্রী সুখের সামগ্রী অহং বুদ্ধি সব গুলি নির্ম্মূল করিয়া

তবে সদয় হবে মা ?—তবে দেখা দিবে ? হায়! এই অকৃতজ্ঞ সন্তানের পক্ষে ইহা উপযুক্তই হইয়াছে।

মা গো, এই যে তুমি প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি, প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে আসিতেছ বসিতেছ, মনের অনুভূতিতে অনুভূত হইতেছ। আমি পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ সন্তান ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্জরের বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তোমাকে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বলি অথবা এই সসীম বায়ুমণ্ডলের এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ বলি—এই ত মা তোমার অধম সন্তানের ভক্তির পরিচয়, পাষণ্ড পুত্রের কৃতজ্ঞতা। তুমি এই যে এত সহজ—সাকার ও নিরাকারের—স্বরূপ ও অরূপের সংযোজনা স্থলে, প্রতিমুহূর্ত্তে দেখা দিতেছ। শোণিতের প্রতি বিন্দুতে, প্রাণ সেচনা করিতেছ, মনের বাহন স্নায়ুর প্রতি-কেন্দ্রে শক্তি বিধান করিতেছ, তোমারই শক্তিতে বাঁচিয়া আছি—উঠিতেছি বসিতেছি, আহার্য্য গ্রহণ করিয়া আমার অহংটীকে পরিপুষ্ট করিতেছি।

মা গো, বড় সমস্যার কথা। আমি কে ?—আমার অহং আবার কে ? তুমি কার জননী ? এই ক্ষুদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র দেহাভিমানী একটী ক্ষুদ্র দুগ্ধ পোষ্য শিশু অহং আছে, তাহাকেই "আমি" বলি। আর তুমি স্নেহময়ী জননী প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া তোমার সেই শিশু সন্তানটীর মুখ চুম্বন করিয়া যাও—মুহুর্মুহু তাহাকে তোমার বিদ্যারূপিনী স্তন্য দান করিয়া কত স্নেহে তাহাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছ, কত যুগযুগান্তর ধরিয়া আমাকে বুকে করিয়া স্তন্য দান করিয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছ তাহা কে বলিবে ? —এত দয়া এত যত্ন এত কষ্ট এই সংসারের কোন জননীতে দেখা যায়! মা বিশ্বজননি! তোমার স্নেহ অগাধ। কেন সৃষ্ট পদার্থের সহিত তাহার তুলনা দিব মা, তুমিই তাহার তুলনা, তুমিই তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা। তাইত মা ভক্তির প্রাবল্যে পূজার সময় মন্ত্র ও মূর্ত্তি এক হইয়া যায়, আমি ও তুমি এক হইয়া যায়। তখন তোমার উলাঙ্গিনী বর্ণ-মূর্ত্তি আর ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হয় না। মা গো, কেমন করিয়া সেই স্নেহ হৃদয়ঙ্গম করিব ? তোমার সেই অপার স্নেহ সলিলে পরিস্ফুট এই হৃদ্ পদ্মে ডাকি—"দেখা দে মা" তোমার বিদ্যারূপিনী মূর্ত্তিতে "দেখা দে মা"—অহং জননী রূপে আমার অহংকে কোলে করিয়া দেখা—

দে মা" এই কাম-বাসনা, বিষয় বৈভব পদ দলিত করিয়া এই জগতের লয়ের স্থলে "দেখা দে মা"।

মা গো, সেই মহিষাসুর, অসুর হইয়ও ধন্য, কেননা সে তোমার অভয় চরণ লাভ করিল, তুমি তাহার অহংটীকে তোমার চরণতলে স্থান দিলে সে তোমাতে মিশিযা তোমার প্রসাদ পাইযা তাঁহার চির-আকিঞ্চনের চির শান্তির স্থানে ভক্তি তদ্‌গত চিত্তে স্থির হইয়া রহিল আর বর চাহিল "আমার বুদ্ধি যেন তোমাতেই স্থির থাকে" মা গো, চতুর্বর্গ প্রদায়িনী দুর্গে, কবে জীবের হৃদয়ে তুমি মহিষ-মর্দ্দিনী রূপে দাড়াইবে?—তোমারই প্রসাদ চতুর্বর্গ রূপে তাহাদের বহির্জগতে প্রকাশিত হইয়া তোমার মহিমাকে চির-ধন্য করিবে? তাই ডাকি মা, সেই সন্ধিপূজার সন্ধি স্থলে দেখা দাও মা। এই জগতে বসিয়া সে মিলন মন্দিরে উপনীত হইলে মা গো! বিদ্যারূপিনি তোমাকে দেখা যায় তোমার স্নেহ ও তোমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়, জীব চৈতন্য তোমার সহিত মিলিত হয়। চৈতন্যের সেই মিলন মন্দিরে "দেখা দাও মা—সেই সন্ধি স্থলে দেখা দাও মা এই শিশু অহং—এই জীব চৈতন্য, সুধাপানে বিভোর থাকুক—আর কাঁদিবে না আর বলিবে না—"দেখা দে মা"।

দিশেহারা।

নিজের প্রতি।

দেখা স নারে ঘৃণার হাসি প্রেমের ফাঁসি পরিয়ে নে,
বিশ্ব প্রাণে লুকিয়ে থাক্ নিজের প্রাণ বিলিয়ে দে।
আত্মহারা হ'স্‌নে রে আর, স্বার্থের খাঁচা ভেঙ্গে যাক্,
বেরিয়ে আয় সুখের কুঞ্জে অসীম শূন্য ব্যেপে থাক্।
পাষাণ বুকটি যাক্ রে ভেঙ্গে পরের লাগি কাঁদরে আজ
নিজের কান্না পরে কাঁদিস সেটি তো তোর নিজের কাজ।

মীনের মত অগাধ জলে জ্ঞানের তত্ত্বে ডুবে র',
দবের কথা ভাবিস্ যাবে শিশুর মত সরল হ'।
আঁধার মাঝে লুকাস্ না আর আলোর মাঝে উঠে আয়
আলো দেখে ভুলিস্ নারে মোদের দীন কালো মায়।
ভাবিস্ যদি নিজের কথা একটু আধটু ভাবিস্ না
গভীর ভাবে ভেবে দেখবে, যখন তখন হাসিস্ না।
বাঁচতে যদি চা'স রে তুই আর মরণ রে তুই স্মরণ রাখিস্
সংসার কুঞ্জে থাক্‌বি যদি শ্মশানরে তুই ভাল বাসিস্।
কমল যদি তুলবি রে তুই কাঁটা দেখে ফিরিস্ না
রত্ন-রাশি পরবি যদি তরঙ্গের ভয় করিস্ না।
অতি উদ্ধে উঠ্‌বি যদি অতি নিম্নে তাকিয়ে নে,
নিজের বাড়ী যাবি যদি পরের ঘর ছেড়ে দে।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

বহ্নি।

যেতে চাই স্বরগের সুষমা উদ্যানে
পথের মাঝারে তুমি থাক দাঁড়াইয়া,
কতই মধুর কথা কহি কানে কানে
দুটি হাত ধরি মোরে আন ফিরাইয়া।
আঁখির ইঙ্গিতে আর মুচকি হাসিয়া
দূর করি দেহ মোর তপস্যা সাধনা
ভ্রান্ত আমি, মুগ্ধ আমি তোমারে হেরিয়া
ভুলে যাই আপনার দেব আরাধনা।

রূপের আগুণে মোর পতঙ্গের মত
হৃদয়ের পুণ্য বৃত্তি মরিছে পুড়িয়া,
তোমারি পূজায় শুধু আজি আমি রত
তুমি আছ এ মানস মন্দির যুড়িয়া।
জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষে নিভিয়া নিভিয়া
শীতল অঙ্গারে বুঝি হ'বে পরিণত,
তারই প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি বসিয়া,
কে জানে সে দিন আর দূরে আছে কত।

শ্রীনলিনী নাথ দাস গুপ্ত এম, এ।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৭।

সুদেহার হৃদয়ে শান্তি নাই, মনে সুখ নাই। কেন নাই? সুদেহার তাহা বলিবার সাধ্য ও নাই। সুদেহা তাহার গঙ্গাজলের মুখে মথুরাধিপতি কংশাসুরের ন্যায় কি এক অভিনব দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছে। সেই বাণী সেই অপরিস্ফুট ও অবোধ-গম্য বাণী, আজ তাহার জীবন রঙ্গ ক্ষেত্রে কি যে এক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব অভিনয়ের আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে তাহা কি, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। অপরকে কি করিয়া বুঝাইবে?

প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই এইরূপ একটী বাণীর ইঙ্গিত আসিয়া পড়ে। যিনি রসিক, যিনি চতুর তিনি এই বাণীকে না দেখিয়া তাহার আধার বা উৎপাদকের দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিতে পান, এ বাণী কার? এ কি বলে? আর যে অরসিক অচতুর তাহারা বাণীকে আপনার মত করিয়া গড়ে ও স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরে। তাই—

যেই বংশী হলধরে ডাকে বলাই দাদা,

তাই শুনে ধায় বনে পাগলিনী রাধা—

এটা শব্দেরই গুণ যে শ্রোতার নিজ ভাবটা ফুটায়ে দেয়। শব্দকে নিজের মত করিয়া শোনে। এই শব্দ লক্ষণে বিল্বমঙ্গল প্রেমিক, লালাবাবু বৈরাগী কংশ স্বজন-হন্তা, ইত্যাদি।

সুদেহা যাহা শুনিয়াছিল শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছিল তাহাতে আর সুদেহা স্থির থাকিতে পারিল না। সুদেহা যে সু-দেহা। সে তাহার আমির তৃপ্তির জন্য স্বামীকে দ্বিতীয় পরিণয় সহ্য করিয়াছে সপত্নীর প্রতি স্বামীর অজস্র আদর দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছে, সপত্নি তনয়ে নিজের স্বকীয়ত্ব স্থাপন করিয়া আনন্দ হিল্লোলে ভাসিয়া যাইতে পারিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সেই মমত্ব মাত্রায় আঘাত লাগিয়াছে, সে দেখিতে পাইয়াছে ফলত তাহার কিছুই নহে। স্থুলভিমানী কি কখনও স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতে পারে? লোষ্ট্র যেমন কখনও ধরণীর পৃষ্ঠ ছাড়িয়া নিজ বলে শূন্য বা সলিল আশ্রয়ে থাকিতে পারে না সুদেহা ও স্বভাবতঃ বিদেহ সুখে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। তাহার সুখ দ্রব্যে ভাবে নহে। তাই সুদেহা আজ কেবল 'আমার আমার' করিয়া পাগল।

সুদেহা দিবারাত্রি ভাবেন আমার বলিতে কি আছে? আপন মনে আপনি শত প্রশ্ন করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দেয়।

প্রশ্ন—এ ঘর বাড়ী কার?

উত্তর—যুষ্মার।

প্রশ্ন—স্বামী কার?

উত্তর—যুষ্মার।

প্রশ্ন। পুত্র কার।

উত্তর। যুষ্মার।

প্রশ্ন। সুখ কার?

উত্তর। যুষ্মার।

প্রশ্ন। আমি কে?

উত্তর। তুমি কেহই না। তুমি জল প্রবাহে ভাসমান শৈবাল-খণ্ড মাত্র

সুদেহা আর সহ্য করিতে পারিল না। "কি অপরে সুখী হইবে আর আমি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিব? এই জন্য বিধাতা আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন?" এইরূপ ভাব-তরঙ্গে অভিহত হইয়া সুদেহা "আমার" বলিতে শিখিয়া "আমার" বলিয়া সংসারকে পৃথক করিয়া দিল। সে দেখিতে পাইল যে তাহার বলিতে সংসারে আর কিছুই রহিল না, তাহার বর্ত্তমান শূন্য ভবিষ্যত ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন, ও অতীত একখানি কালিকাচ্ছন্ন দীনতার ম্লান চিত্রপট। আজ সেই অতীতের চিত্র পটে নিজের আস্থান গুলি দেখিয়া দারুণ অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। সে ভাবিতেছে হয় "আমি কি জন্যই বা স্বামীর বিবাহ দিয়াছিলাম। কি জন্য যুশ্মার পুত্র লইয়া সুখের মোহে ডুবিয়া ছিলাম? কি ভ্রান্তি কি সর্ব্বনাশ। আমি আপন হাতে সোনার ঘরে আগুণ দিয়াছি। এখন যাহা কিছু দেখিতেছি সকলইত যুশ্মার সবই, যুশ্মার যুশ্মারই সব" সুদেহার কেহই নাই কিছুই নাই।

অবশেষে সুদেহা স্থির করিল যুশ্মার নয়ন জলেই তাহার দুঃখের নিবৃত্তি যুশ্মার সুখ, যুশ্মার হৃদি, এমন কি যুশ্মার ছায়াটী পর্য্যন্ত তাহার চক্ষু-শূল হইয়া উঠিল। আর যেই পুত্রের সহজ সরল, ভালবাসা, সুদেহার জন্য ভূতলে স্বর্গের নন্দন নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেই পুত্র আজ তাহার শত্রুবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই পুত্রের মৃত্যুই এখন তাহার একমাত্র বাঞ্ছনীয়। সে ভাবিল "এই পুত্রের মৃত্যু হইলেই সে আর যুশ্মা সমান পদটী লাভ করিতে পারিবে। এই চিন্তার সুদেহা নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। অতি নীচ ভেদভাবে সুদেহার হৃদয় কলুষিত হইল ও তাহার হৃদয়ের সুখের আশা ও নির্ম্মূলিত হইল।

সুদেহার হৃদয়-কালিয়হ্রদের বিষ জ্বালা যে ভয়ানক তেজে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সুদেহা যতটা ঐকান্তিক প্রযত্নে এতকাল পর্য্যন্ত পারিবারিক প্রীতির অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছিল, তদপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে, ভালবাসার কপটাস্তরণাস্তরালে জিঘাংসা রূপ তক্ষককে স্বকীয় হৃদয়-শোণিত ধারায় এতদূর পরিপুষ্ট করিয়াছিল যে তাহার দংশন হলাহলোদ্গারে অতি সুপরীক্ষিত নব-পুঙ্গবও মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। পদ্ম-যোনি কর্ত্তৃক অপহৃততনয়া গোকুল কামিনীগণের বাৎসল্য প্রবাহ যেমন

শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া স্ব-পুত্র-রূপধারী শ্রীনন্দনন্দনে অর্পিত হইতেছিল, সেইরূপ সুদেহার স্বভাব-সুলভ প্রীতি ও ভালবাসা কপটতার তীব্রতায় এত মধুরতা ধারণ করিয়াছিল যে তাঁহাতে সকলেই অধিকতর আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়াছিল, পরন্তু কিছু বিস্মিতও হইয়াছিল।

সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। সুদেহার হৃদয়ে যে, এতাদৃশ একটা বিষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহা কেহই জানিল না। সকলেই বিশ্বস্ত হৃদয়ে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে মিলিয়া মিশিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। সুধর্ম্মা যথা সময়ে পুত্রের বিবাহ দিলেন। পুত্র বধূ ঘরে আসিয়া অগ্রেই সুদেহাকে প্রণাম করিল। সুদেহার গণ্ড বহিয়া দুইটী অশ্রুবিন্দু পতিত হইল, ঘুশ্মা ভাবিলেন সুদেহা আনন্দবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সুদেহার এই অশ্রু- কণা আশীর্ব্বাদ কি অভিশাপ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা কে বলিবে?

৮।

গভীর রজনী। নিদ্রামগ্ন নবদম্পতি প্রগাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ। সেই নিদ্রিত নবোঢ় মিথুনের বদনকমলে নিবাবিল শান্তি বিরাজ করিতেছে। দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে ঘুশ্মা এই সন্তান লাভ করিয়াছে। সেই করুণাসাগর শশাঙ্কশেখরের প্রসাদে এত দিন বর্দ্ধিত হইয়া এই নবীন প্রসূন যুগল একমাত্র প্রীতির বৃন্তাবলম্বনে স্ফুরণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে। সংসার কুসুম বিতানের দুইটী নবীন কোরক বিধাতার আশ্চর্য্য বিধানে একবৃন্তে জড়িত ও মিলিত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে এই কুসুম কলিকাযুগলের রূপে আজ সুধর্ম্মার সংসার উদ্যান আলোকিত ও পুলকিত করিয়া সাধক হৃদয়ে দেবাদিদেবের নির্ম্মাল্য শোভা ধারণ করিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের করুণা সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সুধর্ম্মার গৃহে বিরাজমান—আর প্রীতি ও পবিত্রতার অনন্ত উৎস পুষ্পপরিমলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। এই দম্পতি যুগলের সুষুপ্তি সুখের ব্যতিক্রম ভয়েই যেন রজনী নিস্তব্ধ, বায়ু প্রশান্ত, ও বনস্পতি সকল নীরব প্রহরীর ন্যায় দূরে দণ্ডায়মান। যখন

ক্রীড়া-পরায়ণ পবন হিল্লোল এক অতি পেলব মধুর নিশ্বাসে নিদ্রিত দম্পতির অধরোষ্ঠ চুম্বন করতঃ বালিকাবধূর নিদ্রিত কপোল-কমল-দলের উপরে ক্রীড়া-পরায়ণ ভ্রমর সদৃশ অযত্ন বিন্যস্ত চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইয়া রাখিতে যাইয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাড়াইয়া দাড়াইয়া ঐ বদন শোভা দর্শনে বিমোহিত হইতেছিল। তখন—রজনীর সেই প্রশান্ত মুহূর্ত্তে, সেই নৈশ নীরবতার স্নেহময় পবিত্র অঙ্কে থাকিয়াও, একটী অভিশপ্ত জীব সেই গৃহের কক্ষান্তরে থাকিয়া দারুণ মর্ম্ম পীড়নে ছটফট্ করিতেছিল। তাহার আরক্ত উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় বিস্ফারিত, বদন মণ্ডল নিদারুণ উদ্বেগে আরক্ত ও পৈশাচিক আলোর জ্যোতিতে অলক্ষিত হস্তে, দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ, সুশানিত ছুরিকা। সেই পাপীয়সী রমণী মূর্ত্তি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ইতস্ততঃ সাবধানতার তীক্ষ্ণ ও বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় সেই দম্পতি-যুগলের মিলন-মন্দিরে প্রবেশ করিল।

কে তুমি? এমন পবিত্র মিলন ক্ষেত্রে—এমন মধুর মুহূর্ত্তে, এই নিদ্রা ব্যাজগলদকলেবর সুখালিঙ্গনবিধুর দম্পতি যুগলের সম্মুখে করাল অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান, পিশাচী তুমি কে? যেই পেলব মধুর মূর্ত্তি দর্শনে কৃতান্তের করাল কবলও মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হয়,—যেই তরুণ রূপ-লাবণ্যের ছটায় রাক্ষসেরও হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়—যে পবিত্র মিলনে বিষাদ কালিমা বিন্দু পাত করিতে পিশাচেরাও ঘৃণা বোধ করে—সেই নবীন নিদ্রিত মিথুনের সম্মুখে এমন করিয়া মুষ্টি বদ্ধ হস্তে শাণিত অস্ত্র লইয়া তুমি কেন দাঁড়াইলে? তুমি কে? তুমি কি সুদেহা? তুমিই না এই প্রসূন যুগলের পরিপোষক আশ্রয় বৃন্ত! তুমিই না ইহাদের পোষিকা মাতা!! সুদেহা!—সুদেহা ত রমণী—রমণী মাতার জাতি, সে কি, নরহত্যা করিতে পারে? পুত্র হত্যা করিতে পারে? না, না তা' কখনই হইতে পারে না, একান্ত অসম্ভব ও অবিশ্বাস যোগ্য। এই কি সেই সুদেহা, যে সুদেহা আপনার জীবিত-সর্ব্বস্ব প্রিয় পতির সেবার জন্য স্বহস্তে স্বপত্নির সেবায় পরম পরিতোষ লাভ করিত?—এই কি সেই সুদেহা, যে যুশ্মার পুত্রের প্রতিপালনে আত্মহারা হইয়া নিজে বন্ধ্যা হইয়াও গর্ভধারণ ও প্রসব বেদনার অলৌকিক স্মৃতি আপন প্রাণে অনুভব করিত? এই কি সেই সুদেহা, যাহাকে এই নব-দম্পতি

মাতা ভিন্ন অন্য বলিয়া জানে না? যাহার প্রগাঢ় স্নেহের প্রবাহে সুধর্ম্মার সংসার উচ্ছলিত এই কি সেই—সেই সুদেহা? না, তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু কোন্ প্রমাণ বলে জাজ্জল্যমান প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে? যদি তেমন প্রমাণ কিছু থাকে তাহাই অবলম্বন করিয়া দেখ, পাঠক দেখিতে পাইবে যে মানব-চরিত্র দেবতা ও দানবের রঙ্গভূমি—বিসদৃশ ভাবের মিলন ক্ষেত্র, এই স্থলেই আলোকের উজ্জলতার পার্শ্বে অন্ধকারের গাঢ়তা প্রতিফলিত—মানব চরিত্রে অসম্ভব কিছুই নাই। অসম্ভব শব্দটী মানবের চরিত্র কোষে দুর্ঘট। প্রবৃত্তি তরঙ্গ মানব চরিত্রকে মুহূর্ত্ত মধ্যে নন্দনগন্ধামোদিত দ্যুতিমান ত্রিদিব হইতে পুতি গন্ধময় নরকে নামাইয়া আনিতে পারে। এই খানেই অঘটন-ঘটনা পটীয়সী ভগবৎ লীলার রঙ্গমঞ্চ। হে ভগবান! তোমার এই অঘটনঘটন লীলাকে কোটী নমস্কার।

আমরা বেহুলা লখিন্দরের বাসর শয্যা পার্শ্বে দারুণ বিষধর উদয়কাল নাগের কালান্তক মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সতীর শয্যা পার্শ্বে তাহারও ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বরবধূর কাঁচা লাবণ্যে সেই ফণিণীর হৃদয়েও একটু স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। সেও একবার ভাবিয়াছিল কেমন করিয়া এই রূপে বিষ-দন্তাঘাত করি? কিন্তু সুদেহার বিকট দৃষ্টি হিংসার পৈশাচিক ভঙ্গিতে সেই দম্পতি যুগলের দিকে চাহিবা মাত্রই জিঘাংসার দারুণ বহ্নি শতগুণে জ্বালাইয়া তুলিল, প্রতিহিংসা পিশাচি তাহার কাণে কাণে কহিতে লাগিল "এ যুশ্মার পুত্র, এই যুশ্মার পুত্রবধূ এ আমার কে?—এ আমার দুঃখের নিধান, অসুখের মূল।—তবে আর কেন? আর বিলম্ব কেন? যুশ্মার নয়ন জলেই আমার সকল জ্বালা মিটাইব।" সুদেহার করস্থিত ছুরিকা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইল। সুদেহা সাবধান!—ঐ দেখ গগণে নক্ষত্রনিকর ভগবানের অপলক নয়নের ন্যায় তোমার কার্য্য অনিমিষে দেখিতেছে। এই অচঞ্চল বায়ু তাঁহার উৎকর্ণ শ্রবণ বিবরে তোমার মর্ম্মবাণী বহন করিতেছে নব দম্পতির এই মিলন মন্দির তাঁহার প্রশান্ত দেহ, এই মন্দিরে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিও না। তাঁহার নিকট—সেই অন্তরাত্মার নিকট—তোমার কোন কর্ম্মই গুপ্ত থাকিবে না। সাবধান সুদেহা সাবধান!! ক্ষান্ত হও সুদেহা, ঐ দেখ নিদ্রিত দম্পতি এই গভীর সুষুপ্তির মধ্যেও তোমারই সম্মানগৌরবে আলিঙ্গন পাশ মুক্ত হইয়া পার্শ্ব পরি

বর্ত্তন করিল। এ যে তোমারই তনয়। এই যে কুমারের নিদ্রিত মস্তক তোমার পদতলে আসিয়া পড়িল, এই কি তাহার জীবনের শেষ মাতৃ চরণ বন্দন। তুমি কি পদানত তনয়ের শিরচ্ছেদ করিবে? যাও সুদেহা ফিরে যাও, ভক্তিমান পুত্রের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া যাও তোমার স্নেহ বাবা'ত পূর্ব্ব হইতেই উহার প্রাণ মন গ্রহণ করিয়াছে অসির আঘাতে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না বরং ছিন্ন হইয়া যাইবে। আবার সেই—সেই বিকট চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই নিশাচরী সেই করাল অস্ত্রের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি দেখ সুদেহা? তোমার হৃদয় এই অস্ত্র অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ অধিক ভীষণ, চন্দ্রতারাহীন রজনী অপেক্ষাও ঘোরতর অন্ধকার।

রমণী হৃদয় সলিলের ন্যায় দ্রব-শান্তি দায়িনী, কিন্তু হায় সেই দ্রবময়ী যখন শীতল স্বার্থের বশীভূত হইয়া কঠিন হিমানী মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন উহা পাষাণোপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়ে। পাষাণেরও কোমলতা দেখা যায়, কিন্তু এই কঠিন সুদেহার হৃদয় কিছুতেই টলিল না, দৃঢ় মুষ্টি কিছুতেই নড়িল না। যে নিদ্রিত শির মাতৃচরণ সমীপে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে বদন মণ্ডলে সুবর্ণা ও যুধ্মার ঐহিক সুখ ও সাধ একটী দৃঢ় বন্ধনে সংযোজিত ছিল, সুদেহার করাল অস্ত্রাঘাতে তাহা দেহাবিচ্ছিন্ন হইয়া বিমাতৃ চরণে পতিত হইল। তৃপ্ত হইলে'ত সুদেহা? সরুধির পুত্র মুণ্ড পাইয়া তৃপ্ত হইলে ত? একি আবার আঘাত। কাট, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্তি কর। বস্ শেষ হল'ত। রুধিরাপ্লুত মাংস বড় সুকোমল মাংস—বন্ধন করিতে হইবে না। ভাণ্ড লইয়া বন্ধন শালায় যাইবে? বেশ। একি জলাশয়ে কেন? তোমার উদর ভাণ্ডে কি ইহার স্থান হইল না? বন্ধ্যা, সন্তান জঠরে ধারণ কর নাই, আজ পুত্রকে উদরে পুরিয়া সেই সাধ মিটাইবার অবসর পাইয়া ছাড়িলে কেন? যাও, বেশ করেছ, হস্তপদ প্রক্ষালন ও স্নান মার্জ্জন করিয়া শয্যায় শয়ন কর, নিদ্রা যাও। আজ বড় তৃপ্তির নিদ্রা। এমন নিদ্রা কেহ কখন লাভ করে নাই। কল্পনা কৌতুকী কবির কল্পনায়ও ইহা দুর্লভ। বিধাতার সৃষ্টিতেও ইহাই বোধ হয় প্রথম।

(ক্রমশঃ)

'দিশেহারা

কঠোপনিষদ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

তৃতীয়া বল্লী।

ছায়া ও আতপ যথা বিলক্ষণ
জীব পরমাত্মা বিরুদ্ধ তেমন
জীবাত্মা সংসারী পরমাত্মা নন
ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইহাই বলে।

তবু পরমাত্মা পাতা সম্বন্ধেতে
না করে ও ভোগ যা কিছু জগতে
হন ব্যবহৃত ভোক্তৃর রূপেতে
জীবাত্মা সহ সম্বন্ধের ফলে

নচিকেত অগ্নি যজমান গণ
ভাবয়ে যাহারে দুঃখ নিবারণ
সেই অগ্নিবরে করিতে চয়ন
সম্পূর্ণ যেন গো সক্ষম হই

পরন্তু যেন গো আত্মাখ্য অক্ষর
ভয় শূন্য যাহা আলম্বন পর,
সংসার তরিতে যে বস্তু অমর
তাহারে যেন গো জানিয়া লই।

বিদ্যা বা অবিদ্যা অধিকৃত জন
সংসার অথবা মুক্তির কারণ,
যে সব সাধন করে আলম্বন
'রথ' বলি তাহা কল্পিত হয়,

আত্মা রথস্বামী সেই কল্পনার
বিবেক সারথি দেহ রথ তার
করিতেছে সভা কার্য্য রশনার
সংকল্প বিকল্প লক্ষণ ময়

চক্ষুরাদি যত   ইন্দ্রিয় সকলে
দেহরথবাহী   'হয়' বলি বলে
রূপ আদি সব   বিষয় করলে
'রথ মার্গ' বলি জানিয়া রাখ।

শরীর ইন্দ্রিয়   মনের সহিত
সংযুক্ত আত্মারে   মনীষি বিহিত
জ্ঞানে ভোক্তা বলি   এ আত্মা অমৃত
উপাধিক ভোক্তা জানিয়া থাক

'বুদ্ধি' আখ্যা ধারী   'সারথি' সে জন
যদি করিবারে   মনঃ প্রগ্রহণ
হয় অনিপুণ   যত্তপি কখন
না রহে বিবেকী সংসার মাঝে

দুষ্ট অশ্ববাহী   রথ-বর মত
হয় সদা সেই   বিপথেতে নীত
এ জড় মরতে   হয়ে স্নেহ জড়িত
করে দুঃখ ভোগ সংসারী-সাজে

যে জন আবার   বিপরীত তার
সমাহিত চিত্ত   সারথি যাহার
তুরঙ্গ স্থানীয়   ইন্দ্রিয় তাহার
সদা আজ্ঞাকারী সংযত হয়,

দান্ত অশ্ব নিয়ে   সারথি যেমন
নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্যে   করয়ে গমন
সুনিপুণ বুদ্ধি   ইন্দ্রিয়ে তেমন
করি বশীভূত প্রধান রয়।

অবিজ্ঞান-বান সারথি যাহার
মন প্রগৃহীত নহে কভু তার
তাইতে সর্ব্বদা বিবেক তাহার
ইন্দ্রিয় অধীন অশুচি রহে।

এ হেন সারথি করিয়া আশ্রয়
কভু নাহি রথী কৈবল্য লভয়
জন্ম জরা মৃত্যু চিহ্ন সমুদয়
সদাই সে জনে যেরিয়া রহে।

বিবেকী সারথি— যুক্ত রথী যেই
প্রগৃহীত মন সদা শুচি সেই
জীবনে তাহার কোনো ভয় নেই
মুক্তি পথ সদা অক্ষুন্ন তার,

ব্রহ্ম পদ যাহা অব্যয় অমর
হয় প্রাপ্ত সেই আত্মাখ্য অক্ষর,
জনম সংসারে গাঢ় ক্লেশ কর
হয় না তাহার কখনো আর।

বিবেকী সারথি সম্পন্ন যে জন
পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রগৃহীত মন
রহে সদা শুচি যে বিদ্বান জন
মুক্তি-ভাগ্য তার প্রসন্ন রয়

সংসারের সীমা পর পারে তার
গিয়ে, পেয়ে পদ সকলের সার
ব্যাপন স্বভাব পরম আত্মার
স্বরূপ তাহার জানিয়া লয়।

রূপ আদি করি   যতেক বিষয়
তা'হতে ইন্দ্রিয়   সূক্ষ্ম অতিশয়
তা'হতে ও সূক্ষ্ম   মন নিঃসংশয়
অন্ন-ময় সৌম্য বলিয়া খ্যাত,

সেই মন হতে   বুদ্ধি সূক্ষ্মতর
তাহতে ও সূক্ষ্ম   আর মহত্তর
দেখি বোধাত্মক   আত্মা সে অমর
অব্যক্ত হইতে প্রথম জাত।

সে মহৎ হতে   আরও সূক্ষ্মতর
বিশ্ব বীজ ভূত   'অব্যক্ত প্রখর
ওতঃপ্রোত ভাবে   যাহা নিরন্তর
পরম-আত্মায় আশ্রিত রহে

সে অব্যক্ত হতে   সূক্ষ্ম ও মহান্
'পরম পুরুষ'   পূর্ণ গরীয়ান্
সমগ্র সৃষ্টির   সেথা অবসান
তা হতেও পর কিছুই নহে

সেই সে পুরুষ   ব্রহ্মাদি হইতে
রয়েছে সংবৃত   সমস্ত জগতে
মায়ায় আচ্ছন্ন   ভূত সমীপেতে
প্রকাশিত কারো আত্মত্বে নহে।

কিন্তু সংস্কৃত   সূক্ষ্মদর্শীজন
ব্রহ্মভাব-বুদ্ধি   করি আলম্বন
করেন সবাই   আত্ম দরশন,
জগতে পণ্ডিত তারেই কহে।

বিবেকী মানব ইন্দ্রিয় সকলে
করেন বিলয় মনের কবলে
সেই মনে পুনঃ করেন কৌশলে
প্রকাশময় বুদ্ধিতে বিলীন,

আত্মা প্রথমজ মহত আখ্যান
করে লুপ্ত তথা আপনার জ্ঞান
সেই মহতের করি অবসান
জ্ঞানী পূর্ণতায় রহেন লীন।

সেই জ্ঞানীমত ওহে জীবগণ
সর্ব্বানর্থ-ভূত এ মোহ বন্ধন
অজ্ঞান নিদ্রার করিয়া ছেদন
আত্ম জ্ঞান মুখী কেন না হও।

আমি এই 'আত্মা তত্ত্ব সবিশেষ
কার্য্য কারণের আমি সর্ব্বশেষ'
আচার্য্য সমীপে এই উপদেশ
বিশেষ করিয়া জানিয়া লও।

অতীব বিচিত্র ঘোর রূপা মায়া
মহাশক্তিশালী এ বিশ্ব ভরিয়া
জেনে জীবে তার মুগ্ধকরী ক্রিয়া
করিয়া সে পথ দুর্গম রহে।

কহেন তাঁহারা তীক্ষ্ণ ক্ষুর ধার
রহিয়াছে পথে অকূল পাথার
তত্ত্ব-জ্ঞান মার্গ দুর্গম অপার
সুসম্পাদ্য ইহা কখনো নহে।'

অশব্দ অস্পর্শ রূপ রস হীন
তাই সে অব্যয় নিত্য চির দিন
অনাদি অনন্ত বুদ্ধি সমীচিন
ধারণা ইহারে করিতে নারে

হ'ন অবগত যেই নর বর
এ হেন আত্মায় মহত্তের পর
মরণ কবল চির ক্লেশকর
হ'ন মুক্ত তা'তে অনন্ত তরে।

নচিকেতা-প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ও অক্ষয়
মৃত্যুদেব প্রোক্ত এই বল্লী ত্রয়
শুনিলে মেধাবী স্থির অসংশয়
ব্রহ্মলোক মাঝে উপাস্য রহে।

গুহ্য গ্রন্থ এই শ্রাদ্ধে যেই জন
পবিত্র হইয়া করিবে পাঠন
ব্রহ্মণ সভাতে সে শ্রাদ্ধ মতন
অনন্ত ফলদ কিছুই নহে।

ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।
ইতি কাঠকোপনিষদি প্রথম অধ্যায় সমাপ্তঃ।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিষয় প্রকাশ
জড় জ্ঞানে নহে আত্মার বিকাশ
তাই বলি, ধাতা করেছেন নাশ
ইন্দ্রিয় কল বহির্মুখী করে

তবে নদী স্রোত প্রবর্ত্তন মত
ইন্দ্রিয় সকলে করিয়া সংযত
বিবেকী মানব লভিতে অমৃত
প্রত্যগ্ আত্মায় হেরিতে পারে।

অল্প-প্রজ্ঞ নর ভোগ বাসনায়
মজিয়া বিষয়ে সৃজিত মায়ায়
মরণ করলে বার বার যায়
প্রতিবদ্ধ আত্মদর্শন তাহে

কূটস্থ অবিচালা অমৃত ধনে
তাই ধীর ব্যক্তি ধ্রুব বলি জেনে.
প্রতিকূল যাহা আত্ম দরশনে
অধ্রুব সে হেন কভু না চাহে।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ মৈথুনেরে
মায়াবদ্ধ প্রাণী এ জড় সংসারে
যেই বস্তু দ্বারা উপলব্ধি করে
অবিজ্ঞেয় যার কিছুই নাই,

সেই সে সর্ব্বজ্ঞ সেই দ্রষ্টা শ্রেয়
তিনি পরমাত্মা মুমুক্ষুর প্রেয়
নচিকেতা তব জিজ্ঞাস্য বিষয়
উত্তর তাহার জানিহ এই।

যেই আত্ম দ্বারা স্বপ্ন জাগরণ
এ, দুয়ে বিজ্ঞেয় যাহা কিছুধন
ক'রে উপলব্ধি মানব জীবন
সংসারে নিজেরে জড়িত করে,

ধীর ব্যক্তি সেই আত্মারে জানিয়া
'আমি পরমাত্মা' প্রকৃষ্ট বুঝিয়া
শোকাদি হইতে বিমুক্ত করিয়া
রাখে আপনারে জীবন ধরে।

প্রাণাদি কলাপ নাবস্থিতা তার
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান আর
যেই কালত্রয় নিয়ন্তা তাহার
নিখিল বস্তুর ঈশ্বর যেই,

সেই সে অদ্বৈত জানিলে তাহারে
গোপন কিছুই না থাকে সংসারে
চির ভয়-হীন বিশ্ব চরাচরে
সুখদুঃখশূন্য জানিহ সেই।

স্বর্ণ হতে জাত স্বর্ণ গুণ যেমন
তপস হইতে তেমন বরুণ
যে হিরণ্যগর্ভ লভিলা জনম
প্রাণী হৃদাকাশে বসতি যার,

সে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাত্মক ধন
পারে হেরিবারে যে মুমুক্ষু জন
প্রকৃত ব্রহ্ম সে করে নিরীক্ষণ
সবার সার্থক জনম তার

রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ চয়
অদিতি তাদের সর্ব্ব দেব ময়
বিবেক গুহায় যার স্থিতি রয়
প্রকৃত ব্রহ্ম যে জানিহ তাই

সে হিরণ্যগর্ভ পর ব্রহ্ম হতে
হইয়া উৎপন্ন সমগ্র বিশ্বেতে
রয়েছে বিলীন চৈতন্য রূপেতে
তা হতে পৃথক কিছুই নাই।

উত্তর অধঃ অরণি যেমন
সর্ব্ব হবি ভোক্তা তীব্র হুতাশন
রাখে লুকাইয়া হৃদয়ে আপন
পরে যজ্ঞ কর্ম্মে প্রকাশ তরে।

কিম্বা অন্তর্ব্বত্নী যেমতি ধরণ
কটু ও কষায় বর্জ্জিত ভোজন
করি স্বীয় মুখে করয়ে পালন
গর্ভস্থ সন্তানে সুপুষ্ট ক'রে।

তেমতি প্রকার প্রতিদিন রবি
অর্চ্চনা বন্দনা স্তুতি আদি করি
কর্ম্মী যোগীগণ আপনা পাসরি
সমর্পি আজ্যাদি রক্ষিব' পরে।

জাগরণ শীল জাতবেদা বনে
রাখি লুকাইয়া হৃদয়ে গোপনে
অসীম বিরাট বৃদ্ধি ক্ষয় হীনে
প্রকৃত ব্রহ্মে উপলব্ধি করে।

যেই প্রাণ হতে উদিয়া ভাস্কর
করি আলোকিত বিশ্ব চরাচর
প্রতি দিবা শেষে হয়ে ক্ষীণকর,
যান অস্ত পুনঃ যাহার (ই) মাঝে

অগ্নি আদি কবি সর্ব্ব দেব দল
রথে রথ চক্র তথা অবিকল
আছে সম্প্রবিষ্ট যাহাতে সকল
তদতীত আর কিছুনা আছে।

অবিবেকী কাছে উপাধি অম্বিত
প্রকাশিত যাহা সংসারীর মত .
তাহাই সংসার ধর্ম বর্জ্জিত
পরব্রহ্ম নিত্য বিজ্ঞান ধন।

ঘোর মায়া মোহে ভুলি যেই জন
'নানা' ভাবে ব্রহ্ম করে নিরীক্ষণ
মৃত্যু পরে মৃত্যু করিয়া বরণ
চির ক্লেশে সেই রহে নিমগণ।

আচার্য্য-আগম- সংস্কৃত মন
প্রাপ্য তাহা দ্বারা ব্রহ্মাত্মক ধন
নহে নানা তাহা একই অনুক্ষণ
সান্ত-অনন্তে মহান স্পন্দন।

ঘোর মায়া মোহে ভুলি যেই জন
নানা ভাবে ব্রহ্মে করে নিরীক্ষণ
মৃত্যু পরে মৃত্যু করিয়া বরণ
চির ক্লেশে রহে মগ্ন সেই জন।

হৃদয় কমল তার ছিদ্র মাঝে
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সে পুরুষ রাজে
বংশ পর্ব্বে যথা আকাশ বিরাজে
এও সে তেমতি তেমতি ধারা।

সেই সে অদ্বৈত জানিলে তাহারে
গোপন কিছুই না থাকে সংসারে
চির ভয়-হীন বিশ্ব চরাচরে
সুখ দুঃখ হীন জানিও তারা।

সেই সে পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ
নহে ধূম যুক্ত মহা জ্যোতিষ্মান
যোগীগণ তার পেয়েছে সন্ধান
আপন হৃদয় কমল মাঝে

ভূত ভবিষ্যৎ তার ঈশিতার
বর্ত্তমানে যাহা, অতীত সম্ভার
সেই বার্ত্তা কয় ভবিষ্যে আবার,
সেই পরিপূর্ণ তেমতি রাজে।

উন্নত প্রদেশে যদি বৃষ্টি হয়
জল সেথা কভু নাহি স্থিত রয়
নিম্ন দেশে আসি পায় তারা লয়
ভেদদর্শী জন তেমতি রূপে

হেরিয়া প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে
নানা আত্ম ধর্ম্ম ভিন্ন পথে চরে:
আপনি নিজেরে শীর্ণ নষ্ট করে
থাকয়ে পড়িয়া মায়ার কূপে।

যথা শুদ্ধ জলে প্রসন্ন সলিল
প্রক্ষিপ্ত হইলে বহে অনাবিল
তথা ভেদ হীন এক-রসশীল
আত্মারে জানে যোগীজনগণ

(তাই)　নাস্তিক কুদৃষ্টি,　　ভেদ দৃষ্টি আর
　　মন্দ তার্কিকের　　কবি পরিহার
　　মহা হিতৈষিণী　　শ্রুতির কথার
　　　　　　সাদরে লহগো করিয়া বরণ।

কঠকোপনিষদি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমা বল্লী সমাপ্তম্।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ।

প্রথমাধিকরণং—

মনোময়োঽয়ং শারীর ঈশো বা প্রাণ মানসে।
হৃদয়স্থিতানীয়স্তে জীবেস্যাস্তেনজীবগাঃ॥
শম বাক্যগতং ব্রহ্ম তদ্ধিতাদিরপেক্ষতে।
প্রাণাদিযোগশ্চিন্তার্থং শ্চিন্ত্যং ব্রহ্মা প্রসিদ্ধিতঃ॥ ১॥

অনুবাদ—

ছান্দোগ্য উপনিষদ তৃতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন "মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরোভা-রূপঃ" (সেই ব্রহ্ম) মনোময় অর্থাৎ মনঃ প্রায়, প্রাণ (লিঙ্গাত্মা) তাহার শরীর এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। এই শ্রুতি এই অধিকরণের বিষয়, এই শ্রুতিতে মনোময় শব্দ জীবের প্রতিপাদক অথবা ঈশ্বরের প্রতিপাদক এই সন্দেহ। মনের বিকার এই অর্থে মনোময় পদ হয়, অতএব মনঃসম্বন্ধ ঈশ্বরের হইতে পারে না। প্রাণ ইহার শরীর, এই প্রাণ সম্বন্ধও ঈশ্বরের হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ঈশ্বরের প্রাণ নাই মন নাই এবং তিনি শুভ্র অর্থাৎ নির্ম্মল, কোন রূপ মল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

অতএব মনোময় শব্দ জীবের প্রতিপাদক বলিতে হইবে। এবং "মনোময়" ইত্যাদি শ্রুতির পর "এষ স আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অনীয়ান্" "ইহাই আমার আত্মা যাহা হৃদয়ের মধ্যে অণুস্বরূপ" এই শ্রুতি বলা হইয়াছে। সর্ব্ব ব্যাপক নিরাধার পরমেশ্বর কখনও হৃদয়ের মধ্যে থাকিতে পারেন না, এবং অণুও হইতে পারেন না। এই সকল জীবে উপপন্ন হয়, অতএব জীবই মনোময় শব্দ প্রতিপাদ্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান শান্ত উপাসীত" যেহেতু এই সকল জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহাতে স্থিত এবং তাহাতেই লীন হইবে, অতএব সকলই ব্রহ্ম, সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেতে রাগ কিম্বা দ্বেষ কিছুই হইতে পারে না, এই জন্য উপাসনা কালে উপাসক শান্ত হইবে (অর্থাৎ দ্বেষাদি রহিত হইবে)। এই বাক্য-গত ব্রহ্মই বিশেষ্য রূপে "মনোময়ঃ প্রাণ শরীরঃ" এই বাক্যের সহিত অন্বিত হইয়াছে। এবং মনঃ-প্রাণ-সম্বন্ধ নিরুপাধিক ব্রহ্মের না থাকিলেও সোপাধিক ব্রহ্মের উপপন্ন হয়, অতএব সকল বেদান্ত-দর্শন যে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন সেই ব্রহ্মই এই মনোময়াদি বাক্যে উপাস্য বলিয়া জানিবে। ইহা সিদ্ধান্ত। ১।

ভাবার্থ—"মনোময় প্রাণ-শরীর ভা-রূপ" এই বাক্যে মনোময় জীব কিম্বা ঈশ্বর এই সন্দেহ। মনঃ-সম্বন্ধ এবং প্রাণ-সম্বন্ধ কিছুই ঈশ্বরে সম্ভব হয় না। কারণ শ্রুতি নিজেই "অপ্রাণোহমনাঃ শুভ্রঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ঈশ্বরের প্রাণ-মনঃ-সম্বন্ধ নিষেধ করিয়াছেন। অতএব জীবই মনোময় শব্দ প্রতিপাদ্য এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পূর্ব্ব বাক্য গত ব্রহ্মই "মনোময়ঃ প্রাণশরীর" এই বাক্যে বিশেষ্য রূপে বলা হইয়াছে। অতএব মনোময় বাক্যও ব্রহ্ম-পর। নিরুপাধিক ব্রহ্মের মনঃ-প্রাণ-সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলেও, উপাসনার জন্য সোপাধিক ব্রহ্মের সে সম্বন্ধ হইতে পারে॥ ১॥

দ্বিতীয়াধিকরণং।

জীবোঽগ্নিরীশোবাত্তাস্যাদোদনেজীবইষ্যতাং।
স্বাদ্বত্তীতিশ্রুতে র্বহ্নি র্বাগ্নিরন্নাদইত্যতঃ॥
ব্রহ্মক্ষত্রাদি জগতো ভোজ্যত্বাৎস্যাদিহেশ্বরঃ।
ঈশপ্রশ্নোত্তরত্বাচ্চ সংহার স্তস্যচাত্তৃতা॥ ২॥

অনুবাদ—"যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থাবেদ যত্রসঃ,—" ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি যাহার অন্নস্থানীয় আর মৃত্যু (যম) যাহার উপসেচন স্থানীয়,—সেই পুরুষ যে স্থানে আছে সেই স্থান কে জানে, অর্থাৎ কেহই জানে না। এই শ্রুতিতে ওদন এবং উপসেচন শব্দ দ্বারা একজন ভক্ষক আছে ইহা প্রতীত হয়, সেই ভক্ষক জীব অগ্নি অথবা ঈশ্বর এই সন্দেহ। 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' তাহার মধ্যে এক জন কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, অর্থাৎ জীবই কর্ম্ম ফল ভোগ করেন। এই শ্রুতি জীবের অত্তৃত্ব, (ভক্ষকত্ব) বলিয়াছেন অতএব এই স্থলেও জীবই ভক্ষক। অথবা বহ্নি এই স্থলে ভক্ষক হইতে পারে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অগ্নিরন্নাদঃ" অগ্নি অন্ন ভক্ষণ করেন, অতএব এই স্থলে ব্রহ্ম ক্ষত্রাদির ভক্ষক জীব কিম্বা অগ্নি বলিতে পারা যায়। ইহা পূর্ব্ব পক্ষ।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি উপলক্ষন মাত্র, বাস্তবিক এই শ্রুতিতে সকল জগতই ভক্ষ্য রূপে বলা হইয়াছে। এতাদৃশ ভক্ষণের কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য-কারণ এবং কালত্রয়াতীত ঈশ্বরের কথা নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" যস্য 'ব্রহ্মচ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যম তাহার উত্তর দিয়াছেন অতএব এই বাক্য-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরই বলিতে হইবে। যদি বল 'অনশ্নন্নন্যো হভি চাকশীতি' এই শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের ভোক্তৃত্ব নিষেধ করিয়াছেন, এই শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্ব কি রূপে হইতে পারে? তাহা বলিতে পার না। ঈশ্বরের অত্তৃত্ব শব্দের অর্থ সংহর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ সংহার কর্ত্তা ঈশ্বর, ইহা সকল বেদান্তেই প্রসিদ্ধ। ইহা সিদ্ধান্ত। ২।

ভাবার্থ—যস্য ব্রহ্মচ ক্ষত্রঞ্চ" এই বাক্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির ভোক্তা যাহাকে বলা হইয়াছে, সে জীব, অগ্নি অথবা ঈশ্বর। এই সন্দেহে জীব কিম্বা অগ্নিকে এই শ্রুতি-বাক্যে ভোক্তা বলা হইয়াছে। কারণ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি," "অগ্নিরন্নাদঃ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জীব এবং অগ্নিরই অত্তৃত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এবং ঈশ্বরের অত্তৃত্ব "অনশ্নন্নন্যোহভি চাকশীতি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব জীব কিম্বা অগ্নি এই বাক্যে ভোক্তা। এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন "তাহা বলিতে পার না,

কারণ ব্রহ্ম রুদ্রাদি সকল জগতের অন্তক ঈশ্বর ভিন্ন অন্যের সম্ভব হইতে পারেন, এবং নচিকেতা ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তরে যম এই বাক্য বলিয়াছেন। ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না, ঈশ্বরই বলিতে হইবে; অন্যথা অসম্বদ্ধ বাক্য বলা হয়। অতএব ঈশ্বরই এই বাক্যের প্রতিপাদ্য ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধিকরণং।

গুহাং প্রবিষ্টৌ ধীজীবৌ জীবেশৌবা হৃদিস্থিতেঃ।
ছায়াতপাভ্যাং দৃষ্টান্তাদ্ধীজীবৌন্তো বিলক্ষণৌ।
পিবন্তাবিতি চৈতন্যং দ্বয়োর্জীবেশ্বরৌতনঃ।
হৃৎ স্থান মুপলব্ধ্যৈ স্যাদ্বৈলক্ষণ্যমুপাধিতঃ ॥৩॥

অনুবাদ—কঠোপণিষদ বলিয়াছেন "ঋতং * পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ" এই শরীরে স্বকৃত কর্ম্মফলের ভোক্তা + জীব ও পরমাত্মা তাহার বুদ্ধিরূপ গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরব্রহ্মের উপলব্ধি স্থান হৃদয়াকাশে বাস করেন। ইহারা ছায়াও আলোকের ন্যায় বিলক্ষণ, একজন সংসারী আর অপর অসংসারী, ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। এবং পঞ্চাগ্নি অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ তিনবার করিয়া নচিকেত নামক অগ্নিচয়ন করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন। এই শ্রুতি অধিকরণের বিষয়। "ঋতং পিবন্তৌ" এই দ্বিবচন দ্বারা বুদ্ধি ও জীব বলা হইয়াছে অথবা জীব ও ঈশ্বর বলা হইয়াছে ইহা সন্দেহ। বুদ্ধি ও জীব পরিচ্ছিন্ন অতএব তাহাদেরই গুহাতে প্রবেশ সম্ভব, এবং বুদ্ধি জড়

---

* ঋত শব্দের অর্থ সত্য; কর্ম্ম করিলেও তাহার ফল সত্য অবশ্যম্ভাবী অতএব ঋত শব্দের অর্থ কর্ম্মফল হইয়াছে।

+ বস্তুতঃ কর্ম্ম ফলের ভোক্তা জীব পরমাত্মা নহে তথাপি ছত্রি ন্যায় ক্রমে পরমাত্মাকেও ভোক্তা বলা হইয়াছে।

ছত্রি ন্যায়—যথা—দশজন লোক যাইতেছে তাহার মধ্যে পাঁচজন ছত্র ধারণ করিয়া যাইতেছে আর পাঁচজন ছত্র ধারণ করেন নাই তথাপি তাহাদিগকে ছত্রিগণ যাইতেছে এইরূপ বলা হয় ইহারই নাম ছত্রি ন্যায়। এ স্থলেও জীব ভোক্তা নহে তথাপি উভয়কেই ভোক্তা।

এবং জীব চেতন, এই জন্য ছায়া আতপের মত বৈলক্ষণ্যও তাহাদেরই যুক্ত হয় অতএব 'ঋতং পিবন্তৌ' এই দ্বিবচন দ্বারা বুদ্ধি এবং জীবই বলা হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ। পিবন্তৌ এই দ্বিবচন দ্বারা উভয়ই চেতন এইরূপ প্রতীতি হয়। এবং সর্ব্বগত ঈশ্বরেরও হৃদয় বাসস্থান বলা হইয়াছে উপলব্ধির জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগত হইলেও হৃদয় স্থানে তাঁহার উপলব্ধি হয়। জীব এবং ঈশ্বর উভয় চেতন বলিয়া তুল্য হইলেও, জীব সোপাধিক আর ঈশ্বর নিরুপাধিক অতএব তাহার বৈলক্ষণ্য ও আছে. এই জন্য "ছায়া তপৌ" এই দৃষ্টান্ত ও সঙ্গত হইল জীব এবং ঈশ্বরই এই শ্রুতির বিষয় ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—"ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি বাক্য এই অধিকরণের বিষয়। গুহা (বুদ্ধি) প্রবিষ্ট বুদ্ধি ও জীব, অথবা জীব ও ঈশ্বর ইহা সংশয়। ছায়া ও আলোকের মত এই দৃষ্টান্ত শ্রুতি বলিয়াছেন অতএব বুদ্ধি আর জীবই বলা যাইতে পারে, কারণ বুদ্ধি এবং জীব একটী জড, অপরটী অজড এই জন্য ছায়া ও আলোকের মত বৈলক্ষণ্য সঙ্গত হয়, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ। 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচন দ্বারা উভয়কেই চেতন বলা হইয়াছে এবং সর্ব্ব ব্যাপক ঈশ্বরের হৃদয় দেশে উপলব্ধি হয়। এই জন্য হৃদয় তাঁহার স্থান এ কথাও উপপন্ন হয়। জীব সোপাধিক এবং ঈশ্বর নিরুপাধিক অতএব বৈলক্ষণ্যও যুক্ত হয়, বস্তুতঃ জীবও ঈশ্বরই এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য ইহা সিদ্ধান্ত।

চতুর্থাধিকরণং

ছায়া জীবৌ দেবতেশৌ বাসৌ যোঽক্ষণি দৃশ্যতে।
আধার দৃশ্যতোক্তো শাদ ন্যেষু ত্রিষু কশ্চন।
কং খং ব্রহ্ম যদুক্তং প্রাক তদেবাক্ষণ্যা পাস্যতে।
বামনীত্যাদিনা ন্যেষু নামৃতত্বাদি সম্ভবঃ ॥৪॥

অনুবাদ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতিহোবাচ" চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়ায় এই আত্মা, ইহা সত্যকাম উপকোসলকে বলিয়াছিলেন। (ছা ৪র্থঃ অধ্যায়)। এই বাক্য এই অধিকরণের বিষয়, এই বাক্যে—অক্ষি মধ্যস্থ পুরুষ ছায়া, জীব, চক্ষুর অধিপতি দেবতা অথবা ঈশ্বর ইহা সন্দেহ। অনুভব-সিদ্ধ ছায়া অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, কারণ তাহাকে, চক্ষুর আধার বলিয়া প্রতীতি হয় এবং সে দৃশ্য অর্থাৎ তাহাকে দেখিতে

পাওয়া যায়। কিম্বা জীব, কারণ রূপ-দর্শন কালে জীব চক্ষুতে অবস্থিত থাকে এবং অন্য সময় থাকে না অতএব এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জীবই চক্ষুতে অবস্থিত বলা যায়। অথবা "আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিনি প্রাবিশৎ" সূর্য্য চক্ষু রূপে নয়ন গোলকে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্রুতি সূর্য্য দেবতাই চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন ইহা বলিতেছেন অতএব অক্ষিস্থ পুরুষ সূর্য্য দেবতা, কিন্তু পরমাত্মা নহে, কারণ তাহার আধার আধেয় ভাব এবং দৃশ্যত্ব পরমাত্মায় হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্ব পক্ষ।

"কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" এই বাক্য দ্বারা সুখ স্বরূপ ব্রহ্ম যাহা বলা হইয়াছে তাহাই "য এস অক্ষিনি পুরুষো দৃশ্যতে" এই বাক্যে এতদ শব্দ দ্বারা চক্ষুতে উপাসনার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। এবং বামনীত্ব ভামনীত্ব এবং সংযদ বামত্বাদি গুণের ও উপাসনার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

এই সকল গুণযুক্ত সোপাধিক ব্রহ্মের আধারত্ব হইতে পারে। এবং শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা দৃশ্যমানত্ব অর্থাঃ শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা তাহাকে জানা যায়। ইহা বিরুদ্ধ হয় না। ছায়া জীব এবং দেবতার অমৃতত্ব অভয়ত্ব ইত্যাদি গুণের সম্ভব হয় না, অতএব ঈশ্বরই এই বাক্যে উপাস্য ইহা সিদ্ধান্ত। ৪।

ভাবার্থ—"য এষোঽক্ষিনি" ইত্যাদি বাক্যে ছায়া, জীব, দেবতা অথবা ঈশ্বর কাহার উপাসনার বিধান করা হইয়াছে এই সন্দেহ হওয়ায়, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন 'অক্ষি পুরুষের আধারত্ব বলা হইয়াছে এবং দৃশ্যত্ব বলা হইয়াছে' এই সকল পরব্রহ্মে যুক্ত হয় না, অতএব ছায়া, জীব, কিম্বা দেবতা এই তিনের মধ্যে কাহাকেও উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত-বলিতেছেন "কং ব্রহ্ম" খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে পরব্রহ্ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই শ্রুতিতে সেই পূর্ব্বোক্ত পরব্রহ্মেরই বামনীত্বাদি গুণ দ্বারা চক্ষুতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে। কারণ পরব্রহ্ম ভিন্ন ছায়া জীব কিম্বা দেবতা কাহারই অমৃতত্বাদি সম্ভব হয় না।

পঞ্চমাধিকরণং।

প্রধানং জীব ঈশো বা কোঽন্তর্য্যামী জগৎ প্রতি।
কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাজ্জীবোবা কর্ম্মনো মুখাৎ ॥
জীবৈকত্বামৃতত্বাদে রন্তর্য্যামী পরেশ্বরঃ।
দ্রষ্টৃত্বাদের্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ ॥৫॥

অনুবাদ—বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালককে বলিয়াছেন। "যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়তি অন্তর্যাম্যমৃতঃ" যে পৃথিবীর অন্তর্যামী সেই তোমার আত্মা, তোমার অন্তর্যামী, এবং অমৃত অর্থাৎ মরণ ধর্ম্ম রহিত' নিত্য। এই বাক্য এই অধিকরণের বিষয়। এই শ্রুতিতে অন্তর্যামী—প্রধান, জীব, অথবা ঈশ্বর, এই সংশয়। সকল জগতের উপাদান প্রধান (প্রকৃতি), অতএব জগতের নিযামক অন্তর্যামীও প্রধান। অথবা জীব অন্তর্যামী, কারণ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সেই কর্ম্মফল দানের জন্য ফলভোগের সাধন জগৎ সৃষ্টি করে অতএব কর্ম্ম দ্বারা জগতের উৎপাদক জীবই অন্তর্যামী। ইহা পূর্ব্ব পক্ষ—

"এষত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" এই শ্রুতি অন্তর্যামীর জীবের তাদাত্ম্য ও অমৃতত্ব বলিয়াছেন। এবং পৃথিব্যাদি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্যামী এ কথা বলায় সর্ব্ব ব্যাপক ইহাও বলা হইয়াছে। অচেতন প্রধানের জীব-তাদাত্ম্য সম্ভব হয় না। এবং "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতো শ্রোতা" এই শ্রুতি অন্তর্যামীর দ্রষ্টৃত্ব (দর্শন কর্তৃত্ব) শ্রোতৃত্ব (শ্রবণ কর্তৃত্ব) বলিয়াছেন, ইহাও সম্ভব হয় না এই জন্য অচেতন প্রধানকে অন্তর্যামী বলা যায় না। এবং জীবও অন্তর্যামী নহে কারণ "য আত্মান মন্তরো যময়তি" এই শ্রুতি জীবের নিয়ম্যত্ব অর্থাৎ নিয়মন বলিয়াছেন। যে নিয়ম্য সে অন্তর্যামী হইতে পারে না অতএব ঈশ্বরই অন্তর্যামী ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—"যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য অন্তর্যামী প্রধান (প্রকৃতি), জীব, অথবা ঈশ্বর, এই সন্দেহ হওয়ায়, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন প্রধান জগৎ কারণ, এবং কর্ম্ম দ্বারা জীবও জগৎ কারণ, অতএব প্রধান কিম্বা জীবই পৃথিব্যাদির অন্তর্যামী। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন অন্তর্যামীকে দ্রষ্টা বলা হইয়াছে অচেতন প্রধানের দ্রষ্টৃত্ব হইতে পারে না এবং জীবেরও নিয়ন্তা (নিয়মন কর্ত্তা) বলা হইয়াছে এই জন্য জীব ও বলা যাইতে পারে না। জীবের সহিত অন্তর্যামীর তাদাত্ম্য বলা হইয়াছে এবং অন্তর্যামী অমৃতত্বাদিগুণ যুক্ত অর্থাৎ মরণ-ধর্ম্ম-রহিত নিত্য, ইহাও বলা হইয়াছে। অতএব পরেশ্বর (পরমাত্মা) অন্তর্যামী। ৫।

ষষ্ঠাধিকরণং।

ভূত যোনিঃ প্রধানং বা জীবো বা যদ্বিবেশ্বরঃ।

আদ্যৌ পক্ষাবুপাদান নিমিত্তত্বাভিধানতঃ॥

ঈশ্বরোভূতযোনিঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কীর্ত্তনাৎ।

দিব্যাদ্যুক্তের্ন জীবঃস্যান্ন প্রধানং ভিদোক্তিতঃ॥ ৬॥

অনুবাদ—"তদব্যয়ং ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" সেই নিত্য সর্ব্ব-ভূত কারণকে পণ্ডিতগণ দেখিয়াছিলেন। এই বাক্য 'ভূতযোনি' শব্দ প্রতিপাদ্য সাংখ্যোক্ত প্রধান, জীব, অথবা ঈশ্বর এই সংশয়। যোনি শব্দ উপাদান এবং নিমিত্তের বাচক, অতএব ভূতযোনি প্রধান কিম্বা জীব। কারণ প্রধান জগৎ রূপে পরিনত হইয়াছে অতএব প্রধান জগতের উপাদান, এবং জীব স্বকর্ম্ম দ্বারা ভোগার্থ কর্ম্মফল রূপ জগতের নিমিত্ত। এই জন্য প্রধান কিম্বা জীবই 'ভূত-যোনি শব্দ প্রতিপাদ্য, ইহা পূর্ব্ব পক্ষ।

জীব ভূতযোনি হইতে পারে না, কারণ "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যা-ভ্যন্তর হ্যজঃ" বাহ্য ও অভ্যন্তরের ব্যাপক দিব্য (স্বয়ং প্রকাশ) অমূর্ত্ত পুরুষঃ নিত্য জন্মরহিত ইহা ভূতযোনিকে বলা হইয়াছে অতএব জন্মাদি শীল জীবের কখনও এই সকল উপপন্ন হয় না এবং অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" অক্ষর (প্রধান) হইতে ভিন্ন ভূতযোনি, এই শ্রুতি অক্ষর শব্দ-বাচ্য প্রধান হইতে ভূত-যোনির ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরও ভূত যোনিকে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" 'যিনি সামান্য এবং বিশেষ রূপে সকল জানেন এবং যাহার জ্ঞানই তপস্যা'। এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে অত-এব জীব কিম্বা প্রধান বলা যায় না। কারণ এই সকল গুণ ব্রহ্মে থাকে, অন্যে থাকিতে পারে না অতএব ঈশ্বর (ব্রহ্ম ভূত যোনি শব্দ বাচ্য, ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—"ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" এই বাক্যে ভূতযোনি শব্দ-প্রতিপাদ্য প্রধান জীব অথবা ঈশ্বর এই সন্দেহ। যোনি শব্দে উপাদান কিম্বা নিমিত্ত বুঝায়, প্রধান জগতের উপাদান এবং জীব কর্ম্ম দ্বারা নিমিত্ত, অতএব জীব কিম্বা প্রধানই ভূত যোনি। এই পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ভূতযোনির সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে। "দিব্যোহ্য মূর্ত্তঃ" এই শ্রুতি প্রতিপাদ্য দিব্যত্ব অমূর্ত্তত্ব, সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব,

জন্ম বাহিত্য, এই সকল জীবেব সম্ভব হয় না। এবং "অক্ষবাৎ পবতঃ পরঃ" এই শ্রুতি অক্ষর শব্দ-প্রতিপাদ্য প্রধান হইতে ভূত যোনির ভেদ বলিয়াছেন, অতএব প্রধান কিম্বা জীব ভূতযোনি নহে, ভূতযোনি শব্দ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বব। ৬।

সপ্তমাধিকবণং।

বৈশ্বানবঃ কৌক্ষ ভূত দেব জীবেশ্ববেষুকঃ।
বৈশ্বানবাত্মশব্দাভ্যামীশ্ববান্তেষু কশ্চন॥
দ্যামূর্দ্ধত্বাদিতো ব্রহ্ম শব্দাচ্চেশ্বব ইষ্যতে।
বৈশ্বানবাত্ম শব্দৌ তাবীবশ্বস্যাপি বাচকৌ॥ ৭॥

ইতি বৈয়াসিক ন্যায় মালাযাং প্রথমাধ্যাযস্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ২।

অনুবাদ—ছান্দোগ্যেব পঞ্চমাধ্যাযে বৈশ্বানব বিদ্যাতে বলিয়াছেন, "আত্মানং বৈশ্বানবমুপাস্তে" বৈশ্বানব আত্মাকে উপাসনা কবি। এই বাক্যে বৈশ্বানব শব্দ প্রতিপাদ্য জাঠবাগ্নি, ভূতাগ্নি, সূর্য্য দেবতা, জীবাত্মা, অথবা পবমাত্মা, এই সংশয়। "অযমগ্নি বৈশ্বানব যোয়মন্তঃ পুরুষে" যে পুরুষের অন্তবে আছে সেই অগ্নি বৈশ্বানব এই শ্রুতি জাঠবাগ্নিকে (উদরস্থ অগ্নিকে) বৈশ্বানরবলিতেছেন। "বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায দেবা বৈশ্বানবং" বিশ্ব ভুবনেব জন্য বৈশ্বানব অগ্নিকে দেবতারা দিনেব চিহ্ন স্বরূপ সূর্য্য কবিযাছিলেন। এই শ্রুতি ভৌতিক অগ্নিকে বৈশ্বানব বলিতেছেন। "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম" অর্থাৎ বৈশ্বানব দেবতা আমাদিগেব প্রতি প্রসন্ন হউন এই শ্রুতি সূর্য্য দেবতাকে বৈশ্বানব বলিতেছেন, অতএব জাঠরাগ্নি, ভৌতিকাগ্নি, কিম্বা সূর্য্য দেবতা এই তিনই বৈশ্বানর শব্দ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে। এবং আত্ম শব্দ জীবে রূঢ়, অতএব জীবও বৈশ্বানব হইতে পাবে। কিন্তু ঈশ্বরের নহে কারণ ঈশ্বব প্রতিপাদক কোন প্রমাণ নাই। ইহ পূর্ব্ব পক্ষ।

"তস্য হবা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" সেই আত্মা বৈশ্বানরেব দ্যুলোক (স্বর্গ লোক) ই মস্তক, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বর্গ লোক হইতে আরম্ভ কবিযা সকল জগৎ বৈশ্বানরেব অবয়ব ইহা বলা হইয়াছে, ইহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাব ও সম্ভব হয় না। এবং "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" আমাদের আত্মা কি এবং ব্রহ্মই (ঈশ্বর) বা কি, এই বাক্যগত ব্রহ্ম শব্দ ঈশ্বরেই মুখ্য, । বৈশ্বানব শব্দ ও যোগদ্বাবা ঈশ্ববেবই বাচক যথা

বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ, অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক পুরুষ। এবং আত্ম শব্দ যেমন জীবের বাচক হয় সেই রূপ ব্রহ্মেরও বাচক হয় অতএব পরমেশ্বরই বৈশ্বানর শব্দ প্রতিপাদ্য। ইহা সিদ্ধান্ত।

ভাবার্থ—শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানর উদরস্থিত অগ্নি ভৌতিক অগ্নি সূর্য্যদেবতা, জীব অথবা ঈশ্বর এই সংশয়। বৈশ্বানর শব্দ উদরাগ্নি, ভৌতিক অগ্নি এবং সূর্য্য দেবতা এই কয়টীকে বুঝায়, কারণ শ্রুতি অনেক স্থানে বৈশ্বানর শব্দ দ্বারা ইহাদিগকে বলিয়াছেন, এবং আত্ম শব্দ জীবে রূঢ় অর্থাৎ আত্মা বলিলে জীবই বুঝায় অতএব বৈশ্বানর শব্দ এই শ্রুতিতেও এই চারিটীর মধ্যেই কাহার ও বাচক এই পূর্ব্বপক্ষে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন দ্যুলোক (স্বর্গ লোক) হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জগৎ বৈশ্বানরের অবয়ব বলা হইয়াছে। ইহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না এবং ব্রহ্ম শব্দ ও মুখ্য পরমেশ্বরেরই বাচক। বৈশ্বানর শব্দও যোগার্থদ্বারা ঈশ্বরকে বুঝায়। আত্ম শব্দ যেরূপ জীবের বাচক, সেইরূপ ব্রহ্মের ও (ঈশ্বরের) বাচক হয়। অতএব বৈশ্বানর শব্দ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

বৈয়াসিক ন্যায় মালার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত। ২।

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী। সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

শিষ্য :—হে ভগবন্ বন্ধন কাহাকে কহে? উহা কি রূপে হয়? কে কিরূপে বন্ধন করে? উহার নিবৃত্তির উপায় কি? ইহাদের মধ্যে একটীরও স্বরূপ আমি জানি না। এজন্য কৃপা করিয়া আপনিই ইহার স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইয়া আমার দুঃখ নিবারণ করুন। হে প্রভু। আমি আপনার শরণে আসিয়াছি। তখন গুরু কহিলেন।

গুরু :—"অহং মমেত্যয়ং বন্ধো নাহং মমেতি মুক্ততা।"

"আমি দেহ এবং দেহাদি আমার" এই প্রকার অধ্যাসের নাম বন্ধন। ইহাই বন্ধনের স্বরূপ। এই বন্ধন, স্বরূপের অজ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হয়। এজন্য স্বরূপের অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। এবং "উহা আমি নহি, ও উহা আমার নহে" এইরূপ দৃঢ়তা দ্বারা দেহাদিতে অহংতা মমতার নিবৃত্তি হওয়াকেই মুক্তি কহিয়া থাকে।

শিষ্য —হে কৃপালো ! এই অহংতা মমতা কিরূপে নিবৃত্ত হইবে।

গুরু :—হে শিষ্য ! সাধন দ্বারা অহংতা মমতা নিবৃত্ত হয়।

শিষ্য :—হে ভগবন্ ! আমি যে যে সাধন করি, সেই সেই সাধনে তো "আমি দেহ ও আমার দেহ" এ প্রকার অহংতা হওয়া দূরে থাক মমতা নিবৃত্ত বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সমস্ত বস্তু ত্যাগ করিলে আমি ত্যাগী, যোগ করিলে আমি যোগী, তপ করিলে আমি তপস্বী, আমি তপ করিতেছি ইত্যাদি সমস্ত সাধনেই আমি দেহ ও আমার দেহ এই প্রকার অহংতা মমতা তো থাকিয়াই যাইতেছে। কিন্তু আপনি কহিতেছেন যে অহংতা মমতা সাধন দ্বারা অপসৃত হয়, উহা কিরূপে হয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য ! তুমি যাহা বর্ণন করিলে উহা অহংতা মমতার নিবৃত্তি-প্রদ সাধন নহে। বরঞ্চ ইহা দ্বারা অহংতা মমতা অধিকতর দৃঢ় হইয়া যায়। অহংতা মমতা নিবৃত্তির উপায়, একমাত্র বিবেক এবং বিচার। ইহা বিনা যত প্রকার সাধন আছে সে সমস্তই বন্ধনের মূল। যেহেতু মনুষ্য যে জাতি কুল ও বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে, আজন্ম তাহার অন্তঃকরণে সেই সকলের অধ্যাস বর্ত্তমান থাকে। পুনরায় অবিবেক পূর্ব্বক কোন যতির বেশ ধারণ করিলে, তাহারও অভিমান মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। প্রথমে একই অভিমান ছিল, এখন তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, যেহেতু যখন সেই লোক গৃহস্থাশ্রমে ছিল, তখন নম্রতা-পুরঃসর কোন মহাত্মার সেবাও করিত। কিন্তু বৈরাগীর ভেক (বেশ) ধারণের পর উহার মনে ভারি অভিমান জন্মিয়া গেল। তখন তাহার আপনার মনে সর্ব্বদাই এই অহঙ্কার হইতে থাকে "আমি ত্যাগী আমাকে সকলেই মানে এবং সকলেই আমার আদর সৎকার করে।" সুতরাং পূর্ব্বের মত বিদ্বান মহাত্মার সেবা এবং

তাঁহার বাক্য দ্বারা মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা তাহার হৃদয় হইতে এককালে লোপ হইয়া যায়। কারণ মূর্খতা পূর্ব্বক সেই অবিবেকী আপনাকে ত্যাগী জানিয়া আপনাকে অতি উচ্চপদস্থ মনে করে, এবং ভাবে সে নিজেও তাঁহার তুল্য। এই প্রকারে তাহার অভিমান বৃদ্ধি হওয়াতে নিজেই নিজের দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ "বিড়াল ফেলিতে গিয়া উট চাপিল" এই এক ইতিহাস আছে তাহা শুনিলে তুমি এ বিষয় উত্তম বুঝিতে পারিবে, অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

কোন গৃহে একজন বৃদ্ধা বাস করিত। দৈবক্রমে একটী বিড়াল তাহার প্রাঙ্গনে মরিয়া গেল। সে ঐ মৃত বিড়ালকে বহির্দেশে ফেলিবার জন্য ঝোড়ায় করিয়া সহরের বাহিরে লইয়া গেল। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময়, ভিতরের ঘরের দ্বার বন্ধ করিল, কিন্তু বাহিরের দ্বার ভুল ক্রমে খোলাই ছিল। যখন উক্ত বৃদ্ধা বিড়ালকে ফেলিয়া দিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তখন দেখিল যে একটা রুগ্ন উট চলিতে চলিতে, উহারই দ্বার দেশে আসিয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধা ফিরিয়া আসিয়া উটকে আপনার দ্বারে মরা পড়িয়া আছে দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হায়! আমি বিড়াল ফেলিতে গিয়াছি ইতিমধ্যে একটী উট আমার গৃহের দ্বারে মরিয়া রহিয়াছে, এখন উহাকে কি প্রকারে ফেলা যায়। বিড়াল ত হালকা ছিল, উহাকে ত আমিই ফেলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এত বড় ভারী উট আমি উহাকে কিরূপে লইয়া যাইব। যে প্রকার বিড়াল ফেলিতে গিয়া উট, বৃদ্ধার গলায় পড়িয়াছিল, সেই প্রকার—

বিচার বিবেক বিনা যে দেহাভিমান ত্যাগ করিবার জন্য গৃহস্থাশ্রমরূপ বিড়াল ছাড়িয়া আসা হইল, সেই ত্যাগের অভিমান-রূপ উট গলায় পড়িল। সুতরাং উত্তম জ্ঞানেচ্ছা ও অধিকার বিনা, কেবল ভেক ধারণ দ্বারা অথবা সকাম জপাদি অন্য সাধনদ্বারা, অহংতা মমতা রূপ বন্ধন-নিবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না।

শিষ্য :—হে ভগবন্! যখন জপ তপ দানাদি সাধন দ্বারা অহংতা মমতা উচ্ছেদ হয় না, তবে যে সাধন দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয় তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য। বিবেকাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়ে গিয়া তাঁহার উপদেশ দ্বারা আত্মা-অনাত্মা বিচার দ্বারা প্রাপ্ত যে স্বরূপ-জ্ঞান তদ্দ্বারা অহংতা মমতা নিবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ জ্ঞানের স্বরূপ এইরূপ, যথা—"এই দেহ পঞ্চ ভূতের কার্য্য, এই জন্য অনাত্মা ঘটের ন্যায় দৃশ্য। যে প্রকার ঘট-দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, সেই প্রকার দেহের দ্রষ্টা আমি, দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ জড়, আমি চৈতন্য, দেহ বিকারী, আমি নির্ব্বিকার দেহ ক্রিয়াবান্, সঙ্গবান্ ও মলিন, আমি অক্রিয় অসঙ্গ ও নির্ম্মল। যখন আমি দেহ নহি তখন দেহে কল্পিত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম এবং বালক, যৌবন, বৃদ্ধ, স্থূল, কৃশ, হ্রস্ব, দীর্ঘ, শ্যাম, গৌর ইত্যাদি দেহ ধর্ম্মও আমার আত্মাতে নাই।"

এই প্রকারে বিচার দ্বারাই দেহ হইতে অহংতা মমতা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। দেবদত্ত, বিষ্ণুদত্ত ইত্যাদি 'নাম' ও দেহের ব্যবহার সিদ্ধির জন্য কল্পিত, উহা আত্মাতে নাই, তথাপি আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক ইহা না জানিবার জন্যই, দেহে কল্পিত নাম সকল আত্মার নামে অভিহিত হয়। সুতরাং উহাকেও বিবেক পূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা নিবৃত্তি করিতে হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কে ?' তখন তুমি বল "আমি দেবদত্ত", কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, তোমার স্থূল শরীরের যে দেবদত্ত নাম তাহা তোমার জন্মের দশ বার দিন পরে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু যখন ঐ দেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তখন কেহই ইহাকে ঐ দেবদত্ত নামে ডাকিত না। পুনরায় যদি কেহ কহে যে 'এই দেহে দেবদত্ত কে' তাহা হইলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলা যাইবে না যে এই দেবদত্ত কারণ যেখানে হাত দিবে তাহা মস্তক, না হয় মুখ, স্কন্ধ, পিঠ, পেট, কোমর, উরুদেশ, জানু, অথবা পা, ইহার কোন না কোন এক অংশ পাওয়া যাইবে, দেবদত্তের চিহ্নও কোনও স্থানে পাওয়া যাইবে না। এই বিচার দ্বারা যদি দেহের নাম দেহেই সিদ্ধ হইল না, তখন দেহ হইতে ভিন্ন দেহের দ্রষ্টা যে আত্মা তাহাতে দেবদত্ত নাম কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ?

শিষ্য :—হে গুরো! আমি আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন কি প্রকারে হইলাম। উহা আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু: -হে শিষ্য। বিচার করিয়া দেখ, তুমি যে এই প্রকার বলিতেছ যে তোমার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ তুমি এ জন্মে করিতেছ এবং এই জন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ আগামী জন্মে করিবে, তবে দেখ দেখি এই তোমার স্থূল দেহ প্রথমে ছিল না এবং পরে ও থাকিবে না, কেবল এক্ষণে মাতার উদর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু কর্ম্ম কর্ত্তা যে তুমি দেহের উৎপত্তির পূর্ব্বে দেহ হইতে ভিন্নই ছিলে, এবং যখন এই দেহের নাশ হইবে তখনও এই দেহ-কৃত কর্ম্মের ভোক্তা যে তুমি দেহ হইতে ভিন্নই থাকিবে। অতএব এই স্থূল দেহ তুমি নহ। ইহা তোমার অনুভব হইতেছে কি না?

পুনর্ব্বার দেখ, তুমি বলিতেছ "আমার দেহ, আমার হাত, আমার পা, আমার মস্তক, ইত্যাদি কিন্তু 'আমি দেহ, আমি হাত আমি পা আমি মস্তক' ইত্যাদি বলনা। যেমন লোকে আমার ঘর, আমার বাংলা, আমার বাগান ইত্যাদি সমস্ত বস্তুকে আপনার বলিয়া থাকে, কিন্তু আমি ঘর আমি বাংলা আমি বাগান ইত্যাদি কেহই ত বলে না। এই হেতু "আমার" এই প্রকার বলাতে পুরুষ সেই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি। সেই প্রকার দেহকে আপনাব বলিতেছ যে তুমি আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন।

যে রূপ ঘরে কড়ী, বরগা, থাম, জানালা, দরজা ইত্যাদি থাকে, ইট, পাথর, অথবা খিলেন দ্বারা আবদ্ধ ভিত থাকে, উহাব উপর সাদা, কাল লাল ইত্যাদি রং করা থাকে। ছপ্পর ও মাটির ঘর যদি হয় তবে তাহার উপর ছোট ছোট ঘাসও জন্মে সেই ঘরে যে মনুষ্য অবস্থিতি করে, সে যেমন ঘর নহে, বরঞ্চ ঘর হইতে ভিন্ন, সে আপনাকে ঘর কহে না, সেইরূপ এই দেহ রূপ ঘর হাড়রূপ বরগা কড়ী, হাত পা রূপ থাম দ্বারা সংযুক্ত। ছোট ছোট হাড রূপ ইট, পাথর এবং মাসখণ্ড একত্র জুড়িয়া দেহরূপ ঘর খাড়া হইয়াছে। *গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি রং*, *চক্ষু কর্ণ নাসিকা মুখ ইত্যাদি* দরজা ও জানালা লোম রূপ ঘাস জমী ও রহিয়াছে। এই প্রকার দেহরূপ ঘরের দ্রষ্টা আত্মা যে তুমি, ঐ দেহরূপ ঘর হইতে ভিন্ন।

এই হেতু উপরি উক্ত বিচার দ্বারা দেহাভিমান রূপ অহংতা মমতা নিবৃত্ত হইয়া যায় বিচার ব্যতিরেকে নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই।

শিষ্য ;—হে স্বামিন্, আপনি যে উপদেশ করিলেন উহার বিচার দ্বারা "আমি দেহ নহি" এই প্রকার অহংভাব নিবৃত্তি হয় সত্য, কিন্তু "দেহ আমার" এই মমতা তো যায় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা ও ঐ কথা অনুভবে আসিলে। যেরূপ ঘটের দ্রষ্টা আপনাকে ঘট বলিয়া মানে না সত্য, কিন্তু ঘট আমার ইহা ত বলিয়াই থাকে। যেরূপ ঘরে যে ব্যক্তি থাকে সে আপনাকে ঘর বলিয়া মানে না বটে, কিন্তু আপনার ঘর তো স্বীকার করে। সেই প্রকার দেহের দ্রষ্টা আমি দেহ নহি সত্য কিন্তু এই আমার দেহ, এরূপ বলিলে তো মমত্ব থাকিয়া যাইতেছে। এই হেতু ঐ মমত্বও যে উপায় দ্বারা নাশ হয় সে উপায় আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু।—হে শিষ্য। যে প্রকার তুমি দেহ নহ, সেই প্রকার দেহও তোমার নহে। কারণ এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক. কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার বলিয়া মানিয়া লইয়াছ। যেরূপ কলসী মাটির. কিন্তু তুমি আপনার কলসী কহ। যেরূপ ঘর, কাঠ, পাথর, চুণ ইত্যাদির তুমি আপনার বলিয়া লও, সেই প্রকার হাড়, মাংস, ত্বক, নাড়ী প্রভৃতি দ্বারা গঠিত ভৌতিক শরীরকেও তুমি আপনার বলিয়া থাক। উহা তোমার অতিশয় ভ্রম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হাড় মাংস, চর্ম্মকে কখনই আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু তুমি ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ কহিতেছ যে হাড় চর্ম্ম নির্ম্মিত দেহ আমার এবং আমি দেহ হই। ঐরূপ স্বীকার করাই তোমার বন্ধনের কারণ। অধিকন্তু এই দেহ পঞ্চভূতের তাহাকে তুমি আপনার কহিতেছ, এই হেতু পঞ্চভূতও তোমাকে অবশ্য কষ্ট দিবে। যখন এই পৃথিবীতে মিথ্যা ভূত ঘাড়ে চাপিলে লোক দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন এই পঞ্চভূতের দেহতে যে তুমি মমতা স্থাপন কর তাহা হইলে এই পঞ্চভূত কে কি কখন তুমি ছাড়াইতে পারিবে? যে অন্যের বস্তুতে মমত্ব করে সে কদাচিৎ দুঃখ ব্যতিরেকে সুখ পাইতে পারে না. ইহার সম্বন্ধে এক দৃষ্টান্ত কহিতেছি তুমি শ্রবণ কর,

বুঝিবে অন্যের বস্তুতে মমত্ব করিলে বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

কোন ধনবান্ ব্যক্তির যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজন, অথবা স্বজাতি ভোজন প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু আপনার গৃহের সম্মুখে স্থান সংকোচ হেতু, তিনি কোন সাধারণ স্থানে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

পুনরায় তিনি পাঁচ জনের নিকট হইতে স্থান চাহিয়া লইয়া সকুটুম্ব উঠিয়া গিয়া সেই স্থানেই বাস করিলেন। ঐ স্থানে থাকিতে থাকিতে কিছু দিন গত হইলে, তিনি লোভাদির বশতাপন্ন হইয়া পূর্ব্ব বিচারিত যজ্ঞাদি শুভকার্য্যের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। পুনশ্চ ঐ স্থান প্রশস্ত হওয়াতে তাঁহার খুব সচ্ছন্দ হইল, এই হেতু তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ পঞ্চায়তী স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ইচ্ছা হইল ঐ স্থান হইতে কদাচ উঠিবেন না। এইরূপে অনেক দিন গত হইলে, যাঁহাদের স্থান তাঁহাদের মনে পড়িল। তখন তাঁহারা কোন লোক দ্বারা উপরি উক্ত ধনবান ব্যক্তিকে স্থান খালী করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ ধনী ঐ স্থানে অত্যন্ত আরাম পাওয়াতে ঐ পাঁচ জনের আদেশ তুচ্ছ করিয়া স্থান ছাড়িলেন না।

ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির মন্দ অভিসন্ধি দেখিয়া, সেই পাঁচ জনে মিলিত হইয়া এক স্থানে তাঁহাকে ডাকাইলেন, কিন্তু তিনি নানা প্রকার চাতুরি করিয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন না। বরং তৎপ্রতিকূলে কহিতে লাগিলেন ঐ স্থান আমার, ইহাতে পাঁচ জনের কি অধিকার আছে? উঁহার অন্যথা বচন শুনিয়া তাঁহারা ক্রোধ না করিয়া এরূপ স্থির করিলেন, আচ্ছা আর কিছু দিন পর্য্যন্ত উঁহাকে ওখানে থাকিতে দেওয় যাক, পুনরায় তিনি নিজেই ঐ স্থান ছাড়িয়া দিবেন।

এই রকম ক্ষমা করাতেও যখন তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থান ছাড়িয়া দিলেন না তখন পাঁচজনে কাছারিতে নালিশ করিয়া আদালত হইতে উঁহার নামে সমন বাহির করিলেন। বিচারপতি তাঁহাকে কহিলেন 'তুমি পাঁচ জনের স্থান কেন না খালি করিয়া দিতেছ'? তখন তিনি কহিলেন 'স্থান আমার। পাঁচ জনের ইহাতে কিছু মাত্র অধিকার নাই।' বিচারপতি কহিলেন যদি এ স্থান তোমার হয় তাহা হইলে উহার প্রমাণার্থে তোমার নিকট যাহা কিছু দলিল দস্তাবেজ আছে তাহা হাজির কর। তাঁহার নিকট কিছু প্রমাণ না থাকাতে ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি নানা প্রকার মিথ্যা বলিতে লাগিলেন। এই হেতু বিচারপতি উঁহাকে কয়েদ করিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি পাঁচ জনের স্থান খালি করিয়া না দেন সে পর্য্যন্ত তিনি কারাগারে থাকিবেন।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত এই যে

জীবরূপ ধনবান পুরুষের মোক্ষরূপ শুভকার্য্য সম্পাদন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু দেব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির শরীরে, ভোগের আসক্তি থাকাতে আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি অসম্ভব জানিয়া, এবং পশু পক্ষী আদির শরীরে অতি মূঢ়তা প্রযুক্ত আত্মজ্ঞান অপ্রাপ্তি অবধারণ করিয়া, মোক্ষদ্বারভূত এই মনুষ্য-শরীরকে পঞ্চ মহাভূতের নিকট হইতে সেই জীব প্রার্থনা করিয়াছিল। অতঃপর জীব উহাতে আসিয়া বাস করিতে করিতে, এই শরীরেও নানা বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তিরূপ বিঘ্নের সংযোগে মোক্ষরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং ইহাতে তৎপরিবর্ত্তে এরূপ ভ্রান্ত দৃঢ় হইল যে 'এই দেহ আমারই।' পরে পঞ্চভূত, শাস্ত্র রূপ (অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্মা বিবেক রূপ) দোভাষীর দ্বারা সমাচার পাঠাইল যে "এই দেহ পঞ্চ ভূতের, এজন্য উহাতে মমত্ব ও অভিমান ত্যাগ কর।" প্রত্যহ শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়াও বিষয়াসক্ত জীব শাস্ত্রের কিছুমাত্র মান্য না করিয়া, সর্ব্বদা দেহে মমত্ব-বুদ্ধি বাড়াইয়াই চলিতে লাগিল। যদি তাঁহার কোন প্রিয়, সৎপুরুষ সন্মিত্র বেদান্ত শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ করিতেন, তাহাতে তিনি ভাল মন্দ নানা ওজর করিয়া সময়াভাব ইত্যাদি কহিয়া তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিত। পরে পঞ্চ ভূতগণ এই বিচার করিল "যে আজ না হয়, তো দশ দিন পরে সে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া আমাদের দেহ আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে" এই স্থির করিয়া বসিয়া রহিল, কিছু বলিল না। পরে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে যখন জীব কিছুমাত্র মনোযোগ করিল না, তখন পঞ্চ ভূত যমরাজের নিকট গমন করিয়া উহার নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, 'এই অজ্ঞানী জীব আমাদের কার্য্য-রূপ এই মনুষ্য দেহ দ্বারা মোক্ষ সম্পাদন করিবার জন্য এই দেহ আমাদের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া লয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত অনেক বার ক্ষমা করাতেও অথবা স্মরণ করিয়া দেওয়াতেও, উহা দ্বারা মোক্ষও সম্পাদন করিল না এবং আমাদের দেহ আমাদিগকে প্রত্যর্পণও করিল না। এখন এই দেহের মালিক হইয়া বসিয়াছে এবং আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইতেছে। অতএব হে যমরাজ! আপনি ন্যায়-পূর্ব্বক আমাদের দেহ আমাদিগকে দেওয়াইয়া দেন।' পঞ্চভূতের

নালিশ শুনিয়া যখন যমরাজ আপনার দূত প্রেরণ করিয়া জীবকে আহ্বান করিল, তখন সে এদিক ওদিক কথা কহিয়া পূর্ব্বে পঞ্চভূতের নিকট যেরূপ মিথ্যা আপত্তি করিত সেইরূপ ত করিতে পারিল না। কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবদিগকে কাঁদাইয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া যমদূতগণের সহিত যমলোকে চলিয়া গেল। তখন যমরাজ কহিল 'অজ্ঞানী জীব। এই পঞ্চ ভূতের দেহ তুমি পঞ্চ ভূতকে দিতেছ না কেন?' তাহাতে অজ্ঞানী জীব কহিল 'এই দেহ আমার, ইহাতে পঞ্চ ভূতের কি প্রয়োজন?' তখন পঞ্চ ভূত প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া বলিল এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ তাহাদের। ইহার সাক্ষী চারি বেদ, ছয় দর্শন শাস্ত্র, আঠার পুরাণ, ইত্যাদি সংশাস্ত্রদিগকে আনাইয়া দাঁড় করাইল। কিন্তু অজ্ঞানী জীব কোন প্রমাণ দ্বারা দেহে নিজের স্বামিত্ব সিদ্ধ করিতে পারিল না। এজন্য যমরাজ ঐ অজ্ঞানী জীবকে পরের দ্রব্যে বল পূর্ব্বক স্বসামত্ব স্থাপন করার দোষে, চৌরশী লক্ষ যোনিরূপ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, এবং আজ্ঞা দিলেন যে ঐ জীব যে পর্য্যন্ত না পঞ্চ ভূতের দেহ তাহাদিগকে দেয়, সে পর্য্যন্ত এই কারাগার হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না।

এজন্য হে শিষ্য। পঞ্চভূত নির্ম্মিত শরীরকে আপনার না জানিয়া উহা পঞ্চভূতের জানিয়া, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ কর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে "দেহ দৃশ্য এজন্য আমি দেহ নহি, বরঞ্চ উহা পঞ্চ ভূতের। এজন্য উহা আমারও নহে" এই প্রকার বিচার করিয়া দেহে অহংতা মমতা পরিত্যাগ কর।'

শিষ্য :—হে গুরো। আপনি বলিলেন এই দেহ পঞ্চ ভূতের, ইহার তুমি দ্রষ্টা এ জন্য তুমি দেহ নহ এবং দেহ পঞ্চ ভূতের এজন্য উহা তোমার নহে। এ সমস্ত কথা ত আমি শুনিলাম, কিন্তু পঞ্চ ভূত কাহাকে কহে তাহাই আমি জানি না। এ জন্য আপনি প্রথমে পঞ্চ ভূতের নাম বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য। শুন—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ ভূত।

শিষ্য :—হে গুরো। যদি উহারাই পঞ্চভূত হয়, তবে আপনার বাক্য অনুসারে তো আমার শরীরে ইহাদের কিছু ভাগ দেখিতে পাইতেছি

না। তবে এই দেহ যে পঞ্চ ভূতের ইহা আমি কিরূপে স্বীকার করিতে পারি।

গুরু :—হে শিষ্য! বিচার করিয়া দেখ। এই শরীরে যে যে ভাগে কঠিনতা আছে উহা পৃথিবীর ভাগ, যে যে ভাগে দ্রবতা আছে উহা জলের ভাগ, যে যে ভাগ উষ্ণ উহা তেজের ভাগ, গমন আগমন প্রভৃতি ক্রিয়া বায়ু দ্বারা নির্ব্বাহ হয়, উহা কেবল ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং উহা বায়ুর ভাগ, এবং শরীরে যেখানে যত সচ্ছিদ্র ভাগ আছে তাহা আকাশের ভাগ জানিবে।

শিষ্য :—হে গুরো! কৃপালো! আপনি সংক্ষেপে ত কহিলেন "অমুকের অমুক ভাগ, অমুকের অমুক তত্ত্ব" কিন্তু আমি উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। এজন্য আপনি পঞ্চ ভূতের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বর্ণন বিস্তার পূর্ব্বক কহিয়া আমাকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিন,—এই স্থূল দেহে পঞ্চ ভূতের কোন্ কোন্ অংশ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

সন্ধ্যা তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(১) প্রথমতঃ আপমার্জ্জনের প্রয়োজন বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মানবের জীবন স্বরূপ ও বিশ্বের উৎপত্তির কারণ নির্ম্মল জলে মানুষের মন সহজে নাবিত হয় বলিয়া, জলে আমাদিগের মন্ত্র, উপাসনা, সন্ধ্যা, অর্চ্চনা ন্যাস প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। নির্ম্মল জলে শ্রীভগবানের চিৎ-প্রতিবিম্ব, একাগ্রতা এবং সহজ ভক্তিতেও উপলব্ধি করা যায়। তাহাতে সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ জলে সন্ধ্যার্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আপ-জল, মার্জ্জন-শুদ্ধি, অর্থাৎ বাহিরে কুশনিঃসৃত জল মস্তকাদিতে প্রক্ষেপ করা এবং অন্তরে পবিত্র ভাবের উন্মেষকারি-মন্ত্রের উচ্চারণ ও মন্ত্রের অর্থ ভাবনার দ্বারা শ্রীভগবৎ পরমাত্ম-ভাবের আবির্ভাব হয়। "মৃজ্ শুদ্ধৌ"—এই ধাতু হইতে মার্জ্জন পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপে বুঝিতে পারা গেল যে, সন্ধ্যায় আপ-মার্জ্জন দ্বারা বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধি এবং পরম অত্ম-ভাবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। ক্রমে মহা মন্ত্র গায়ত্রী প্রভৃতিরও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে।

(২) অপর কেহ কেহ বলেন পঞ্চ ভূতের মধ্যে জল চতুর্থ ভূত ইহা সূক্ষ্ম স্থূল দুই ভাবে বিভক্ত। সূক্ষ্ম অপঞ্চী-কৃত, স্থূল পঞ্চীকৃত। তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম ভূতের (জলের)ই অভিমানিনী দেবতা বা বিশ্বরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশ্ব-প্রাণেরই জাগ্রত-ভাবকারক আপ-মার্জ্জন। কারণ-বারি জল হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। তথাচ শ্রুতিঃ "আপস্ত্র-বেদমগ্র আসন্" "তা আপঃ অব্রুবন্" "তা আপ ঐক্ষন্ত"। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কারণ স্বরূপ একমাত্র জল ছিল'। 'সেই জলাধিষ্ঠাত্রী দেবগণ বলিলেন'। 'সেই জলামানী দেবতাগণ ঈক্ষণ বা অভিধ্যান করিবেন'।

"অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজ মবাসৃজত" (মনুঃ) 'বিশ্ববিধাতৃ পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণ-বারি সৃজন করিয়া তাহাতে বিশ্বের বীজ বপন করিয়াছেন।'

"আপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥" (তৈ, আ, প্র ১০, অঃ ১, যজুর্ব্বেদ)

মন্ত্রার্থঃ—হে জল সমূহ! তোমরা পান, অবগাহন, মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে, আমাদিগের সুখদায়ক হও, (যে হেতু পান, দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা জল, প্রাণি-গণের অতি শান্তি ও আনন্দ দায়ক হয়)। নিরুক্তকার বলিয়াছেন, "যদ্বৈ শিবং তন্ময়ঃ, আপো হিষ্ঠ সুখ ভুবঃ"। 'যাহা মঙ্গল স্বরূপ তাহাই জলময়, অতএব জলই নানারূপে সুখের আস্পদ'। যেহেতু আপনারা পরম সুখের আকর, অতএব যথাকালে বর্ষণাদি দ্বারা শস্য ওষধি প্রভৃতি দ্বারা আমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া সুখে স্থাপন করুন। এবং যথাকালে বর্ষিত সুজল ও সুফলের দ্বারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ রমণীয় (সূক্ষ্মতত্ত্ব) দর্শন ও জ্ঞানে সুযোগ্য হউক। তাহা দ্বারা মন ও

ইন্দ্রিয় সকল মত্ত বলশালী হইয়া সকল পবিত্র কার্য্যে সমর্থ হইবে। নির্ম্মল জল, অন্ন, ওষধি প্রভৃতি দ্বারা জীবগণ কার্য্য-সক্ষম হইয়া জীবিত থাকে।

শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ সমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ২। মন্ত্রার্থ :—

শং কল্যাণ) নঃ (আমাদিগের) আপঃ (জল) ধন্বন্যাঃ (মরুদেশ জাত) সমনঃ (শুভদায়ক) সন্তু (হউন) নূপ্যাঃ (অনূপ্যাঃ—জলময় দেশোৎপন্ন) আপঃ (জল) শমনঃ (কল্যাণদায়ক) সন্তু (হউক)। কূপ্যাঃ (কূপ হইতে উৎপন্ন)

(২) সমুদ্রের জল আমাদিগের কল্যাণ করুন। কূপের জল আমাদের শুভদায়ক হউন।মরুদেশের জল আমার কল্যাণ করুন, জলময় দেশের জল আমাদের অশেষ মঙ্গলদায়ক হউন ॥২॥

মরুদেশে জল অতি দুর্লভ বলিয়া সেই প্রাণোপম জলের নিকট প্রার্থনা, এবং অনুপদেশে জল অসীম বলিয়া তাহার নিকটেও প্রার্থনা॥ এই মন্ত্রে শারীরিক মানসিক মঙ্গল ও পবিশুদ্ধি বুঝিতে হইবে—কেন না ভগবৎ আরাধনায় দেহ মন এই উভয়ই অগ্রে স্থির পবিত্র ও শান্ত হওয়া চাই, তাহা না হইলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ভগবদ্ আরাধনায় ক্রোধ, বিরক্তি, হাহুতাশ, স্বাস্থ্যহানি, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য প্রভৃতি ঘটে না, বলিয়া তদ্ধারা শক্তি, আয়ুঃ নৈকজ্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়॥

"দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেনেবাজ্য মাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ ॥৩॥

দ্রুপাদাৎ (বৃক্ষমূল প্রাপ্ত হইয়া) ইব (যেরূপ) মুমুচানঃ (পরিমুক্ত) স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি), স্নাতঃ (অবগাহন করিয়া) মলাৎ (শারীরিক মানসিক মল হইতে) ইব (যেমন), পূতং (পবিত্র) পবিত্রেণ (পবিত্র দ্বারা সংস্কার বিধান দ্বারা) ইব (যেরূপ আজ্যং (ঘৃত), আপঃ (জল) শুদ্ধন্তু (নির্ম্মল করুন। মা (আমাকে) এনসঃ (পাপ হইতে) ॥৩॥

ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি যেরূপ বৃক্ষমূলে যাইয়া ঘর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করে, স্নান করিয়া যেমন শারীরিক মল হইতে মুক্ত হয়, ঘৃত যেরূপ মন্ত্রোক্ত

সংস্কার বিধি দ্বারা পবিত্র হয়, সেইরূপ জলও আমাকে সকল পাপ হইতে শুদ্ধ করুন ॥৩॥

যোবঃ শিবতমো বসঃ তস্য ভাজয়তেহনঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥৫॥

(তৈত্তিরীয় আরণ্যকে)

যঃ (যে) বঃ (তোমাদের) শিবতমঃ (অত্যন্ত কল্যাণময়) বসঃ (সার ভাগ), তস্য (তাহার) ভাজয়ত (ভাগী কর, ভোগে অধিকারীকর) ইহ (ইহকালে) নঃ (আমাদিগকে) উশতীঃ (পুত্র হিতৈষিণী) ইব (ন্যায়) মাতরঃ (মাতাদিগের) ॥৫॥

স্নেহময়ী জননী যেরূপ স্বীয় স্তনজাত-রস পান করাইয়া পুত্রের অশেষ কল্যান সাধন করিয়া থাকেন সেইরূপ হে জল সকল আপনারাও ইহকালে আমাদিগকে তোমাদের কল্যাণময় রস ভোগে অধিকারী কর ॥৫॥

তস্মা অরঙ্গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চন ॥৬॥

(তৈত্তিরীয় আরণ্যকে)

তস্মৈ (তাহাতে বা সেইরূপ) অরং (তৃপ্তি) গমাম (যেনপাই) বঃ (তোমাদের), যস্য (যাহাদ্বারা) ক্ষয়ায় (সকল স্থানকে, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে) জিন্বথ (তৃপ্ত করিতেছ) আপঃ (হে জল সকল !) জনয়থা (ভোগে অধিকারীকর) চ (এবং) নঃ (আমাদিগকে) ॥ ৬ ॥

হে জল সকল ! তোমরা যে রসে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ তোমাদের সেই রসে আমরা যেন পরম তৃপ্তি লাভ করি। তোমরা আমাদিগকে সেই রস ভোগ করিতে দাও ॥৬॥

উল্লিখিত চারিটী মন্ত্র দক্ষিণাপথের সন্ধ্যা পদ্ধতিতেও মাধব ভাষ্য, বহ্বৃচভাষ্য, কৃষ্ণভাষ্য, মাধ্বভাষ্য, সন্ধ্যামন্ত্রদীপিকা, সায়ণভাষ্য প্রভৃতিতে ব্যাখ্যাত হয় নাই। কেবল এতদ্দেশীয় সামবেদীয়ের সন্ধ্যাপদ্ধতিতে দেখা যায়। উক্ত চারিটী মন্ত্রের দ্বারা সন্ধ্যা প্রারম্ভে মস্তকে জল নিক্ষেপ করিয়া মার্জ্জন করিতে হয়।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরো অজায়ত।
অহো রাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী।
সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ॥ (ঋকসংহিতা—৮।৮।৪৮

ঋতং (একাক্ষর ব্রহ্ম, ওঁকারাত্মক ব্রহ্ম, সংপরমাত্মা বাসুদেব) চ, সত্যঞ্চ (জ্ঞান ও আনন্দময় ব্রহ্ম, চিৎ, আনন্দ, অন্তর্য্যামী) চ (ও) অভীদ্ধাৎ (লব্ধবৃত্তি, ফলদানে উন্মুখ) তপসঃ (অদৃষ্টবশতঃ, প্রাক্তন কর্ম্মবশত) অধ্যজায়ত (উৎপন্ন হইল), অতঃ (তাহার পর) রাত্রি (রাত্রি গাঢ় অন্ধকার) অজায়ত (প্রাদুর্ভূত হইল) ততঃ (তাহার পর) সমুদ্রঃ (সমুদ্র) অর্ণবঃ (জলময়), সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে) অর্ণবাৎ (জলময়) অধি অজায়ত (সমুৎপন্ন হইল) সংবৎসরঃ (সংবৎসর) অজায়ত (উৎপন্ন হইল), অহোরাত্রাণি (দিন ও রাত্রি) বিদধৎ (বিভক্ত করত) বিশ্বস্য (জগতের) সূর্য্য চন্দ্র মসৌ (সূর্য্য ও চন্দ্রকে) ধাতা (ব্রহ্মা) যথাপূর্ব্বং (যথাক্রমে) অকল্পয়ৎ (সৃষ্টি করিলেন) দিবং (মহরাদি লোক) চ (ও) পৃথিবী (মর্ত্ত্যলোক) চ (ও) অন্তরীক্ষং (আকাশ, নক্ষত্র লোক) অথো (এবং) স্বঃ (স্বর্গলোক) ॥৭॥

তখন (মহা প্রলয় কালে) কেবল পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেব মাত্র ছিলেন এবং সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ছিল। তার পর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্টের (পূর্ব্ব জন্ম বা কল্পস্থিত জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মের) বশে জলময় বারিধি উৎপন্ন হইল। তাহার পর সেই জলরাশি-পূর্ণ সমুদ্র হইতে, প্রকাশমান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ বিধাতা উৎপন্ন হইলেন। তিনি যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন এবং রাত্রিও হইতে লাগিল। (দিন রাত্রি হওয়ার পর) সম্বৎসর সৃষ্টি হইল। পরে বিধাতা ভগবান্ বাসুদেব, পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, এবং মহঃ প্রভৃতি লোকের সৃষ্টি করিলেন ॥৬॥ এই ঋগবেদোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি পুরাণোক্ত সৃষ্টি প্রণালী হইতে ভিন্ন বলিয়া যদি কোথায় বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কল্প ভেদে বলিয়া জানিতে হইবে।

প্রণব ও ভূ প্রভৃতি সপ্ত ব্যাহৃতির অর্থ, মাধব ভাষ্যানুসারে লিখিত হইল। ওঁকার পরমেশ্বরের বাচক অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রণবের বাচ্য পদার্থ। শ্রুতিতে উক্ত

হইয়াছে যে, ওঁকার এবং ভূ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। (ওঁকার ব্যাহৃতি পূর্ব্বাং গায়ত্রীং জপেৎ)। তাহাই পাতঞ্জল দর্শনে কথিত হইয়াছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥" সেই একাক্ষর পরব্রহ্ম ওঁকার, ত্রিগুণাত্মক ত্রিদেবাত্মক, ত্রিমাত্রাত্মক, ত্রিলোকাত্মক, ত্রিবেদাত্মক, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীবাসুদেব বিশ্ব কারণ বিশ্ব-প্রণবন হেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত।

ভূঃ—বিশ্ব ভুবনের আকর বা অনন্তগুণ পরিপূর্ণ। ভুবঃ—ভূঃ-ভূতিঃ তস্যাবরঃ। ঐশ্বর্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠ। অথবা ভূঃ (পূর্ণ) বঃ (বর) নিরবধিক শ্রেষ্ঠ। স্বঃ জগতের শোভন সুখপ্রদ বলিলা স্বঃ নামে খ্যাত। মহঃ—মহনীয় কিম্বা পূনীয় বলিয়া তাহাকে মহ বলা হয়। সকলের জনক বলিয়া 'জন'। বিশ্বভাবের আলোচনকারী বলিয়া 'তপ' নামে কথিত। সত্যং পরমানন্দ-জ্ঞান স্বরূপ, শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারপ্রদ 'সত্য'। এই সপ্তব্যাহৃতি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীর্থ।

রমানাথের সরস্বতী পূজা।

গ্রামের অধিকারী ভোলানাথ। ভোলানাথের বৈঠকখানা গ্রামের ইতর ভদ্র সকলকারই একটি বিশেষ বিশ্রাম ভবন। এখানে না মিলে, এমন কিছুই নাই। এখানে যা হয় তা' নয় আর যা' নয় তা' হয়। এখানে যেই যে ভাব নিয়ে আসুন না কেন, কাহাকেও বিফল হইয়া ফিরিতে হয় না, সকলেই তার আপনার মত কিছু কিঞ্চিত লইয়া ফিরে। এই মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান কখনও জনশূন্য হয় না, কেহ না কেহ আছেই আছে।

আজ মাঘের শুক্ল-চতুর্থীর সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয় সময়ে, রমানাথ ভট্টাচার্য্য যখন হরিহরের দুর্বৃত্ততার কথা ভাবিতে ভাবিতে নৈরাশ্য ও উদাস-করুণ নয়ন যুগলে

বিষাদ বিরক্তির ছায়া মাখাইয়া, অনবধান করাঙ্গুলি সমূহে সপুষ্প শিখাগ্র জড়াইতে জড়াইতে ভোলানাথের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে নির্ব্বিকার-চিত্ত ভোলানাথ উপাধান আশ্রয়ে ঈষৎ অবনত দেহে কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গারিণী গর-বর-মুখরা আলবালনল-চুম্বিত ঈষদ্ধাস্য বিম্ফারিতাধরে বামাচরণের অকস্মাৎ অন্তর্হিত হালের গরুযোড়ার শ্রীসম্পন্নগুণগরিমাকাহিনীর সহিত তাহার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে দুই একটী সমবেদনার কথা কহিতেছেন। ভট্টাচার্য্যের স্বাগতভক্ত অভ্যর্থনাহে ভ্রূভঙ্গি বিহীন ভোলানাথের কেশাগ্র মাত্র অবিচল দেখিয়া, স্তম্ভিত রমানাথ যখন স্থির ভাবালম্বন করিতেছিলেন, ভোলানাথ তখন তাঁহার স্বভাবসুলভ গম্ভীর স্বরে ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন —এস ভট্টাচার্য্যি দা, দাঁড়ায়ে কেন ? বস, তামাক খাও। তারপর, ব্যাপার কি ? কোন গুণে আজ হরিহরের উপরে এত অযাচিত সুধা বর্ষণ হচ্ছে ?"

ভোলানাথের ঈক্ষণে ভট্টাচার্য্য কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তাহার ভক্তভাবের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল ও দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির দৃষ্টি ছড়াইয়া পড়িল। তাই বিষাদ-মুখর দৃঢ়স্বরে কহিলেন "আর দাদা বলব কি মাথা আর মুণ্ড, দেশটা হ'ল কি ? দেশের ছেলেগুলোর হ'ল কি ?—হ'রে সে দিনের ছেলে—আমি তার সাতপুরুষের পুরোহিত, কাল নাকি সে আর কা'কে দিয়ে 'তার বাড়ীর সরস্বতীপূজো করাচ্ছে। আমাকে পূজো করতে দিবে না। আমি মূর্খ লেখাপড়া জানি না।"

ভোলা। ও' তাই বুঝি তুমি হরিহরের উপর চটে মটে এলে ? ব'স ভট্টাচার্য্যিদা', তামাক খাও।

ভট্টাচার্য্য। আরে—রাম বল। হ'রে সেদিনের দুধের ছেলে, তার উপর আবার বা—গ। তবে কি বলব দাদা, ওদের জেঁপোমির কথাগুলি শুনলে ঘেন্না হয়—দুঃখ হয়।—দুপাতা ইংরাজি প'ড়ে দুটা সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ ক'রে, বলে কি না,—আমরা যে সকল মন্ত্র পড়ি সব অশুদ্ধ, ওতে দেবতার পূজাই হয় না। কলকাতার কি হরেন্দ্র না হীরেন্দ্র দত্ত কে একজন আছে, দেখ সে নাকি ভারি মস্ত পণ্ডিত, বেদান্ত শাস্ত্রে নাকি সে অদ্বিতীয় ; সাহেবেরা নাকি

তাকে বড় বড় উপাধি দিয়েছে এবং তাঁ'রা তাঁর খুব প্রশংসা করে। সে নাকি বলেছে যে মন্ত্রের উচ্চারণটা ঠিক না হ'লে দেবতাই আসে না—তা' আর পূজো হবে কার? সে কে? তিনি লোকটী কেমন বল দেখি?

ভোলা। আর ভায়া, তা জেনেই বা তোমার দরকার কি? তোমার বিদ্যা ত তোমার নিজেরই জানা আছে। তা সেইটুকু ভেবে দেখলেই ত সব গোল মিটে যায়।

ভট্টাচার্য্য। "ঐ যা বল্লে, দাদা, আমি যে আকাট মূর্খ তা'ত জানি, তবে কি জান দাদা, কর্ত্তা আমার হাতে ধরে সব দেব-দেবীর অর্চ্চনা শিখিয়েছেন, আমিও তাঁর উপদেশের কোনও অন্যথা করি নাই, এই আমার ভরসা, প্রাণ-ভরে মাকে ডাকি। পণ্ডিত লোকে বল্‌ছেন—তবে কি মা আমার ডাক্ শুনেন নাই? এতকাল কি তবে মিছামিছি ফুল চন্দন ছড়িয়ে এলুম? মায়ের পূজার নাম করে পরের শিশুর মাথা কেটে, কেবল পাপেরই সঞ্চয় করে এলুম?—বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

ভোলা। আঃ পাগল, মা কি কেবল কথার মা? মা যে জগদ্ব্যাপিণী চিণ্ময়ীরে ভাই, মা যদি প্রাণের ভিতরে দেখা দেন, তবে কি দুটা অনুস্বার বিসর্গের ঠেকায় আট্‌কে পড়েন। ভাই, অবোধ শিশু যখন বায়না ধরে মা'র কাছে "আঙ্গা দাপল" চায় মা কি তখন তাহাকে "রাঙ্গা কাপড়" দেন না? পশ্চিম দেশীয় লোকেরা মূর্দ্ধণ্য ণ কে ড় বলে আর মূর্দ্ধণ্য ষ কে খ বলে আর আসামের লোকেরা সবগুলি 'শ'কেই 'হ' বলে, তা দিয়েইত তাহারা দেবতার পূজা করে, দেবতা কি তাদের পূজা নেন না? সাধু লোকেরা বলে থাকেন—

মূর্খাঃ বদন্তি বিষ্ণায় পণ্ডিতাঃ বিষ্ণবে বদেৎ।
দ্বয়োরপি সমং পূণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

ঠাকুর চায় প্রাণের ভাব, কথায় বা 'তুক তাকে' তাঁর কিছুই আট্‌কায় না। তা' বলে যে শুদ্ধ করে মন্ত্র বলতে হবে না, বা শাস্ত্রজ্ঞান লাভের চেষ্টাও করতে হবে না তা নয়। যা'দের প্রাণে ভাব আছে সেত উত্তম, তারসঙ্গে

শাস্ত্রজ্ঞান, শুদ্ধ-বাক্য থাকলে, সেত মণিকাঞ্চন-যোগ। আর যার প্রাণে ভাব নাই, শাস্ত্রজ্ঞানও নাই, মুখের বাক্যটাও যদি না হয় তাহা হইলে বৈধি পূজায়'ত কিছুই হয় না। না ডাকলে প্রাণে, না ডাকলে মুখে, কি করে দেবতার কাছে ডাক পৌঁছাতে পারে? তবে কিনা শাস্ত্র-যোনী দেবতা, শাস্ত্র বিধিমত কায করলেও কতকটা হয়। তাতে যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকে তবেত কিছুই কথা নয়।

ভট্টাচার্য্য। তা দাদা, তুমি আজ বড় ভাবা'লে। আমার কি আছে? আমি কি দিয়ে মায়ের পূজা করব? ভাই হরিহর। তুই দীর্ঘজীবি হ,' ভগবান তোর কল্যাণ করুন, তুই আমার পরম উপকার করলি মা বাগ্দেবি, তুমি আজ হরিহরের কণ্ঠে এসে তোর এই দীন সন্তানের দীনতার বোধ ফুটায়ে দিলি? বেশ ভাল এই দীনের পূজার হাত অচল করে দিলি, কিন্তু প্রাণে কাঁদ্‌বার অধিকারত' রৈল।"—এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রাহ্মণ নিজগৃহে গমন করিল ও নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্যের প্রস্থানের মুহূর্ত্ত মাত্র পরেই, কি জানি কেন, হরিহর আসিয়া ভোলানাথের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। নীরব পদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ভোলানাথ তাহার উপাধানে অঙ্গ বিন্যস্ত করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া আছেন, বদনে একটী গভীর সাম্যভাব বিরাজ করিতেছে। সহসা তাঁহার নয়নপ্রান্তদ্বয় বহিয়া দুইটী মুক্তা ফল গড়াইয়া পড়িল। ভোলানাথ তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন সম্মুখে হরিহর।

হরিহর একটু কৌতূহলাবিষ্টের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল—"একি আজ নির্ব্বিকার ভোলানাথের চ'খে জল দেখিলাম কেন?"

ভোলা। তোমাদের দৌরাত্ম্যে, আর কেন?

হরি। কেন?—অপরাধ। এমন কি অপরাধ হতে পারে, যা'তে আমাদের ভোলাদাদার চ'খে জল আসে? যার চ'খের সামনে পাঁচ পাঁচটী উপযুক্ত পুত্র, সতীলক্ষ্মী পত্নী, কুবেরের ঐশ্বর্য্য নাশেও একবিন্দু জল দেখি নাই,—আজ এমন কি অপরাধ করেছি যে তা'র চ'খে জল দেখতে হল?

ভোলা। ব'স, বাঁদর ব'স্, আর বিদ্যের ছড় কুট্‌তে হবে না। থিয়েটার রাখ, তামাক খা।

হাসিয়া সটকার নলে মুখারোপন করতঃ প্রভূত ধুমোদ্গীরণ পূর্ব্বক হরিহর কহিল—"যা'ক তবু ধাতে এ'লেম! তারপর পর দাদা ওর মানে কি?

ভোলা। 'মানে—আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু! অনেক বুদ্ধি খরচ করে গবেষণা টবেষণা করে, যাহ'ক রমানাথের ত মুণ্ডুপাত করেছ! এখন ওর দিন গুজরান হওয়ারও একটা ব্যবস্থা চাই ত।

হরি। কেন! আমি রমানাথ ভট্টাচার্য্যের এমন কি করেছি?

ভোলা। এমন কিছুই নয়। তাকে দিয়ে ত' আর পূজা করান হচ্ছে না।

হরি। তাই!—সে—কথা?

ভোলা। হাঁ, ও আর বেশী কি, দরিদ্রের আঁতে ঘা, তাতে আর কি আসে যায়।

হরি। এ কি বিদ্রূপ, দাদা! তোমার মুখেত বিদ্রূপ কখনও শুনি নাই।

ভোলা। বিদ্রূপ নয় রে বাঁদর! সত্য কথা! তুই ঐ সরল ব্রাহ্মণের হৃদয়ে এমন দারুণ ঘা' কেন দিলি! দু' অক্ষর ইংরাজী পড়ে পণ্ডিত হয়েছিস, আর গায়ের চামড়া দেখে মানুষ বাছতে শিখেছিস্। সেই বিদ্যার গরমেই আর বাঁচিস্ না! সাজ দেখে কবে কা'কে চেনা যাবে রে বাঁদর। ওই লেখা-পড়া জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের ময়লা পৈতা আর লম্বাটিকির ভিতরে ভিতরে যে কত বড় একটা উদার, সহজ, সরল প্রাণ আছে, তাহা কি দেখেছিস?

হরি। আমি ওঁকে দিয়ে পূজা করাব না বলেছি বলে তা' বলে ওঁর পাওনা গণ্ডা ওঁকেই দিব বলেছি। তা' আমি ঠিক দিব।

ভোলা। ওরে বোক্‌চন্দ্র এই তোমার বুদ্ধি হল! পুরোহিত যজমানে দোকানদারী সম্বন্ধ!! দোকান থেকে জিনিষ খরিদ করলি, দাম ফেলে দিলি, ল্যাটা চুকে গেল, কেমন!! আর ভেবেছিস রমানাথ মরে গেলেও তোর অমন দাম নেবে? সে কি কেবল তোর টাকার লোভেই তোর বাড়ী

যায়? হা মূর্খ, সে যে তোর পুরোহিত। সে মূর্খ হ'ক, বোকা হ'ক তার সাত পুরুষের ওয়ারিসি সূত্রে পাওয়া প্রাণটা যে তোর ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের জন্য ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে এসেছে। তুই তাকে দুটো টাকা দিয়ে দিলি, আর সে অমনি কৃতার্থ হয়ে গেল। তোর বাড়ীতে পূজো করে সে ক্ষুদ-কণা যা' পায়, তা, সেই দেবতার প্রসাদ—আনন্দে মাথায় ব'য়ে বাড়ী নিয়ে যায়, তাই নিজ বাড়ীর ও প্রতিবাসী বালকবালিকাদের হাতে দিয়ে দেবতার জিনিস হাতে হাতে দেবতাকে দেয়, পশুপাখীকে দেয়, অতিথি অভ্যাগতকে দেয় আর নিজে তার যজমানের অহঙ্কার দেবতাকে দেখায়ে—মায়ের দেওয়া রাঙ্গা কাপড় পরে আনন্দে মায়ের কাছে নাচে। তার এই সকল স্বাভাবিক আনন্দ, দেবতার বরে আশীর্ব্বাদ হয়ে তোর, তোর বংশের মাথায় বর্ষিত হয়। তোকে উপলক্ষ্য করে সে প্রাণ ভরে দেবতার পূজা করে। নিরীহ ব্রাহ্মণ নিজের জন্য দেবতার নিকট কিছুই চায় না, যাহা চায় সব তোদের জন্য। তুই ওকে টাকার লোভ কি দেখাস্? ও কি তোদের মত টাকায় মরে ও টাকায় বাঁচে? ওদের পুরুষানুগত দরিদ্রতা, ও কি টাকার অভাব, না নিরীহ নিষ্কিঞ্চন, নিত্য-সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের স্বভাব মহিমা। একবার এই পরিবারটার দিকে দেখ দেখি, এই গ্রামে এমন মহিমাময় ছটাঘটাহীন দেবালয় কয়টা দেখতে পাস। যেমন ব্রাহ্মণ তেমন ব্রাহ্মণী, তেমন ছেলে-পিলে গুলি। কারো মুখে কোনও দিন কারো নিন্দা শুনেছিস্। কোনও দিন কাকেও অসন্তুষ্ট দেখেছিস। পরের শ্রী দেখে এমন গৌরব বোধ কয়-জনে করতে পারে। তবে তুই ব্রাহ্মণকে কি আঘাত দিয়েছিস, তা তুই বুঝিস নাই? যার মর্ম্মে বিঁধে, সেই সে শেলের যাতনা বুঝে, কিন্তু সেই মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ তোর উপর ক্রোধ আনতে পারল না, তোকে অভিশাপ দিতে পারল না—কেবল তোর জন্যে মায়ের উদ্দেশে মঙ্গল ভিক্ষা করলে।" কি বল্লে জানিস? বল্লে মা হরিহর অবোধ ছেলে, সংসর বংসরে মত তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে পারলেম না, মা তুইত সবারই মা বটে, মা বাগ্বাদিনী তুই আজ হরিহরের কণ্ঠে বসে তোর এই অকৃতি সন্তা-নের মূর্খতার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেছিস, দয়াময়ি, আমি তা তোর উপদেশ শুনেছি মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ করেছি। কিন্তু মা তোর আদেশের কণ্ঠ,—আমার হরিহর

—কচি ছেলে, তার যেন কোনও অমঙ্গল হয় না মা, তা হলে যে এ প্রাণ আর রাখতে পারব না মা।”—এই বলিতে বলিতে ভোলানাথের অপাঙ্গ বহিয়া আবার দুটী মুক্তা ফল গড়াইয়া পড়িল। হরিহর ভোলানাথের পায়ের কাছে লোটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল ‘হায় ভোলাদাদা আমি কি করলুম। যে শিক্ষার অন্ধতা মানুষের হৃদয়ে দেবতাকে, দেখিতে দেয় না সে যদি বিদ্যা, তবে অবিদ্যা কি? আজ মা বাগ্বাদিনী। তুই একই আঁচড়ে আমারও চখ্ ফুটিয়ে দিলি মা, বিদ্যা মা তোকে যেন বুঝতে পারি; তোর পদাশ্রয় হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

ভোলা। ঐ মন্ত্র—ঐই মন্ত্র। ঐ মন্ত্রে যে'যে সারারাত ভব মাকে ডাক আর প্রার্থনা কর যে—

বিদ্যাং দেহি বিশালাক্ষী———তন্নোধিয়ো প্রচোদয়াৎ

৩।

“কিহে ভোলানাথ কি হচ্ছে? আমি এসে একদিনও তোমাকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেম না তুমি কি সমস্ত দিন রাত্রিই এই ভাবে শুয়ে থাক।” সহসা গাত্রোত্থান করিয়া ভোলানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে প্রণাম করিলেন ও বসিবার আসন প্রদান পূর্ব্বক অনাময় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। “তুমি এ প্রকারে কেমন করে সারাদিন শুয়ে থাক ভোলানাথ।” ভোলানাথ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন শাস্ত্রেত “ওটাই পুরুষের কার্য্য বলেছে দাদামহাশয়। বিদ্যা ভূষণ। (হাসিয়া) সে কি প্রকার?

ভোলা। পুরুষ নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ, ইত্যাদি সকল (নিস) গুলিই তার উপসর্গ, আর তিনি পুরে শয়ান থাকেন বলেইত পুরুষ। তা আমি ক্রমে ক্রমে তা'ই হচ্ছি।

বিদ্যা। তা বটে,—পুরুষ যে পরিপূর্ণ।

ভোলা। আমিই বা অপূর্ণ কোথায়, দাদা মহাশয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতি গম্ভীর ভাবে একটু হাসিলেন। কারণ তিনি ভোলানাথের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার এই অভিনব

আত্ম-তৃপ্তির আভাস তিনি পূর্ব্বে কখনও বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি কিয়ৎ কাল ভোলানাথের মুখের দিকে নিবাঘে তাকাইয়া রহিলেন।

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল 'তা'দাদামহাশয় এখানে কি মনে করে ?'

বিদ্যা। ভায়া, বড় মুস্কিলে পড়েছি। বাড়ীতে যে চতুষ্পাঠী আছে ছাত্রেরা প্রত্যেক সরস্বতী পূজা করে থাকে তাহাও বোধ হয় অবগত আছ। আমিই বৎসর বৎসর মায়ের অর্চ্চনা ক'রে থাকি। এ বৎসর আমার কালাশৌচ তাহাও অবগত আছ। তা শ্রীপুরের গঙ্গাধর ভটাচার্য্য মহাশয়ের পূজা করিবার কথাছিল। এই মাত্র তিনি সংবাদ প্রেরণ করেছেন যে তাহার দশম বর্ষিয়া বালিকাটীর বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তার কি হয় বলা যায় না। আমাদিগকে অন্য পূজকের অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন; যা'র বাড়ীতে এরূপ প্রবল রোগ উৎপন্ন হয় তার অন্যত্র যাওয়াও উচিত নয় বলেই তিনি এ কার্য্যে অসমর্থতা জানায়ে পাঠায়েছেন। তা ভাই এখন রাত্রি-কাল কা'কে কোথায় পাই। সকাল বেলা পঞ্চমী মাত্র ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত আছে। ছাত্রেরা যদিও পূজা করতে পারে তা তারা বলেছে যে পদবী তাদের আচার্য্যের জন্য নিয়োজিত আছে তাঁহারা সেই পদবী লঙ্ঘন করতে অনিচ্ছুক। তাই কি করি। ভাবলেম আমাদের ভোলানাথের কাছে এসে কাহাকেও কখনও বিফল মনোরথে ফিরাতে হয় নাই তাই তোমার এখানে এলেম তুমি কিছু করিতে পারবে কি ?

ভোলা। যে আজ্ঞা কাল সকালে আমি লোক পাঠিয়ে দিব।

বিদ্যা। সে কি। এমন কে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে ? আশ্চর্য্য। বল দেখি ব্যাপার কি ?

ভোলা। আমাদের রমানাথকে'ত জানেনই; হরিহর তার যজমান। হরিহর ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মহাশয়কে দিয়ে কাল পূজা করাবে তাই রমানাথ অবসর আছে।

বিদ্যা। রমানাথকে দিয়া পূজা না করাবার হেতু কি ? সে'ত বেশ কর্ম্মপটু, ভক্তিমান ও নিষ্ঠাচারী ?

(ক্রমশঃ)

শ্রী মতি———

হিন্দু-সখা।

সম্পাদক শ্রীরাজকুমার বেদ-স্মৃতি-কাব্যতীর্থ ও শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল। হিন্দুসখা মাসিকপত্র ও গ্রন্থপ্রচারক, ধর্ম্ম-সমাজ ও ইতিবৃত্তাদি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশই ইহার প্রধান কার্য্য। তাহা ছাড়া অবশ্য জ্ঞাতব্য সাময়িক সংবাদাদিও প্রচারিত হইয়া থাকে। সুতরাং একাধারে ইহা সাহিত্য-বিজ্ঞান, ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারক ও সংবাদপত্র স্বরূপ। বার্ষিক মূল্য অতি সুলভ ১৲ টাকা মাত্র। উপহার কয়েকখানি উপাদেয় গন্থ—সকলে হিন্দুসখার গ্রাহক হইয়া সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার করুন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দিন।

বৈকালা পোঃ (হুগলী)

হিন্দুসখা কার্য্যালয়ের অন্যান্য বিক্রেয় পুস্তক। ১। ভাষাদর্পণ—বঙ্গভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান, স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ইহা হইতে যেমন উপকার পাইবেন, সাধারণ লোকেও তেমনি অনেক কথা শিখিতে পারিবেন।—মূল্য ৸০ আনা। (২) সামবেদ সংহিতা—প্রতিখণ্ড ॥০ আনা, মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ সহ। (৩) নারীচিত্র—৷৵০। (পৌরাণিক স্ত্রীচরিত্রের সমালোচনাসহ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক)। (৪) তারকেশ্বর তথ্য ॥৵০ আনা। (বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৺তারকেশ্বর-ধামের সচিত্র ইতিহাস)। (৫) উপন্যাস কুঞ্জ ॥০ আনা (সত্যঘটনা মূলক সমাজ-শিক্ষক উপন্যাস)। (৬) সন্দর্ভহার ॥৵০ আনা। (ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্ব্বিধ প্রবন্ধের সমবায়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাপ্রদ)। (৭) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা—৷৵০ আনা। (বাঙ্গালাপদ্যে স্মৃতিগ্রন্থ)। (৮) কাব্যমালা—৷৵০ (৩য় সংস্করণ) (নানা রসাত্মক বাঙ্গালা কবিতাবলী)।(১০) কুমারসম্ভবম ৷৵০ (১সর্গ)—বঙ্গাক্ষর, মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ)। (১১) দেবসমিতি—৷০ আনা।—(ছাপা কাগজ সুন্দর। রূপক ছলে স্বদেশ কথা)। (১২) নিশীথ চিন্তা—৵০ আনা। (ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের সুন্দর অনুবাদ)। (১৩) গীতিকুঞ্জ ৵০ আনা। (নানাবিধ গীত ও গীত মাহাত্ম্য)।

কলিকাতা, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর হইতে
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

চতুর্থ ভাগ।] চৈত্র; ১৩২২। [১২শ সংখ্যা

বিশ্ব পীঠ।

সৃষ্টির প্রথম দিনে উর্ণনাভ হয়ে,
গর্ভ হতে সূক্ষ্মতম স্বর্ণরেণু লয়ে,
অদ্ভুত কৌশলে তুমি করিয়া বয়ন,
রচিয়াছ আপনার রত্ন-সিংহাসন।
উর্দ্ধে শোভে রেশমের নীল চন্দ্রাতপ
খচিত হীরকদামে, আসন মণ্ডপ;
সামগ্রী সম্ভারে নিয়ে সজ্জিত সুন্দর,
পর্ব্বতের দুর্গ তীর পরিখা সাগর।
পূর্ণ কুম্ভ লয়ে অই নদ নদী গুলি
আবাহন করে কিবা জয় ধ্বনি তুলি।
উষার বিহগ গাহে বৈতালিক গান,
রবি শশি আসি হেথা আলো করে দান।
প্রণয়ে তোমার পদে নোয়াইয়া শির,
কুসুমের গুচ্ছ লয়ে মলয় সমীর।
কুসুম সুরভি ভার করিয়া বিস্তার
বিকায় আপন প্রাণ চরণে তোমার

অনন্ত বিটপীশ্রেণী মস্তক তুলিয়া
বিচিত্র তোরণরূপে আছে দাঁড়াইয়া ;
কাশগুচ্ছ লয়ে অই প্রকৃতিসুন্দরী
চামর ব্যজন করে আহা কিবা মরি।
বিশ্বরূপ লয়ে তাহে ওহে বিশ্বরাজ !
বিরাট্ আসনে তুমি করিছ বিরাজ।
লক্ষ লক্ষ নরনারী দুয়ারে তোমার
স্তুতি করি মাগে অই বিন্দু করুণার।
এ রাজ্যের অধিবাসী তোমার সন্তান
মাগি করযোড়ে আমি, হে শিল্পী মহান !
অপবিত্র হৃদি মোর করিয়া মার্জ্জিত
সেথায় আসন তব কর প্রতিষ্ঠিত.
কিংবা দেহ শিক্ষা মোরে, শকতি আমাতে,
মন্দিরের ধূলি-কাদা মুছি নিজ হাতে
তোমার আসন সেথা করিয়া স্থাপন
কৃতার্থ করিতে পারি আমার জীবন।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম্, এ।

——:*:——

সম্মোহন বিদ্যা

সম্মোহন বিদ্যায় রোগ নিরাকরণ করা একটী বিশেষ গুণ। ইহার দৃশ্যাবলী দেখিতে অতি অদ্ভুত হইলেও, সাধারণ লোকে তামাসার ভাবে দেখিয়া থাকে ; কিন্তু ইহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি থাকায়, সকল লোকের পক্ষেই ইহা বিশেষ হিতকারী। এই জন্যই ইহার এত আদর ! এই জন্যই লোকে ইহার প্রতি এত আকৃষ্ট।

পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা ব্যাধি-পিড়ীত ব্যক্তি মাদুলি কবজ আদি ধারণ করিয়া, দেবতার নিকট হত্যা দিয়া, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া, বা ঝাড়ফুক করিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে। এইরূপে রোগ শান্তি যে কেবল এদেশ বাসী হিন্দু ও মুসলমান দিগের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহা নহে। ইহা

সর্ব্ব দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। অতি প্রচীন কাল হইতে সকলেই বিশেষ রূপে বিদিত আছে যে ঔষধি ভিন্ন এমন একটী অদৃশ্য দৈব শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে লোকে অতি কঠিন রোগ হইতে পরিত্রাণ পায়। পুরাকালে লোকের ধারণা ছিল যে, এই শক্তি ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত ও বস্তু বিশেষে নিহিত। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে এই সকল মাদুলি কবচাদি ধর্ম্ম-বিশ্বাস-মণ্ডিত, এজন্য রোগীর মনে রোগশান্তিসূচক প্রেরণা বাক্য (Suggestion) প্রোথিত করে। তাহারা বলেন যে, মাদুলি আদি ধারণ করিলে রোগীর মনে ধারণা হয়, যে সে আরোগ্য লাভ করিবে। এই ধারণা তাহার মনে দৃঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আশানুরূপ রোগশান্তি প্রদান করে। তাহারা আরও বলেন যে যে শক্তি আরোগ্য দান করে তাহা রোগীর নিজের মধ্যেই থাকে; অপর কোন বাহ্য বস্তু বা শক্তি হইতে আইসে না। বস্তুত, রোগীর বিশ্বাসই তাহার রোগ আরোগ্যের মুখ্য কারণ; এই নিমিত্তই মনোবিজ্ঞান মতে চিকিৎসা করিতে হইলে অগ্রে মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হয়। যে খানে বিশ্বাসের ভিত্তি সুগভীর ও সুদৃঢ় সেই খানেই কার্য্যের পূর্ণ সফলতা। যেখানে ভিত্তি অল্প কার্য্যের ফলও সেখানে আংশিক মাত্র। এই জন্যই বিশ্বাসের তারতম্যে ফলের তারতম্য লক্ষিত হয়। যেখানে বিশ্বাস নাই; সে খানে ফলেরও অভাব।

সম্মোহন বিদ্যা উন্নয়নকারী ডাঃ বার্ণাহিম (Dr. Bernhiem) বলেন, মনুষ্যের বিশ্বাসে কি অলৌকিক কার্য্য করে! এই বিশ্বাসেই মাদুলি কবচাদির রোগ নিরাকরণ করিবার শক্তি নিহিত। মিসর দেশবাসীরা পুরাকাল হইতে মাদুলি কবচাদি ধারণ করিয়া বাত, শিরঃপীড়া, দণ্ডশূল, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। বিশ্বাসে আরোগ্য সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ করিয়াছেন।

সোয়ার্টজেন বার্গের যুবরাজ পত্নী আট বৎসর ধরিয়া পক্ষাঘাত রোগে শয্যা-শায়িনী থাকেন। জর্ম্মানি ও ফ্রান্সের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ কিছুতেই রোগের উপশম করিতে পারেন না। হোহেনলোর যুবরাজ এক জন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তিনি ঈশ্বর আরাধনায় রোগ মুক্তির কতদূর শক্তি আছে, তৎসম্বন্ধে যুবরাজকে সম্যক্ রূপে বুঝাইয়া দেন ও যুবরাজপত্নীর রোগ শান্তির জন্য এক দিবস একটী কৃষককে সঙ্গে লইয়া আইসেন। তিনি যুবরাজ পত্নীকে তাঁহার ও কৃষকের বিশ্বাসের সহিত বিশ্বাস মিলাইতে বলিলেন; এবং ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করায় যখন যুবরাজ-পত্নী বলিলেন যে 'শক্তি অনুভব করিতেছেন'

তখন বলিলেন—'আচ্ছা এখন উঠুন ও বেড়াইয়া বেড়ান। যুবরাজ পত্নীও তাঁহাদের সহিত একবিশ্বাসী হইয়া শক্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন ও শয়ন কক্ষে কয়েকবার পদচারণ করিয়া সোপান পরম্পরায় নিম্নতলে নামিলেন ও পুনরায় সেই সোপান শ্রেণী দিয়া উপরে উঠিলেন। পরদিন তিনি গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিলেন। সেই অবধি যুবরাজ পত্নী রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন।

একদা আমার একটী ছাত্র কেবলমাত্র বিশ্বাসে রোগমুক্তি হয় কি না দেখিবার নিমিত্ত পরীক্ষা করেন। তাঁহার নিকট একটী জ্বরাক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আইসে। লোকটী পুরাতন জ্বরে অনেক দিবস ভুগিতেছিল। প্রত্যহ তাহার অল্প জ্বর হইত। ডাক্তারি ও কবিরাজী চিকিৎসা করিয়া কিছুই উপশম হয় নাই; সেই জন্য আমার ছাত্রের নাম শুনিয়া তাহার নিকট চিকিৎসার জন্য আইসে। ছাত্রটী তাহার রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া প্রথমেই তাহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য বলিলেন, যে তাহার রোগ অতি সামান্য। ইহার নিমিত্ত এক শিশি জলপড়া (megnetised water) পান করিলে এক দিনেই জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। পরে তাহার নিকট হইতে শিশি লইয়া জল পড়িবার ভান করিয়া বাটীর মধ্যে যাইলেন ও ক্ষণেক পরে, তাহার অজ্ঞাতসারে, চৌবাচ্ছা হইতে এক শিশি জল আনিয়া রোগিটীকে সেই জল সমস্ত দিনে পান করিতে বলিলেন। জলপূর্ণ শিশি হাতে দিয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন যে, নিশ্চয়ই আর জ্বর আসিবে না। পরদিন প্রাতে যখন সে আসিয়া বলিল যে তাহার জ্বর হয় নাই, তখন ছাত্রটীর বিস্ময়ের ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।

মাদুলির সম্বন্ধে আমার আর একটী ছাত্র একটী অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেন। কাহারও আবশ্যক হইলে এই ছাত্রটী দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে মূর্চ্ছা রোগের মাদুলি আনিয়া দিতেন। একদা তাহার এক বন্ধু তাহার এক আত্মীয়ার জন্য একটী মাদুলি আনিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ছাত্রটী বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় মাদুলি আনিবার সময় পান নাই। অবশেষে বন্ধুটীর অত্যন্ত তাগাদায় বিব্রত হইয়া বাজার হইতে একটী মাদুলি কিনিয়া আনিলেন ও মোম দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বন্ধুকে দিলেন। ইচ্ছা ছিল শীঘ্রই একটী যথার্থ মাদুলি আনিয়া দিবেন। কিন্তু আর মাদুলি আনিবার আবশ্যক হইল না। দুই তিন দিন পরে তাঁহার বন্ধু বলিলেন যে, মাদুলি ধারণ করিবার পর

তাঁহার আত্মীয়ার আর মূর্চ্ছা হয় নাই। এই রোগী সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে এক বৎসরের অধিক হইল, আর মূর্চ্ছা হয় নাই।

এই প্রকার ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনোবিজ্ঞান মতে বিশ্বাসই চিকিৎসার মূলাধার। নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে এরূপ ধারণা রোগীর মনে আমূল প্রোথিত করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। যখন রোগী কোন মাদুলির রোগ নিরাকরণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে আশ্চর্য্য ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া আরোগ্যলাভ করিবার আশায় মাদুলি ধারণ করে, তখন তাহার শরীরস্থ রোগহারিণী শক্তিটী জাগিয়া উঠে ও বিশ্বাসের গভীরতা অনুযায়ী রোগশান্তি প্রদান করে।

সম্মোহন বিদ্যাপ্রভাবে রোগ নিবারণ করিতে হইলে, রোগশান্তিপ্রদ প্রেরণা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর মনে তাহার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা বা বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে হয়। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গত মনের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন প্রেরণা বাক্য হৃদয়গ্রাহী হয় না; এই নিমিত্ত মোহনিদ্রা আনয়ন করিয়া রোগমুক্তি-সূচক প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। মোহনিদ্রাবস্থায় অতীন্দ্রিয় মন সহজেই প্রেরণাবাক্য গ্রহণ করে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। অতীন্দ্রিয় মন একদিকে যেমন প্রেরণাবাক্যের অনুগত, তেমনি অপরদিকে শরীরের উপর সম্পূর্ণ অধিপতি। ইহার বিশেষ গুণ এই যে শরীরের যান্ত্রীক, পৈশীক, স্নায়বিক ও শিরা সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উপর ইহার পূর্ণ অধিকার। ডাঃ হাডসনের এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কোনরূপ বিস্তারিত প্রমাণের আবশ্যক হয় না। একমাত্র সম্মোহন বিদ্যার অদ্ভুত দৃশ্যাবলীই যথেষ্ট প্রমাণ। যখন মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির সুস্থ শরীরে কেবলমাত্র প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করিয়া নানা-প্রকার বিকৃতি উৎপাদন করা যায় তখন কোন কারণে শরীর অসুস্থ হইলে, যে, তদনুরূপ প্রেরণাবাক্যের সহায়ে পুনরায় স্বাস্থ্য আনয়ন করা যায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

সম্মোহন বিদ্যায় রোগ নিরাকরণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই এতৎসম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। এই নিমিত্ত অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তারিত বর্ণনা পরিত্যাগ করিলাম। এইবার হিন্দু-মনস্তত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

প্রাণের টান।

চিনি বা না চিনি তায় কি জানি কেন বা তার
শুনিতে মধুর বাণী প্রাণ উচাটন।
আকাশে বিজুলী প্রায় ক্ষণ দরশন।

এই হাসে, এই নাচে পাছে পাছে ধায় প্রাণ
নিমেষে মিভায় অতি ঘোর অন্ধকার।
পথহীন দিশেহারা অকুল পাথার।

জলে পোড়ে যাতনায় তবু তারে চায় প্রাণ
কভু বা আশার হাসি, কভু বা হতাশ।
অবজ্ঞায় বাড়ে তায় দ্বিগুণ প্রয়াস।

জ্ঞানের মন্দিরে কভু পাইয়া সে প্রাণধনে
নিশিদিন সযতনে রাখিবারে চাই।
তবু যেন সদা ভয় হারাই হারাই।

আবার ফিরিয়া চাই মুক্ত দ্বার শূন্য ঘর
ফাঁকি দিয়ে পলা'য়াছে সেই মনোচোর।
বুঝিনু বাঁধিতে চাই প্রেম-ভক্তিডোর।

জ্ঞানভক্তি মিশামিশি কঠিন সাধনা তার
তৃণাদপি-নীচতায় বাঁধা তার তার;
অমানী, সকলে মান, বীত-অহঙ্কার।

অতি ক্ষীণ ভক্তিবল কেমনে পাইব তারে?
প্রাণ টানে তবু সদা কেন তারে চায়!
সে আমার আমি তার?—তাঁরাবি কৃপায়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তি-বিনোদ বি, এ।

সেদিন।

এ দেহ যে দিন ত্যজিব, কোথা চলিব, ঘোরে পড়িব
তব প্রশান্তি গোলক প্রজ্ঞান আলোক পথে কি দেখিতে পাইব ?
ক্ষুৎপিপাসায়, যখন আমায় ব্যাকুল কাতর করিবে,
পাপের আহ্বানে মজিয়ে সেখানে প্রলোভে মানস ভুলিবে,
পিপাসা তবে কে জুড়াবে, দুরাশা তবে কে উড়াবে
ভরসা তোমার করুণা অপার, বিলাও যদি তা বাঁচিব।
বারিদ ঘটায় বিজুলী ছটায় মরম যখন কাঁপিবে
বাত্যা বিতাড়নে অশনি নিঃস্বনে, চকিত পরাণ কাঁদিবে,
সে দুখে মনে কি রাখিবে, সাহসে হৃদি কি পূরিবে
তব আনন্দ সদন মঙ্গল-কেতন সুখে কি ধরিয়া থাকিব।
যবে রাশি রাশি বিভীষিকা আসি আতঙ্ক আগুন জ্বালাবে
হৃদয় জিনিয়ে বিহ্বল করিয়ে, কুটিল কুপথে চালাবে
ডাকিলে তবে কি আসিবে, বিষাদ প্রমাদ নাশিবে
আমি অন্তর আশ্বাসে প্রণয় বিশ্বাসে তোমা কি চিনিতে পারিব।
ওহে সহৃদয় চির-শুভময় এত কি সদয় হইবে
এ দীন লাগিয়া রহিবে জাগিয়া ডাকিলে আসিয়া দেখিবে
আশা তো আপন ভাবিবে, আপন করিয়া লইবে
আমি চিদানন্দময়, পাইয়ে আশয়, অবিদ্যা প্রত্যয় নাশিব।

"কর্ণফুলি তটে"।

(১)

আজি এই ফাল্গুনের নিশা অবসানে
তন্দ্রাহীন, হৃদয়ের আবেগ কম্পনে
এসেছি ছুটিয়া নদি ! তব সিক্ত কুলে,
বাতাসের মৃদুমন্দ নর্ত্তন-হিল্লোলে

হেরিতে মন্দিরে তব মঙ্গল উৎসব ;
বিপুল আবেগ হাস্যে তুলি কলরব
তুমি ছুটিয়াছ নদি ! হয়ে ক্লান্তিহীন,
দ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন বিরাম-বিহীন !
তোমার সে হৃদয়ের একাগ্র সাধনা
আকাশে বাতাসে বহি আনে কি প্রেরণা
কি অপূর্ব্ব আনন্দের, আশা উদ্যোগের
নিশ্চেষ্ট যে অসাব যে তারও হৃদয়ের
যুগান্তসঞ্চিত চির জড়ত্বেরে নাশি,
বাজায়ে তাঁহার প্রাণে কর্ম্মমন্ত্রবাঁশী,
হে তটিনী কর্ণফুলি ! বুঝিয়াছি আমি,
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি আমি
তোমার সেবক যারা, তারা ভাগ্যবান্ ;
তাহারা যে পাইয়াছে ভাবের সন্ধান
ও অতল হৃদয়ের গোপন মন্দিরে,
ভাব সেথা আপনিই গান হয়ে ফিরে,
ভাষার দৈন্যতা সেথা নাহি পায় স্থান
সেথা শুধু ভাব আর সেথা শুধু গান।

(২)

এখনো উঠেনি রবি,
বিহগেরা তুলেনি ঝঙ্কার,
এখনো ডুবেনি তারা,
আজও হেথা ব্যাপ্ত অন্ধকার,
এরি মাঝে কতজন
তোমারই নীরব সেবক
তোমারি মন্দির দ্বারে
উপনীত একক একক,
কেহ'ত কাহারো কাছে
জানিবারে কিছু নাহি চাহে,

একমনে সবে শুধু
তোমারি বন্দনা-গীতি গাহে ,
আর আমি গীতিহীন আসিয়াছি কূলে তোর
অয়ি নদি, অয়ি কর্ণফুলি,
হেরিতেছি শুধু তব বিপুল নর্ত্তন রত
গীতিময় ক্ষুদ্র ঢেউ গুলি,
নিশ্চেষ্ট হৃদয় মোর বধির শ্রবণ মম
শুনে নাই হায় এতদিন
উদাত্ত সঙ্গীত তব তোমার কবম গাঁথা,
ক্লান্তিহীন অবসাদ হীন,
মোর ইহ জীবনের অতীত-সঞ্চিত যত
পুঞ্জীভূত জড়ত্ব জঞ্জাল
আজি পূণ্য উষালগ্নে বিদূরিয় অয়ি মোর
কর্ম্ম দ্বার খোল সুবিশাল !

৩

জানি আমি হে তটিনি, আছে বহুতর
তোমার সেবক আরো, তারা নিরন্তর
তব প্রাণে পায় প্রাণ, তব সুরে সুর
ফুটে উঠে তাহাদের কণ্ঠে সুমধুর ;
তাই তারা নিতি নিতি আনন্দ-উল্লাসে
তোমারি মন্দির দ্বারে ছুটে ছুটে আসে
নিশান্তের শান্ত বায়ে, শান্ত দিবা শেষে,
আর তুমি নিয়তই ইঙ্গিতে আভাসে
তাহাদের শিরে শিরে কবহ বর্ষণ
কল্যাণ-অমৃত-কণা মৃত সঞ্জীবন।
আমি ও তো আসিয়াছি তোমার মন্দিরে,
তুমি কি, তুমি কি নদি উদাত্ত গম্ভীরে
মোর প্রাণে তুলিবে না সঙ্গীত ঝঙ্কার
তুমি কিগো জাগাবে না নিশ্চেষ্ট অসার

আমার এ প্রাণটীরে, অগণিত তব
অনুরাগী ভক্ত মাঝে এক জন নব
গ্রহণ কি করিবে না ? হে চির-কল্যাণী,
আমারে কি শুনাবে না তোমার ও বাণী
কর্ম্মময়ী প্রাণময়ী আনন্দ বিপুলা,
হে তটিনী কর্ণফুলী বিপুল সলিলা !

(৪)

ওঁ, ওঁ, ওই উঠে দেব অংশুমালী
হিরণ কিরণ রাশি একে একে ঢালি,
তোমারি নর্ত্তন রত তরঙ্গে তরঙ্গে,
এ কি জ্যোতি ফুটিয়াছে তোমারি সর্ব্বাঙ্গে
দশ-দিক্-ব্যাপী একি জেগেছে উৎসব
দশ-দিক্-ব্যাপী একি হর্ষ কলরব।
জগতে জেগেছে একি কর্ম্মের স্পন্দন
মুহূর্ত্তে কি ইন্দ্রজালে টুটেছে স্বপন !

* * * *

অকস্মাৎ এ কি, এ কি, মোর সারা প্রাণ
পরিপূর্ণ একি পূণ্য আনন্দে মহান্,
কর্ম্ম কর্ম্ম প্রাণ শুধু মাগিতেছে কাজ,
আজিকে সঙ্কোচ কোথা ! কোথা ভয়, লাজ !
নমো নমঃ, হে তটিনি, তোরে নমস্কার,
বুঝিয়াছি এ যে তোরি করুণা অপার
বর্ষিত হয়েছে মোর পরাণে পরাণে
এই কর্ম্ম অনুভূতি, এ মহা স্পন্দনে,
জড়তা হয়েছে হত, তন্দ্রা আজি দূর,
আজি মহা জাগরণ, মঙ্গল প্রচুর !
আজি কোথা সুপ্তি ! কোথা নিরানন্দ লেশ !
নিদ্রিতের অভিশাপ আজি হতে শেষ ;
তুমি নদি, আজি মোরে লইয়াছ টানি
তোমারি ভকত রূপে, হে নদি কল্যানি,

আজি তুমি কহিয়াছ মোর কাণে কাণে
আমারি আজ্ঞাতে তব কল্যাণ নিঃস্বনে
তোমার অমৃত মন্ত্র জ্ঞান করমের,
তোমার বিজয়ী মন্ত্র মহা সাধনের,
জয়, জয়, জয়,
অয়ি নদি সুবিপুলা, কল্যাণ নিলয়,
আজি মম জীবনেব পুণ্য-ক্ষণ চয়
সার্থক হয়েছে লভি তব পরিচয়।

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

সহজ যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

আমরা গতবারে 'অহঙ্কার তত্ত্বের' কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম ; এইবার তাহার আর একটু অববোধের চেষ্টা করিব। বলিতে গেলে কি আজ কালের দিনে প্রকৃত যোগী ভিন্ন, অন্য কেহ যে অহঙ্কার তত্ত্বের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না।

'সর্ব্বের' ভিতর প্রকৃতির সর্ব্বাত্মিকা যে প্রবণতা আছে, তাহার ভিতর আর্য্য ঋষিগণ কতকগুলি আশ্চর্য্য বীজ-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন ; যেমন স্থূল বস্তুর প্রাণ-শক্তিরূপে পরিণাম প্রবণতা। স্থূল বস্তুমাত্রেই প্রাণরূপে পরিণত হইতে পারে বলিয়াই, চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্ভব। সর্ব্বের ভিতর প্রাণের বীজ আছে ইহা একটী আবিষ্কৃত তত্ত্ব। আধুনিক সময়ে জর্ম্মণগণ আকাশ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহ হইতে তাহাদিগের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে। তাহার পরে দেখা যায় যে, সর্ব্বের ভিতর ছোট আমির উপযোগী ও বাসনারূপে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবের শক্তি বিরাজিত আছে। যখন বৈজ্ঞানিক মানব এই তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি আশ্চর্য্য কৌশলে দ্বেষ্য ও প্রিয় ভাবের শক্তি গুলি হইতে ব্যক্ত আমির পরিপুষ্টির উপায় উদ্ভাবন করিবেন। তখন আর সকলকে এক জাতীয় বাসনার ভিতর দিয়া সুখের চেষ্টায়

ঘুরিতে হইবে না; বিরুদ্ধ শক্তি আসিলেই তাহাকে দ্বেষ করিতে হইবে না; পরন্তু সেই বিরুদ্ধ গুলিকে এইরূপ ভাবে প্রেরণ করা হইবে যাহাতে 'আমার' বুদ্ধিটি অভিব্যক্ত হইয়া 'আমিকে' সংস্থাপিত করিবে।

সে যাহাই হউক, সর্ব্বভাবে বিন্যস্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও খেলা গুলির ভিতরে এমন একটি প্রবৃত্তি আছে, যাহাতে তাহাব দ্বারা 'আমি' রূপ একটি বোধ ফুটিয়া উঠে। ইহাই অহঙ্কার তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ।

আমাদিগের চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করিলে দেখা যায়, যে তাহারা কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্ব এই তিন ভাবে কার্য্য করে। ক্রিয়ার ফল পরিণতি প্রভৃতিকে 'কার্য্য' বলে। চক্ষে একটা পদার্থ দেখিলে যে চাক্ষুষ জ্ঞান হয় উহা কার্য্য (Phenomenon)। চিত্তের ভিতর এই কার্য্য গুলি ছিন্ন ভাবে থাকে না; তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া 'ঘন' ভাবে থাকিবাব চেষ্টা করে। একটী কার্য্য অপর একটী কার্য্যে মিশিয়া যায়, আবার একটী কার্য্য হইতে অপর একটী কার্য্য পুনর্ব্বার ফলরূপে প্রসূত হয়। তারপর দেখা যায় যে, চিত্তে আর দুইটী ভাব থাকে। প্রত্যেক কার্য্যের পশ্চাতে কারণ-বুদ্ধি ও কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি থাকে। কর্ত্তা ভাবে ভিতর হইতে 'উপায়' বা প্রক্রিয়া রূপে 'কারণ' ভাবের বিকাশ হয়। কর্ত্তারই এক অংশ কারণ রূপে প্রকাশিত হইয়া, কার্য্যরূপে পরিণত হয়; তেমনি কারণ বুদ্ধি ফুটিলেই সঙ্গে সঙ্গে একটী কর্ত্তৃত্বের বোধ ও কার্য্যবুদ্ধি ফোটে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলেও এই তথ্যের প্রতিকৃতি আছে। একটী স্নায়ুকোষাণু (Ganglion cell) হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুরেখা বা শিরা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে (Processes)। এই বিস্তৃতি দেখিলে উপনিষদের ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্তটী স্পষ্ট বুঝা যায়। সূতা বা তন্তুর ন্যায় এই স্নায়ু-রেখাগুলি ইন্দ্রিয়স্থানে আসিয়া পড়ে; তাহাতে 'কার্য্য'ভাবটী সম্পাদিত হয়।

চিত্তবৃত্তির ভিতরও এইরূপ ঊর্ণনাভের খেলা দেখা যায়। এক একটী কর্ত্তৃত্ববোধ কেন্দ্ররূপে থাকিয়া অনন্ত 'কারণাত্মক তন্তু' প্রসার করিয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। মনে কর, তোমার চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হইল, ঐ কার্য্যটী চিত্তের অন্যান্য কার্য্যগুলিকে তন্তু-বিস্তারের ন্যায় আপনার বিস্তৃতির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করে; যেন সমস্ত কার্য্যগুলিকে এক করিয়া ফেলিবার জন্য কে চেষ্টা করিতেছে। ইহাকে শাস্ত্রে কার্য্যের শৃঙ্খলা বা পরিণতি বলে। উহার গতি একত্বের অভিমুখে, 'বহু' বা ছিন্নভাব গুলিকে একত্রিত করিয়া যেন প্রধাবিত হয়। স্নায়ুমণ্ডলে এই বিস্তৃতির খেলার জন্য সমস্ত শরীরটী এক ভাবে

থেলে, পায়ে কাঁটা ফুটিলে তাহার যন্ত্রণাটী ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত অণুগুলিকে ঐ ভাবে ভাবিত করে। তারপর কারণরূপ তত্ত্ব-বিস্তৃতির ফলে একবার যে ভাবে কার্য্যগুলি অনুভূত হয়, তাহার কারণ যেমন স্নায়ুমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তক্ষেত্রেও প্রত্যেক কার্য্যের পুনর্ব্বার প্রকাশ হইবার ক্ষমতা (Potentiality) রহিয়া যায়। ইহাতে আরও সূক্ষ্মতর তত্ত্বের প্রকাশ দেখা যায়। ক্রোধ হইলে ক্রোধের বশে সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; মন বিপর্য্যস্ত ও বুদ্ধি কবলিত হইল। ইহাতে একটী সাময়িক একত্বের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী, কারণরূপে আর একটী একত্ব আছে, যদ্দ্বারা ক্রোধের উদয় হইলে পুনরায় কারণ ও কার্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিতে পারে।

মোটা কথায় যাহা একটু বুঝা গেল, সেই তথ্যটী এইবার সমস্ত প্রকৃতির ক্ষেত্রে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে করু সমগ্র বিশ্বটী একটী প্রকাণ্ড শরীর, তাহার ভিতর কার্য্যরাশি আছে, জীব, কীট, পতঙ্গ দেবতা প্রভৃতি সকলেই এক একটী কার্য্য মাত্র। এই কার্য্যরাশি ছিন্ন ভাবে থাকে না। বীজাণু হইতে রোগের সংক্রমণ, নিম্নতর জীব হইতে উচ্চতর জীবের অভিব্যক্তি (evolution), প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত মানবের স্বভাবগত ঐক্য, চিত্তগত ভাবের সহিত স্থূল বস্তু ও সূক্ষ্ম শক্তির সম্বন্ধ—এই সকল তথ্যগুলি একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক মহান্ শক্তির বশে কার্য্যগুলি পরস্পর মিলিত, সংহত ও পরিণত হইয়া বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। তার পর দেখা যায় যে, এই ব্যক্ত খেলাটাই সবটা নহে। কার্য্যের ভিতর দিয়া পরিলক্ষিত একত্বটী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, এখনও তাহার অভিব্যক্তি হইতেছে, এখনও বিশ্বের কোন মর্ম্মস্থান হইতে কারণরূপাত্মক প্রবাহ বহিতেছে ও নূতন নূতন ভাবের কার্য্যের খেলা দেখাইতেছে। সুতরাং সেই কারণগুলির সব না বুঝিলে শুধু ব্যক্ত কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিলে চলিবে না। তাহা হইলে কার্য্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে না। তার পর দেখা যায় যে, এক একটী কার্য্যও তাহার অন্তর্ভূত কারণগুলি একটী কর্ত্তৃত্ব রূপাত্মক কেন্দ্র ভাব অবলম্বন করিয়া থেলে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শুধু কার্য্যই দেখেন; অনভিব্যক্ত কারণ-রাশির আভাস বৈজ্ঞানিকগণ অল্পই পাইয়াছিলেন। কি কারণরাশির খেলায় আজ ইউরোপের ঘননিনাদিত সভ্যতার ক্ষেত্রে, সভ্যমানব সমরানলে পশুর মত আপনাদিগকে আহুতি দিতেছে, তাহা কি হে শিক্ষিত হিন্দু, তোমরা ও তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক গুরুগণ

একটুও জানিতে পারিয়াছিলে? তোমরা—কি বুঝিতে পার যে কি যুক্তিবলে নিরীহ মানবগুলিকে অকাতরে সমুদ্রমধ্যে ডুবাইয়া মারিয়া, ঐ কার্য্যটী সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া জার্ম্মাণ জাতি গর্ব্বিত হইতেছেন? ইহা দেখিয়া কি মনে হয় না যে মানব বাহ্যিক ভাবে শিক্ষিত হইলেও, তাহার পশ্চাতে সমগ্র জগতের পশু, প্রেত, নিশাচরগণের কারণ-শক্তি অপরিণত অবস্থায় রহিয়া যাইতেছে; এবং সেই কারণগুলিকে মানব যতদিন পরিণত করিতে না পারিবে, তত দিন মানবকৃত সভ্যতার প্রতিষ্ঠা কোথায়? আজ অকাতরে পশুবধ করিয়া উদর পূরণ করিতেছ, —ভাবিতেছ না যে একদিন তোমার চিত্তবৃত্তির ভিতর অভিব্যক্ত হইয়া তোমার সোণার সংসারকে ছারখার করিবে। সে যাহাই হউক, এক একটী জাতির উন্নতি সাধিত হইতে গেলে যে কর্তৃত্বাত্মক কেন্দ্রের আবশ্যক এ কথা পাশ্চাত্য দর্শন দেখিতে পান নাই। কুক্কুর জাতি কিরূপে উন্নত হইতেছে? কতকগুলি বিশিষ্ট কুকুরকে সন্তরণ শিখাইতে শিখাইতে Spaniel নামক একটী সন্তরণ-পটু কুকুর জাতি সৃষ্ট হইল, ইহা সকলে জানেন। বিশিষ্ট কুকুরের সন্তরণ-পটুতা তাহার মৃত্যুর সহিত ধ্বংস হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ পটুতা কোথায়, কোন কেন্দ্রে, সংরক্ষিত হইয়া 'স্বভাবশীল দক্ষতা'রূপে পুনরায় কুকুরজাতিতে অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার তাহা কে ভাবিয়া দেখিয়াছে? অথচ তাহা না হইলেও ক্রমবিকাশবাদ মিথ্যা হইয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে— যে পিতৃ দেবতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথচ কর্তৃত্বাভিমানী কতকগুলি কেন্দ্র আছে; তাঁহারাই কার্য্য ও কারণ রাশিকে একত্রিত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া, মানবাদির অভিব্যক্তির জন্য পুনরায় প্রদান করেন। রূপগত যে উন্নতির ভাবগুলি 'অহং' এই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক, অর্থাৎ যাহা দ্বারা অহংবোধটী রূপ ও তাহার অন্তর্ভূত বহুর সমতার ভিতর দিয়া ফুটিতে পারে, সেই ভাব-গুলি রক্ষা করাই পিতৃগণের কার্য্য। উদ্ভিদজাতির অভিব্যক্তির মধ্যে যে রূপ-গত ভাবগুলি দ্বারা বিশেষ বুদ্ধি সংরক্ষিত হয়, সেইগুলি উদ্ভিদ্-অভিমানী পিতৃগণ সংরক্ষণ করিয়া রাখেন; যেমন গোলাপ ফুল। স্বাভাবিক গোলাপ-গুলির এক-দল; কতকটা করবী ফুলের মত; উহাই ইংরাজিতে Tea Rose। উহা যেন গোলাপজাতি অভিমানী পিতৃগণের সামান্য ভাব। 'তারপর এই সামান্য ফুলটীকে কিরূপে পরিচর্য্যার দ্বারা, আজকালের বিশিষ্ট Black Prince প্রভৃতি গোলাপে পরিণত করা হয়, ও কিরূপে সামান্য গোলাপ হইতে বিশেষ গোলাপটী আবির্ভূত হয়, তাহার রহস্য বুঝিতে গেলে দেখিবে যে বিশেষাভিমানী

কতকটা অহং-জাতীয় একটী কেন্দ্র সামান্ত গোলাপরূপ ক্ষেত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। ঐ কেন্দ্রে সামান্ত ভাবগুলি অপ্রধান ভাবে ও Black Princeএর বিশেষ ভাবগুলি প্রধানভাবে সংরক্ষিত হয়। এইরূপে কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগতে বিশেষ ও কর্তৃত্ব-অভিমানী উচ্চ ও উচ্চতর কেন্দ্র গুলি বিন্যস্ত হইয়া মানবের স্নায়ু কেন্দ্রের মত সহস্রার অভিমুখী হইয়া কি এক পরম-বিশেষ অহং স্বরূপ মহৎ তত্ত্বের আধার হইবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহাই গীতার উর্দ্ধমূল অশ্বত্থ। মূলটী উপরে ভগবানের 'অহং'এ মিশিয়া গিয়াছে; কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা রূপে কর্তৃত্বাভিমানী অনন্তকেন্দ্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। অবশেষে কার্য্যাত্মক পত্র ও কারণাত্মক পুষ্প ফলে, এই মহান্ বৃক্ষ শোভিত হইয়া রহিয়াছে।

যে মহান্ শক্তির খেলায়, নিম্ন হইতে দেখিতে গেলে, কার্য্যাত্মক, কারণাত্মক ও কর্তৃত্বাত্মক সমগ্র বিশ্ব 'ঘন' হইয়া এক 'অহং'কে দেখাইবার চেষ্টা করে,—ও উপর হইতে দেখিতে গেলে, এক শুদ্ধ 'অহং'—যাহার বশে কর্তৃত্বাত্মক দেবতাদি ও কারণাত্মক তত্ত্ব ও কার্য্যাত্মক ব্যক্ত বিশ্বরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, তাহাকেই অহংকার তত্ত্ব বলে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগগুলি কার্য্য (Phenomenon), আমিটী যেন ঐগুলিকে আপনার বাহিরে অভিব্যক্ত করিয়া ভোগ করে; সেই জন্য ঐ ভোগকে Experience বলে। উহাই প্রকৃত আমির "শেষ"-সংজ্ঞা সহস্র-শীর্ষ মহা-সর্পরূপ আধার। সেই জন্যই 'শেষ' সর্পকে লক্ষ্য করিয়া কালিদাস বলিলেন—

"ভোগী ভোগাশনাশীনং।"

অনন্ত জন্ম, অনন্ত কর্ম্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়াও অহংকারের এই প্রবণতাকে শেষ করিতে পারা যায় না। তারপর সেই জন্মগুলির মধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য প্রভৃতি সেই অনন্ত কার্য্যগুলিকে কারণরূপে পরিণত করিয়া সংরক্ষণ করা—'অহংকারের' দ্বিতীয় খেলা। এই শক্তি আছে বলিয়া আজকার ঋষি বিশ্বামিত্র কাল মেনকাতে সঙ্গত হইলেন। ভেদাত্মক আমিটীকে রাখিলেই কারণগুলি পুনরায় প্রকটিত হইতে পারে,—ইহাই দেখাবার জন্য বিশ্বামিত্রের পতন বর্ণিত হইয়াছে। কারণাত্মক বিশ্ব যে কার্য্যরূপে প্রকটিত হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য সৌভরি ঋষির চিত্তে পুনরায় কাম উদ্রিক্ত হইল।

প্রকৃত অহংকে লক্ষিত করিবার জন্য অহংকার তত্ত্বের খেলা। তিন

ধারায় এই খেলা চলিতেছে। প্রথমটী কার্য্যের (Phenomenon) ধারা। সমস্ত কার্য্যরাশি এই স্রোতের বশে, পরস্পরে মিশিয়া গিয়া একটী একত্বের ইঙ্গিত করে। এই ধারার স্থূল ভাবটী পাশ্চাত্য জগতের "অভিব্যক্তি বাদ" (Evolution)। মানব শরীরটা কীট হইতে জন্তুগুলির—অভিব্যক্তির সারাংশ ধারণ করিয়া রাখে। হিন্দুর যোগশাস্ত্রে এই ভাবটীকে আরও উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। অনন্ত বিশ্বের সমগ্র সংস্কাররাশি এই শক্তির বশে প্রত্যেক জীবের ভিতর বীজভাবে আছে। তোমার চক্ষুটী দেখিতে সামান্য বটে; কিন্তু উহাতে ত্রিভুবনে সকল জীবের কর্তৃক দৃষ্ট-রূপের বীজগুলি নিহিত আছে। চিত্ত-সংযম করিয়া সেই বীজে আঘাত করিলে, আবার ত্রিভুবনের রূপজ্ঞান ও তাহার ইতিহাসটী পুনরায় ফুটিয়া উঠিতে পারে, ও যোগী ইচ্ছামাত্র সেই সংস্কার রাশি অনুভব করিতে পারেন। পাতঞ্জলের যে বিভূতিগুলির অভিব্যক্তির কথা বলা আছে, তাহা এইরূপে কার্য্যস্রোতের ভিতর দিয়া অহংকার শক্তির একীকরণের নিদর্শন মাত্র।

একটী কারণের কারণান্তরে পরিণতি রূপ যে স্রোত আছে, যে স্রোতের বশে ইন্দ্রিয়, কাম, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিগুলি উচ্চ ও উচ্চতর ভাবে লীন হইয়া যায় এবং পুনরায় উচ্চতর বীজ হইতে নিম্নতর কারণরাশি ফুটিয়া উঠে, উচ্চতর তত্ত্ব হইতে নিম্নতর তত্ত্বগুলি অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে অহংকারের কারণাত্মক একত্ব শক্তি কহে। তারপর কার্য্যকারণাত্মক খেলাগুলি ছোট ছোট আমিরূপ কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের গতিশীল (kinetic) ভাবগুলি স্থির (Static) আমিরূপ জ্ঞানে মিশিয়া যায়। এই উচ্চ ও উচ্চতর আমি-কেন্দ্রগুলিকে দেবতা পিতৃ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়, ঐ আমিগুলি ব্যক্ত ও বিশিষ্ট অভিমানী, ইহাকে অহংকারের কর্তৃত্বাত্মক একত্ব শক্তি বলে। তারপর অহংকারের আর একটী খেলা আছে, তাহাতে কার্য্যগুলি কারণে ও কারণ রাশি কর্তৃত্বে মিশিয়া যায় এবং পুনরায় কারণ ও কার্য্যরাশি উৎপন্ন হয়। অতএব বুঝা গেল কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বাত্মক বিকাশ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধৃত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া খেলে এবং এই বৃত্ত-শক্তিগুলিকে ওতঃপ্রোত করিয়া অহংকারের অপর ভাব আছে। সুতরাং যেরূপ বীজটী ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আপনাকে বিস্তৃত করে ও অবশেষে অণ্ড (Sphere) রূপে বিতরত হয় এবং পুনরায় অণ্ডটী যেরূপ খেলার শেষ হইলে পুনরায় অণু বা বীজরূপে মিশিয়া যায়,—সেইরূপ অহংকার শক্তির বশে শুদ্ধ অহংটী আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডরূপে ওতঃপ্রোত

ভাবে বিন্যস্ত করিয়া ও পুনরায় অহংজ্ঞানে লীন হয়। অণুর ভিতর কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বাত্মক স্তর আছে, প্রত্যেক স্তর ও তদগত ক্ষুদ্র অনুগুলি অপর স্তর ও তাহার অনুগুলিতে পরিণত হইতেছে। জল গরম করিলে (convection) অবস্থায় যেরূপ তলস্থ ও উপরস্থ অনুগুলির মধ্যে ওতপ্রোত গতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের মধ্যে কার্য্য হইতে কর্ত্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হইতে কারণ এইরূপ ওতপ্রোত গতিতে চলিতেছে। দৃশ্য বা বস্তু বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া মন বুদ্ধি প্রভৃতির ভিতর দিয়া ব্যক্ত 'আমি'রূপে মিশিতেছে, আবার ব্যক্ত আমিটী কর্ত্তৃত্ব কারণ ও কার্য্যের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। Convection শক্তির দ্বারা এইরূপে জলের ভিতর বাহির সমভাবে উত্তপ্ত হয়, সেই রূপে অহংকার তত্ত্বের তিনটী শক্তির দ্বারা ব্যক্ত বিশ্বের সমস্তটীই ঘন হইয়া আমির ভাবে ভাবিত হইয়া যায়। ঐ আমি জ্ঞানটীতে ব্যক্ত বিশ্বের সমস্তটিই ঘন হইয়া আমির ভাবে ভাবিত হইয়া যায়, ঐ আমি জ্ঞানটী ব্যক্ত সক্রিয় বা সগুণ। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা হইতে রসিক যোগী আমির ভাষা একটু বুঝিতে পারেন, ইহাই অহংকার তত্ত্বের সাধনা। একথা বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

প্রার্থনা।

প্রভো! বুঝেছি এখন দূরে গেছে ভ্রম,
তুমিই আমার স্বামী প্রভু প্রিয়তম।
অজ্ঞান আঁধারে বাসনার বশে—
কত কি কুকার্য্য করিয়াছি হায়!
না চিনে তোমায় অহমিকা দোষে—
ক্ষমা কর প্রভু—নমি তব পায়।
বুঝেছি এখন, হৃদয়ের ধন!
তোমারি আদেশ—করিতে পালন,
হস্ত পদ আদি—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ—
দিয়ে, দাসে, ভবে করেছ প্রেরণ;
তোমারি শক্তিতে—হতেছি চালিত,—
তোমারি কৃপায় আছি গো জীবিত।

হে হৃদয়-ধন! করি নিবেদন—
মায়া মোহে আর ক'রো না মগন,
ভুলাও না কভু, ও কমল পদ—
জাগাও না হৃদে আমিত্ব আপদ;—
তৃণাদপি নীচ হয়ে, তোমারি চরণ—
দাস ভাবে সেবা করি এই আকিঞ্চন।

শ্রীবিনোদ বন্ধু গুপ্ত।

কঠোপনিষদ্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয়াবল্লী।

জনম-রহিত এই সে আত্মার
আছে পুরী এক, 'দেহ' আখ্যা তার
মন্ত্রী বন্দী আর একাদশ দ্বার
পুরীর সকলই রয়েছে ই'থে।
সেই পুরীমাঝে জ্যোতিপুঞ্জ মত
অকুটিল আত্মা বিরাজ সতত
পুর অপচয়ে নহে অপচিত
বৃদ্ধিতে নাহি উপচয় ই'থে॥
রাজধানী মাঝে যেমতি রাজন্
সকলের স্বতন্ত্র হয় সেই জন
তেমতি স্বতন্ত্র জানিও ব্রহ্মন
আছে স্বামীরূপে শরীর মাঝে।
যেই মহাজন সেই সে ঈশ্বরে
সর্ব্ব-ইচ্ছা-মুক্ত হয়ে ধ্যান করে
ভয় তার কিছু না থাকে সংসারে
মৃত্যু পরে পুনঃ দেহে না রাজে॥

এই আত্মা শুধু একের শরীরে
নহে স্বামী ভাবে, বিশ্ব চরাচরে
আছেন সম্রাট্ সকলের পুরে
সংশয় তোমার দূরিতে কহি।
হংস শুচি ইনি দিব্যাদি আত্মায়
রয়েছেন ব্যোমে বায়ুর কায়ায়
যজ্ঞবেদী রূপে আছেন ধরায়
সোমরস রূপে দ্যুলোকে রহি।
আছেন মানবে দেহের অন্তরে
পূত যজ্ঞস্থলে আকাশ মাঝারে
মকরাদি রূপে সরিতে সাগরে
পদার্থ প্রাণীতে আছেন লীন।
ব্রীহি আদি রূপে জনম ধরাতে
যজ্ঞ আদি রূপে জনম যাগেতে
নদী আদি রূপে জনম পর্ব্বতে
সর্ব্ব-কারণ আত্মা ভেদহীন।
প্রাণ বৃত্তি বায়ু হৃদয় হইতে
উঠে ঊর্দ্ধ দিকে, পৃথক্ তা'হতে
অপান নামায় ধাইছে নিম্নেতে
হৃদয় কমল মধ্যেতে তার;
সে পদ্ম-আকাশে আছেন আসীন
সেই ভজনীয় অব্যয় অসীম;
রূপাদি বিজ্ঞান সর্ব্ব চিরদিন
করে অর্চ্চনা দিয়ে উপহার।
যথা পুরস্বামী চলে গেলে পর
যায় পুরজন স্থানেতে অপর
দেহ হতে আত্মা ভ্রষ্ট হলে পর
প্রাণাদি কলাও তেমতি রূপে;
হয় হতবল নষ্ট নানা মতে,
পরিশেষ কিছু না রহে দেহেতে

অপগমে তার ; যাহার দৃষ্টিতে
আছিল করম কারণ রূপে।
বাঁচিতে না পারে কভু দেহবান্
করিয়া আশ্রয় প্রাণ বা অপান্
মিলে বা এ সব জীবনাধান
কথনো করিতে নাহিক পারে।
তবে মিলে সব করিয়া আশ্রয়
সর্ব্ব হতে ভিন্ন সে আত্ম নিলয়
দেহীগণ সব প্রাণ ধরে রয়
তদতীত কিছু থাকিতে নারে।
পুনরায় আমি কহিব তোমায়
গুহ্য ব্রহ্ম তত্ত্ব সরল কথায়
চিরন্তন যাহা নশ্বর ধরায়
তুলনা যাহার কিছুতে নাই।
বিজ্ঞানে যাহার, সংসার বন্ধন
চিরকাল তবে হয় উন্মোচন ;
অবিজ্ঞানে যার কেবল মরণ
হে গৌতম, তারে জানিতে চাই।
অবিদ্যা-মোহিত সর্ব্বজনগণ
প্রবেশে যোনিতে করিতে গ্রহণ
শরীর ধরায় ; আবার মরণ
কাল পূর্ণ হলে ইহারা লভে।
অত্যন্ত অধম যাদের মরণ
বৃক্ষ আদিরূপে তাদের জনম
যেরূপ বিজ্ঞান করেছে অর্জ্জন
সেরূপ জনম হেথায় হবে।
গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব আছি প্রতিশ্রুত
কহিব তোমায় প্রিয় নচিকেত
সেই তত্ত্ব সর্ব্ব জ্ঞানী মনোমত
সব চেয়ে শ্রেয় এ বিশ্বে তাই ;

যেই চিরন্তন অবিদ্যারে দিয়া
অভিপ্রেত সব নিষ্পন্ন করিয়া
সুপ্ত প্রাণ মাঝে রয়েছে জাগিয়া
　　সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম অন্যথা নাই।
স্ত্রী আদি অর্থ যাহা অবিদ্যার
সকলের ইনি নিরমান-কার
নাহিক বিনাশ এমথা ধারার
　　ধ্বংস বিহীন সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া
যত লোক আছে অনন্ত ভরিয়া
সকলি তাহার আশ্রিত হইয়া ;
　　তিনি ভিন্ন কিছু কিছুই নহে।
অনল যেরূপ প্রবেশি ভুবনে
এক হয়ে, তবু, দাহ্য-ভেদ-গুণে
নানা রূপ ধরে তমো নিবারণে
　　ব্রহ্ম ও তথা সে অনলমত।
অবিকৃত চির আকাশের মত
বস্তুভেদে রূপে হন পরিণত—
যত ভূত আছে সর্ব্বান্তর-স্থিত
　　সকলে বিলীন আছয়ে যত।
পবন যেরূপ প্রবেশি ভুবনে
এক হয়ে তবু পাত্র-ভেদ-গুণে
নানারূপ ধরি প্রকাশে ভুবনে
　　ব্রহ্ম ও তথা সে পবন মত।
অবিকৃত চির আকাশের মত
বস্তুভেদে রূপে হন পরিণত
যত ভূত আছে সর্ব্বান্তর স্থিত
　　সকলে বিলীন আছয়ে যত।
তপন যেরূপ স্বকীয় আলোকে
প্রকাশি অশুচি নয়ন সম্মুখে

হয়ে বিশ্ব-চক্ষু এই সর্ব্ব লোকে
বাহ্য পাপ দোষে নির্লিপ্ত রহে।
ব্রহ্ম ও তেমতি সে তপন মত,
যদি চ সবার অন্তরেতে স্থিত,
বাহ্য পাপ দুঃখে না হন চালিত ;
পরমাত্মা কভু দুঃখী নহে।
সর্ব্বগত সেই একই ঈশ্বর,
সম বা অধিক নাহিক অপর ;
তাহারই অধীন বিশ্ব নিরন্তর
তিনি সর্ব্বভূত অন্তরস্থিত,
শুদ্ধজ্ঞান রূপী সেই এক রসে
অশুদ্ধ উপাধি তা'র ভেদ বশে
আপনা আপনি করিছে অশেষে
দৃশ্যমান যেই নাম-যুত,
হৃদয় কমল আকাশেতে তার
আদর্শস্থ মুখ তাহারই প্রকার
চৈতন্য যে, সেই প্রকাশিত যার
চিরসুখী সেই জগতী মাঝে,
হেরি পরোৎকর্ষ হীনত্ব নিজের
হয় মগ্ন নর সাগরে দুঃখের
বাহ্যাসক্ত বুদ্ধি অবিবেকী দেব
উক্ত চিন্তা সদা হৃদয়ে রাজে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর মজুমদার।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রজত কিরণ বিকীরণ করিয়া রজনী প্রভাত হইল। সুশ্মা প্রথমে স্বামীকে পরে শ্রীগুরুকে বন্দনা করিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, যেন রজতগিরি-নন্দিত দেবাদিদেবের শুভ্র জ্যোতি জগৎকে মধুর আহ্বানে প্রবোধিত করিয়া তুলিতেছে। সুশ্মা তাঁহার সেই হৃদয় দেবতাকে নমস্কার করিয়া সমগ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পূজা করিতে উপবেশন করিয়াই সুশ্মা শিবমূর্ত্তি গঠনের নিমিত্ত আহরিত মৃত্তিকা খণ্ডে, বিশ্বের আধার তত্ত্বের আভাস পাইল ও তাহাতেই তাহার ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও ভক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণাভিমুখে প্রধাবিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যিনি এই বিশ্বের আধার, যিনি অনাদি অনন্ত, তিনিই ভক্তাধীন। তাই এই মৃত্তিকা খণ্ডেও তাঁহারই আবির্ভাব!! ভক্তের জন্য দয়াময়ের কি অপরিসীম করুণা! কে আমি? তুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আর হে দেব তুমি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম, বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বাদি, বিশ্ববীজ। তোমরা আবার লিঙ্গ কি? যিনি নিষ্কল, বিশ্ব যাহাতে সর্ব্বলিঙ্গ বিসর্জ্জন করিয়া একেবারে লীন হইয়া যায়, তাঁহার আবার কি লিঙ্গ, কি চিহ্ন, কি মূর্ত্তি, থাকিতে পারে? সামান্য মৃত্তিকা দ্বারাই বা তাঁহার কি লিঙ্গ-মূর্ত্তি রচিত হইতে পারে? হে প্রাণমন-হর আনন্দঘন হর; আমরা যে তোমারই, আমরা মাটির বলিয়াইত মাটী দিয়া তোমার লিঙ্গ-গঠন করিতে প্রয়াস পাই; আমরা বিশিষ্টতায় ডুবিয়া আছি বলিয়াই'ত অবিশেষ তোমার লিঙ্গ বা চিহ্ন-বিহীন আনন্দঘন স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রেমময়! তুমি তোমার প্রেমে আমাদের প্রাণমন হরণ কর বলিয়াই, আমাদের সামান্য পূজাও স্বার্থক হয়! তোমার প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহা 'হরায় নমঃ' বলিয়া তোমাতেই নিবেদন করি। হে দেব তুমি একত্ব-ব্যঞ্জক সামান্য ভাবগুলিকে আহরণ কর, বলিয়াই বিলক্ষণ-বৃত্তি-সম্পন্ন মিথ্যার জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, হে সত্য তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণ, হে গুণাতীত তোমার গুণগ্রাম ভক্তের মন হরণ করে বলিয়াই তোমার পূজা সম্ভব হয়; হে হর! তোমায় নমস্কার। ঠাকুর তোমারই মায়ার মোহভরে, তোমারই দয়ার স্পর্দ্ধাভরে এই মৃত্তিকায় তোমার লিঙ্গ-মূর্ত্তি রচনা করি। হে দেব, এই মূর্খ, অজ্ঞান অবলার

অপরাধ মার্জ্জনা কর; প্রসন্ন হও। হর! হৃদয় ভরিয়া তোমায় নমস্কার করি। 'হরায় নমঃ' এই প্রণতি ব্যতীত তোমায় নিবেদন করিবার আর কি আছে—নাথ?"

ঘুশ্মার চম্পক-কলিকা-বিনিন্দিত অঙ্গুলি সমুদয় পরিচালিত হইয়া একটী মৃন্ময় লিঙ্গমূর্ত্তি গঠন করিয়া তুলিল। মহাদেবের অতিপ্রিয় চম্পক কুসুম, শিবার্চ্চনের অধিকার না পাইয়াই যেন কোরকরূপে ঘুশ্মার করাঙ্গুলে অবতীর্ণ হইয়া দেবাদিদেবের সর্ব্ব-বিদ্যমান তত্ত্বরূপ মৃন্ময় বেদীতে আত্মোৎসর্গ করতঃ চম্পকদাম-গৌরী-বল্লভের চরণ-প্রান্তে আপনাকে লুটাইয়া আত্মহারা হইতেছে। ঘুশ্মার করাঙ্গুলি আর তাহার করাঙ্গুলি বলিয়া মনে হইতেছে না; ইহা যেন যথার্থ চম্পক-কলিকা, ও তদ্দ্বারা তিনি গৌরীনাথের পাদপীঠ মার্জ্জন করিতে করিতে ধ্যানে আত্মহারা হইয়া ভাবিতেছেন—"সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্বই যাঁহার বেদী সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বরূপী ভগবানেরই এই ক্ষুদ্র মৃণ্ময় বেদী! যে ঐশিক মায়া, সমগ্র সৃষ্টিশক্তি ও সৃষ্ট পদার্থ দ্বারা ও সেই লিঙ্গরূপী অব্যয় মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিতে অসমর্থ, সেই ভগবানের এই পীঠ!!! যে লিঙ্গ-মূর্ত্তির একদিকে কেশব ও অন্যদিকে ব্রহ্মা, দুই জনে, বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান তৎপর হইয়াও কোনও তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে পারিলেন না, সেই সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বগুণময়, নির্গুণ দেবতার এই ক্ষুদ্র মৃণ্ময় মূর্ত্তি। এই বালচপলতার, শৈশব-ক্রীড়াও যাঁহার দয়ায় সত্য ও স্বার্থকতা সম্পন্ন হয়, তাঁহাকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব? আমি কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম নগণ্য পরমাণু-কণা,—আর হে মহত্তম সমূহেরও মহীয়ান, দেবগণেরও দেবতা, ঈশ্বরেরও মহেশ্বর! এই ক্ষুদ্র প্রাণী কোন সাহসে তোমায় "মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া প্রণতি করিতে পারে? কেবল তুমি "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান" বলিয়াই, ক্ষুদ্র-জীব সেই সাহস পায় নাথ!! ইহাও তোমারই কৃপায় সম্ভব। তোমার করুণা প্রাপ্ত জীবের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক ভাষা কোথায়? তাই শাস্ত্র-বাক্যানুসরণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে আত্ম-নিবেদন করিয়া এই ক্ষুদ্রতার মধ্যে তোমার কল্পনা জনিত-অপরাধ ক্ষমার জন্য বলি "মহেশ্বরায় নমঃ"। যিনি অণু-পরমাণুতে, ঈশ্বরের মধ্যেও মহেশ্বররূপে নিজ গুণে বিরাজমান, সেই সর্ব্ব-বিদ্যমান সর্ব্ব-শক্তিমান নির্গুণ "মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া ঘুশ্মা একটী ত্রিপত্রের উপর সেই মৃণ্ময় লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ, ভয় ভক্তি জড়িত চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

অনন্তর আসনে উপবেশন করিয়া ঘুশ্মার চিত্তবৃত্তি এক মহাভাবে ডুবিয়া

গেল। তখন তাহার মন যেন বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়, স্বীয় স্বাধীনতার সুখকর বিমুক্ত গগন মণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিল। সুশ্মার হৃদয় হইতে একটী তরল মধুর আনন্দময় ভাবস্রোত সমস্ত বিশ্বাভিমুখে ছুটিয়া চলিল—'স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি'—শুভ হউক। সুশ্মার এই শিবময় শিবপূজা চিত্ত-প্রফুল্লতার জন্য নহে, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নহে, শ্রীবৃদ্ধিসাধন সঙ্কল্পেও নহে—কেবলমাত্র নিবেদন জগতের শুভ বিধান কর দেব!—এই মঙ্গলময়, এই শিবময় আনন্দময় জ্যোতি চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহনক্ষত্রে, আকাশে পৃথিবীতে, জীবের প্রতি অঙ্গে ও অঙ্গসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতায়, সুরাসুরে,—খেচরে, ভূচরে, বৃক্ষলতায়, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গে—সর্ব্বত্র, হে দেব তোমার শিবময় আশীর্ব্বাদ ধ্বনিত হউক। তখন যেন সেই ভেদ ভাবের বিচ্ছিন্ন জগৎ একই মহাভাবে, এক প্রাণে, এক সুরে সুর মিলাইয়া একটী তন্ত্রীতে ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল।

অর্ঘ্য স্থাপনের জন্য সুশ্মা তাহার পর আধার-শক্তির স্মরণ করিলেন, ও দেখিলেন এই বিশ্বচরাচর সেই স্নেহময়ী জননীর অঙ্কে বিরাজিত থাকিয়া কত খেলা খেলিতেছে, সুশ্মা গন্ধ পুষ্পদ্বারা সে সর্ব্বাধর মহাশক্তির পূজা করিলেন। শ্রীভগবানের এই আধার-শক্তি একদিন কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া তন্নরূপা-ক্ষিতিকে পূর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলেন সুশ্মা সেই স্বান্তরপ্রবিষ্টাঙ্গ কূর্ম্মরূপী ভাস্বর দেবতাকেও গন্ধ চন্দনদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। এই আধারশক্তিই সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ্ অনন্ত-দেব ; ইনিই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত থাকিয়া, জড় ও চেতনকে এক অভেদ জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া, স্বীয় মায়াময় মহিমা বিস্তার করিয়া বিশাল বিশ্বকে সামান্য সর্ষপবীজের ন্যায় ধারণ করিয়া আছেন। সুশ্মা এই আদি-দেব অনন্ত-পুরুষকেও গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। আমাদিগের মহিধর-স্তনমণ্ডলা, সমুদ্রমেখলা, শ্যামা ধরিত্রী জননী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সেই মহাপুরুষঅঙ্কে বিরাজমানা ; সুশ্মা সেই ধারিত্রী-দেবীকেও কুসুম-চন্দনে অর্চ্চনা করিলেন। এইরূপে সেই মহান আধার-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ সমূহকে অর্চ্চনা করিয়া যেন এক অভেদ জ্ঞানে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বে, বিশ্বাধারে, বিশ্বাতীত ভগবানে ও আমাদিগের আধাররূপিনী পৃথিবীতে অতিশয় ভক্তিমতি হইয়া একটী সামান্যভাব ও একরস অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞান-গঙ্গাবারিবিধৌত বিশুদ্ধ-কোষা সাক্ষাৎ আধার ভূতা ধরিত্রী জননীর অঙ্কে সংস্থাপন পূর্ব্বক "সামান্য অর্ঘ্য" স্থাপন করিলেন গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বিল্বপত্র ও গন্ডহীন ত্রিপত্র দূর্ব্বাদল সেই স্নেহকোষোপম,

কোষার পুরোভাগে সংস্থাপিত হইয়া সাধকের মনও প্রাণকে দেবতার চরণাভিমুখে উন্মুক্ত করিয়া দিল।

যেই দেবতাকে কোনও শক্তিই স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে; যুগ্মা কোন দ্রব্যে তাহাকে স্পর্শ করিবেন? এ জগতের কোন্ দ্রব্য তাঁহার চরণে উপনীত হইতে পারে। আধার-ভূতা পৃথিবী শক্তিরূপিণী পৃথ্বীতত্ত্বের স্থূল পরিনতি; তাই যুগ্মা নির্ম্মল অন্তঃকরণে রসময়ী আপতত্ত্বের দেবীগণকে ভক্তিভরে আহ্বান করিলেন—"এস মা, শঙ্কর মৌলীবিলাসিনী জ্ঞানরূপিনী বিমলা গঙ্গে, বিষ্ণু-পাদপদ্মস্পর্শ-পূতা কাল-প্রবাহিনী কল-নাদিনী যমুনে, এসমা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সার-ভূতা সর্ব্বতাপ সংহারিনী তপঃস্বরূপিনী গোবিন্দবল্লভা গোদাবরি, তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপা পঞ্চতন্ত্রীবাণীরূপিনী ত্রয়ীরূপা সরিদ্বরা সরস্বতি; হে নর্ম্ম-দায়িনী নর্ম্মদে, হে শতদ্রুবিপাশাদি পঞ্চ প্রবাহশালী নদশ্রেষ্ঠ সিন্ধু, হে কাবেরি তোমরাই দেবার্চ্চনের অধিকারী,—তোমরা সকলেই সেই সর্ব্বৈক-সার পরম দেবতার বিভিন্নরূপাত্মক পাদসম্ভূতা হইয়াও তাঁহারই অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্ররূপ অঙ্কে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতেছ। ধরণীর এই ক্ষুদ্র জীব সমূহকে তোমরাই সেই পাদপদ্মে লইয়া যাইতে সমর্থ। তোমরা প্রসন্না হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র কোষাধারে অধিষ্ঠিত হও মা। তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জীবের পূজার অর্ঘ্য পরমদেবতার চরণসমীপে উপগত হইতে পারিবে। তোমাদিগের পুণ্যসলিলে হরি-হর পূর্ণভাবে পূর্ণ-ভাবে বিরাজমান থাকিবার বাসনার প্রবর্ত্তক ও ভগবানের ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত আপতত্ত্বে চরাচর বিশ্বকে পবিত্র করিতেছেন। যুগ্মা সেই দেবীরূপিনী দ্রবময়ী স্রোতগণের পূজা করিয়া ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিলেন ও সেই পবিত্র সলিলের অভ্যুক্ষণে গন্ধ পুষ্পাদি উপকরণ সামগ্রী পবিত্র করিলেন। তখন যুগ্মা গন্ধে, পুষ্পে, ও পূজার সর্ব্বোপকরণে এক পবিত্র দেবভাব দ্যোতিত দেখিতে পাইলেন।

তারপর যুগ্মা ঋষিদিগকে স্মরণ করিলেন। যাঁহাদের তেজ সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধাভিমুখী হইয়া জগতের বদ্ধ-ভাবকে দেবতার দিকে—সেই অনন্ত, পর, পুরুষের দিকে লইয়া যায়, সেই ঋষিদিগকে স্মরণ করিলেন। সুবিনীত কাতর প্রাণে যুগ্মা তখন কূর্ম্মরূপী ভগবানের ভাবে সিদ্ধ মেরুপৃষ্ঠ ঋষি ও কূর্ম্ম দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিলেন—"হে ঋষি! হে দেবতা! আপনাদের প্রসাদে আমি যেন সুললিত সুতলচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হই—আপনাদিগের নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া আসন বন্ধন মন্ত্র অর্থযুক্ত হউক, দেব! যে সুতলে "তুমি আমার ও আমি তোমার"

এই ভেদভাবের মিশামিশি টুকু স্বর্গীয় সঙ্গীতে গীত হইতেছে সেই সাম্যের গীতে আমার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়া দাও, আমার আসন বন্দন স্বার্থক হউক। হে ধরণী দেবি তুমি এই লোক সকল ধারণ করিয়া আছে, সর্ব্ব সংরক্ষক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন; সেই তুমি, আমাকে নিত্যই ধারণ করিয়া থাক, তবে কেন আমার আসন পবিত্র হইবে না?—তবে কেন আমি তোমার ভাবে অনুভাবিত হইয়া তোমার পূত-অঙ্গস্পৃষ্ঠ থাকা প্রযুক্ত, বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও ভেদভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিত হইতে পারিব না?" যুশ্মা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত ভাব অনুভব করতঃ আত্মভাবে তন্ময় হইয়া অবস্থিত হইলেন।

তখন যুশ্মা বামদিকে গুরু পরমগুরু ইত্যাদি আশিষ-পরায়ণ ঋষিমণ্ডলীকে প্রত্যক্ষ করতঃ, বায়ু বিচালিত ব্রততীর ন্যায়, দেবতা ও ঋষিদিগকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণেশ, উর্দ্ধে ব্রহ্ম, নিম্নে অনন্ত, মধ্যে নারায়ণ, বামে গুরু পংক্তি ও সম্মুখে আরাধ্য দেবতা মহাদেব। প্রণতিপরায়ণা যুশ্মা দেবতা দিগকে বন্দনা ও অর্চ্চনা করিতে করিতে আত্মানন্দে পরিপূর্ণা হইয়া সমগ্র বাহ্য জগৎ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

যুশ্মার বহির্জ্জগতের স্থূল অনুপরমানু সমূহ দেব-ভাবে দ্যোতিত হইয়া উঠিল; যুশ্মার সর্ব্বত্রই দেবতা। তখন বিশ্বের অধিপতি বিষ্ণুকে, সর্ব্ব-সম্প্রদানের এক মাত্র সিদ্ধিদাতা নারায়ণকে, ও সাক্ষাৎ দেবতারূপে বিরাজমান গন্ধ পুষ্পাদি উপ-করণ সমূহকে অর্চ্চনা ও বন্দনা করিলেন। সেই গন্ধ পুষ্পাদিকে সাক্ষাৎ দেবতা বুদ্ধিতে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন—"হে দেব এই অবলার প্রতি সদয় হও; আমার এই ইষ্ট পূজা ভেদভাব পরিরহিত হইয়া একত্বে পরিস্থাপিত হউক।

(ক্রমশঃ)

দিশেহারা।

শর্ম্মার পত্র।

তৃতীয় সংখ্যা।

মহাশয়, কথাটা লিখিতে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আপনার পন্থায়ও এত গোলালোক চলে? হয়ত তাঁরা আবার বলবেন 'গোলা' মানে কি? উত্তর— গোলা মানে কামানের গোলা নয়—নিরেট মূর্খ, যা'দের মস্তিষ্কে উচুনীচু নাই একদম পালিস। যাক কথাটা হচ্ছে এই যে গত বারে বলা হয়েছিল "ভূত-ভাবোদ্ভবকর বিসর্গ কর্ম্ম"। মহাশয়, আমার কাছে ডাক টিকেট পোরা গাদা-গাদা চিঠি এসে হাজির! তারা ব'লছেন কি,—"ওটা গীতার শ্রীকৃষ্ণের কথা, ওটা বড় আমির কথা কি ক'রে হল?" জনে জনের কাছে পত্র না লিখে, আপনাকেই লিখছি, আপনি পন্থায় ছাপাইয়া দিলেই আমার বে খরচায় অনেক লাভ হবে, পন্থারও একটা প্রবন্ধ হয়ে যাবে। ওটা যেন গীতার কথা হ'ল। বলি কাহারও কি কোন দিন নিজের 'ছোট আমিটীর' সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে? 'বড় আমি' দূরে থাকুক্। আর কৃষ্ণ যদি জীবের 'বড আমি' হ'য়ে দাঁড়ান তাতে কাহারও আপত্তি আছে কি? যাক যদি নিজের 'আমির' দেখা পেয়ে থাক বাপু, তার পর না হয় যা মনে আসে তা' বলিও। যদি নিজের আমিটীকে দেখতে কারো সাধ থাকে, তবে একবার সদানন্দদায়িনীর পায়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ক'রো যে "মা আমার আমিটীকে একটু চিনিয়ে দেমা।" তিনি যদি দয়া করে বিদ্যাভাবে একটু থেলেন, তা'হলেই দেখতে পাবে 'আমি কে?' 'গুরু কে?' 'কৃষ্ণ কে?' এখন যতই গুরু গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর, ও সব ময়না টিয়ার মুখস্থ বুলি।

এখন আমার নিজের কথা বলি। আমি যেমন চিরকালই মরি কিন্তু কোন কালেও আসলে মরি না—আমি আমিই থেকে যাই—কেবল 'ইচ্ছা-আমি' ঠাকুরাণীর খেলার দায়ে মরা-বাঁচার ঢং করা তা' কচ্ছি, ও' বেস মজার খেলা। এই খেলার মধ্যে বারে বারে আমি যা সেজে গুজে আসছি, তার কথাই বলা হচ্ছে—আসলে আমি যা' তার কথা কিছুই নয়।

আমার 'ইচ্ছা' আমি-বল্লেন—তুমি একটা কিছু হও;

আমি বল্লেম 'কি হব?

তিনি। হও একটা ভ্যাডা! আমি অমনি ভ্যাড়া হয়ে চেঁচাতে লাগলুম

তিনি খানিক মজা করে বল্লেন 'দেখলে কেমন খেলা!' আমি যাই বল্লুম 'তাইত' অমনি ঐ 'ভ্যাড়া-আমি' মরে গেলুম। এই রকম তিনি আমাকে এক একটা কিছু হ'তে বলেন আমিও একটা কিছু হই। আসলে কিন্তু হওয়া হয়ি কিছু নয়। সবই খেলার খাতিরে একটা ধরেনেওয়া। যেমন মহাশয় হয়ত শুনে থাকবেন একটা সিংহের বাচ্ছা ধরে নিয়েছিল যে সে ভ্যাড়া; তাই সে তার সঙ্গী ভ্যাড়া গুলির মত ঘাস পাতা খেত, আর খোঁয়াড়ে যেয়ে শু'ত, নেকড়ে দেখে ল্যাজ গুটিয়ে ভয়ে পালাত। একদিন একটা সত্যিকার সিংহ ভ্যাড়ার পালে পড়ে দেখল 'বাঃ এ যে আমার স্বজাতি!' তাই সে দয়া করেই অবশ্য সকল ভ্যাড়া ছেড়ে ঐ সিংহ-ভ্যাড়াটাকে ধরলে, তখন তার কান্না কে দ্যাখে। অনেক কাকুতি মিনতি করে হাতে পায়ে ধরে সে সিংহকে বল্লে, মহাশয় আমাকে মেরে ফেল্‌বেন না। সিংহ বল্লে 'ওরে বাপু তুইত ভ্যাড়া ন'স্ তুই যে আমার জাত ভাই, সিংহ!' এই বলে ওকে নানা প্রকারে বুঝায়ে সুঝায়ে সাব্যস্ত করালে যে ও ভ্যাড়া নয় সিংহ। তখন ওই সিংহের বাচ্ছার "এই ধরে নেওয়াটা" অর্থাৎ ভেড়ারোগটা ছেরে গেল। তখন সে কি হ'ল? বলতে পারেন! মূলে কিন্তু সে কিছুই হল না; যা ছিল তাই রইল, কেবল ওই 'ধরে নেওয়াটা' ছেড়ে গেল। আর ধাড়ী সিংহ আর বাচ্ছা সিংহ একই সিংহ বটে, কিন্তু ধাড়ীটা যা তাই আছে। সে কিছুই ধরে নেয় নাই। এই যা' তফাৎ।

কথা হচ্ছে এই "ধরে নেওয়াটা", কিছু কালের জন্য ছেড়ে থাকতে পারলে আসল আমিটার কিছু আভাস পেলেও পাওয়া যেতে পারে। আর যা কিছু 'ধরে নেওয়া' সেই গুলিই ঐ "ঘোড়ার ডিম" জাতীয়। যেমন ঘোড়াও আছে, ডিমও আছে; এই 'ধরে নেও' ঘোড়ারই ডিম হল। আমি-আমিও ইচ্ছা-আমি ঠাকুরাণীর খেলার খাতিরে 'ধরে নিয়েছি' যে আমি কিছু একটা 'ঘোড়ার ডিম' কি "শিবাশৃঙ্গ" গোছ একটা কিছু হয়েছি। তাই তিনি বলে দিয়েছেন "আচ্ছা এবার খেল দেখি,—এই তুমি জন্মালে, এই তুমি মরলে, এই তোমাকে বাঁধলুম, এবার তুমি ছাড়াও দেখি।" আর আমিও ঠিক জন্মাচ্ছি, মরছি, আর বাঁধন খোলার জন্য নানা কায়দা, কুস্তি, কস্‌রৎ কচ্ছি। আসল কথাটা হল এই। মহাশয়, সকলকে এটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন; তাঁহারা যেন আমাকে বারে বারে চিঠি পত্র লিখে বিরক্ত না করেন।

আমার আসল কথাটি যেন মনে থাকে মহাশয় যে "আমার আমি বদলান চাই" সেই জন্যই কিন্তু আমার আমির সব মজাদারী কাহিনী আপনাকে

বলা হচ্ছে। আমার আমিটা যে মাঝে মাঝে বদলে যায়, তা আগেই বলেছি তবু দুঃখ এই যে "হয় যদি, তা'ও খানিক থাকে, আবার কেন রয় না?"—

যাক্, আমিত মরিলাম। আসলে কিন্তু মরিলাম না। পোষাকটা বদলায়ে এলাম মাত্র। এবার আমার চালচলন খুব গম্ভীর হল। গম্ভীর মেজাজ, আমি একটা কেউ কেটা নই। ভিতরের কথা আমার বাঁধন ছাড়ান চাই। কর্ম্ম করা চাই। অমনি সেই কথাটা কে যেন প্রাণের ভিতর থেকে টুক্ ক'রে বলে দিল—'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ" আমি ভাবতে বসে গেলুম ব্যাপারটা কি? বিসর্গের রকমটা কেমন? ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গই বা কেমন? দেখা যাক। এটার একটা হেস্ত নেস্ত না করে কিছুই করা হচ্ছে না। আসল কিন্তু হচ্ছে, সেই বড় আমিটাকে ধরা। এই কর্ম্মের বাঁধনে আটকে গিয়েইত, সেটাকে ধরতে পারছি না! কাজেই বিচার করে, বিবেচনা করে কাজ করতে হচ্ছে। ব্যাকরণে অনুস্বার বিসর্গের কথা আছে। তা কেমন?—

তিনি বলেছেন বিসর্গই হ'ল কর্ম্ম। তা॰ ব্যাকণের বিসর্গও'ত বিসর্গ বটে। বিসর্গ মানে হচ্ছে যা ত্যাগ করা যায়, যেটা আত্মসাৎ হয় না, তাই, এই হিসাবে মল মূত্রাদিও ত বিসর্গ! মানুষের অনেক অনুস্বার বিসর্গ আছে। দাদা রাম প্রসাদ "বিষয় বিসর্গের" কথা বলেছিলেন। অনুস্বারটা তানপুরার হঠাৎ-ছেড়া তারের মত অং—॰—ং করে অনেক দূর পর্য্যন্ত ব'য়ে গিয়ে শেষে কোথায় যেন মিলে উ'পে যায়। আর বিসর্গটা অঃ করে থেমে পড়ে। কাজেই ব্যাকরণের বিসর্গই বিসর্গ। তবে সকল বিসর্গই কি কর্ম্ম? হুঁ—খানিক খানিকটা তা' বটেইত। তবে কিনা তিনি "ভূত ভাবের উদ্ভবকর" বিসর্গের কথাই বলেছিলেন। বিসর্গ জেতের স্বভাবই,—ও ব্যাটা পেছনেরটার সঙ্গে লিপ্টে থাকে। যেটা হয়ে গেছে, তার সঙ্গে জুড়ে থাকাই যেন এই জাতের ধারা। কর্ম্মও তাই। যা' হয়ে গেছে সেই সবটাই ফের জাগিয়ে দেয়। If always refers to the past of a man not to the future * ফল কথা আগে যাহা কিছু আহার বা আহরণ করা হয়েছে তাহার যে টুকু হজম বা আত্মসাৎ হয় নাই সেই টুকুই হ'ল বিসর্গ। অনাস্তিকে বলে রাখি যে আজকালকার

* এই ইংবাজি টুকু মৎকর্ত্তৃক লিখিত। বলা বাহুল্য যে অপিদাদের "শর্ম্মা" নিদান সহিত পণ্ডিত। তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমি তাঁহার অনাহারী লিখক নিযুক্ত আছি। আমার নাম 'চিন্তামণি চমৎকার' সঙ্ক্ষেপে ইংরাজি ধরণে লিখি—চি, ম, চ।

অনুলেরোগী আপিসের চাকুরে বাবুদের সবটাই বিসর্গ। অনুস্বার হবার মত তাঁ'দের কিছুই নাই।

একটা ছোট কথায় ভেবে দেখা যাক—চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, কামড়ানাদি পঞ্চরসের দ্রব্য আহার করা গেল। তারপর সবগুলি পাকস্থলিতে গিয়ে বায়ু দেবতার সাহায্যে ও জলদেবতার অনুগ্রহে বেশ একটা পিণ্ডি চটকে নিলে; সেখানেত নাছোড়বান্দা বৈশ্বানর (বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি) মহাশয় বসেই আছেন। তিনি এ'কে নিয়ে পোড়াতে লাগলেন। পুড়ে ঝুড়ে যে টুকু ছাইপাশ রৈল, সেই টুকু হ'ল প্রথম মল। বাকী যা রৈল, কবিরাজ মহাশয়রা তা'কে বলেন 'রস'। একেবারে 'আমি' না হওয়া পর্য্যন্ত বৈশ্বানর মহাশয়ের কাছে ছাড়াছাড়ি নাই; তিনি ঐ 'রস'কে আবার পাক করতে লাগলেন। ইহাকে যদি chemical process বলতে ইচ্ছা করেন তাও বলতে পারেন। এই রকম বৈশ্বানরের বারংবার পাকে রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে হাড়, হাড় থেকে মজ্জা, মজ্জা থেকে যখন রেত হল তখনও পাকের একেবারে বিরাম নাই। রেতের মধ্যে পাকের কৌশলে এটা শেষ শক্তি (abstruct power) হল, কি না বীর্য্য। সেই বীর্য্য বা শক্তি যা হল উহা রেতঃ নয়। সেই জিনিসটা খানিকটা শর্ম্মার ইচ্ছা-আমি'র মত। তবে বীর্য্য হওয়া পর্য্যন্ত রস, রক্ত, মাংস ইত্যাদি যা কিছু হ'ল সবগুলিই কিন্তু আগেরটা পরেরটার বিসর্গ বা ছোট্ট করে বলতে গেল 'মল'। ওঃ এতক্ষণে বুঝা গেল আমাদের দেহটাকে কেন মল দেহ বলা হয়?

আচ্ছা যদি আমরা যা কিছু আহার করি সবটাই একদম বীর্য্য হয়ে যায় তবে কেমন হয় বল দেখি? মনে মনে এই প্রশ্নটা হ'ল। প্রথম'ত ভাবলাম বেশ'ত মস্ত পালোয়ান হব। রামমূর্ত্তি, কৃষ্ণমূর্ত্তি, কোথায় লাগে? কিন্তু একটু ভাবতেই মনে হল বাবা সবটাই বীর্য্য হলে, আর এই শরীরটা থাকে কোথায়? এ'ত থাকতে পারে না। তখন আর পালোয়ান হয় কে? যা'ক বিসর্গও যে দেখছি একটা, দুটা নয়! তা'ত অনেক! যে দিকে তাকান যায় কেবলই বিসর্গের মেলা। তবে সবগুলি বিসর্গকে টেনে এনে গোটা তিনেক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন একটা হ'ল দ্রব্য-বিসর্গের, আর একটা হল ক্রিয়া বিসর্গের আর একটা হল ভাব-বিসর্গের শ্রেণী। বিসর্গ'ত চিরকালই বিসর্গ। বিসর্গ জাতির স্বভাব এই যে সে কাহাকেও আশ্রয় না করে থাকতে'ত পারেই না; আর যা'কে আশ্রয় করে তারও খানিকটা ভাগ নেয়।

তাই বিসর্গ যখন অনুস্বারের ভাগনেয় (অবশ্য অনুস্বারের ভাগ নেওয়াটা অন্ত শক্তি বা প্রকাশ মাত্রা কিছুর যোগ না হলে বুঝা যায় না, তবুও) তখন সদ্যজাত শিশুর (ঃ ঃ) 'ঙা' 'ঙা'রমত বা বেশী স্পষ্ট করে বলতে গেলে আমার সদানন্দময়ী জননীর 'উমা' নামটীর মত হয়ে পড়ে। আপনারা হয়'ত উহাকে প্রণবধ্বনি বা যা কিছু বলতে পারেন। আবার উল্‌টা করে যখন বিসর্গের পেছনে অনুস্বার লাগেন তখন কিন্তু বিসর্গ ভারি জব্দ, টঙ্কারের চোটেই, তিনি কোথায় মিশে যান। আপনারা হয়ত তাকে (ঃং) 'অহং' বলতে পারেন। আমি কিন্তু এ'কে ধনু থেকে বাণ ছুটে যাওয়ার বা বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দের মত, এই ছিল আর কোথায় মিলিয়ে গেল, তেমনই দেখি। মোট কথা বিসর্গ হচ্ছেন, আমার সেই গোড়ায় বলা 'ইচ্ছা'-ঠাকুরাণীর মত ; তিনি যখন সামনে এসে বসেন তখন কত কি বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি করতে থাকেন তার আর লেখা জোঁকা নাই ; আর যাই ফিরে বসলেন অমনি কোথায় যে ফুস্‌ করে মিলিয়ে গেলেন তার কেউ পাত্তাই পায় না।

তা' যা'ই হক কেবল বিসর্গ নিয়ে থাকলেই চলছে না। কর্ম্ম চাই কর্ম্মটা বিসর্গ বটে, তবে যে সে বিসর্গই কর্ম্ম নয়। ভূতের যে ভাব তা' ভূতভাব তার উৎ+ভব+কর ;—বিসর্গই হল কর্ম্ম। অর্থাৎ যে ভূতভাবের উদ্ভব করে বা ভূতের ভাবটাকে উস্কে দেয়—মানে ভূতের ভাবের মধ্যেও যে ভূত নয়, অথচ তাহা অপেক্ষা কিছু "উৎ" (উছলে-থাকা কিছু) তাই দেখা'য়ে দেয় তেমন যে বিসর্গ বা বিশেষ সৃজন তাই হ'ল কর্ম্ম। বিসর্গ'ত বোঝা গেল। এখন 'ভূত-ভাবোদ্ভবকরের' রকমটা কি, দেখতে হচ্ছে। বাবা, ভূতের ভাবটা কি? ভূত কি? এক'ত জানি মানুষ মরেই ভূত হয়। তার আর ভাব কি? কেন, তা'র ভাব, "কলা পোড়া খাওয়া।" মানুষ মরে যখন ভূত হয়, তখন কলা পোড়ায়ে পিণ্ডি দিতে হয়—!! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা শুনুন।—না বলে দিলে ত আর বুঝবেন না। 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং"— মানুষ মরে গেলে ও যেমন ভূত হয়, সময় চলে গেলেও তেমন ভূত হয়। মহাশয় মনে রাখবেন সবই ধরেনেওয়া কথা, কারণ মরা কথাটা শর্ম্মার অভিধানে নাই। শর্ম্মা 'মরণ কি?' জানেন না। তিনি মরণ মানেনও না। আর সময় অর্থাৎ কাল কখনও যায় না সে যেমন তেমনই আছে তবে জীবের "আমির" সঙ্গে যে টুকু মিশ খায় অর্থাৎ সমান সমান চলে (সমম এতি) তাকেই সময় বলা হয়। কাযেই এ গুলি কথার কথা।' যা'ক, মানুষ

মরেই হ'ক, কি সময় চলে গিয়েই হ'ক, ভূত হলেও তার কতকগুলি কলা থেকে যায়, যেমন 'আমি অমুক চন্দ্র অমুক'—আমার বিদ্যা, আমার ধন, আমার যশ, আমার ধর্ম্ম ইত্যাদি অনেক আমার আমারই হচ্ছে মানুষভূতের কলা—দ্বাদশ-কলাত্মক সোম মূর্ত্তি। আর সময়েরও দিন, মাস, বার মাসে বর্ষ, যুগ আর ছোটর দিকে প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপলাদি কলা। কলা মানে শাস্ত্র-কর্ত্তারা বলছেন অংশ। এই কলাগুলি পোড়ায়ে না খেলে, ষোলআনা হজম না করলে ভূতের উদ্ধার হয় না, ভূত ভূতই থেকে যায়। ভূতের এই কলা-ভাবও থেকে যায়, কাযেই এই কলাভাবের সঙ্গে বিসর্গের যোগ হয়ে অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ম্ম, আমার দেহ, আমার ধন প্রভৃতি আমার আমার গুলি উৎলে উঠে, তখন আর কার বাবার সাধ্য যে চুপ করে থাকে। এই—শর্ম্মা—অচলপ্রতিষ্ঠ শর্ম্মাও সেই বিসর্গের ঠেলায় পিড়িং পিড়িং করে নাচতে থাকেন। শুনেননি কি, মায়া আগুনে যখন জনক রাজার বাড়ীটা জলে যাচ্ছিল তখন আজন্ম বৈরাগী শুকদেব ঠাকুর একখানা কৌপীন-বিসর্গের জন্য কতটা ছুটাছুটি কচ্ছিলেন। বিসর্গটা আমার নকল আমির গলাগলি ধরে বড় ভাব ক'রে বসে আছেন। কিন্তু খাঁটি আমির সঙ্গে তার দেখা শুনা খুব কম। খাঁটি আমিটা অনুস্বার ধাতের পদার্থ কিনা তার সঙ্গে যেয়ে মিশতে পারে না. দূরে থেকে খেঁকিকুকুরের মত খুব আস্ফালন করে থাকে। একবার তার সঙ্গে দেখা হলেই "বিসর্গের গোষ্ঠীশুদ্ধ ধূম্রলোচনকে অম্বিকার মত "হুঙ্কারেনৈব তং ভস্ম" করে ছেড়ে দেয়। সেখানে আর বড় ট্যাঁ পোঁ করতে হয় না। একবারে পুরোদমে 'আমি' হয়ে বসলে, এই ক্ষুদে আমিগুলি বিসর্গ হয়ে পড়ে, তখন সেই বড় আমিটা—ওই যে বড় ডলটা সেটা হয় এর অনুস্বার আর এক ঠেলায় কোথায় নিয়ে যায়, বাবা সব ভোঁ ভাঁ বস্।

তবে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিসর্গ ছাড়ানটাই হচ্ছে প্রধান কর্ম্ম। কলামাখান পিণ্ডি দু'টাই যত বাঁধনের গোড়া। এই দুটাকেই —হয় একদম হজম করতে হচ্ছে, নয় 'গঙ্গা, গঙ্গা, গদাধর' ব'লে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করতে হচ্ছে; তা না হলে ত বাঁধ ছুটছে না!! এখন কি ক'রে ঐ পিণ্ডি দুটো হজম করি? কুস্তি কসরৎ করতে আরম্ভ করলেম। কত নাক টিপে, মুখ টিপে, আসন ক'রে, মুদ্রা করে, কত ছাই ভস্ম করে—কত কি করতে লাগলেম? কই আমার বাঁধন ত ছুটল না—ঐ আবার সেই কাল সাপ!! আমাকে গিলে ফেল্লে!' হায় আমি এবারও মরলাম! (ক্রমশঃ) শ্রীশর্ম্মা—

রমানাথের সরস্বতী পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভোলা। কারণ এমন বেশী কিছুই নয়। রমানাথ যে বেশী লেখা পড়া জানে না তা'ত জানেনই। হরি ভায়া কলিকাতায় শুনে এসেছে মন্ত্রবাক্য গুলির যথার্থ উচ্চারণ না হলে নাকি দেবতার উদ্বোধনই হয় না, সে মন্ত্র দেবতাব কাছে পর্য্যন্ত পহুছায় না, তাই সে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাব্যতীর্থ মহাশয়কে দিয়ে পূজা করাবেন।

বিদ্যা। মহাভারত। মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চাবণের একটা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু কেবল মন্ত্রোচ্চারণেই যদি কায হ'ত তা' হ'লে ছাপার বই দেখে ত' সকলেই মস্ত পূজক হ'তে পারত। তা হলে আর নিষ্ঠাচারী, ভক্তি-মান্, কর্ম্মপটু ব্রাহ্মণের কোনও আবশ্যকই হইত না।

ভোলা। অনেকেই ত' দরকার মনে করে না।

বিদ্যা। থাক সে কথা। তবে তুমি বমানাথকে আমার বাড়ীতে পাঠাবে, অবশ্য পাঠাবে। আমার একটা পণ্ডিত খ্যাতি থাকলেও তা'র মত লোককে মূর্খ বলিয়া দেবার্চ্চনের অযোগ্য মনে করিবাব ধৃষ্টতা আমি পোষণ কবি না। আমার দেবতাব য'দ শ্রবণশক্তি থাকে, আর যদি সে সত্যিকার দেবতা হয়, তাহা হইলে সে ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন মূর্খ ভক্তের ডাক শুনিতে পাবে। ভক্তি দিয়েই হ'ল দেবার্চ্চন—শাস্ত্রে বলেছে—

পিতরো বাক্যমিচ্ছন্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতা।

তা ভাই, আমি নিজেই রমানাথকে বলে যাই, কি বল।

ভোলা। তা, আপনি না গেলেও চলবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ আজ বড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে হয় ত কাতর প্রাণে ঘরে বসে দেবতাকে ডাকৃছে। এই মাত্র সংবাদ পেলেম সে সন্ধ্যার পরেই ঘরে ঢুকে দ্বার বন্ধ করেছে; রাত্রের মধ্যে কাহাকেও ডাকতে নিষেধ করে দিয়েছে।

বিদ্যা। তা হ'লে তা'কে ডেকে বিরক্ত না করাই ভাল। ভাই দেখতে পাচ্ছ, মায়ের আদরের শিক্ষার চেয়ে ঠ্যাঙ্গার গুতোয় শিক্ষাটা কেমন!! তা, তুমি ভুগে ভুগে শিখেছ, অনেকটা বুঝবে বলেই বল্লুম।

ভোলা। হাঁ দাদামহাশয়! তবে আগে ঠ্যাঙ্গাটাই দেখে ফেলি, হাতটা চ'খে পরলেই সব মিষ্টি হয়ে যায়! তবে যখন ঠ্যাঙ্গা দেখা দিয়েছে গোড়ায় হাত নিশ্চয়ই আছে কি বলেন "পর্ব্বতো বহ্নিমাণ্ ধূমাৎ।"

বিপ্ৰ। অতি সহজ ও সত্য!! ভাই রাত হয়েছে এখন বিদায় হই!

ভোলা। তবে প্রণাম করি দাদা মহাশয়।

বিপ্ৰ। ভগবানে তোমার মতি থাকুক। আর কি আশীর্ব্বাদ করব ভাই!

* * * *

যামঘোষ জীবগণ যখন বাসন্তী ত্রিযামার শেষ যামার্দ্ধের অবসান ঘোষণা করিয়া নীরব হইতেছিল, পূর্ব্বগগন যখন অরুণের নবানুরাগদীপ্ত আলিঙ্গনাশায় একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল, শুকতারা যখন নবীনা উষায় অধরপুট হাস্য বিস্ফারিত দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পূর্ব্ব গগনাভিমুখে শান্ত স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল প্রায় সেই সময়ে, প্রাকৃতিক প্রকাশের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, * * পুর গ্রামের বিজন মাঠের পরপার হইতে এক অভিনব মধুর সঙ্গীত প্রাতঃসমীরে ভাসিয়া আসিতেছিল। চির-জাগরিতা প্রকৃতি ব্যতিরেকে তাহার অপর কোনও শ্রোতা নিকটে দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল না। যাঁহার উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীত ধারা সংসারের একটি মানব কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল তাঁহার সর্ব্বগ্রাহী শ্রবণ বিবরে পৌছিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা এত মধুর বোধ হইতেছিল। আর যাঁহার কণ্ঠ হইতে ঐ সঙ্গীত লহরী ধ্বনিত হইতেছিল, তিনি সেই সঙ্গীত ধারার চরম বিরাম স্থলে বিরাজ করিতেছিলেন, কি উহাতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাসাইয়া দিয়া সেই চরম বিরামের দিকে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাহা এক মাত্র তাঁহারই বিদিত। সেই সঙ্গীতের 'রেশ' প্রাণে বাজিয়া ছিল বলিয়াই, বোধ হয় আমাদের ভোলাদাদা আজ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া অরুণোদয়ের পুরগামী তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে সকলের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। বনরাজি-বিতম্বত গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া প্রান্তর সীমায় উপনীত হইয়াই অদূরবর্ত্তী মনুষ্য মূর্ত্তি দর্শনে ও তাহার সঙ্গীত রবে তাঁহার পরিচিত গায়ককে চিনিতে পারিলেন ও খানিক কৌতূহল পরবশতা প্রযুক্ত, খানিক গায়কের সঙ্গীতে বাধা প্রদানে অনিচ্ছা বশতঃ, সেই অনিবিড় অন্ধকারের সাহায্যে গুল্মান্তরালে গা'ঢাকা হইয়া দাঁড়াইলেন ও আপন মনে গদগদ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহম্ বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

ভোলানাথ যাঁহার বেদগান শ্রবণে মুগ্ধপ্রায় হইয়া ছিলেন, তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রমানাথ ভট্টাচার্য্য। ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব দিবস গৃহে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছিলেন। তাহার মত মর্ম্মাহতের পক্ষে রজনীতে নিদ্রাগত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই, বোধ হয় রজনীর শেষ যামার্দ্ধে গৃহ-ত্যাগ পূর্ব্বক যথারীতি গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি যে স্তব স্তোত্রাদি আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া ভোলানাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলেন। ভোলানাথ যখন গুল্মান্তরালে থাকিয়া উঁহার বেদগান শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন তিনি তাহার স্বভাবসুলভ মধুরস্বরে ভাব-বিহ্বল হৃদয়ে মধুসঙ্গীত গাহিতেছিলেন। আজ কি-জানি-কেন এই মধুসঙ্গীত তাঁহার বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল, মধুসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁহার নিকট মধুময় হইয়া উঠিয়া মধুসঙ্গীতকে জীবন্ত ও জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। এই বাসন্তী মারুত প্রবাহ, জাহ্নবীর লহরী লীলা, সুনীল গগন, জ্যোতিকিরিটিনী উষার উজ্জ্বলছটা ও ভূত ধাত্রীর পূত পরিমল যেন তাহার সহিত সমতান-ঝঙ্কারে গাহিতে ছিল—

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মধুনক্ত মুতোষ যো।
ওঁ মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নঃ বনস্পতি মধুমাং অস্তু সূর্য্যো॥
ওঁ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মাধ্বির্গাব ভবন্তু নঃ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

তাঁহার সেই দেহ-প্রাণ-মন-চিত্তাকর্ষিণী প্রণবরাগিণী যেন ব্যক্ত বিশ্বের স্তর সমূহ কি এক অভিনব সন্ধানে গলাইয়া গলাইয়া দ্রব করিয়া, কোথায় কোন অবাঙ্মনসগম্য সর্ব্বরসময় পরম আধারলক্ষ্যে ধাবিত হইয়া যেন কোন এক চিরমধুর 'অস্তু' অভিমুখে মিলিয়া যাইতেছিল, সেই তানে উজ্জীবিত উদাত্ত রাগে সে বারংবার সেই একই গীতি বহুভাবে গাহিয়াও যেন তাঁহার দেহ প্রাণ মন তৃপ্ত হইতেছিল না, তাই গাহিতেছিলেন—

সমীরণ মধুময় মধু ঢালে সিন্ধুচয়,
মধুময় তৃণ লতা বনস্পতি দল
মধুময় মধুনিশা মধুর হাসিছে ঊষা
মধুময় রজযুতা ধরণী শ্যামল॥

মধুময় নভতল　　মধুমান অন্তস্থল,
দেবলোকে পিতৃলোকে মধুস্রোত বয়,
মধুরসে দীপ্ত রবি　　মধুরসে সিক্ত গবি,
মাধুর্য্য আপ্লুত সবই সব মধুময়॥

নবরবি কিরনচুম্বিতা দীপ্তিময়ী প্রকৃতির শ্যামাঙ্গে হরিৎ-হিরণের মিশামিশি ক্ষেত্রে জীবকুল জাগিয়া যখন স্বজাতীয় কলরবে দিগঙ্গন মুখরিত করত প্রকৃতির চরণ বন্দনা করিতেছিল, সেই সময়ে মধুসঙ্গীত রব পুলকিত-প্রাণ রমানাথ ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়াই ভোলানাথকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, রমানাথের যেন বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ভোলানাথ দাদা এ দিকে যে?"

ভোলা। তোমার বেদগান শুনে এদিকে এলুম; তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। বেলা হয়ে এল মায়ের পূজা করিতে যাবে না?

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল—'মা কি মূর্ত্তিমতি হয়ে আর আমার পূজা গ্রহণ করিবে, ভোলাদাদা! কিন্তু যতক্ষণ দেহে প্রাণ, মন, আছে তত-ক্ষণ যে মাকে না ভেবে পারি না। ও, যেন কেমন করে আমার প্রাণের আড়ালে উড়ে' এসে সব জুড়ে বসে। ওর ভাবনাত' ছাড়াতে পাচ্ছি না, মা'র আদেশ'ত পালন হ'ল না!—বল ভোলাদাদা, না হয় মিথ্যে করে বল যে হরিহরের কণ্ঠে বসে মা আমার মন বুঝেছেন ওটা মায়ের আদেশ নয়!!—বলিতে বলিতে আবার রোদন করিতে লাগিল—

ভোলা। ওরে তা' আমার মিথ্যা করে বলতে হবে কেন? সত্যি করেই বলছি মা যেমন হরিহরের কথায় তোমাকে নিষেধ করেছেন আবার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কথায় বড় আদর করে ডেকে গিয়াছেন—

রমা। বল কি দাদা, মা আমায় ডেকেছেন—এঁ্যা এঁ্যা।

বলিতে বলিতে যেন কোথায় কোন অলক্ষিত প্রদেশে তাহার প্রাণ, মন, ছুটিয়া যাইতেছিল, দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

ভোলা। ওরে ওটা ওর জেতের ধারা; তা জানিস ত, ওরা কোলে নেবার জন্য ছল করে ছেলে কাঁদায় রে ভাই। চল—শীগ্‌গির করে। এই বলিয়া পথে যাইতে যাইতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আগমন ও অভিপ্রায় এবং উঁহাকে রাত্রে না ডাকার কারণ সমুদয়ই বলা হইল। পরে বলিলেন—

তোমার নিত্যকার্য্য সমাধান করিয়া সত্বর এস। তোমাকে লইয়া আমাকেই বিদ্যাভূষণ দাদার বাড়ী যাওয়ার কথা।' এই বলিতে বলিতে উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্য পথে গমন করিল।

* * * *

সংস্কার বশে রমানাথ তাহার নিত্য কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহাভিমুখে গমন করিল। সে পথ চলে, ভোলানাথ তাহার সঙ্গী। ভোলানাথের, কি জগতের, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন সে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। তাহার পা চলিতেছে কিন্তু সে চলিতেছে কিনা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার শারিরীক ক্রিয়া সকলই হইয়া যাইতেছে. কিন্তু তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না; সবই যেন কি-ও-কেমন? বাহ্য-জ্ঞান-বিস্মৃত রমানাথ ভোলানাথের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে আগমন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইল। কাহারও সহিত কোনও বাক্যালাপ না করিয়া যথাশাস্ত্র আচমনাদি করিয়া পূজা আরম্ভ করিল। পূজা মণ্ডপে বেদীর উপর দেবী মূর্ত্তি, সম্মুখে পূজক ও তন্ত্র-ধারক দক্ষিণে ও বামে উপচাররাশি; ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনাদির গন্ধে পূজামণ্ডপ আমোদিত একদিকে জাহ্নবীসলিলস্নাত শুদ্ধবাসপরিহিত পূতচিত্ত ছাত্রমণ্ডলী অপরদিকে আমন্ত্রিত বান্ধবগণ উপবেশন করিয়াছেন।

পুরমহিলাগণের হুলুধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার, পূজক ও ঋত্বিকছাত্রগণের ঐক্যতান স্বস্তিবাচন মন্ত্র একত্র মিলিত হইয়া শব্দ, রূপ, গন্ধাদির সহিত মননের মিলনে সকলেই কি এক মহান আনন্দময় সত্বা উপলব্ধি করিতে লাগিল। মৃগমদ সৌরভের ন্যায় উহার অনুভূতির আনন্দ আছে কিন্তু উৎপত্তির স্থানানুসন্ধান-পরায়ণ কৃষ্ণসারের ন্যায় কাহাকেও বিচলিত করিতেছে না, বরং সকলকেই শ্রীশৈলকাননজাত চন্দন তরুর ন্যায় একই সৌরভে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার উন্মাদনা আছে, কিন্তু উদ্বেগ নাই; অনুভূতি আছে, বিক্ষেপ নাই; একাগ্রতা আছে, ব্যগ্রতা নাই। অনুসন্ধান আছে অনুশোচনা নাই। সকলেই যখন এই আদ্যন্তমধ্যহীন বিমল আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির হইয়াছিল, তখন হরিহর ও কাব্যতীর্থ মহাশয়ও সে স্থানে আগমন করিলেন; কারণ তখন হরিহরের বাড়ীর পূজা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা পূজা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই, সমুদ্রাভিস্নাত সরিৎ যুগলের ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে সেই আনন্দাম্বুরাশিতে মিলিয়া গেল। ফল কথা সেই কি-জানি-কেমন অননুভূতপূর্ব্ব ভাব সমাবেশে সকলেই মিলিতে পারে, মিশিতে

পারে, কাহারও কোন ও দ্বিধা রাখিতে পারে না। তাহার মধ্যে ক্রিয়া আছে, অনুষ্ঠান আছে, মন্ত্রের উচ্চারণ আছে, পুষ্পাক্ষতাদির বিকীরণ আছে; কিন্তু ভেদ নাই, ছেদ নাই। তাই তন্ত্র ধারক বিদ্যাভূষণ মহাশয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, পূজক রমানাথ তাহা পাঠ করিতেছেন সত্য। তবু যেন কেমন উভয়ই এক হইয়া গিয়াছে। একই গ্রন্থীতে বাঁধা সূতার দুইটী অগ্রের মত ভিন্নও, একত্র।

জল-শুদ্ধি করিতে করিতে যেমন রমানাথের তেমন সমাগত সকলেরই নয়ন যুগল যে কেমন করিয়া কেন অশ্রু পরিপ্লুত হইয়া আসিল, কেহই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না, ও কি হইল তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। আসন শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কি জান কি অনুভব করিল; কিন্তু তাহার বহির্বিকাশ এই মাত্র দেখা গেল, যেন সকলের দেহ একটী দেহের ন্যাস—পুলক-রোমাঞ্চ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র, দেবতা ও ঋষিগণ যেন জাগ্রত ও জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়া সকলের প্রাণ, মন, বুদ্ধি এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিলেন।

রামনাথ যখন বর্ণমালা জপ করত ভূতশুদ্ধি করিতে ছিলেন, তখন হরিহরের স্তিমিত নয়নদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল। কাব্যতীর্থ মহাশয়ও তাহার কিঞ্চিৎ অংশ লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। হরিহর যেন দেখিতে পাইল 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত উনপঞ্চাশৎ বর্ণমালা জীবন্ত ও জাগ্রত কিছু। তাহাদের অতুল শক্তি সম্পন্ন জাজ্জল্যমান প্রভায় রমানাথের স্থূল দেহ, এত উজ্জলতা লাভ করিয়াছে যে তাহার দিকে চাহিতে যেন চক্ষু ঝলসিত হইয়া উঠে; কিন্তু উহা এত শীতল ও মধুর যে নয়ন তাহা ছাড়িতে পারে না। ক্রমে ক্রমে রমানাথের সর্ব্বাঙ্গ ইন্দ্রিয়াদি যখন পরা দেবতার জ্যোতির্ম্ময় শরীরে ন্যস্ত হইয়া, তাঁহার বিশ্বরূপের সহিত একতানতা লাভ করতঃ পুনরায় দেবী মূর্ত্তিতে ন্যস্ত হইল, তখন—যখন পূজকের প্রাণ দেবীর প্রাণে সন্নিবেশিত হইল—তখন সেই মূর্ত্তি, সেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি, যথার্থ, জীবন্ত ও জাগ্রত চিন্ময়ীরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার করধৃত বীণা কি অপ্রাকৃত মধুর রাগিণীতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সেই ঝঙ্কার যাহার কাণের ভিতরে প্রবেশ করে তখনই তাহার মর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ে, হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্ব সন্দেহ ছিন্ন হইয়া পড়ে; তখন জগত আর জগত থাকে না সুগন্ধময়ী বিভূতিস্বরূপ ধারণ করে। দেবীর কর-কমলতলে অনুরাগ-রঞ্জিত পুস্তক সমূহ অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ বিদ্যা-মূর্ত্তিতে শোভমান; জগতের যাবতীয় বস্তু, যাবতীয় শক্তি, ক্রিয়ারাশি কেন্দ্রিত

হইয়া যেন জ্ঞানের প্রেমময় গ্রন্থিতে গ্রথিত হইয়া পুস্তকরূপে অভিহিত হইতেছে। উহা কেবল আভাস ও ইঙ্গিত মাত্র, সর্ব্ববিশ্ব যেন একটী সঙ্গীতের ইঙ্গিতরূপে ঐ যেন কোথায় কোন পরম বিশেষে মিশিতে চলিয়াছে। সেই গতির অন্তই যেন চিন্ময়ী বাণী মূর্ত্তিমতি বাগ্দেবী। বিহ্বল বিভোর, বাহ্যজ্ঞান হারা, সংজ্ঞাহীন হরিহর দেখিতে পাইল রমানাথের হৃদয় ফলকে সর্ব্বদেবময়ি বাণী উজ্জ্বল জ্যোতিতে বিরাজমান,—বাহিরের মূর্ত্তি ও অন্তরের মূর্ত্তি এক, অভেদ !! সর্ব্ব উপচারেও উপাদানে দেবী স্বয়ং বিরাজিত, অর্পণেও দেবী, অর্চ্চনেও দেবী, পূজকও দেবী, পূজাও দেবী। মানস পূজান্তে দেবীকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে বাহিরের মূর্ত্তিতে আনয়ন পূর্ব্বক, অন্তর বাহিরে সমতানে মিলিত করিয়া রমানাথ দেবীর অর্চ্চনা করিতেছে। দেবী হাসিতেছেন, দেবী কথা বলিতেছেন তাহা সকলে বুঝিতে পারিল না। কেবল রমানাথই বুঝিল, রমানাথ তদীয় স্থূল দেহদ্বারা দেবীর চরণ বন্দন করিলে, দেবী সম্মুখস্থ ঘট হইতে একটী অমল ধবল পদ্ম পুষ্প লইয়া রমানাথের হাতে দিল, রমানাথ তাহা গ্রহণ করিল ও ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল "মা, আবার কি কেবল এই ফুলের খেলায় ভুলাইয়া রাখিবি মা !" মাতা কহিলেন "যে একবার আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিয়াছে, সে কি আর খেলায় ভুলে ; এই নির্ম্মাল্য পুষ্পের দ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইবে, সময়ে জানিতে পারিবে।" রমানাথ কহিল "মা আমার হরিহর" দেবী তাহাকে বাধা দিয়াই যেন বলিলেন ঐ দেখ তোর হরিহর এখানেও জাগ্রত রহিয়াছে আর সকলেই নিদ্রাগত। পুলককম্পিত হরিহর কি বলিতে যাইতেছিল। দেবী কহিলেন—

যংকাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি, তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

বলিয়া দেবী রমানাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বাবা আজিকার পূজা শেষ হইয়াছে। শান্ত হও আমিত কখনও তোমাদের হৃদয় ছাড়া নই, আর ভ্রান্তির অবকাশ নাই।" এই বলিয়া যেন দেবী মূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিত হইল। তখন সকলে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক সমকণ্ঠে "ত্রিবিধাং ভারতীং" প্রপদ্যে বলিয়া দেবীর চরণে কুসুমাঞ্জলী প্রদান করিল। সকলে দেখিল ঘটের উপরকার ফুলটী উড়িয়া আসিয়া রমানাথের হস্তোপরি সংস্থাপিত হইল।

রমানাথ হরিহরের দিকে, ভোলানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দিকে তাকাইলেন। তাঁহাদের নয়নের ভাষা তাঁহারাই বুঝিল। আমরা বুঝিলাম মায়ের তাড়নদণ্ডের মূলেও মায়েরই হাত।

পূজাবসানে ছাত্রগণ আপনা আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "কি ? এ'রি মধ্যে পূজা হ'য়ে গেল ? সবে'ত আধ ঘণ্টা খানিক হ'ল পূজায় বসেছেন !" হরিহর ঘড়ি দেখিয়া বলিল "বেলা ১টা বাজিয়াছে"। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে মাঘের স্পৃহনীয় মরীচিমালি মধ্যাহ্নের সীমা অতিক্রম করতঃ পশ্চিমাভিমুখে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছেন। জাগ্রত জীবকণ্ঠের জয়রব-পরায়ণা প্রকৃতির সহিত পুরমহিলাগণের মাঙ্গল্য হুলুধ্বনি ও শঙ্খ ঘণ্টারবে সরস্বতীর পদবন্দনা পূর্ব্বক সকলে আসন ত্যাগ করিল।

ভদ্রকাল্যৈ নমোনিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এবচ ॥
অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী।
মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতীবাক্ সরস্বতী।
আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্ব্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী ॥
মেধে সরস্বতী বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং পসীদেশে নারায়ণিনমোস্তুতে ॥

ওঁ তৎসৎ

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রী মতী—

শ্রীভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বে ভাগবতের ব্রহ্ম ও পরমাত্মাভাবের অনুশীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইবার উহার ভগবদ্ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমেই স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই ত্রিভাবে লীলাপরায়ণ তত্ত্বটী 'এক'। উহা 'অদ্বয়' ভেদ-ভাব-বর্জ্জিত স্বরূপ প্রতিষ্ঠ জ্ঞানতত্ত্ব। নিমিরাজার প্রশ্নে সংসাররূপ পিপ্পলের ভোক্তা জীবগণের 'অয়ন' বা গতিরূপ পিপ্পলায়ন ঋষি বলিয়াছিলেন—

নৈতন্মনো বিশত বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমার্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধক নিষেধতয়াত্ম মূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥ ৩৬,

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপ তয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃপরংযৎ ॥ ৩৭

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।৩।

এতৎ পরং তত্ত্বং মনো ন বিশতি ন বিষয়ী করোতি। বাক্ উত চক্ষুশ্চ আত্মা বুদ্ধিশ্চ প্রাণশ্চ ন প্রাপ্নোতি। অন্যানি চ ইন্দ্রিয়ানি ··
শব্দোঽপি আত্মমূলং আত্মনি প্রমানং সৎ অর্থোক্তং অর্থাৎ উক্তং যথা ভবতি তথা আহ ন সাক্ষাৎ। কুতঃ। বোধক নিষেধতয়া। স্বস্যৈব বোধকস্য নিষেধরূপত্বাৎ। নম্নু তর্হি প্রমানাবিষয়ত্বাৎ নাস্তি ব্রহ্মেতি উপসজ্যেত। অতঃ আহু তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব ভাতি সৎ কার্য্যং অসৎ কারণং তয়োর্পরং যৎ। নম্নু কথমেকং বহুবিধস্য কারণং তত্রাহ উরুশক্তি। বহুধা ভাণমেব দর্শয়তি যদেকং ব্রহ্ম তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃৎ প্রধানং প্রবদন্তি। ততঃ ক্রিয়া শক্ত্যা সূত্রং, জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি তদেব প্রবদন্তি। ততঃ অহমিতি জীবং ততশ্চ জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়া। জ্ঞান শব্দেন দেবতাঃ, ক্রিয়াং ইন্দ্রিয়ানি অর্থাঃ বিষয়াঃ, ফলং তৎপ্রকাশং।" শ্রীধরঃ।

সেই পরতত্ত্বকে মন বিষয় করিতে পারে না। বাক্ বা বাহ্য প্রকাশ শক্তি চক্ষু, আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণও তাঁহাকে ধরিতে পারে না ইন্দ্রিয়ের আর কথা কি? শব্দ বা শাস্ত্র প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাকে দেখাইতে পারে না। অর্থোক্তরূপে 'তন্ন তন্ন' করিয়াই তাঁহার ইঙ্গিত করিতে পারে। অথচ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন 'তন্ন' প্রভৃতি নিষেধ ভাবের সিদ্ধি হয় না। তাহা হইলে কি ব্রহ্মের প্রমান না থাকাতে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানতত্ত্ব নাই। না, সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও কারণ ভাবের মধ্য দিয়া এক ব্রহ্মই প্রকাশিত হইতেছেন। যদি বল বহুভাবে প্রকাশিত এই ব্যক্ত জগতের একটী কারণ থাকা অসম্ভব তাহা হইলে জানিও শাস্ত্র তাহাকে উরুশক্তি নামে অনন্ত শক্তির আধার বলিয়া অভিহিত করেন। বহুর ভাবটী ভাণ মাত্র। এই ব্রহ্মই সত্ত্ব রজঃ তম রূপে ত্রিবিধ প্রধান হন, পরে ক্রিয়াশক্তির ভিতর দিয়া সূত্র রূপে, এবং জ্ঞানশক্তির ভিতর দিয়া মহৎ রূপে প্রকাশিত হ'ন। ইহাকেই জীবগণ অহং নামে অভিহিত করে। তার পর জ্ঞান অর্থাৎ দেবতা, ক্রিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, অর্থ অর্থাৎ বিষয় রূপে ব্যবস্থিত হইয়াও সুখ, বোধ প্রভৃতি একত্ব রূপে, একত্বের ভাবে, সেই ব্রহ্মই ফুটিয়া উঠিতেছেন।

শ্লোক হইতে বুঝা গেল যে এই জ্ঞানতত্ত্বে কেবল দুইটি ভাব আছে—

'অস্তি' ও 'ভাতি'। সর্ব্বের আধাররূপ এই এক জ্ঞানতত্ব আছে বলিয়া যত কিছু নিষেধ ভাবের পরিসমাপ্তিও সিদ্ধ হয়। এই নিষেধ ভাবটীকে বেদান্তে 'নেতি', 'তন্ন' নামে অভিহিত করে; এবং এই নিষেধ মার্গটী স্বরূপ অববোধের এক মাত্র মার্গ ইহা ভাগবতও পুনরায় ঘোষনা করিলেন। সুতরাং অদ্বয়জ্ঞানতত্বের বোধের জন্য আমরা এই নিষেধ ভাবের একটু অনুশীলন করিব।

আমরা বিষয় ত্যাগ করিতে যাই কেন? বিষয়ের ভিতরেও ত সেই ব্রহ্মই প্রকাশ হইতেছে। তবে কেন মহাপ্রভু অর্দ্ধখণ্ড হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তবে কেন ইন্দ্রিয় সুখ ও কাম সর্ব্বশাস্ত্রে পরিত্যাজ্য? তবে কেন মনকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করা এবং বুদ্ধিকে প্রত্যাহৃত করা আবশ্যক? তবে কেন সর্ব্বশেষে চিত্তের সর্ব্বভাবের প্রকাশ ভাবকে বা সর্ব্বার্থতাকে সমাধির স্তরে ত্যাগ করিতে হয়? সাধনার প্রত্যেক স্তরই এই নিষেধের উপর স্থাপিত। সর্ব্বত্রই 'ন+ইতি' যাহা দেখিতেছ তাহা নয়, দৃষ্ট ভাবের পশ্চাতে অনুসন্ধান কর এই ভাষাটী বুঝিতে হইবে, এইরূপে না না বলিয়া কিরূপে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় এ রহস্যটী কি কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? বাহ্যলীলায় ও ত এই ভাষা! ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাতেও ত 'নেতি'রই খেলা, বস্ত্র হরণটী ত' সম্পূর্ণই 'নেতি'।

তবে সাধকের 'নেতি' ও নাস্তিকের 'নাস্তি' এই দুই জ্ঞানের মধ্যে কি কিছু পার্থক্য আছে। ব্যক্ত ভাবে নাস্তিকের বুদ্ধি অভিভূত। তিনি ব্যক্তের কষ্টি-পাথরটী লইয়া পরিমান করিতে গিয়া দেখেন যে সত্য পদার্থ কখন ও ব্যক্ত বস্তু ভাবের মত নহে। তাহার চিত্তে কিছু একটী পদার্থের অভাব আছে সকলের পশ্চাতে যে এক সত্য পদার্থ আছে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আসে নাই। সুতরাং ব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিতে গিয়া তিনি অন্ধকারে পতিত হন। সাধকের ভাষা অন্য রূপ। শ্রীগুরু কৃপাতেই হউক আর ভগবানের কৃপাতেই হউক অথবা পূর্ব্বকৃত পুণ্যের ফল স্বরূপ মহত্ব ভাবের দ্বারাই হউক তাঁহার হৃদয়ে যে একত্ব ভাবের আভাস পড়িয়াছে এই আভাসটী দিবার জন্যই গুরু, ঋষি ও শাস্ত্রের এত মহিমা। "তৎপদং-দর্শিতং-যেন" আপ্তগণ ভক্তের হৃদয়ে তাঁহাদের অনুভূত ভাবটী সংক্রমণ করিয়া দেন। "স্ববোধ সংক্রমণান্তরে শব্দেন উপদিশন্তি।" তাঁহারা মনের ভাষায় কথা কহেন না, বুদ্ধির ভাষা প্রয়োগ করেন; তাহা না হইলে এক খণ্ড লবণ জলে মিশাইয়া দিয়া তাহা হইতে "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" উপদিষ্ট হইতে পারে না।

এইরূপে ভাগ্যবান সাধকের হৃদয়ে তত্বের অবভাস হয় সে জানেনা

তত্ত্বটী কি? কি খুজিতেছি তাহাও তাহার বোধ নাই। তাহার হৃদয়ে এই ক্ষণভঙ্গুর গতিশীল খেলাঘরের খেলার অতিগ কি একটা শান্ত পরিপূর্ণ শুদ্ধ বস্তু বা তত্ত্বের জন্য পিপাসা জাগিয়া উঠে। যোগদ্বারা লব্ধ উচ্চলোকের প্রত্যাশা সে করে না। এই একত্ববোধটী হৃদয়ের ভিতর জাগিয়া আছে বলিয়াইত আমরা আমাদের 'আমি'টীর স্থিতির জন্য মর্ম্মরের (মার্ব্বেলের) প্রতিমূর্ত্তি গঠন করি, কবিত্বপ্রভৃতির ভিতর দিয়া অমৃতত্ত্বের প্রত্যাশা করি, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় এই অপরিস্ফুট তথ্যটীকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন বটে; কিন্তু সকল সাধকের ভিতর প্রকাশিত মনস্তত্ত্বের স্বরূপটী এক। সকলেই বাহ্য বা "সর্ব্বের" সহিত ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের যে ভাবটী আছে তাহার পরিসমাপ্তি বা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এই মনস্তত্ত্বের আরোপ করি। যার যে কামনা আছে তার সেই কামনাটী পরিপূর্ণ হইবে ইহাই সকলের ভাষা। রমণীর প্রতি কাম আছে বলিয়া হয়ত' অপ্সরাসিদ্ধির দিকে যাইতে পারি, কিন্তু তাহার ভিতরেও এই কামনার পরিসমাপ্তি বা পরিপূর্ণতার ভাবটী পূর্ণ রহিয়া গেল। এইটী প্রথম ভাষা। তারপর আমরা সকলেই চাই যে, সেই লক্ষ্যে আমাদের 'আমি'টীর অবস্থিতি ঘটিবে, উহা ও 'আমি'টীকে বর্জ্জিত করিয়া থাকে না। আমরা আমাদের 'আমি'টীর সহিত রূপভাব বা শক্তিভাব না মিশাইয়া থাকিতে পারি না। সেইজন্য সেই লক্ষ্য পদার্থের সহিত একরূপত্ব ও তাহার মত শক্তিমান হইব ভাবিয়া হয়ত ছোট ভাবের মোক্ষ চাহিতে পারি। প্রেমের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই না বলিয়া হৃদয়ের ক্ষেত্রে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের ভাষা প্রেমের ক্রীড়াদ্বারা তাঁহার সহিত মিলনের জন্য পিপাসিত হই। জ্ঞানের তৃষা মিটেনা বলিয়া তাঁহাকে জগদ্‌গুরুরূপে স্থাপিত করিয়া জ্ঞানঘনভাবে মিশিতে ইচ্ছা করি। প্রত্যেক ভাবেই কিন্তু একই তথ্যের প্রমাণ হইতেছে। যাহাকে খুজি সে 'পর' বা বাহিরের হইলেও 'অহং' এর পরিসমাপ্তি বা সোঽহং।

এইরূপে তিনটী মূলভাবে সাধকের 'আমি' থাকে ও সেই সেইজন্যই সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব 'ব্রহ্ম' "পরমাত্মা" ও 'ভগবান' এই ত্রিবিধ ভাবে উপলক্ষিত হন।

তাই বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীজীবগোস্বামী বলিলেন,—যে, যেসকল পরমহংসগণ সাধনবশে ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য বা একাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং যাঁহারা স্বরূপ ভাবে বিশেষ অংশ গ্রহণে অসমর্থ তাঁহারা সেই 'সম' রূপ একত্ব ভাবটীকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করেন। "স্বদীয় স্বরূপশক্তি বৈচিত্র্যাংশ

গ্রহণাসমর্থে চেতসি সামান্যতঃ লক্ষিতং স্ফুরৎ অবিবিক্তশক্তিপ্রাতপদ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে।" এবং তথানুভবৈক সাধকতমঃ স্বদীয় স্বরূপানন্দশক্তি-বিশেষাত্মকভক্তি ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ফুরৎ বিবিক্ততাদৃশশক্তি শক্তিমত্তাভেদেন প্রাতপদ্যমানং ভগবানিতি শব্দ্যতে।" অর্থাৎ যাঁহারা ভগবানের অনুভবের জন্য ভক্তি ভাবিত ভগবানের বিশেষভাবে চিত্তস্থাপিত করেন তাঁহারা তাহাকে ভগবান্ শব্দে লক্ষিত করেন। "শক্তিবর্গ লক্ষণ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি।" শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ও তাহাদের ধর্ম্ম বা অবয়বীভাব যখন ছাড়িয়া দিতে পারা যায় তখন এক ও কেবল জ্ঞান স্বরূপ তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে দেখা যায়।

"অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুরাচচ্ছক্ত্যাংশবিশিষ্টা পরমাত্মেতি "অর্থাৎ যখন তাঁহাকে মায়াশক্তিরূপক্ষেত্রে অন্তর্যামীরূপে এবং প্রচুর চিৎশক্তি বা জ্ঞানশক্তি সংবলিত বিশেষভাবে দেখা যায় তখন তিনি 'পরমাত্মা' রূপে শব্দিত হন।

"পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানিতি।" অর্থাৎ সর্ব্বভাবের শক্তিগুলি যে পরিপূর্ণতারূপ শুদ্ধ পুরুষভাবে মিশিয়া যায় সেই ভাবের উপর চিত্তের প্রাধান্য থাকিলে তখন তিনি 'ভগবান' শব্দে শব্দিত হন্।

তিনটী ভাবেই এক অদ্বয় জ্ঞান ঘন সত্বাকে লক্ষিত করা হইতেছে। অতএব বুঝা গেল ব্রহ্ম, ভগবান প্রভৃতি ভাবগুলি আমাদের ভিতরের শুদ্ধ 'আমি'র ভাবের উপরে নির্ভর করে। তত্ত্বটি 'এক' এবং তাহার স্বরূপ 'অদ্বয় জ্ঞান'। ত্রিপুটীর জ্ঞান নহে ঘনএকত্ব বাচক চৈতন্য। অন্তর ও বাহির্ভাব শূন্য স্থির ও শাশ্বত। আমি ও জগৎ, এই চৈতন্যক্ষেত্রে বুদ্বুদের মত উঠিতেছে।

এই ঘন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বিগতমোহ, বাহ্যভাব ও সঙ্গবর্জ্জিত, সর্ব্বদা 'আমি'ভাবের অধিকরণরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিস্থাপিত, এবং যাঁহাদের কাম আর বস্তাভিমুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে সেই বিশিষ্ট অহং ভাব বর্জ্জিত—

নির্ম্মান মোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ

সাধকগণ ব্রহ্মভাবে ভগবানকে দেখিতে পান। বিশেষ অহঙ্কার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আর বিশেষ ভাব দেখিতে চাহেন না। বিশেষ শব্দে তাঁহারা 'শেষ-ভাব-শূন্য', সুতরাং গতিশূন্য, প্রবাহশূন্য স্থির চৈতন্য! তাঁহারা কি ভগদ্ভাব ও পরমাত্মা ভাব বুঝিতে পারেন না? তাহা নহে। আর সেই স্থির স্থিতপ্রজ্ঞ পরিশুদ্ধ 'আমি'র কাছে, বাহিরের

খেলাদ্বারা, বিভূতিদ্বারা বেশী মহিমার প্রকাশ হয় না। 'আমি'কে নির্দ্দেশ ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া আর নির্দ্দেশ করিয়া দেখিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না।

পরমাত্মা ভাব যোগমার্গে সিদ্ধ। সবিকল্পসমাধির অবস্থাতে পরিপক্ক 'আমি'র নিকট প্রকাশিত হয়। আমিটিকে খেলার অবসান বলিয়া বুঝিয়া তাঁহারা আর আমির বাহিরে আসিতে চাহে না, তাই ভগবান তাহাদের নিকট জ্ঞান-ঘন ভাবে, পরমাত্মারূপে দেখা দেন। এখানে একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক, বিশেষ মাত্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বগত আমিকে লইয়া যখন ব্রহ্ম ভাব ফুটিয়া উঠে তখন আমিতে আর তাঁহাতে কোন ও ভেদ থাকে না। তবে একটু বৃংহন শীলত্ব বা ব্যাপ্তি ভাবটী ব্রহ্মে দেখিতে পান। 'আমি'র বিন্দুও জল বটে, ব্রহ্মসমুদ্রও জল বটে, তবে কি না একটু পরাভাব ব্রহ্মে থাকে। জগৎ নাই, ভেদের মাপকাটি নাই, সুতরাং সেই সমরস ক্ষেত্রে 'পর' শব্দে আর ভেদ ভাব নাই অথচ একটু পরভাব রহিয়া গেল, জীব বুঝিতে পারিল যে অহং' 'স' হইলেও 'স'য়ে' অহংএর পরি সমাপ্তি; বিপরীত ভাবে নহে। তেমনি পরমাত্মা ভাবে আমির ভিতর তিনি ফুটিলেও ঐ পরিসমাপ্তি বুদ্ধিটি থাকিয়া যায়।

ভগবৎ ভাবের স্বরূপ কি? ভাগবৎ বলিলেন—

অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া॥ ভাগ।৩।২৬।১৮

কোঽসৌ ভগবান, তমাহ অন্তরিতি। অন্তঃ প্রাণিনাং যঃ পুরুষরূপেণ নিয়ন্তৃত্বেন সমন্বেতি সম্যক তদ্বিকাররহিত এবানুস্যূতো বর্ত্ততে, বহিশ্চ কাল রূপেণ এষ ভগবান। (শ্রীধর)

অর্থাৎ কে এই ভগবান, যিনি প্রাণিগণের ভিতরে শেষ বা পরিসমাপ্তিরূপে, পুরুষ রূপে, ভাবও সত্ত্বা সমূহকে সম্যকভাবে অথচ ক্ষুদ্র ভাবগুলি দ্বারা বিকার প্রাপ্ত না হইয়া ঘন সম ও একত্বরূপ বর্জ্জন না করিয়া মিশাইয়া দেন যাঁহার একত্ব আছে বলিয়া বিষয় ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়, মনে, এইরূপে ঘন হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে; যাঁহার একত্বে উজ্জীবিত হইয়া ব্যক্ত প্রাণীগণ ঘনীভূত হয় এবং যিনি পূরের ভিতর সর্ব্ববৃত্তির অবসানরূপ 'কারণাত্মা' বা 'কারণ আমি' কে আধার করিয়া পুরুষ রূপে অবস্থান করেন তিনিই ভগবান। আর, যিনি বাহিরের জগদ্ভাবে কালরূপে ছিন্ন ও ব্যক্তভাব ও তত্ত্বগুলিকে কলন করিয়া খেলেন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্বসমূহ প্রসূত হয় তিনিই ভগবান। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

নিবেদন।

সংসারের সকল কার্য্যেরই ত্রুটি সম্ভব ও সকল প্রকার ত্রুটির মূলেই এক একটা অজুহাত বা কৈফিয়ৎ চলিতে পারে; কিন্তু উহার সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে বিচারকের উপর নির্ভর করে। এই বৎসরের পন্থা-পরিচালন-কার্য্যে আমাদিগের অনেক ত্রুটি আছে, আমরা তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমাদিগের ত্রুটি স্বীকার দ্বারা গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের বিশেষ কোনও লাভ নাই সত্য, কিন্তু সংরক্ষণ ধর্ম্ম তাহাদের কর্ত্তব্য। ইয়োরোপ খণ্ডের সমরব্যাপদেশে অস্মদ্দেশে কাগজের অভাবটী গুরুতর। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক মূল্য দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাগজ পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং 'পন্থা'র কলেবরের কিছু খর্ব্বতাসাধনই উহার মূল্য বৃদ্ধি অপেক্ষা সমীচীন বিবেচনা করত আগামী বর্ষে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই ত্রুটিটি আগামী বর্ষে কাগজের বাজার সুলভ না হওয়া পর্য্যন্তই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি বর্ত্তমান বর্ষেও আমাদিগকে কলেবর খর্ব্ব করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আগামী বর্ত্তমান সংখ্যার ন্যায় আট ফর্ম্মার স্থলে বোধ হয় ছয় ফর্ম্মা কাগজ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অনুমান করিতেছি।

এই বৎসরে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে অথচ তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া উঠিতে পারে নাই, আগামী বর্ষে ঐ সকল প্রবন্ধ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা রহিল। তন্মধ্যে 'ভাগবতের উপদেশ' ও 'সহজ যোগ' ছাড়িয়া দিলেও 'পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ', 'বৈয়াসিক ন্যায়মালা', 'সন্ধ্যাতত্ত্ব', 'প্রকৃত পূজা', 'সাধক সর্ব্বানন্দ' বা 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি কতিপয় প্রবন্ধ এখন কিছুকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। এতদ্ব্যতিরেকে দৈবকর্ম্ম, তর্পণ, ব্রত ও দেবার্চ্চন প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও উহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা বলিতে পারি না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। আগামী বর্ষে আমাদের বিংশ বর্ষ শীর্ষক প্রবন্ধে উহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

ধর্ম্মপন্থাবলম্বী বলিয়াই পন্থা 'পন্থা'। সংসারের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণের দরিদ্রতা ভূষণস্বরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যেই দরিদ্রতা অনশন-ক্লেশজনিত ক্ষীণতা আনয়ন করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া সাংসারিক কার্য্য চলিতে পারে না। এই অর্থকৃচ্ছ্রতাও আমাদিগের এই বৎসরের ত্রুটির একটী প্রধান কারণ। তাহাতে অনেক গ্রাহক যখন বর্ষ-ভোর আমাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়াও বর্ষান্তে মূল্য না দিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, তখনকার ক্লেশ অসহনীয়; সুতরাং এই মহা ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য পরিচালিত 'পন্থা'র এই ত্রুটি মার্জ্জনীয় এবং আশা করি গ্রাহকগণ পত্রিকা প্রত্যাখ্যান করিয়া আমাদিগকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। ইতি—

শ্রীমদনমোহন বর্ম্মণ—ম্যানেজার।